ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1856

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1856

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

রচনায়

মোঃ আলী করিম
মুহাম্মদ ওমর ফারুক
মোঃ সাইফুল্লাহ
মোঃ নুরুল আমিন
এ কে এম ইফতেখারুল ইসলাম

সম্পাদনা

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইব্রাহিম

সমন্বয়কারী

মোঃ আলী করিম

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

Islamic History and Culture

প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC 1856

এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রকাশকাল : আগস্ট, ২০১৭
পুনঃমুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮
পুনঃমুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
অনলাইন ভার্সন: জানুয়ারী, ২০২২

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫।

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ সিদ্দিকুল ইসলাম

কভার গ্রাফিক্স
আব্দুল মালেক

ছবি/মানচিত্র: সংগ্রহ

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 978-984-34-3149-3

মূদ্রণ
অনুপম প্রিন্টার্স
মাতুয়াইল মোঘল নগর
কদমতলী রোড, মাতুয়াইল ১৩৬২, ডেমরা, ঢাকা।

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

বিষয়ের নাম: ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি কোর্স কোড: এইচএসসি-১৮৫৬ (HSC-1856)

জাতীয় জীবনের উন্নয়নে এবং গতিশীল জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। সুশিক্ষিত জনশক্তি ছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা ও প্রাথমিক স্তরের অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এ শিক্ষাক্রম বিন্যাস করা হয়েছে। যা ইসলামের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটিয়ে অতীত ঐতিহ্যের অনুসন্ধান এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল হতে অনুপ্রাণিত করবে। দেশের ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বাস্তবতায় এরই প্রয়োগের দিকটি বিবেচনায় রেখে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়েও জ্ঞান, দক্ষতা এবং মানবতাবোধ সম্পন্ন জনশক্তি তৈরি করা যায়। এই শিক্ষাক্রমকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয় আত্মস্থ করতে পারে, বিষয়বস্তুকে সহজে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়। মুখস্থ বিদ্যা নিরুৎসাহিত করে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করার জন্য আরও জীবনঘনিষ্ঠ এবং অধ্যয়ন সহজতর ও আনন্দদায়ক করার কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের বিবেচনায় নিয়ে স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। যেহেতু, এ পাঠ্যপুস্তক একইসঙ্গে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবে, তাই বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বুঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রতিটি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা, ইউনিট সম্পর্কীয় নির্দেশনা ও ইউনিট বিভাজন (পাঠ) দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর কাছে পাঠটিকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও সহজতর করার জন্য বিষয়বস্তু আলোচনার সময় মাঝে মাঝে 'শিক্ষার্থীর কাজ' (যা অ্যাক্টিভিটি নামে পরিচিত) সংযোজন করা হয়েছে। প্রয়োজন মাফিক মানচিত্র, ছবি, চার্ট ও টেবিল ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ শেষে পাঠের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ে সারসংক্ষেপ দেয়া হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থী পাঠটি পুনরায় ঝালিয়ে নিতে পারে। শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ও সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন এবং ইউনিটের শেষে উত্তরমালা দেয়া হয়েছে। স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকটি সুখপাঠ্য ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করা যায়।



কোর্স বই অনুসরণ করার প্রয়োজনীয় পরামর্শ

এই বইটি দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামত সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এখানে পাঠ্যপুস্তক একইসাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। এ কারণেই বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বুঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে।

কোর্স বইটির ভাবগত ঐক্য রক্ষা করে পাঠের বিষয়বস্তুকে কতগুলো ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। আবার ইউনিটগুলোকে কতগুলো পাঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠের শেষে আপনি নিজেই নিজের পাঠের অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে পারবেন। এজন্য পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়ন এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন রয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে এ বই পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল ঃ

- ইউনিটের শিরোনাম ও ভূমিকা পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- প্রথম পাঠের সবগুলো 'উদ্দেশ্য' পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালভাবে অধ্যয়ন করুন। বিষয়বস্তু অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হলো কি না তা ভালভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন। কোথাও চিত্র থাকলে চিত্রের সাথে বিষয়বস্তু মিলিয়ে পড়ুন।
- কোন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য তা পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- প্রতিটি ইউনিটের বিষয়গুলো ভালভাবে বোঝার জন্য প্রতিটি ইউনিটের প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাকটিভিটি (এসো নিজে করি) সংযোজন করা রয়েছে। ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালভাবে অধ্যয়ন করে অ্যাকটিভিটিগুলো সম্পন্ন করুন।
- পাঠশেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। ইউনিটের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভাল করে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এরপর চূড়ান্ত মূল্যায়ন অংশের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে কিনা দেখুন। জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ আবারও পড়ুন।

টিউটোরিয়াল ক্লাস সম্পর্কিত পরামর্শ

- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য প্রতি মাসে টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশ গ্রহণ করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল অধ্যায়কে ততটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত প্রথম অংশটি ভালভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করুন, প্রয়োজনে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন। টিউটোরিয়াল ক্লাসে যোগ দিয়ে আপনি বইটি পড়তে গিয়ে যেগুলো কঠিন/দুর্বোধ্য বলে চিহ্নিত করেছেন সে সকল বিষয় বুঝতে স্টাডি সেন্টারের টিউটরগণের সহায়তা নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ইউনিটের সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মডিউল এর কোনটি শিখনফল, কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোনটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইনকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

 কোর্সবই অনুসরণের নির্দেশনা	 কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	 উদ্দেশ্য	 বিষয়বস্তু/মূলপাঠ	 ভিডিও বা দেখা	 অডিও বা শোনা
 **অ্যাসাইনমেন্ট**	 কেস স্টাডি	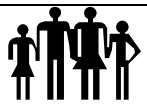 দলীয় কাজ	 ব্যবহারিক	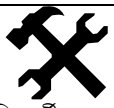 শিক্ষার্থীর কাজ	 সারসংক্ষেপ
 পাঠোত্তর মূল্যায়ন	 শব্দার্থ/মুখ্যশব্দ	 চূড়ান্ত মূল্যায়ন	 উত্তরমালা	 সাহায্য/প্রয়োজনে	

 **কোর্স সমাপ্তির সময়**	**কোর্স সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩২ সপ্তাহ**

 **অডিও/ভিডিও**	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়গুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোন বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

 **ব্যবহারিক**	

 **প্রয়োজনে**	**যে কোন সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–** ১. আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর অথবা ২. **(মোঃ আলী করিম)** কোর্স সমন্বয়কারী, সহকারী অধ্যাপক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) ওপেন স্কুল, বাউবি গাজীপুর-১৭০৫। ই-মেইল: *alikarimsshl@yahoo.com*

সূচিপত্র

ইউনিট ১: প্রাচীন সভ্যতাসমূহ ---------- ১-২৬

পাঠ ১: মিসরীয় সভ্যতা ---------- ১

পাঠ ২: সুমেরীয় সভ্যতা ---------- ৬

পাঠ ৩: ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ---------- ৯

পাঠ ৪: পারসিক সভ্যতা ---------- ১২

পাঠ ৫: হিব্রু সভ্যতা ---------- ১৫

পাঠ ৬: গ্রিক সভ্যতা ---------- ১৮

পাঠ ৭: রোমান সভ্যতা ---------- ২২

ইউনিট ২: জাহিলিয়া যুগে আরব ---------- ২৭-৪৬

পাঠ ১: জাজিরাতুল আরবঃ পরিচিতি ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ---------- ২৮

পাঠ ২: আইয়ামে জাহিলিয়া ---------- ৩২

পাঠ ৩: জাহিলিয়া যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ---------- ৩৫

পাঠ ৪: জাহিলিয়া যুগে আরবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ---------- ৩৮

পাঠ ৫: জাহিলিয়া যুগে আরবের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ---------- ৪২

ইউনিট ৩: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা জীবন ---------- ৪৭-৭৪

পাঠ ১: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও প্রাথমিক জীবন ---------- ৪৮

পাঠ ২: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়াত লাভ ---------- ৫৩

পাঠ ৩: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কায় ইসলাম প্রচার ও কাফিরদের বিরোধিতা ---------- ৫৬

পাঠ ৪: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইসলাম প্রচারে কুরাইশদের নির্যাতন ও প্রতিকার ---------- ৫৯

পাঠ ৫: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মিরাজ ---------- ৬৩

পাঠ ৬: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনায় হিজরত ---------- ৬৮

ইউনিট ৪: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনা জীবন ---------- ৭৫-১১৪

পাঠ ১: মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাথমিক কার্যাবলি ---------- ৭৬

পাঠ ২: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব ---------- ৭৯

পাঠ ৩: বদর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ---------- ৮৩

পাঠ ৪: উহুদ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ---------- ৮৭

পাঠ ৫: খন্দকের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ---------- ৯১

পাঠ ৬: হুদাইবিয়ার সন্ধি ---------- ৯৫

পাঠ ৭: মক্কা বিজয় ---------- ৯৮

পাঠ ৮: হুনায়ুনের যুদ্ধ ---------- ১০১

পাঠ ৯: মুতার যুদ্ধ এবং তাবুক অভিযান ---------- ১০৪

পাঠ ১০: ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্পর্ক ---------- ১০৭

পাঠ ১১: বিদায় হজ্জের ভাষণ ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তিকাল ---------- ১১০

ইউনিট ৫: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র-কৃতিত্ব ও সংস্কারসমূহ ---------- ১১৫-১৩২

পাঠ ১: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র ও জীবনাদর্শ ---------- ১১৬

পাঠ ২: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মীয় সংস্কার ---------- ১১৯

পাঠ ৩: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সামাজিক সংস্কার ---------- ১২১

পাঠ ৪: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রাজনৈতিক সংস্কার ---------- ১২৪

পাঠ ৫: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অর্থনৈতিক সংস্কার ---------- ১২৬

পাঠ ৬: জাতি গঠনকারী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)---------- ১২৮
পাঠ ৭: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন ---------- ১৩০

ইউনিট ৬: খুলাফায়ে রাশিদীন (৬৩২-৬৬১ খ্রিঃ) ----------১৩৩-১৯০
পাঠ ১: খলিফা ও খিলাফত ---------- ১৩৪
পাঠ ২: হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ---------- ১৩৬
পাঠ ৩: রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ---------- ১৩৮
পাঠ ৪: হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিজয় অভিযানসমূহ ---------- ১৪১
পাঠ ৫: হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসন ব্যবস্থা ও চরিত্র ---------- ১৪৩
পাঠ ৬: হযরত উমর (রা.)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ ---------- ১৪৫
পাঠ ৭: হযরত উমর (রা.)-এর বিজয় অভিযানসমূহ---------- ১৪৭
পাঠ ৮: হযরত উমর (রা.)-এর প্রশাসনিক সংস্কার ---------- ১৫৩
পাঠ ৯: হযরত উমর (রা.)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব---------- ১৫৭
পাঠ ১০: হযরত উসমান (রা.)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ---------- ১৬০
পাঠ ১১: হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ ---------- ১৬২
পাঠ ১২: হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার ঘটনা ও ফলাফল ---------- ১৬৬
পাঠ ১৩: হযরত উসমান (রা.)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব ---------- ১৬৯
পাঠ ১৪: হযরত আলী (রা.)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ---------- ১৭২
পাঠ ১৫: উষ্ট্রের যুদ্ধ---------- ১৭৫
পাঠ ১৬: সিফ্ফিনের যুদ্ধ ---------- ১৭৮
পাঠ ১৭: হযরত আলী (রা.)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব ---------- ১৮৩
পাঠ ১৮: খুলাফায়ে রশিদীনের শাসনব্যবস্থা ---------- ১৮৬

ইউনিট ৭ ঃ উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০ খ্রিঃ) ----------১৯১-২২২
পাঠ ১: হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রাথমিক জীবন ও উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা---------- ১৯২
পাঠ ২: হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব---------- ১৯৬
পাঠ ৩: ইয়াযীদ ঃ কারবালার ঘটনা ও ফলাফল ---------- ১৯৮
পাঠ ৪: আবদুল মালিকের রাজ্য বিস্তার ও সংস্কারসমূহ ---------- ২০১
পাঠ ৫: আল-ওয়ালিদের রাজ্য বিস্তার ও কৃতিত্ব---------- ২০৫
পাঠ ৬: উমর ইবন্ আবদুল আযীয-এর শাসননীতি, সংস্কার ও কৃতিত্ব ---------- ২১০
পাঠ ৭: হিশামের শাসন ব্যবস্থা ---------- ২১৩
পাঠ ৮: উমাইয়া আমলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা---------- ২১৬
পাঠ ৯: উমাইয়া খিলাফতের পতন ---------- ২২০

ইউনিট ৮: আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮ খ্রিঃ) ---------- ২২৩-২৬৮
পাঠ ১: আব্বাসীয় আন্দোলন ও বংশ প্রতিষ্ঠা ---------- ২২৪
পাঠ ২: আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ ---------- ২২৭
পাঠ ৩: আবু জাফর আল-মনসুর এর শাসন ব্যবস্থা---------- ২২৯
পাঠ ৪: আবু জাফর আল-মনসুর এর চরিত্র ও কৃতিত্ব---------- ২৩৩
পাঠ ৫: আল-মাহদী ও আল-হাদী ---------- ২৩৬
পাঠ ৬: হারুন-অর-রশিদের খিলাফত লাভ এবং তাঁর অভ্যন্তরিণ ও বৈদেশিক নীতি ---------- ২৩৮
পাঠ ৭: হারুন-অর-রশিদের চরিত্র ও কৃতিত্ব---------- ২৪১
পাঠ ৮: খলিফা আল-আমীন ও আল-মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল ---------- ২৪৪
পাঠ ৯: আল-মামুনের শাসন ব্যবস্থা ---------- ২৪৮

পাঠ ১০: আল-মামুনের শাসন আমলে জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতি ----------২৫০
পাঠ ১১: আল-মুতাসিম বিল্লাহ, আল-ওয়াসিক ও আল-মুতাওয়াক্কিল ----------২৫৩
পাঠ ১২: বুয়াইয়া বংশের উত্থান ও পতন----------২৫৬
পাঠ ১৩: সেলজুক বংশের উত্থান ও পতন----------২৫৯
পাঠ ১৪: আব্বাসীয় বংশের পতন----------২৬২
পাঠ ১৫: আব্বাসীয় সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি----------২৬৫

ইউনিট ৯: স্পেনে মুসলিম শাসন (৭১১-১৪৯২ খ্রিঃ) ---------- ২৬৯-৩০৪

পাঠ ১: স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থা ----------২৭০
পাঠ ২: মুসলিম বিজয়ের পূর্বে স্পেনের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা----------২৭৩
পাঠ ৩: মুসলিমদের স্পেন বিজয় ও উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা ----------২৭৫
পাঠ ৪: টুর্সের যুদ্ধ ----------২৭৮
পাঠ ৫: প্রথম আব্দুর রহমান----------২৮১
পাঠ ৬: প্রথম হিশাম ----------২৮৪
পাঠ ৭: দ্বিতীয় আব্দুর রহমান----------২৮৭
পাঠ ৮: ওমর বিন হাফসুন ----------২৯০
পাঠ ৯ : তৃতীয় আব্দুর রহমান----------২৯৩
পাঠ ১০: দ্বিতীয় হিশাম ও হাজিব আল মনসুর----------২৯৬
পাঠ ১১: স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ----------২৯২
পাঠ ১২: শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে স্পেনের মুসলিমদের ভূমিকা ----------৩০২

ইউনিট ১০ : ফাতিমি খিলাফত ও আইয়্যুবী বংশ (৯০৯-১২৫০ খ্রিঃ) ---------- ৩০৫-৩৩২

পাঠ ১: ফাতিমিদের পরিচয় ও মিসরে খিলাফত প্রতিষ্ঠা ----------৩০৬
পাঠ ২: উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী,আল-কায়িুম ও আল-মনসুর ----------৩০৯
পাঠ ৩: আল-মুইয ----------৩১২
পাঠ ৪: আল-আযিয ----------৩১৫
পাঠ ৫: আল-হাকিম ----------৩১৮
পাঠ ৬: ফাতিমিদের পতন ----------৩২১
পাঠ ৭: জ্ঞান-বিজ্ঞানে ফাতেমিদের অবদান----------৩২৪
পাঠ ৮: ক্রুসেড ----------৩২৭
পাঠ ৯: আইয়্যুবী বংশ----------৩৩০

মানবণ্টন ও নমুনা প্রশ্ন ---------- ৩৩৩-৩৩৭

প্রাচীন সভ্যতাসমূহ

ইউনিট ১

ভূমিকা

পৃথিবী সৃষ্টির আদি থেকে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতা আজ এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আর এ কারণে মানব সভ্যতার বিকাশ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। আজ থেকে আনুমানিক প্রায় ১০ হাজার বছর পূর্বে শিকারী সমাজ থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজের উদ্ভব ঘটে। মাত্র ছয় থেকে সাত হাজার বছর পূর্বে মানুষ নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার সৃষ্টি করে। কৃষিভিত্তিক সভ্য সমাজ গড়ে উঠার ফলে কৃষিজীবী ও পশুপালক বা শিকারী এই দুভাগে মানব সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে কৃষক ও পশুপালক সমাজের মানুষেরা বহুবিধ উন্নত কর্ম কৌশল আবিষ্কার করতে থাকে এবং মানুষ স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাসও শুরু করে। ধারণা করা হয় এ সকল মানুষই ৬০০০ থেকে ৪০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে পশুটানা লাঙ্গল, চাকাওয়ালা গাড়ি, পালসহ নৌকা, প্রাথমিক ধাতু শিল্প এবং প্রাথমিক ধরনের পৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। আর এ সকল আবিষ্কার একের পর এক ঘটেছিল পশ্চিম এশিয়া, ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেঁষে পূর্ব ইউরোপ ও তৎসংলগ্ন উত্তর আফ্রিকায়। যার ফলে পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়া, পূর্ব ইউরোপের নিম্ন বলকান অঞ্চল ও মিসরে প্রথম নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। আধুনিক মানব সমাজ এ সকল সভ্যতার নিকট ঋণী। শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ ইউনিটে প্রাচীন নগর সভ্যতার উন্মেষ, রাজনৈতিক ইতিহাস, সমাজ, বিভিন্ন আবিষ্কার, ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করব।



প্রাচীন মিশরের পিরামিড



প্রাচীন গ্রিসের মানচিত্র

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় **১** সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১: মিসরীয় সভ্যতা
পাঠ ২: সুমেরীয় সভ্যতা
পাঠ ৩: ব্যাবিলনীয় সভ্যতা
পাঠ ৪: পারসিক সভ্যতা
পাঠ ৫: হিব্রু সভ্যতা
পাঠ ৬: গ্রিক সভ্যতা
পাঠ ৭: রোমান সভ্যতা

পাঠ-১.১ মিসরীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার সময়কাল ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় ধর্মবিশ্বাস, লিখন পদ্ধতি, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মিসরের নীলনদ, 'ফারাও', র‍্যামেসিস, 'আমন রে', পিরামিড ও মমি**

ভূমিকা:

মানুষ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে মাত্র ছয় থেকে সাত হাজার বছর পূর্বে নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। কৃষিজীবী ও পশুপালক বা শিকারী এই দুভাগে মানব সমাজ বিভক্ত ছিল কৃষি ভিত্তিক সভ্য সমাজ গড়ে উঠার ফলে। যার কারণে কৃষক ও পশুপালক সমাজের মানুষেরা বহুবিধ উন্নতি ও কর্ম-কৌশল আবিষ্কার করতে থাকে এবং মানুষ স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস শুরু করে। আর মিসরীয় অঞ্চলের এ সকল মানুষই ৬০০০ থেকে ৪০০০ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে বিভন্ন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। এ সকল আবিস্কারের কারণে মিসরে প্রথম নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। আর তাই আধুনিক মানব সমাজ মিসরের এ সভ্যতার নিকট থেকে উপকৃত হয়েছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ পাঠে প্রাচীন মিসরীয় নগর সভ্যতার উন্মেষ, রাজনৈতিক ইতিহাস, সমাজ, বিভিন্ন আবিষ্কার, ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শন ইত্যাদি আলোচনা করব।

মিসরীয় সভ্যতার কাল ও ভৌগোলিক অবস্থান

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমির দেশ মিসর। এছাড়া বর্তমান উত্তর আফ্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ এই মিসর। আজ থেকে প্রায় ৬ হাজার বছর পূর্বে নীলনদের অববাহিকায় মিসরীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। দেশটির উত্তরে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে সুদান নামক রাষ্ট্রটি অবস্থিত। এর পূর্ব দিকে বয়ে গেছে লোহিত সাগর এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত লিবিয়া। আর উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত তিউনিসিয়া। নীল নদের দান বলে খ্যাত মিসর ভৌগোলিক দিক থেকে দক্ষিণাঞ্চল (Upper) এবং উত্তরাঞ্চল (Lower) এই দু'ভাগে বিভক্ত। মিসরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত নীলনদ ভূমধ্যসাগরে মিলিত হয়েছে। বর্ষার সময় নীল নদের দু'কূল প্লাবিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি হতো। ফলে মিসরে উভয় অঞ্চলে পলিমাটি জমে উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।



মিশরের মানচিত্র

মিসর নীলনদের দান

নীলনদের পানি উপচে দু'কূল ছাপিয়ে যাবার ফলে নবোপলীয় যুগের মানুষের কৃষি উৎপাদনসহ অন্যান্য বিষয়াদি ভাসিয়ে নিঃস্ব করে ফেলত। প্রাচীন মিসরে প্রতি বছরের এ বন্যাকে রোধ করার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, কৃষির উপকরণ, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি বিকাশের সাথে সাথে নগরের বিকাশ ঘটতে থাকে যা মিসরকে সভ্যতার পটভূমিতে পরিণত করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মিসরীয় সভ্যতার সূচনাকারী জনগণ পানির প্রাপ্যতা, নীলনদকে কেন্দ্র করে কৃষি

উৎপাদন, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ ও পশুপালনের জন্য তৃণভূমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। নীলনদের দু'কুলে ৪ মাস স্থায়ী এ বন্যার সময় গাছ-গাছড়া পচে গিয়ে এবং এর সাথে জলধারায় পাহাড়ি লাল পাথুরে মাটি মিশে এক উর্বর পলিমাটির সৃষ্টি হতো। এ কারণে মিসরের এ অঞ্চলসমূহের জমি খুব উর্বর হতো। বিখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডটাস মিসরের উৎকর্ষতা দেখে বিস্মিত হয়ে তিনি মিসরকে "নীলনদের দান" বা "The gift of the Nile" বলে উল্লেখ করেছেন।

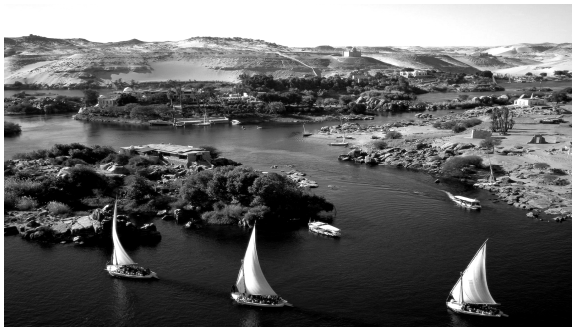

মিশরের নীলনদ

প্রাচীন মিসরীয় রাজনৈতিক ইতিহাস

ধারণা করা হয়, মিসরীয় সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩২০০ পর্যন্ত সময়কালকে মিসরের ইতিহাসে প্রাক-রাজবংশীয় যুগ বলা হয়। রাজা মেনেস নামে এক শক্তিশালী সামন্ত রাজা খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে উত্তর ও দক্ষিণ মিসরকে একত্রিত করে একটি বড় রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁকে মিশরের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। উচ্চ মিসরের রাজধানী ছিল থিব্স (Thebes)। দক্ষিণ মিসরের মেম্ফিশ শহরে নতুন রাজধানী স্থাপন করা হয়। রাজা মেনেসের পর থেকে তিন হাজার বছর পর্যন্ত প্রাচীন মিসরে ৩১টি রাজবংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। মিসরের প্রাচীন ইতিহাসকে ঐতিহাসিকগণ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেন। তা হচ্ছে প্রথমত: প্রাক রাজবংশীয় যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০-৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), প্রাচীন রাজত্বের যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০-২৩০০), সামন্ত যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০-২১০০), মধ্য রাজত্বের যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ২১০০-১৭৮৮), বৈদেশিক হিক্সসদের আক্রমণ (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০-১৫৮০) এবং নতুন রাজত্বের যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮০-১০৯০) পর্যন্ত।

প্রাচীন মিসরীয় শাসন ব্যবস্থা

নীল নদের অববাহিকায় প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার সূচনা হয় প্রাক-রাজবংশীয় যুগে। এ যুগে মিসরীয়রা কৃষি কাজে সেচব্যবস্থার বিভিন্ন কৌশল আবিষ্কার করে। এ ছাড়া তারা লিখন পদ্ধতি, উন্নতমানের কাপড়, সৌরপঞ্জিকা প্রস্তুত করতে শিখে। ৩২০০ খ্রি: পূর্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ প্রাচীন রাজত্বকালের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। রাজা মেনেস উত্তর ও দক্ষিণ মিসরকে এক করে একটি বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন মিসরের সম্রাটদের 'ফারাও' বলা হতো। ফারাও শব্দের অর্থ 'বড়বাড়ি'। বিশাল প্রাসাদে বসবাসকারী ফারাওদের মনে করা হতো ঈশ্বরের সন্তান। তাঁরা একই সঙ্গে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 'ফারাও'রা নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য ভাই-বোনের সাথে বিয়ের প্রচলন করেন। সম্রাটের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োজিত থাকতেন একজন উজির বা প্রধানমন্ত্রী। মিসরের 'ফারাও' বা সম্রাটের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন রাজা মেনেস, প্রথম আহমোজ, রাজা তুথমোস, সম্রাট ইখ্নাটন, তৃতীয় আমেনহোটেপ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় র‍্যামেসিস। পরাক্রমশালী তৃতীয় র‍্যামেসিসের মৃত্যুর পর শক্তিশালী শাসক না থাকায় 'ফারাও' বা সম্রাটদের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নানা পরিবর্তনের পর ৫২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পার্সীয়ানদের হাতে এ সভ্যতার পতন ঘটে।

প্রাচীন মিসরীয়দের জীবন যাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয়

ধর্ম বিশ্বাস

প্রাচীন মিসরীয়রা বিশ্বাস করত যে, প্রকৃতিকে দেবদেবীরাই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে। তাই প্রাচীন মিসরীয় সমাজে ধর্মের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। প্রধান ধর্মীয় নেতা ছিল রাজা বা ফারাও। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল 'আমন রে' (Ammon Re)। নীলনদের দেবতা নামে খ্যাত ছিল ওসিরিস (Osiris)। মিসরীয়রা আত্মার অবিনশ্বরতা ও পূনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল। তাদের ধারণা ছিল দেহ ছাড়া আত্মা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হবে। এজন্যই তারা ফারাও বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে মমি প্রস্তুত করত। মমিকে যুগ পরম্পরায় অক্ষত রাখার জন্য নির্মাণ করা হয় সমাধি স্তম্ভ পিরামিড। তবে ধর্ম বিশ্বাসে ন্যায় অন্যায়ের বা পাপ-পূণ্যের বিশ্বাসও জড়িত ছিল। মিসরীয় সমাজে পুরোহিতদের দৌরাত্ম ছিল ব্যাপক। খ্রিস্টপূর্ব ১৩৭৫ অব্দে রাজা চতুর্থ আমেনহোটেপের নেতৃত্বে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। তিনি প্রধান পুরোহিতদের মন্দির থেকে বহিস্কার করে একক দেবতা এটন (Aton) (বা একেশ্বর) এর পূজা করার নির্দেশ দেন। তাদের ধারণা ছিল, পাপ-পূণ্যের বিচারের মাধ্যমে পুণ্যবানকে সুখময় স্থানে ও পাপীকে অন্ধকার ঘরে নিক্ষেপ করা হবে।

লিখন ও লিপি পদ্ধতি

সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়দের অন্যতম প্রধান অবদান লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার। নগরসভ্যতা গড়ে তোলার সাথে মিসরীয়রা প্রথম লিখন ও লিপি পদ্ধতি আবিষ্কার করে। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল হায়ারোগ্লিফিক (Hieroglyphic) বা চিত্র লিখন পদ্ধতি। এটি গ্রীকদের দেয়া নাম। যার অর্থ দাঁড়ায় 'পবিত্র লিপি'। এ হায়ারোগ্লিফিক পদ্ধতির রূপ পাওয়া গিয়েছে। এ লিখন পদ্ধতি তার চারিত্রিক বিন্যাসের দিক থেকে তিনটি রূপ পায়। যেমন- চিত্রভিত্তিক, অক্ষরভিত্তিক ও বর্ণভিত্তিক। খোদাই কাজ করা বা চিত্রে প্রদর্শন করা- এই পদ্ধতির ২৫টি বর্ণ ছিল এবং প্রতিটি বর্ণ একটি বিশেষ চিহ্ন বা অর্থ প্রকাশ করতো। মিসরেই প্রথম মানব জাতি ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবনে সক্ষম হয়। প্যাপিরাস নামক নলখাগড়া দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে উন্নতমানের কাগজের আবিষ্কার মিসরীয়দেরই অবদান।

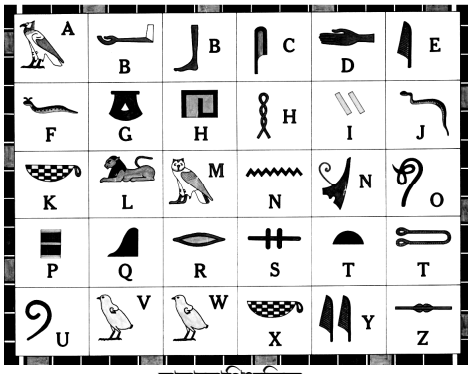

হায়ারোগিণ্ফফিক

দর্শন ও বিজ্ঞান

আধুনিক সভ্যতা অনেকটা প্রাচীন মিসরীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের নিকট দায়বদ্ধ। সে যুগে জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন মিসরে কারিগরিবিদ্যার প্রসার লাভ করেছিল। ব্রোঞ্জ ব্যবহারের ফলে নানা প্রকার অস্ত্র ও যন্ত্র আবিষ্কার হয়। মিসরীয়রা গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শি ছিল বলে জানা যায়। তারা নিকটবর্তী নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করার কৌশলও আয়ত্ব করেছিল। মিশরীয়রা নীলনদের জোয়ার-ভাটা নির্ণয় এবং এ সম্বন্ধীয় সম্যক জ্ঞান আয়ত্ত্ব করেছিল। মিসরীয় বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম জ্যামিতি ও গণিত শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন। তারা যোগ-বিয়োগের ব্যবহার জানলেও গুণ ও ভাগ করতে জানতো না। মধ্য রাজবংশের যুগ থেকে মিসরীয়গণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন। মিসরীয়রা চক্ষু, দন্ত ও পেটের পীড়া রোগের চিকিৎসা আবিষ্কারে সক্ষম হয়। তারা বিভিন্ন রোগ ও ঔষধের নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং 'মেটেরিয়া মেডিকা' (Materia Medica) বা ঔষধের তালিকা প্রণয়ন করেন। মৃতদেহকে অক্ষত রাখার জন্য মিসরীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী এক ধরনের ঔষুধ আবিষ্কার করেছিল। ধারণা করা হয় সে যুগে দাঁত, চোখ ও পাকস্থলি প্রভৃতির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিল।

পিরামিড

মিসরীয়দের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়। প্রাচীন মিসরীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্যের আশ্চর্য নিদর্শন 'পিরামিড'। পাথর দিয়ে নিখুঁতভাবে তৈরী ত্রিকোনাকার পিরামিড আজও মিসরের কায়রো শহরের অদূরে সভ্যতার ইতিহাস বহন করছে। এ সকল পিরামিডের অভ্যন্তরে মিসরের রাজা এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের মৃতদেহ (মমি) করে রাখা হয়েছে। লক্ষাধিক পাথর টুকরো করে নিখুঁতভাবে জোড়া দিয়ে এই পিরামিড তৈরী করা হতো এবং এক একটা পিরামিড চার থেকে পাঁচশ ফুট উচু ছিল। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় মিসরীয়দের বিজ্ঞান ও কারিগরি কৌশল কি পরিমান উন্নত ছিল। মিসরে অনেক পিরামিড আছে, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ফারাও খুফুর পিরামিড।

মিসরীয় সভ্যতার পতন

প্রাচীন মিসরের বিশতম রাজবংশের শেষ সম্রাট ছিলেন একাদশ রামসেস। এ সময় মিসরে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। ১০৮০ খ্রিঃপূর্বাব্দে থিবস শহরের প্রধান পুরোহিত বা ধর্মযাজক সিংহাসন দখল করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে পারস্য রাজশক্তি মিসর অধিকার করলে মিসরীয় সভ্যতার অবসান ঘটে। অতঃপর ৩৩২ খ্রিঃপূর্বাব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার মিসর অধিকার করেন। তারপর থেকে মিসরে "টলেমী রাজবংশ" প্রতিষ্ঠিত হয়। টলেমী রাজবংশ দীর্ঘদিন মিসর শাসন করে। এই বংশেরই রাণী ছিলেন বহু আলোচিত ও জগত খ্যাত রানী ক্লিওপেট্রা। ক্লিওপেট্রার সময় মিসর বারবার রোমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কালক্রমে রোমানরা মিসরে রোমান শাসন বিস্তার করে। মিসর থেকে রোমানদের দূরে রাখতে রোমান সম্রাটদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন চতুর ক্লিওপেট্রা। মিসরীয় রীতি অনুযায়ী তাঁর বিয়ে হয়েছিল নিজের ভাই টলেমির সঙ্গে। এর কয়েক বছর পর জুলিয়াস সিজার পম্পেই বিজয়ের মাধ্যমে মিসরে আসেন। তিনি প্রেমে পড়েন ক্লিওপেট্রার। জুলিয়াস সিজারের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সমর্থনে টলেমি রাজ্যচ্যুত হন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৃথিবীর মানচিত্রে মিসরের অবস্থান নির্ণয় করুন।

বিশ্ব মানচিত্রে মিসরের আশপাশে কোন কোন রাষ্ট্র অবস্থিত?	মিসরের মধ্যদিয়ে নীলনদের গতিপথ দেখান।	নীলনদের পতিত স্থান ভূমধ্যসাগরের চিত্র আঁকুন।

সারসংক্ষেপ :

মিসরীয় সভ্যতা ছিল প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম। এ সভ্যতায় নগর সভ্যতা সৃষ্টিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সময় নানা আবিষ্কার বিশেষ করে পিরামিড ও লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার নগর সভ্যতার উদ্ভবে সহায়তা করে। মিসরীয় সভ্যতা আধুনিক সভ্যতার পথ প্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত হয়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে মমি প্রস্তুত করত। তাদের প্রধান অবদান লিখন, লিপি এবং হায়ারোগ্লিফিক (Hieroglyphic) বা চিত্র লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার। প্রাচীন মিসরীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্যের আশ্চর্য নিদর্শন ছিল 'পিরামিড'।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মিসরীয় সম্রাট বা রাজাদের উপাধী ছিল–
   ক. ফারাও খ. ইখনাটন গ. সম্রাট ঘ. বাদশাহ

২. প্রাচীন মিসরের টলেমী রাজবংশের বিখ্যাত রানী-
   ক. রানী ফারাহ খ. রানী ক্লিওপেট্রা গ. রানী ইমেলদা ঘ. রানী নূর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আপনি বন্ধুদের নিয়ে মিসরে বেড়াতে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন অনেক উঁচু-নিচু পাহাড়। আসলে সেগুলো ছিল মিসরীয় পিরামিড। পিরামিডের সৌন্দর্য অবলোকন করলেন এবং সেখানকার মানুষ সম্পর্কেও ধারণা হল।

৩। মিশরের পিরামিড তৈরীর কারণ-

i. মিসরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য ii. মৃতদেহকে দীর্ঘ কাল অক্ষত রাখার জন্য
iii. মিসরীয় রাজাদের উপাসনার জন্য।

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.১

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

যমুনা নদীর সাথে আজীবন সংগ্রাম করে আসছে সুমন। সে সিরাজগঞ্জের বাসিন্দা। এখানে তার বাপ-দাদার বসতভিটে রয়েছে। যশোরে সুমনের মামাতো ভাই মিজানুর বাস করে। মিজানুর সিরাজগঞ্জ এলাকায় বেড়াতে গিয়ে জানতে পারল, প্রতিবছর জুলাই হতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যমুনা নদীর উভয় তীর প্লাবিত হয়। কিন্তু শহরবাসী বসে না থেকে সরকারের সাহয্য নিয়ে নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করে। তবে প্লাবনের ফলে পলিমাটির গুণে প্রচুর শস্য জন্মে।

ক. মিসরীয় সমাধিকে কী বলা হতো? ১
খ. মিসরীয়দের লিখন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকের শহরের সাথে মিসরীয় সভ্যতার ভৌগলিক অবস্থা আলোচনা করুন। ৩
ঘ. সিহাবের শহরের সাথে কোন সভ্যতার মিল খুঁজে পাওয়া যায় বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-১.২ সুমেরীয় সভ্যতা



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুমেরীয় সভ্যতার উৎপত্তি বা উন্মেষ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন;
- সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ও
- প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।

	**মুখ্য শব্দ**	**'এনসি', আক্কাদীয় রাজ্য, 'ডুঙি', 'গিল গামেশ', 'জিগগুরাট' ও 'কিউনিফর্ম'**



ভূমিকাঃ

আধুনিক ইরাক রাষ্ট্রের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (যথাক্রমে দজলা ও ফোরাত) নদীর অববাহিকায় কয়েকটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলো একত্রিতভাবে 'মেসোপটেমীয় সভ্যতা' নামে পরিচিত। একে অনেকে 'Fertile Crescent' বা 'অর্ধচন্দ্রাকৃতি উর্বর ভূমি'ও বলে থাকে। ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিসরীয় সভ্যতার সমসাময়িক মেসোপটেমীয় সভ্যতা অনেকগুলো জাতির অবদানে গড়ে ওঠে। এ সকল জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, কাসাইট, অ্যাসিরীয় এবং ক্যালডীয়রা অন্যতম। 'মেসোপটেমিয়া' একটি গ্রিক শব্দ-যার অর্থই হলো দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। আর দুই নদী বলতে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মেসোপটেমীয় সভ্যতার অগ্রদূত ছিলো সুমেরীয় জাতি।

সুমেরীয় সভ্যতা

৫০০০ খ্রিস্টপূর্বে সুমেরীয় জাতি মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশে এবং পারস্য উপকূল অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। এরা অ-সেমিটিক জাতিগোষ্ঠি এবং মধ্য এশিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। লিখন পদ্ধতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, আইন কানুন প্রণয়ন, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি সুমেরীয়রাই প্রথম শুরু করে।

সুমেরীয় রাষ্ট্র

কয়েকটি নগরকে কেন্দ্র করে সুমেরীয়রা সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। সুমেরীয়রা কতকগুলি নগরের গোড়াপত্তন করেছিল। এগুলোর মধ্যে তাদের রাজধানী উর ছাড়াও সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্র ছিল লাগাস, কিস, ইরিদু এবং উরুক অন্যতম। সুমেরীয় সভ্যতায় ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের পদবী ছিল 'পাতেজী'। সুমেরীয়রা প্রথম মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে খাল খনন, জলাশয় ও বাঁধ নির্মাণ করে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং নিজেদের উন্নতি ঘটিয়ে নগর সভ্যতার উদ্ভব ঘটায়। ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে প্রায় ১৮টি নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব নগর রাষ্ট্রের প্রশাসকরা 'এনসি' নামে পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত শাসক সারগন সুমেরের নগর রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করে সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সুমেরিয়ায় সারগনের প্রতিষ্ঠিত আক্কাদীয় রাজ্য দুশো বছর স্থায়ী ছিল। সুমেরীয়দের পরবর্তী বিখ্যাত শাসক ছিলেন সম্রাট 'ডুঙি'। সম্রাট ডুঙির নেতৃত্বে সুমেরীয়গণ খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ অব্দে একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন। ডুঙি সুমের জাতির জন্য সর্বপ্রথম একটি বিধিবদ্ধ আইন (Code) প্রচলন করেন। সুমেরীয় সমাজে শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনায় নারীদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

সুমেরীয় সমাজ

বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল সুমেরীয় সমাজ ব্যবস্থা। প্রথমস্তরে ছিল শাসক ও ধর্মযাজক, দ্বিতীয় স্তরে সাধারণ নাগরিক এবং তৃতীয় স্তরে ছিল ক্রীতদাস সম্প্রদায়। শাসকগণ নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি দাবি করে দেশ শাসন করতেন। দাসদাসীরা শাসকদের সেবায় নিয়োজিত থাকতো। স্বাভাবিক ভাবেই দাসদাসী এবং কৃষক ছিল সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়।

সুমেরীয়দের প্রতিশোধমূলক আইন

সাধারণভাবে সুমেরীয়দের আইনকে বলা হয় প্রতিশোধমূলক আইন। অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ, হাতের বদলে হাত ইত্যাদি। সুমেরীয়দের আইনের মূল বিষয় ছিল, প্রথমতঃ অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য তদ্রুপ শাস্তি দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ একধরণের বিচার আদালত বিদ্যমান ছিল, যেখানে বাদী বিবাদী উভয়কেই হাজির করা হতো। তৃতীয়তঃ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হতো। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর বিচারকার্য কঠোর ছিল। অথচ সামরিক বাহিনীতে একমাত্র অভিজাতদেরই অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিল। অন্যান্য সমাজের মতো সুমেরীয় আইনও গড়ে ওঠেছিল তাদের সামাজিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যদিয়েই। সুমেরীয়দের বিখ্যাত সম্রাট 'ডুঙি' প্রথম আইন সংকলন করেন। সুমেরীদের আইন ব্যবস্থা পরবর্তী সমসাময়িক সভ্যতাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে ছিল। সুমেরীয় আইনের মূল অধ্যায় ছিল- ক. প্রতিশোধমূলক আইন, খ. আইনে অসমতা এবং গ. আকস্মিক ও ইচ্ছাকৃত হত্যার স্বল্প পার্থক্য।

অর্থনৈতিক কাঠামো

সুমেরীয়দের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল সরল। মিসরের মত এখানে একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্য দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। সুমেরীয় সমাজে ভূমি দাসের অস্তিত্ব ছিল। তবে কারিগরী কাজে নিপুন শ্রমিকরা উচ্চ পারিশ্রমিক লাভ করতো। সুমেরীয় অর্থনীতির মূল উৎস ছিল কৃষি। কৃষক হিসেবে এরা ছিল বেশ উঁচু স্তরের। তাদের সেচ ব্যবস্থা ছিল উন্নততর। ফসল উৎপাদনের পরিমানও ছিল বেশী। সুমেরীয়দের সাথে বিভিন্ন অঞ্চলের এক বিস্তৃত বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুমেরীয় 'সীল' দেখে অনুমান করা হয় সম্ভবত ভারতের সাথেও তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সুমেরীয়রা প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃত্রিম মৃত্রিকাস্তুপের উপর শহর, গ্রাম এবং মন্দির গড়ে তোলে।

সুমেরীয় ধর্ম

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার ন্যায় সুমেরীয়রা অনেক দেব দেবীতে বিশ্বাসী ছিল। তাদের এক একটি দেবতা এক একটি নামে পরিচিত ছিল। যেমন বিখ্যাত দেবতা 'শামাশ' (সূর্যদেবতা), 'এনলিল' (বৃষ্টি, বন্যা ও বায়ুর দেবতা), পানির দেবতা 'এনকি', প্লেগ রোগের বিশেষ দেবতা 'নারগাল' এবং 'ইস্টারা' (নারী জাতির দেবতা) নামে পরিচিত ছিলেন। তবে তাদের প্রধান দেবতা ছিল নার্গাল। সুমেরীয় সভ্যতায় মিসরীয় সভ্যতার অনেক প্রভাব থাকলেও পরকালের ধারণা বা পুর্নরুজ্জীবন (স্বর্গ-নরক) ধারণা জন্ম লাভ করেনি মিসরীয়দের মধ্যে। সম্ভবতঃ এই কারণে সুমের অঞ্চলে মৃতদেহকে কেন্দ্র করে কোন প্রকার অট্টালিকা, সমাধি বা মমির প্রবণতা দেখা যায় না। তাই তারা মৃতদেহকে কবর দিতো।

সুমেরীয় সাহিত্য

সুমেরীয়রা বিদ্যাশিক্ষায় উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি তারা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবেশী মিসরীয়দেরকেও অতিক্রম করেছিল। যেমন, সুমেরীয়রা 'গিল গামেশ' নামক মহাকাব্য রচনা করেছিল। ইউরুকের কিংবদন্তী রাজা গিলগামেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই বিখ্যাত 'গলগামেশ' নামক মহাকাব্য। ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই মহাকাব্য রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

সুমেরীয়দের লিখন পদ্ধতি

সুমেরীয় সভ্যতার অন্যতম কীর্তি ছিল একধরনের লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন। এই পদ্ধতি ছিল প্রথমতঃ চিত্রলিপি এবং পরবর্তীতে তা শব্দলিপিতে রূপান্তরিত হয়। এই লিখন পদ্ধতি 'কিউনিফর্ম' নামে পরিচিত। কাঁদা মাটিতে চাপ দিয়ে চিত্রাংকন দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করতো। যা মেসোপটেমীয় লিপি হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এ সুমেরের বিখ্যাত শহর নিপ্পুরে এ কিউনিফর্ম (Cuneiform) চিত্রলিপির প্রায় চার হাজার মাটির চাকতি পাওয়া গেছে। এসকল কিউনিফর্ম বর্ণভিত্তিক নয়, বরং একে বলা যেতে পারে অক্ষরভিত্তিক বর্ণলিপি।

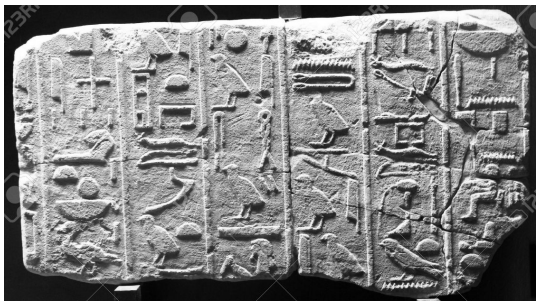

কিউনিফর্ম

সুমেরীয় স্থাপত্য ও শিল্প

ধারনা করা হয় সুমেরীয়রা নগর সভ্যতায় পোড়া ইটের প্রথম ব্যবহার। তবে মিসরীয়দের মতো সুমেরীয়রা পাথরের ব্যবহার করতো না বলে তাদের তৈরী ইমারত দীর্ঘস্থায়ী হতো না। সম্ভবতঃ সুমের অঞ্চলে পাথর দুস্প্রাপ্য ছিল। তবে তাদের নগর পরিকল্পনা ছিল খুবই নিখুঁত। দালানের দেয়াল ইটের তৈরী হলেও ছাঁদ ছিল কাঠের দ্বারা তৈরী। সুমেরীয় শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি 'জিগগুরাট' নামক ধর্মমন্দির। প্রায় প্রতি নগরেই এইরূপ জিগগুরাট নামক ধর্মমন্দির বা ইমারত তৈরী হয়েছিল। সুমেরীয়দের অন্যান্য কৃতিত্বের মধ্যে ছিল গণনা পদ্ধতি, গুণভাগ নির্ণয়, চন্দ্র ভিত্তিক বর্ষপঞ্জি তৈরী, পানি দ্বারা

চালিত এক ধরনের ঘড়ি। অন্যদিকে কৃষি ছিল সুমেরীদের প্রধান জীবিকা। দ্বিতীয় পেশা হিসেবে তারা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন ঘটায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুমেরীয় সভ্যতার বিখ্যাত দেবতাদের নাম লিখুন?

সারসংক্ষেপ :

পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত সুমেরীয় সভ্যতার সাথে আফ্রিকার মিসরীয় সভ্যতার অনেক মিল রয়েছে। নতুন পাথরের যুগ পার হয়ে ব্রোঞ্জ (তামা) যুগেই উভয় সভ্যতার সৃষ্টি হয়। এখানে তামা বা ধাতু ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ক্ষমতা ও হাতিয়ারের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। মিসরীয়দের মতো সুমের অঞ্চলেও রাজা, পুরোহিত, সামরিককর্তা এরূপ বিভাজন দেখা যায়। মেসোপটেমীয় সভ্যতার বিকাশ এবং নিত্য নতুন আবিষ্কারের মূলে সুমেরীয়দের অবদানই অধিক ছিল। সুমেরীয় শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি 'জিগগুরাট' নামক ধর্মমন্দির।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সুমেরীয় জাতির বিখ্যাত রাজা ছিল–
ক. ফারাও খ. ইখনাটন গ. ডুঙি ঘ. বাদশাহ

২. সুমেরীয়রা মহাকাব্য রচনা করেছিল -
ক. ইলিয়ট খ. 'গিল গামেশ' গ. ওডিসি ঘ. রামায়ন
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ফাহিম প্রাচীন হাম্বুরাবী আইনের বিষয় সম্পর্কে জানতে গিয়ে রাজা হাম্বুরাবীর আইন সম্পর্কে জানলেন। সেই আইনের কতটুকু প্রচলিত রোমান আইনের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে ফাহিম সেটি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন।

৩। সুমেরীয় শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি 'জিগগুরাট' ছিল-
i. ধর্ম মন্দির ii.দেবতা iii. রাজা।
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.২

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

সিহাব একটি শহরে বাস করে। সেই শহরের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটগুলো সুপরিকল্পিতভাবে তৈরী। বন্যার সময় নদীর প্লাবনে শহর প্লাবিত হয় এবং ফসলের ক্ষতি হয়। এ পানির দ্বারা সেচ দিয়ে প্রচুর ফসল ফলায় এবং নদীপথে বাণিজ্য করে আর্থিক উন্নতি লাভ করে। তাদের বসতবাড়িগুলো তারা খুব যত্নসহকারে তৈরি করে।

ক. সুমেরীয়দের ধর্ম মন্দিরের নাম কী ছিল? ১
খ. কৃষি ও বাণিজ্যে সুমেরীয় সভ্যতা বিখ্যাত কেন? বর্ণনা দিন। ২
গ. উদ্দীপকে সিরাজগঞ্জের কৃষিব্যবস্থার সাথে কোন প্রাচীন সভ্যতার কৃষিব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বিশ্লেষণ করুন। ৩
ঘ. সিরাজগঞ্জের সাথে উক্ত সভ্যতার পার্থক্য কোথায়? মতামত দিন। ৪

পাঠ-১.৩ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার পরিচয় সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন;
- রাজা হাম্মুরাবীর শাসন ও আইন সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অবদান সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**রাজা হাম্মুরাবী, এ্যামোরাইট, অ্যাসিরিয়ান, নেবুচাঁদনেজার, ও 'ঝুলন্ত উদ্যান'**

ভূমিকা: মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে গড়ে ওঠা সভ্যতা- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার জনক ছিলো সেমিটিক জাতি। এ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে তোলে এ্যামোরাইট নামক সেমিটিক জাতি। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে সেমিটিক জাতির অবদান সর্বাধিক। প্রকৃত পক্ষে সুমেরীয় রাজা ডুঙির মৃত্যুর পর পরই সুমেরীয় সভ্যতার পতন ঘটে। সুমেরীয় সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের ওপর গড়ে ওঠে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য বা সভ্যতা। অ্যামোরাইটরা আরব মরুভূমির উত্তরাঞ্চল থেকে মেসোপটেমিয়ায় এসে ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে সভ্যতা গড়ে তোলে। এই সভ্যতাকে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বলা হয়।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

মূলতঃ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা চরম খ্যাতি অর্জন করে বিখ্যাত সম্রাট হাম্মুরাবীর শাসনামলে। ব্যাবিলনে বসতিস্থাপনকারী এ্যামোরাইটদের নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি তেমন উন্নত ছিল না। ব্যাবিলনে রাজ্য স্থাপন করে তারা পূর্বের সুমেরীয় সভ্যতার সবকিছুই গ্রহণ করে। হাম্মুরাবীর 'আইন সংহিতা' ছিল জগত বিখ্যাত। পরবর্তীতে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধন করে।

রাজা হাম্মুরাবী ও ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য

রাজা হাম্মুরাবী (১৭৯২-১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ছিলেন এ্যামোরাইট জাতির বিখ্যাত নেতা। তাঁর আমলে ব্যাবিলন নতুন সভ্যতায় উদ্ভাসিত হয়। তিনি যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে এক বিশাল শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন এবং ইউফ্রেটিস উপত্যকায় ব্যাবিলনে কেন্দ্রীয় রাজ্য স্থাপন করেন ।

নব্য ব্যাবীলনীয় সাম্রাজ্য

হাম্মুরাবীর মৃত্যুর পর ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব হয়নি বেশী দিন। এ সময় সুমেরীয় অঞ্চল আবার অনেকগুলো ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নিষ্ঠুর সামরিক নীতি প্রয়োগ করে মেসোপটেমিয়ায় বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তারা। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে এ অঞ্চলে উত্থান ঘটে অ্যাসিরিয়ানদের। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে অ্যাসিরিয়ানদের পরাজিত করে সামন্তরাজা নেবুচাঁদনেজার ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে নতুন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাম্রাজ্য 'নব্য ব্যাবিলনীয়' সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। এই সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন নেবুচাঁদনেজার। জেরুজালেম বিজয়ী এ রাজা রাণীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নগর দেয়ালের উপরে এক মনোরম উদ্যান নির্মাণ করেন। এ উদ্যানই বিশ্বখ্যাত 'ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান' বা 'ঝুলন্ত উদ্যান' নামে পরিচিত। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম হিসেবে পরিচিত- 'ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান'।

হাম্মুরাবী আইন

হাম্মুরাবীর কানুন অনুসারে খাজনা দিতে হতো ফসলের এক তৃতীয়াংশ; ফলের বাগান হলে দিতে হতো দুই-তৃতীয়াংশ। খাজনা দিতে দেরী হলে এবং সুদ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে ব্যর্থ হলে তাকে দাস বানানো হতো। ১৯০১-০২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সুসা নামক স্থানে ফরাসি পুরাতত্ত্ববিদ এম.ডি. মরগান একটি বিশাল শিলাখণ্ডে প্রাচীন ব্যাবীলনীয়দের একটি লিপি আবিষ্কার করেন। রাজা হাম্মুরাবী স্বীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার্থে প্রচলিত স্থানীয় নীতি ও আইন কানুন সংস্কার করে একটি সর্বজনস্বীকৃত বিধিবদ্ধ আইন তৈরী করেন। ইতিহাসে তা হাম্মুরাবীর 'আইন সংহিতা' (Code of Hammurabi) বলে খ্যাত। তবে হাম্মুরাবীর প্রণীত আইন সুমেরীয় রাজা ডুঙির আইন দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত। প্রস্তর স্তম্ভে

বিধানমালা খোদিত করে রাজা হাম্মুরাবী বিভিন্ন মন্দিরে স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে ফ্রান্সের প্যারিস যাদুঘরে (ল্যুভর যাদুঘর) সংরক্ষিত এই স্তম্ভে সর্বমোট ২৮২টি বিধি উৎকীর্ণ রয়েছে। রাজনৈতিক অপরাধ, পারিবারিক, বিবাহ, ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়মাবলী, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি-এই আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাম্মুরাবীর প্রণীত আইন পরবর্তীকালে রোমান আইন (Roman Law) এবং পাশ্চাতের আইন-কানুনকে প্রভাবান্বিত করে।

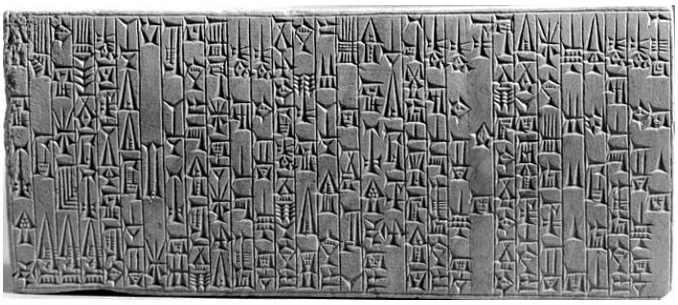

হাম্মুরাবীর বিধানমালা খোদিত প্রস্তর স্তম্ভ

ধর্ম বিশ্বাস

ব্যাবিলনীয়রাও অন্যান্য সভ্যতার মতো দেবদেবীর পূজা-অর্চনায় বিশ্বাসী ছিল। 'মারডক' (Marduk) নামক সূর্যদেবতার পূজা ব্যাবিলনীয় সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া তারা প্রণয়ের দেবী ইসতার, বায়ুর দেবতা মারুসহ অসংখ্য নগর দেবতা ও ছোটখাট দেবদেবীর পুজা করত। অশরীরী প্রেতাত্মার শক্তিতেও তারা বিশ্বাসী ছিল।

শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চা

প্রাচীন ব্যাবিলনীয়নরা আলাদা কৃতিত্বের দাবীদার ছিল শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে। তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল এবং তাদের ভাষার ৩৫০টি ধ্বনি চিহ্ন ছিল। শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যাবিলনীয় সমাজে এক ধরণের শিক্ষালয় চালু ছিল। সেখানে নরম ও ভিজা কাদার মধ্যে কাঠি দিয়ে লেখার লিখন পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়। একে কিউনিফর্ম বা 'কীলকাকার লিখন পদ্ধতি' বলা হয়। লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়াই ছিল এই শিক্ষালয়ের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীকে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হতো। বিদ্যালয়ের দেওয়ালে লিখা হতো "লিখন পদ্ধতিতে যে উৎকর্ষতা অর্জন করবে, সে সূর্যের ন্যায় কিরণ দেবে।" সুমেরীয় সভ্যতার ন্যায় ব্যাবিলনীয় সমাজেও সাহিত্য চর্চা ছিল। সুমেরীয়দের 'গিলগামেশ' উপাখ্যানের উৎস থেকে ব্যাবিলনীয় কবি সাহিত্যিকগণ অনবদ্য সাহিত্য রচনা করেন।

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা

ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিতে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। সে সময় ব্যবিলনে ৫৫০ রকমের ওষুধের প্রচলন ছিল। ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখেন। তারা তারকা মন্ডল, সূর্য ও রাশিচক্র সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহী ছিল এবং এ সম্বন্ধে যুক্তি সংগত ধারণাও লাভ করেছিল। গণিত শাস্ত্রে ব্যাবিলনীয়রা বুৎপত্তি অর্জন করে। দশমিকের প্রচলন, বীজগণিতে সরল সমীকরণ, পরিধি, ব্যাসের অনুপাতের মানস্থিত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। জ্যোতিষীগণ একধরণের জলঘড়ি ও সূর্যঘড়ির আবিষ্কার ও ব্যবহার আয়ত্ত্ব করেছিল। এছাড়া বর্ষপঞ্জিকাকে বছর, মাস ও দিনে বিভক্ত করে ব্যবহার করার কৌশলও তারা আবিষ্কার করে।

ভাস্কর্য

ব্যাবিলনীয়রা ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতি লাভ করেছিল এবং বিভিন্ন পাথরের স্তম্ভে ব্যাবিলনীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দে চুনাপাথরের স্তম্ভে শ্মশ্রুমন্ডিত এবং নক্শাকৃত পোশাকে হাম্মুরাবীকে খোদিত করা হয়েছে। এ ছাড়া হাম্মুরাবীর ২৮২টি আইন নিখুঁত ও বিন্যাস্তকৃত পাথরে খোদাই করা হয়েছে। এভাবে ভাস্কর্য শিল্পে ব্যাবিলনীয়রা অনবদ্য অবদান রেখে গেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যালনীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

মেসোপটেমিয়ায় আগত এ্যমোরাইট জাতি ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে তোলে। এই এ্যমোরাইট জাতির বিখ্যাত সম্রাট হাম্মুরাবী পৃথিবীর প্রথম আইন প্রণেতা বলে বিবেচিত। তারকা মণ্ডল, সূর্য ও রাশিচক্র সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহী ছিল এবং এ সম্বন্ধে যুক্তি সংগত ধারণাও লাভ করেছিল। জ্যোতিষীগণ এক ধরণের জলঘড়ি ও সূর্যঘড়ির আবিষ্কার ও ব্যবহার আয়ত্ত্ব করেছিল। এছাড়া বর্ষপঞ্জিকাকে বছর, মাস ও দিনে বিভক্ত করে ব্যবহার করার কৌশলও তারা আবিষ্কার করেন। পরবর্তী গ্রিক, রোমান ও পারসিক সভ্যতা ব্যাবিলনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিচার ব্যবস্থার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে-

ক. খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে খ. খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০০ অব্দে

গ. খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে ঘ. খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে

২. ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান নির্মাণ করেন-

ক. রাজা হাম্মুরাবী খ. রাজা নেবুচাঁদনেজার

গ. রাজা নেবোপলেসার ঘ. রাজা সারগন

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

শাহাদাত বিভিন্ন সভ্যতা সম্পর্কে জানতে গিয়ে একটি উদ্যান সম্পর্কে জানলেন। অবাক হয়ে এ সম্পর্কিত প্রশ্ন করলেন এক বন্ধুকে এবং তার নিকট থেকে সেখানকার মানুষের আবিষ্কার সম্পর্কেও ধারণা হল। সে সময়ে রাজা তাঁর রাণীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নগর দেয়ালের উপরে এক মনোরম উদ্যান নির্মাণ করেন।

৩. ব্যাবিলনীয়রা কত ধরণের ঘড়ি আবিষ্কার করে -

i. এক ধরণের ii. দু' ধরণের iii. চার ধরণের

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.৩

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

২০১৫ সালে সুমাইয়া আক্তার নামের শিক্ষার্থী রংপুর সরকারি কলেজের অনার্সের শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি হওয়ায় তার পাষণ্ড স্বামী হাতের চারটি আঙ্গুল কেটে নেয়। তার অপরাধ ছিল স্বামীর অসম্মতিতে কলেজে ভর্তি হওয়া এবং পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া। আইনের শাসন ও সমাজের মানুষ মেয়েটির পাশে দাড়ানোর ফলে তার স্বামী ভুল বুঝতে পারল। সুমাইয়া আক্তারের ফলাফলে সন্তুষ্ট হয়ে স্বামীর বিশ্বাস ও অগাধ ভালবাসায় সিক্ত হয়ে সুমাইয়ার জীবন সুখময় হয়ে উঠল।

ক. ব্যাবিলনের শূণ্য উদ্যান নির্মাণ করেন কে? ১

খ. হাম্মুরাবীর আইন জগত বিখ্যাত ছিল-ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি আপনার পঠিত গ্রন্থের প্রাচীন সভ্যতার সাথে তুলনা করুন। ৩

ঘ. উক্ত সভ্যতার নব্য ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিন। ৪

পাঠ-১.৪ পারসিক সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আর্য জাতি কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানতে পারবেন;
- পারস্য সভ্যতায় সাসানীয় বংশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন ও
- প্রাচীন সভ্যতায় পারসিকদের অবদান ও পারসিক ধর্ম (জরথুস্ত্রবাদ) সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**রাজা দারিয়ুস, রাজা ক্যামবিসাস, জারেক্সস, জরথুস্ত্র ধর্ম, পাসারগাডের রাজপ্রাসাদ ও 'যেন্দাবেস্তা'**

রাজা দারিয়ুস

রাজা ক্যামবিসাস আততায়ীর হাতে নিহত হলে দারিয়ুস নামক এক সামন্ত অভিজাত খ্রিস্টপূর্ব ৫২২ অব্দে পারস্যের সম্রাট নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনামলে পারস্য গ্রীক ও রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। রাজা দারিয়ুসের মৃত্যুর পর তার পুত্র জারেক্সস পারস্য শাসন করেন। পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ দিকে দুর্বল শাসনের কারণে রাজশক্তির ক্ষয় হয়। ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার পারস্য আক্রমণ করে দখল করে নেন। ৩৩০ থেকে ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পারস্য যা বর্তমানে ইরান; গ্রিক শাসনাধীনেই ছিল।



পারস্যে সাসানীয় বংশ

প্রায় এক শতাব্দীকাল গ্রিক শাসনের পর পার্থিয়ানগণ পারস্য শাসন করেন। অতঃপর ২২৬ খ্রিস্টাব্দে আর্দাশির নামক এক নেতার নেতৃত্বে পারস্যে সাসানীয় বংশের রাজত্ব শুরু হয়। ইতিহাসে তা সাসানীয় সাম্রাজ্য বলে পরিচিত। এই সময় পারস্যে জরথুস্ত্র ধর্ম প্রবর্তিত হয়। আর্দাশির এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম শাহপুরের (২৪০-৩০৯ অব্দ) রাজত্বকালে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং শিল্পকর্মে নবজাগরণ পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় শাহপুর (৩০৯-৩৭৯ অব্দ) পারস্যের সিংহাসনে আরোহন করে বীর বিক্রমে রোমানদের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সাসানীয় রাজা পারভেজ খসরুর সময়ে আরবের মক্কায় হযরত মুহম্মদ (সা:) ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা:) এর শাসনামলে আরব মুসলমানদের নিকট পরাজিত হবার পর পারস্যে সাসানীয় রাজবংশের পতন ঘটে এবং ইসলামী সভ্যতার সূত্রপাত হয়।

লিখন পদ্ধতি

আরামীয় ও প্রাচীন পারসিয় এই দুই ধরনের ভাষা পারস্যে প্রচলিত ছিল। রোমান হরফে যেমন ইংরেজী লেখা হয় তেমনি আরামীয় হরফে প্রাচীনকালে পারসি লেখা হতো। পারসিকরা তাদের লিখন পদ্ধতি হিসেবে শুরু থেকে কিউনিফর্ম লিপির ব্যবহার করতো। পারসিকরা ৩৯টি বর্ণমালা বিশিষ্ট এক লিখন পদ্ধতির প্রবর্তন করে। পারস্যসহ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পারসিকরা মুদ্রার ব্যাপক প্রচলনও ঘটায়।

স্থাপত্য শিল্প

পারসিকদের স্থাপত্য শিল্পে প্রভূত অবদান পাওয়া যায় প্রাসাদ শিল্পে। স্থাপত্যশিল্পে পারসিকরা ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় রীতির মিশ্রণ ঘটায়। কিন্তু তাদের স্থাপত্যে মেসোপটেমীয়দের মতো খিলান পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। তাঁরা খিলানের পরিবর্তে মিসরীয় স্থাপত্যরীতি অনুসারে স্তম্ভ ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে মিসরীয় প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অন্যান্য সভ্যতার স্থাপাত্যে যেখানে ধর্মীয় মন্দির নির্মাণ অধিক গুরুত্ব পেয়েছে- সেখানে পারসিকরা প্রাসাদ নির্মাণে এগিয়ে ছিল। বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে আজও দারিয়ুদের প্রাসাদ (সুসা প্রাসাদ), সাইরাসের সমাধি, পাসারগাডের রাজপ্রাসাদ পারস্য স্থাপত্য শিল্পের অনন্য সাক্ষ্য বহন করছে।

পারসিক ধর্ম

জরথুস্ত্র ধর্মের আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে। সম্রাট আর্দাশিরের আমলে এই ধর্ম রাজকীয় মর্যাদা লাভ করে। জরথুস্ত্র ধর্মের উপাস্য দেবতার নাম ছিল 'আহুরামাযদা'। তিনি মঙ্গলের দেবতা এবং তার প্রতীক অগ্নি। এই কারণে পারসিকদের অগ্নি উপাসক বলা হয়। তাদের ধর্মমতে, 'আহ্রিমান' হলেন অমঙ্গলের দেবতা। অগ্নি উপাসক পারসিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন। জরথুস্ত্রের মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা ধর্মগুরুর বাণী লিপিবদ্ধ করে রাখে। এই ধর্মগ্রন্থের নাম 'যেন্দাবেস্তা'। যেন্দাবেস্তার মূল বিষয় ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ-নরক, ভাল মন্দ। তবে এই ধর্ম বর্তমানে পারস্যে আর প্রচলিত নয়। জরথুস্ত্রবাদ দীর্ঘদিন তার মূল অবস্থায় টিকে থাকতে পারেনি। ধীরে ধীরে এ মতবাদের মধ্যে কুসংস্কার ও স্বার্থপরতা প্রবেশ করে। ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর অল্প কিছু দেশের খুব কম সংখ্যক লোক এখন এ ধর্মের অনুসারী। সমকালীন বিশ্বের ধর্মাচারণে জরথুস্ত্রবাদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছিল। এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল চারটি- ক. দ্বৈতবাদ, খ. চূড়ান্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাস, গ. একটি নৈতিক ধর্ম, ঘ. একটি ঐশী ধর্ম।

পারস্য সভ্যতার পতন

প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার পর্যালোচনায় পারসিকদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তারা এসেরীয়দের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোকে উন্নততর রূপ দিয়ে প্রায় ২০০ বৎসর স্থায়ী একটি সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের পূর্বে আর কোন রাষ্ট্র কাঠামো পারসিকদের মত দক্ষ সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। পারসিকদের ধর্মে মৌলিকত্বের ছাপ ছিল। একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যেও প্রতিষ্ঠাতা পারসিকগণ অধিকৃত অঞ্চল সমূহের সাংস্কৃতির সমন্বয় করে বিশ্বসভ্যতায় এক অনন্য ভূমিকা রাখে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৃথিবীর খুব কম সংখ্যক মানুষ জরথুস্ত্র ধর্মের অনুসারী হবার কারণগুলো লিখুন?

সারসংক্ষেপ :

পারসিকরা সমগ্র মেসোপটেমিয়া অঞ্চলসহ ক্যালডীয় সাম্রাজ্য অধিকার করে সভ্যতার সূচনা করে। পরবর্তীতে ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত পারস্য সভ্যতার প্রভাব বিস্তার ঘটে। ফলে পারসিকরা যেমন অন্য দেশ ও সভ্যতা থেকে শিক্ষা সংস্কৃতি গ্রহণ করে, তেমনি পারস্যের অনেক কিছুই অন্যান্য দেশের শিক্ষা সংস্কৃতিতে বিস্তার ঘটে। পরবর্তী সভ্যতা ও ধর্মতত্ত্বের ওপর পারস্য প্রভাব অত্যধিক ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ৩৩০ থেকে ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পারস্য যা বর্তমানে ইরান ছিল -

ক. গ্রীক শাসনাধীনে　　খ. রোমান শাসনাধীনে

গ. সাসানীয় শাসনাধীনে　　ঘ. মেসপোটেমীয় শাসনাধীনে

২. জরথুস্ত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কি -

ক. আহরিমান　　খ. বেদ

গ. মহাভারত　　ঘ. 'যেন্দাবেস্তা'

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

শাকের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানতে গিয়ে নতুন একটি ধর্ম সম্পর্কে জানলেন। যার উৎপত্তি স্থলে এধর্মের অনুসারী খুবই কম। তবে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে স্বল্প সংখ্যক অনুসারী রয়েছে। বিষয়টি তাকে অবাক করল, তিনি ভাবলেন অনুসারী ছাড়া ধর্মের পরিচিতি পায় না।

৩. খলিফা হযরত উমর (রা:) এর শাসনামলে পতন ঘটে পারস্যের -

i. সাসানীয় রাজবংশের

ii. দারিয়ুস রাজবংশের

iii. জারেক্সস রাজবংশের

কোনটি সঠিক?

(ক) i　　(খ) ii

(গ) iii　　(ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.৪

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

পাল বংশের রাজা ধর্মপাল সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য জনগণের অধিকার সংবলিত একটি সংবিধান রচনা করেন। উক্ত সংবিধানে নাগরিক জীবনের সকল দিক তুলে ধরা হয়েছে। রাজা- কৃষি ও শিক্ষাব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। অবাধ্য কৃষকদের শাস্তির ব্যবস্থা রেখে তিনি কৃষি উৎপাদনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তিনি সাম্রাজ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্ণমালা শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চতর গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হতো।

ক. পারস্যের বিখ্যাত রাজা কে ছিলেন? ১

খ. প্রাচীন পারস্যের ধর্মমত সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষিব্যবস্থার সাথে পারস্যের কৃষিব্যবস্থার মিলগুলো নির্ণয় করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পারস্যের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-১.৫ হিব্রু সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিব্রু জাতির উৎপত্তি ও পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- হিব্রু সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হিব্রু ধর্ম সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**হিব্রু জাতি, ইসরাইল, জুদাহ রাজ্য, জেরুজালেম, একেশ্বরবাদ ও 'অ্যাপক্রিপা'**

হিব্রুদের পরিচয়

হিব্রু জাতি প্রাচীন মিসরীয় এবং মেসোপটেমীয় সভ্যতার পর প্রাচীন মানব সভ্যতায় অবদান রেখেছিল। হিব্রুরাই ইহুদী ধর্মের অনুসারী এবং ইসরাইলী জাতি হিসেবে সমধিক পরিচিত। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন ফোরাত নদীর (ইউফ্রেটিস নদী) অপর পাড় থেকে যে সব মানবগোষ্ঠী বিতাড়িত হয়ে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করে-তারাই হিব্রু জনগোষ্ঠী। হিব্রু শব্দের অর্থ 'বিদেশী' (Alien) থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই নৃতাত্ত্বিক অর্থে হিব্রুরা কোনো নির্দিষ্ট জাতি নয়। মিসরীয় ও ব্যাবিলনীয় উৎস থেকে আহরিত হয়েছিল হিব্রু সভ্যতার অনেক উপাদানই ।

হিব্রুদের রাজনৈতিক ইতিহাস

হিব্রু জাতি খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে তাদের আদি পুরুষ ইব্রাহিমের (আ:) (আব্রাহাম) নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় একত্রে বসবাস শুরু করে। অতঃপর ইব্রাহিমের (আ:) এর পৌত্র ইয়াকুব (আ:) (জ্যাকব) হিব্রুদের নিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করেন। ইয়াকুব এর অপর নাম 'ইসরায়েল' থেকেই উক্ত জাতি ইসরাইলী নামে পরিচিতি। ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইসরাইলীরা দুর্ভিক্ষে পতিত হলে প্রতিবেশী মিসরে গমন করে কিন্তু সেখানে তারা ফারাওদের অধীনে দাসত্ব বরণ করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০-১২৫০ অব্দে নবী মুসা (আ:) (মোজেস) মিসরে আবির্ভূত হয়ে হিব্রুদের মুক্ত করে সিনাই উপদ্বীপে উপস্থিত হন। এখানে এসে হিব্রুরা দেবতা যেহোভা'র উপাসনা শুরু করে। অতঃপর দাউদ (আ:) (ডেভিড) এর নেতৃত্বে তারা প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন) দখল করে এবং জেরুজালেম শহরে রাজধানী স্থাপন করেন। দাউদ (আ:) হিব্রু জাতিকে সুসংহত করেন। তাঁর এর মৃত্যুর পর সুলায়মান (আ:) (সলোমন) হিব্রুদের রাজা মনোনীত হন। তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী ও সুপণ্ডিত। খ্রিস্টপূর্ব ৯৩৫ অব্দে সুলায়মান (আ:) মৃত্যুবরণ করলে হিব্রু জাতির পতন শুরু হয়। জেরুজালেম রাজ্য দ্বিখন্ডিত হয়ে উত্তরে ইসরাইল এবং দক্ষিণে 'জুদাহ রাজ্যে' বিভক্ত হয়। পরে এ্যাসিরীয়গণ হিব্রুরাজ্য এবং ক্যাল্ডীয় রাজা নেবুচাঁদনেজার 'জুদাহ' রাজ্য দখল করেন। প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে হিব্রু জাতির উত্থান সভ্যতার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা।



হিব্রু জাতির বসবাসের অঞ্চল

হিব্রু ধর্ম

তাওরাত বা ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old Testament) হিব্রু ধর্মের (ইহুদী জাতির) প্রধান ধর্মগ্রন্থ। মুসা (আ:) এর নেতৃত্বে তারা একেশ্বরবাদের প্রতীক হিসেবে যেহোভার আরাধনায় আকৃষ্ট হয়। মুসা (আ:) এর মৃত্যুর পর হিব্রু ধর্ম কুসংস্কারে পতিত হয়। নিরাকার আল্লাহর স্থলে জেহোভাকে তারা আকার-বিশিষ্ট একেশ্বর বলে মনে করত। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে পারস্যের হাতে জেরুজালেমের পতন ঘটলে হিব্রুরা পারস্যের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন বন্দীদশায় থাকার পর এক পর্যায়ে হিব্রুদের মধ্যে নব চেতনার উদ্ভব হয়। এ যুগে ইহুদীরা জরথুস্ত্র ধর্মের প্রভাবে আসে এবং আবার একেশ্বরবাদে আকৃষ্ট হয়।

হিব্রু আইন

হিব্রুদেরও আইন তৈরীতে এ্যামোরাইটদের ন্যায় যথেষ্ট অবদান আছে। তবে তাদের আইন অনেকটা হাম্মুরাবীর আইনের দ্বারা প্রভাবিত। ব্যাবিলনীয় আইনের অনুকরণে তারা যে আইন তৈরী করে তা 'ডিউটোরোনোমিক কোড' নামে পরিচিত ছিল। এই কোড হাম্মুরাবীর আইনের চেয়ে অনেকটা পরিশুদ্ধ বলে মনে করা হয়। তাদের প্রণীত অনুশাসনে গরীব-দুঃখীদের স্বার্থরক্ষা, মানবতা, সুক্ষ্ম বিচার, সুদ গ্রহণে শাস্তির ব্যবস্থা এবং দাসদের মুক্তির যথাযথ ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে এই আইনের প্রয়োগের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা মজবুত হয়।

হিব্রু সাহিত্য

হিব্রুদের সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বেশ পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের সাহিত্য কর্ম 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' (Old Testament) এবং 'অ্যাপক্রিপা'য় (Apocryphal) লিপিবদ্ধ রয়েছে। মুসার (আ:) এর অনেক বাণী ওল্ড টেস্টামেন্টে সংগৃহীত করা হয়েছে। "উইজডম অব সলোমন" একটি শ্রেষ্ঠ ইহুদী সাহিত্য গ্রন্থ। এ ছাড়া "সোলেমানের গীতিকা" (Songs of Solomon) হিব্রুজাতির জনপ্রিয় গীতিকা। 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' (Old Testament) এর দ্বিতীয় পুস্তক ('The Book of Exodus') ছিল মূলত মুসা (আ:) এর জীবনবৃত্তান্ত। ষষ্ট পুস্তকটি ('The Book of Joshus') মহাকাব্যের মানসম্মত ছিল। এখানে হিব্রু বীর ও জনগনের ঘটনাবহুল জীবন কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অষ্টম পুস্তকে ('The Book of Ruth') নারীদের অবস্থান ও চরিত্র করুণ রসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। হিব্রু শিল্পকলা এবং স্থাপত্য অতুলনীয়। দাউদ (আ:) জেরুজালেমকে ঐশ্বর্যশালী তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন। জেরুজালেমে এখনো অনেক স্থাপত্য তাঁর কীর্তি বহন করছে যা আজও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

হিব্রু দর্শন

গ্রীকদের পূর্বে হিব্রুরা বিস্ময়কর দর্শনের জন্ম দিতে পেরেছিল। এই দর্শন মানুষ ও জীবন সম্পর্কে নতুন ধারণা দিয়েছিল। পুরাতন টেস্টামেন্টে তাদের অনেক দার্শনিক-মতবাদ পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষ করে 'Book of Proverbs' এবং 'Apocryphal Book of Ecclesiasticus'- পুরাতন টেস্টামেন্টের এই দুই অংশে হিব্রুদের প্রাথমিক দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে।

পারস্য প্রভাবের ফল

হিব্রু ধর্ম উন্নয়নের চূড়ান্ত স্তর ছিল পারস্য প্রভাবের ফল। এই স্তর ছিল ৫৩৯ থেকে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। পারস্য প্রভাবের এ সময় ইহুদী ধর্মে একটি বড় রকমের অলোড়ন হচ্ছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরজীবন ও অশুভ শক্তি হিসেবে শয়তানের অস্তিত্বের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। জাগতিক জীবনের ভোগ বিলাশের চেয়ে হিব্রুদের কাছে পরজীবনের শান্তির প্রশ্নটিই বড় হয়ে পড়ে। যাতে হিব্রু ধর্মে একেশ্বরবাদী চেতনার কঠোরতার প্রকাশ ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**হিব্রু জাতির বিভিন্ন শহর ও নেতাদের তালিকা তৈরী করুন।**

হিব্রু জাতির আদি পুরুষ কে?	তাদের শহরের নাম কী?	হিব্রু নেতাদের নাম কী?

সারসংক্ষেপ :

মধ্য এশিয়া ও নিকট প্রাচ্যের যেসব সভ্যতা আমাদের আধুনিক সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে তাদের মধ্যে হিব্রু সভ্যতা অন্যতম। হিব্রু সভ্যতা পূর্ববর্তী সভ্যতার অনেক কিছু আত্মস্থ করেছিল বটে কিন্তু হিব্রু সভ্যতার মৌলিক কিছু সৃষ্টিও আছে। বিশেষ করে একেশ্বরবাদের প্রবক্তা ইহুদীরা ধর্মে নৈতিকতা এবং পবিত্রতা রক্ষায় অধিক ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হিব্রু শব্দের অর্থ-
   ক. দেশী খ. যাযাবর
   গ. বিদেশী ঘ. স্থানীক

২. হিব্রু জাতির আদি পুরুষ-
   ক. আব্রাহাম খ. সোলেমান
   গ. ডুঙি ঘ. ডেভিড

৩. হিব্রুদের প্রধান দেবতা
   ক. উরিয়া খ. জেহোভা
   গ. ওসিরিয় ঘ. জেকব

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আরেফিন সভ্যতা সম্পর্কে জানতে গিয়ে প্রাচীন হিব্রু জাতি সম্পর্কে জানলেন। হিব্রু জাতির সাথে তিনি ইহুদী জাতির মিল লক্ষ্য করলেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন।

৪। ইসলামের মতো একেশ্বরবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল?
   (ক) খ্রিষ্ট ধর্ম (খ) হিন্দু ধর্ম
   (গ) বেদ (ঘ) ইহুদী ধর্ম।

   কোনটি সঠিক?
   (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.৫

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

শিরিন সুলতানা দীর্ঘদিন ধরে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে চলেছেন। সম্প্রতি তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, ''এ সমাজই একটি সময় মনে করত কন্যা সন্তান জন্মদান অপমানজনক।'' এ অবস্থার উত্তরণে বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা অন্দোলন সফল হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

ক. ইহুদী জাতির ধর্মের নাম কী? ১
খ. হিব্রুদের জাতিগত পরিচয় ব্যাখ্যা দিন। ২
গ. উদ্দীপককে শিরিন সুলতানার বক্তব্যে কোন সভ্যতায় নারীর অবস্থা ফুটে উঠেছে? মূল্যায়ন করুন। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার সাথে বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-১.৬ গ্রিক সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গ্রিক সভ্যতার উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- হেলেনিক ও হেলেনিষ্টিক সভ্যতার পার্থক্য বুঝতে পারবেন ও
- গ্রিক দর্শন-সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**বলকান উপকূল, 'ওসেনিয়ান' (সাগরীয়) সভ্যতা, 'হেলাস' 'ইলিয়ড' এবং 'ওডিসি'**

গ্রিক সভ্যতার উৎপত্তি স্থল

ইউরোপ মহাদেশের গ্রিক রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রাচীন কয়েকটি শহরকে কেন্দ্র করে গ্রিক সভ্যতার উদ্ভব ঘটে। বলকান উপকূলের দক্ষিণাংশে অবস্থিত গ্রিক প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী বিস্তৃত। ভূ-প্রকৃতিই দেশটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে; দক্ষিণ গ্রিস, মধ্য গ্রিস ও উত্তর গ্রিস। মেসিডোনিয়ান অধিপতি আলেকজাণ্ডারের শাসনামলে এ সভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে আধুনিক মিসর, ইসরাইল, প্যালেষ্টাইন, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও ইরান হয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর, ইজিয়ান সাগর দ্বারা বেষ্টিত থাকার কারণে গ্রিক সভ্যতাকে 'ওসেনিয়ান' (সাগরীয়) সভ্যতা বলা হয়। অপরদিকে মিসর, ব্যাবিলন সভ্যতা ছিল নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা।



প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা

গ্রিকদের রাজনৈতিক ইতিহাস

প্রাচীন গ্রিক সমাজের বিশেষত্ব দাসপ্রথা, গ্রিকদের আগে আর কোন সমাজই দাসত্বের বুনিয়াদের উপর গড়ে ওঠে নাই। গ্রিকদের আদি বাসস্থান গ্রিসে নয়। গ্রিসে আসার পূর্বে তারা থিসালি ও এপিরাসে বাস করত। গ্রিক সভ্যতার সূচনাকাল থেকে পতন পর্যন্ত এর রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে, এ সভ্যতাকে ২টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা: ১. হেলেনিক যুগ, ২. হেলেনিস্টিক যুগ।

হেলেনিক সভ্যতা

গ্রিক সভ্যতায় দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তর হেলেনিক সভ্যতা এবং দ্বিতীয় স্তরে হেলেনিস্টিক সভ্যতা। গ্রিকরা তাদের 'হেলাস' বলতো। তাই গ্রীক সভ্যতার উন্মেষ বা আদিপর্ব হেলেনিক যুগ। কেবল গ্রিক উপদ্বীপ কেন্দ্রিক এই সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র বিন্দু ছিল এথেন্স। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ৩৩৬ অব্দ পর্যন্ত হেলেনিক যুগ বিদ্যমান ছিল। অতঃপর রাজা ফিলিপ কর্তৃক মেসিডোনিয়া কেন্দ্রিক নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে। রাজা ফিলিপের পুত্র আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে গ্রিকরা ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়াব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। গ্রিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে বাইরের সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে পরবর্তীতে যে সভ্যতার সৃষ্টি হয় তা-ই হেলেনিস্টিক যুগের সভ্যতা। হলাস'

হোমারিক যুগ (১২০০-৮০০ খ্রি :)

গ্রিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে আদিকালকে 'হোমারিক যুগ' বলা হয়। গ্রিক কবি হোমারের নাম থেকে এ যুগের নামকরণ করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৮০০ অব্দ পর্যন্ত এই যুগের বিস্তৃতি। বিখ্যাত কবি হোমার 'ইলিয়ড' এবং 'ওডিসি' নামে দুটি মহাকাব্য রচনা করেন। তার রচনাবলী থেকে গ্রিক ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, লোক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। হোমারিক যুগে সমগ্র গ্রিস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামীণ সংস্থায় (Village/Rural Community) বিভক্ত ছিল এবং স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হতো।

নগর রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ ও গণতান্ত্রিক এথেন্স

খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে হোমারিক যুগের অবসান ঘটে। হোমারিক যুগের গ্রাম সম্প্রদায়গুলি ভেঙ্গে কালক্রমে নগর রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এথেন্স, থিব্স, মেগারা, স্পার্টা এবং করিন্থ প্রভৃতি নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এগুলির মধ্যে এথেন্স ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার ধারক বাহক। এথেন্সই ছিল গ্রিসের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ৫৯৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সোলন নামক একজন সংস্কারক এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করেন। তাঁর পদক্ষেপসমূহ (১) ৪০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্সিল গঠন, (২) সংসদ বা সাধারণ পরিষদে নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি, (৩) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি সুপ্রীম কোর্ট গঠন। এছাড়া প্রশাসন ও ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি অবদান রাখেন। এই সংস্কারের ফলে এথেন্সের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্লিস্থিনিস্

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দে ক্লিস্থিনিস জনগণের সহায়তায় এথেন্সের ক্ষমতায় আসেন। তিনি এথেন্সের গণতন্ত্রের প্রতিভূ (Father of Athenian Democracy) হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এ সময়ে পারস্য কর্তৃক গ্রিস আক্রান্ত হয় এবং দীর্ঘ দিন গ্রিক-পারস্য যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।

গ্রিক-পারস্য যুদ্ধ

পারস্যের অ্যাকামেনীয় সম্রাট ছিলেন বিখ্যাত সাইরাস। তিনি প্রথমে গ্রিক অভিযান করেন এবং নগর রাষ্ট্র সমূহের ওপর ধ্বংসলীলা চালান। সাইরাসের পর পারস্য সম্রাট দারিয়ুস গ্রিক আক্রমণ করে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে ম্যারাথন নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে গ্রিকরা পারস্য বাহিনীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে। উল্লেখ এ যুদ্ধের ঘটনাকে স্মরণ করে পরবর্তীতে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। প্রতি ৪ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এ খেলায় বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করত। ফলে এ খেলার সূত্র ধরে পারস্পরিক শত্রুতা অপসারিত হয়ে গ্রিকদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে। ম্যারাথনে পরাজয়ের পর দারিয়ুসের পুত্র জারেক্সস খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে গ্রিক যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু থার্মোপলীর যুদ্ধে পারস্য বাহিনী আবার পরাজিত হয়। গ্রিকদের বিজয়ের ফলে গ্রিক গণতন্ত্র আরো সুদৃঢ় হয় এবং গ্রিসের মূলভুখণ্ড থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত গ্রিক গণতন্ত্র ছড়িয়ে পড়ে। গ্রিক গণতন্ত্র পৃথিবীর ইতিহাসে আজও স্বরণীয়।

পেরিক্লিসের যুগ

দেশাত্মবোধে উজ্জিবিত গ্রিকরা এথেন্সের নেতৃত্বে এক সমৃদ্ধিশালী গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই বিকশিত গণতন্ত্র ও সমাজকে আরো চূড়ান্ত শিখরে তোলেন বিখ্যাত পেরিক্লিস। তাঁর সময়ে (খ্রিঃ পূর্ব ৪৬১-৪২৯) সমগ্র গ্রিসের গণতন্ত্র, স্থাপত্যকলা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম বিকাশ লাভ করে। এই কারণে তাঁর সময়কালে পেরিক্লিসের যুগ বলা হয়। পেরিক্লিসের সময়ে নাট্যকার সোফোক্লিস, দার্শনিক এনাক্সগোরাস, নাট্যকার ইউরিপিডিস রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

হেলেনিক সভ্যতার পতন

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিসের দুটি শক্তিশালী নগর রাষ্ট্র এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এ সময় স্পার্টা নগর রাষ্ট্রটি বরাবরই সামরিকতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তা ইতিহাসে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ (খ্রিস্টপূর্ব ৪৩১-৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বলে খ্যাত। এই যুদ্ধে এথেন্সের পতন ঘটে এবং স্পার্টা এথেন্স দখল করে নেয়। যার ফলে হেলেনিক সভ্যতারও পতন ঘটে।

হেলেনিস্টিক যুগ

আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উত্তর গ্রিসের মেসিডোনীয় রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মেসিডোনীয় রাজা ফিলিপ, এথেন্সসহ সমগ্র গ্রিক রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। রাজা ফিলিপের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে ইউরোপসহ শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্য অধিকৃত হয়। আলেকজান্ডার এখন পারস্য, মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের সম্রাট। ফলে গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রাচ্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক

নতুন যুগের সূচনা হয়। মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ছিল এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি। তাই এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি আলেকজান্দ্রিয়ান বা হেলেনিস্টিক সভ্যতা বলে পরিচিত।

গ্রিক দর্শন ও সংস্কৃতি

পৃথিবী ব্যাপী সভ্যতার ইতিহাসে গ্রীক দর্শন গোটা বিশ্বের দর্শন ও সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে। অদ্যাবধি জ্ঞানের জগতে যে সকল গ্রিক কবি দার্শনিক জ্ঞানের আলোক বর্তিকা বিতরণ করেছেন তাদের মধ্যে বিশ্ব বিখ্যাত শিক্ষাগুরু সক্রেটিস। সক্রেটিস এর ছাত্র প্লেটো ও প্লেটো এর ছাত্র এ্যারিস্টটল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রিক দার্শনিকদের যুক্তি, ব্যাখ্যা ও দর্শন জগতকে সমৃদ্ধিশালী করে। এই সকল যুক্তিবাদী দার্শনিককে সফিস্ট বলা হয়। গ্রিক দর্শনে অন্যতম দার্শনিক সক্রেটিস নিজের সত্য প্রকাশে অনড় থেকে শাসকের নির্দেশে বিষপান করে মৃত্যুবরণ করেন। তার বিখ্যাত উক্তি 'নিজেকে জানো' (Know Thyself)। তাঁর শিষ্য প্লেটো এবং প্লেটো শিষ্য এ্যারিস্টটলের সর্বকালের বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। প্লোটো বারো বছর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে 'একাডেমি' নামে একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শিক্ষাগুরু প্লেটোর সাথে জ্ঞানের ক্ষেত্রে মতের কিছুটা অমিল ঘটলে এ্যারিস্টটল নিজেই 'লাইসিয়াম' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ সিম্পোজিয়াম, রিপাবলিক এবং লজ প্রভৃতি। এ্যারিস্টটলের বিখ্যাত গ্রন্থ লজিক, ফিজিক্স এবং পলিটিক্স প্রভৃতি। এ্যারিস্টটলের 'পলিটিক্স' (Politics) গ্রন্থে রাজনীতি, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে মতামত তুলে ধরা হয়েছে। প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি রিপাবলিক'। আর বিশ্ববিজেতা আলেকজান্ডার নিজেও একজন দার্শনিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন দার্শনিক প্লেটো।

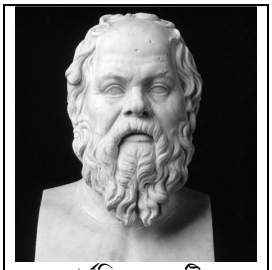
দার্শনিক সক্রেটিস

গ্রিক সাহিত্য

হোমারিক যুগে গ্রিক সাহিত্যের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। যদিও হোমারের সাহিত্য নিয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'তে গ্রিকদের বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হোমারিকযুগের পরে গ্রিক সমাজে গীতিকাব্য ও শোক গাথার আবির্ভাব ঘটে। এ সকল শোক গাথায় ব্যক্তিগত প্রণয়কাহিনীর বিবরণ রয়েছে। সোলোন ছিলেন একজন বিখ্যাত গীতি কাব্য রচয়িতা। এছাড়া বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন এসকাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস প্রমুখ।

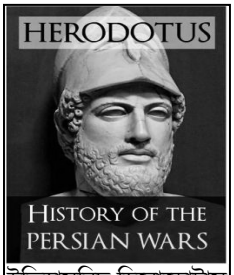

ইতিহাসবিদ হিরোডোটাস

গ্রিক ইতিহাস

ইতিহাসের জনক ছিলেন গ্রিসের বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (৪৮৪-৪২৫ খ্রি:পূর্ব)। ইতিহাস শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'হিস্ট্রি' শব্দটি গ্রিক ভাষার শব্দ। তিনি মিসর, পারস্য ও ইতালি ভ্রমণ করে ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করেন। এছাড়া জেনোফার নামে এক ব্যক্তি ইতিহাস সংগ্রহে খ্যাতি অর্জন করেন।

গ্রিক বিজ্ঞান

বিজ্ঞান সাধনায় হেলেনিস্টিক যুগেও অসাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হয়। সে সময়ে ইতিহাস গবেষণায় পলিবিয়াস, জ্যোর্তিবিদ্যায় এ্যারিস্টটল ও হিপারকাস, গণিতে বিখ্যাত পিথাগোরাস ও ইউক্লিড প্রমুখ মনিষীগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	গ্রিক সভ্যতার বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

গ্রীক সভ্যতার বড় বৈশিষ্ট্য 'চিন্তার স্বাধীনতা'। এ সময়ে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার প্রতি স্পৃহা জাগে এবং আত্মার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এ সভ্যতায় ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়। পুরোহিতদের কব্জা থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ নিজের বিবেক বুদ্ধি ও মননশীলতাকে প্রাধান্য দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গ্রিক সভ্যতার দুটি স্তর রয়েছে-
   ক. হেলেনিক এবং হেলেনিস্টিক সভ্যতা খ. হেলাস এবং হেলেন সভ্যতা
   গ. গ্রিস এবং হেলেন সভ্যতা ঘ. রোমান এবং হেলেন সভ্যতা

২. গ্রিসের গণতান্ত্রিক নগর রাষ্ট্র ছিল-
   ক. স্পার্টা খ. এথেন্স
   গ. মেগারা ঘ. থিনিস

৩. মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' কার লিখিত ছিল?
   ক. রাজা হাম্মুরাবী খ. রাজা নেবুচ্যাদনেজার গ. হোমারের ঘ. 'ওডিসি'র
   কোনটি সঠিক?
   (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন কলাকৌশল ও আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মানুষ জ্ঞান লাভ করছে। আর এই জ্ঞান পৃথিবীতে বিতরণের কাজটি করেছেন কয়েকজন মহামনীষী।

৪। গ্রিক দর্শনের কোন বিখ্যাত দার্শনিক নিজের সত্য প্রকাশে অনড় থেকে শাসকের নির্দেশে বিষপান করে মৃত্যুবরণ করেন?
   (ক) সক্রেটিস (খ) এ্যারিস্টটল (গ) প্লেটো (ঘ) আলেকজান্ডার ।

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.৪

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

গ্রিক সভ্যতার সূচনাকাল থেকে গ্রিক সভ্যতার পতনের সময়কাল পর্যন্ত এর রাজনৈতিক অবস্থান পর্যালোচনা করে এ সভ্যতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- ১. হেলেনিক যুগ; ২. হেলেনিস্টিক যুগ। গ্রিক সভ্যতায় হেলেনীয় যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে ইতিহাসে ক্রমবিবর্তনে হেলেনিস্টিক যুগের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এ যুগের সূচনা ঘটেছিল মেসিডোনীয় শাসক দ্বিতীয় ফিলিপ কর্তৃক।

ক. হেলেনিস্টিক যুগের সৃষ্টিতে কে জড়িয়ে আছেন? ১
খ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হেলেনিস্টিকদের অবদান ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সভ্যতাটি বিকাশে এথেন্সবাসীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের যুগের সভ্যতা কীরূপ ছিল মতামত দিন। ৪

পাঠ-১.৭ রোমান সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রোমান সভ্যতা উৎপত্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন;
- রোমান সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস ও সময়কাল জানতে পারবেন ও
- জ্ঞান বিজ্ঞানে রোমানদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**টাইবার নদী, ল্যাটিন ভাষা, 'অগাস্টান যুগ', নেবুচাঁদনেজার, ও 'ঝুলন্ত উদ্যান'**

ভূমিকা:

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে- 'Rome was not build in a day'। এই প্রবাদ বাক্যটি রোমান সভ্যতার ক্ষেত্রে এমনিতেই স্থান পায়নি। কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, উদ্ভাবন-ধ্বংসের পথ পাড়ি দিয়েই গড়ে উঠেছিল রোমান সভ্যতা। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে রোমানরা গ্রিক সাম্রাজ্য দখল করে। রোমানরা ইতালি ও ইতালির পশ্চিম দিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী দেশগুলো জয় করে। লাতিনদের একটি ক্ষুদ্র জাতি থেকে সুবিশাল সাম্রাজ্যের বিকাশ হয়, মধ্য ইটালির ল্যাটিয়ামে রোম ছিল তাদের প্রধান শহর।

রোমান সভ্যতার উৎপত্তি

গ্রিক সভ্যতার সমসাময়িক রোমান সভ্যতা হেলেনিক ও হেলেনিস্টিক সভ্যতার অনেক সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। ঐতিহাসিকদের ধারণা, ৭৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা রোমুলাস এর নামানুসারে রোম নগরীর নামকরণ করা হয়। টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন রোমানগরীকে 'বিশ্বের রাজধানী' বলা হয়। কারণ রোম নগরীর সঙ্গে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া-এই তিনটি মহাদেশের বিস্তৃত যোগাযোগ ছিল। রোমীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসহ উত্তরে ব্রিটেন, জার্মানী; পূর্বে মেসোপটেমিয়া এবং দক্ষিণে মিসর ও লিবিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

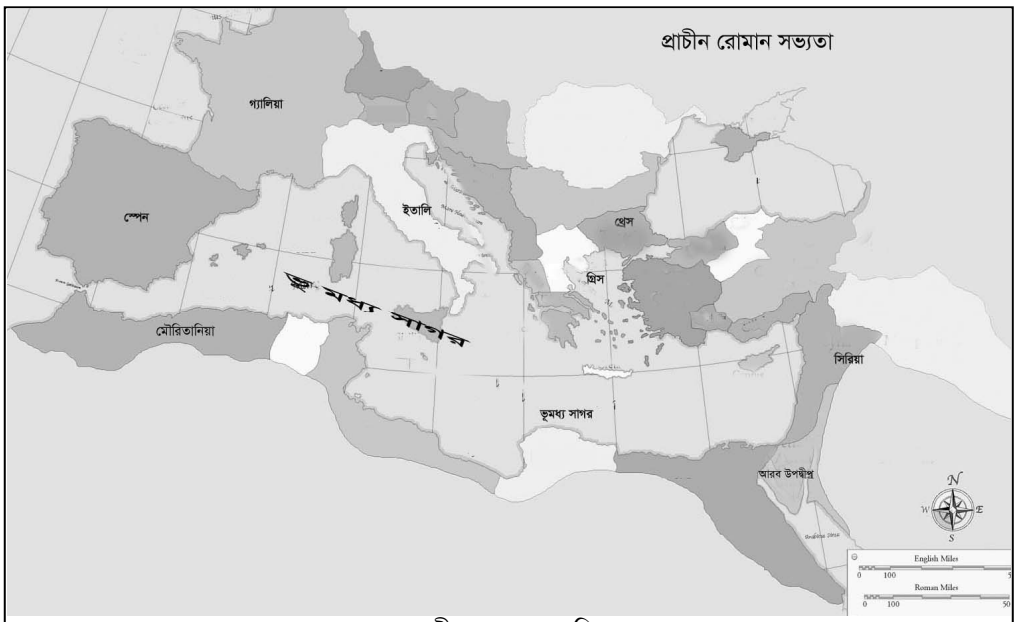

প্রাচীন রোমান মানচিত্র

রোমান ইতিহাস

ঐতিহাসিকগণ রোমান সভ্যতার ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেন। (ক) রাজতন্ত্র যুগ (৭৫৩-৫১০ খ্রিস্টপূর্ব), (খ) প্রজাতন্ত্র যুগ (৫১০-৬০ খ্রিস্টপূর্ব), (গ) প্রথম কনসুলেট যুগ (৬০-৩১ খ্রিস্টপূর্ব), (ঘ) সম্রাট অক্টাভিয়ান অগাস্টান যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৩১-১৪) (ঙ) অগাস্টান পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্য (১৪-৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত।

অগাস্টান যুগ

জুলিয়াস সিজারসহ (সিজার রোমান সম্রাটদের উপাধি) অনেক বিখ্যাত শাসক রোমীয় সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। কিন্তু সম্রাট অক্টাভিয়ান অগাস্টাস (খ্রিস্টপূর্ব ৩১-১৪ খ্রিস্টাব্দ) রোমের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনামলে রোমীয় সভ্যতায় স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে রোমীয় ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞানচর্চা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। এই জন্য ইতিহাসে তাঁর সময়কালকে 'অগাস্টান যুগ' (Augustan Age) বলা হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে রোমানদের অবদানঃ

রোমীয় সাহিত্য

রোমান সাহিত্য-সংস্কৃতিতে গ্রিক সভ্যতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উচ্চ শিক্ষিত রোমানরা ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতো। সে যুগে রোমান সাহিত্য চর্চা ছিল ব্যাপক। মলিয়ে প্লুটাস এবং টেরেন্স ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও নাট্যকার। রোমীয় সাহিত্যে নাটকের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। গীতি কাব্যকার ক্যাটুলাস ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। এ ছাড়া সিসিরো এবং ভার্জিল সাহিত্য চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেন। অগাস্টান পরবর্তী যুগের বিখ্যাত কবি জুভিনাল ছিলেন একজন ব্যঙ্গধর্মী কবি। সে যুগে সাহিত্য-চর্চায় স্বাধীনতা ছিল। ক্যাটুলাস রোমান শাসক পম্পি এবং জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধেও বিদ্রুপাত্মক কবিতা ও গীতি কাব্য রচনা করেন।



রোমান ক্লোসিয়াম নাট্যশালা

ইতিহাস

সাহিত্যকর্মের সঙ্গে ইতিহাস চর্চাও রোমে সমৃদ্ধি অর্জন করে। সে যুগে ইতিহাস দর্শন ও সাহিত্য চর্চার মধ্যে তেমন প্রভেদ ছিল না। সাহিত্যের প্রধান উপাদানই ছিল ইতিহাস। রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন টিটাস লিভি (Titus Livius); খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯-১৭ খ্রিস্টাব্দ), ট্যাসিটাস (৫৫-১১৭ খ্রি:) এবং প্লুটার্ক। এ সকল রোমান ঐতিহাসিকরা লিভিকে পম্পিয়ান হিসেবে অভিহিত করেন। লিভির বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ The History of Rome from the Foundation of the City, ট্যাসিটাস-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Annals' এবং 'Histories' আর প্লুটার্ক এর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'The Parallel Lives' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল। এ সব গ্রন্থে লেখকরা তৎকালীন রোমান সংস্কৃতি, রাজনৈতিক বিশৃংখলা, সামাজিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে বিবরণ দেন। রোমের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রধান উৎস হচ্ছে লিভির রচিত রোমের ইতিহাস।

রোমান ধর্ম

রোমানরা গণপ্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে শাসনকার্যে ধর্মীয় প্রভাব বা পুরোহিততন্ত্র পাকাপোক্ত হয়ে বসতে পারেনি। তাদের দেবদেবীর মধ্যে গ্রিকদের মতো মানবিক গুণাবলী আরোপিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রিক ধর্মের সঙ্গে রোমীয় ধর্মের বৈসাদৃশ্য থেকে সাদৃশ্যই বেশী পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত গ্রিক দেবতা জিউস, রোমানদের নিকট আকাশের দেবতা জুপিটার হিসেবে খ্যাত। গ্রিক দেবতা এথেনার জায়গায় রোমীয় দেবতা মিনার্ভা স্থান দখল করে। রোমের প্রেমের দেবতা ছিলেন ভেনাস। বাতাস এবং সমুদ্রের দেবতা নেপচুন রোমানদের নিকট খুবই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী ছিল। রোমীয় ধর্মচর্চা ছিল রাজনৈতিক ও ইহজাগতিক।

রোমান দর্শন

রোমানরা দর্শনের ক্ষেত্রেও গ্রিক প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। গ্রিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই রোমান দর্শনের সূত্রপাত। রোমীয় দার্শনিকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন সিসিরো (Cicero), লুক্রেটিয়াস (Lucretius)। লুক্রেটিয়াস ছিলেন গ্রিক এপিকিউরিয়ান মতবাদের প্রবক্তা। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'On the Nature of Things' অপর দিকে সিসিরো ছিলেন গ্রিক স্টয়িক মতবাদের অনুসারী। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'On Duty' তে স্টয়িক মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায়।

রোমান আইন

প্রাচীন সভ্যতায় রোমানদের অন্যতম কৃতিত্ব হলো রোমান আইন ব্যবস্থা (Roman Law)। রোমান দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন (সিভিল ও ক্রিমিনাল'ল) খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই সংকলিত হয়। এই আইনগুলি জনগণের সুবিধার্থে কাঠের ফলকে খোদিত করে রাজপথে প্রকাশ্যে টানিয়ে রাখা হতো। এ আইনগুচ্ছকে বলা হতো দ্বাদশ তালিকা (Twelve Tables)। বিশিষ্ট আইনবিদ ছিলেন গেইয়াস, আলপিয়ান প্যাপিনিয়ান এবং পলাস। সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আমলে এদেরকে আইনের ব্যাখ্যা ও মামলা নিস্পত্তির অধিকার দেয়া হয়। এদের দ্বারা আইন সংস্কারের মাধ্যমে রোমান আইন একটি সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নতুন আইনের তিনটি শাখা ছিল। (ক) জাস সিভিল (Jus Civile), (খ) জাস জেন্টিয়াম, (গ) জাস ন্যাচারাল। জাস সিভিল বা বেসামরিক আইন সকল রোমীয় নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য। জাস জেন্টিয়াম বা জনগণের আইন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রযোজ্য এবং জাস ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক আইন মূলতঃ প্রাকৃতিকভাবে ন্যায় অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে মানুষ জন্মগতভাবে সমান এবং মৌলিক অধিকার প্রাপ্ত। তাই, রাষ্ট্র বা সরকার তাকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। এই আইনের প্রবক্তা ছিলেন দার্শনিক সিসেরো। ৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জপাতে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলিত হয়। রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর পূর্ব-রোমে নতুনভাবে রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে ইতালির কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। রোম এবং অন্যান্য বড় শহরগুলোতে সর্বহারা দল ভিড় করে। রোমের দাস-মালিকরা গর্বের সঙ্গে বলত, রোমের ক্ষমতা চিরস্থায়ী। তাদের শক্তিমান রক্ষীবাহিনী ও বিশাল সেনাবাহিনী অপরাজেয়। কিন্তু সেই শক্তি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। জার্মান ও পারসিকরা এক একটি রোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি দখল করতে থাকে। যারা কয়েক শতাব্দী ব্যাপী অন্যদের দাস বানিয়েছে, আজ তারাই দাসে পরিণত হয়।

রোমান শিল্পকলা

রোমনগরীকে কেন্দ্র করে রোমান স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা বিকশিত হয়। জুলিয়াস-সিজারের আমল থেকে রোমীয় শিল্পকলার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। অগাস্টাস রোমীয় শিল্পকলাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। রোম নগরীর স্থাপত্যে ইটের পরিবর্তে মার্বেল এবং মোজাইকের ব্যবহার শুরু হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	রোমীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবিত অঞ্চলসমূহের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

রোমান সম্রাটগণ প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী শাসন করেছেন। তাঁরা পাশাপাশি সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন ও শিল্পকলার প্রসার ঘটিয়ে বিশ্বমানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধশালী করেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে রোম ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী নগরী। প্রচলিত আছে যে, রোম গোটা বিশ্বকে শাসন করেছে (Rome ruled the world)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অগাস্টান যুগ বলা হয়–

ক. জুলিয়াস সিজারের শাসনকালকে
খ. অক্টাভিয়ান অগাস্টাসের শাসনামলকে
গ. ব্রুটাসের শাসন কালকে
ঘ. পম্পির রাজত্বকালকে

২. রোমীয় আকাশ দেবতার নাম-

ক. জুপিটার খ. জিউস

গ. এথেনা ঘ. মিনর্ভা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মারুফ সভ্যতা সম্পর্কে জানতে গিয়ে জানলেন যে কোন সভ্যতা একদিনে গড়ে ওঠেনি। সভ্যতার এই অগ্রযাত্রা নদীর মত বহমান, এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে তার অভিষ্ট লক্ষ্য পানে। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এর চলমান ধারা অব্যাহত থাকবে।

৩। রোমান নতুন আইনের শাখা ছিল-

i. জাস সিভিল

ii. জাস জেন্টিয়াম

iii. জাস ন্যাচারাল

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ১.৭

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতাটি গড়ে তুলেছিল এ্যাসেরীয়গণ। বেশকিছু শহর নিয়ে এ্যাসেরীয় সভ্যতার বিকাশ হয়। এ্যাসেরীয় সমাজের মানুষ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। তারা বহু দেবতায় বিশ্বাসী ছিল। সিহাব শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করল- স্যার, তাদের কি কোন আইনি কাঠামো ছিল? শিক্ষক বললেন, সুশৃংঙ্খল জীবন পরিচালনার জন্য তারা একটি আইনের কাঠামো গড়ে তোলে। এ্যাসেরীয়রা একটি ভিন্ন ধরনের লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে।

ক. প্রাচীনকালে ইউরোপের কোথায় রোমান সভ্যতা গড়ে ওঠে? ১

খ. রোমান আইন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন। ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত দর্শনে রোমান সভ্যতার দার্শনিকদের কী অবদান রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. ধর্মের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত সভ্যতার ন্যায় রোমান দার্শনিকদের মূল্যায়ন করুন। ৪

উত্তরমালাঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ :	১.ক	২.গ	৩.খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ :	১.গ	২.ক	৩.খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ :	১.ঘ	২.গ	৩.খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ :	১.ক	২.গ	৩.ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫ :	১.গ	২.ক	৩.খ	৪.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬ :	১.ক	২.খ	৩.গ	৪.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৭ :	১.খ	২.ক	৩.গ	



পিরামিড

ক. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কোন দেশের পরিচয় বহন করে?
খ. মিসরের নীল নদ প্রকৃতির দান-ব্যাখ্যা করুন?
গ. মিসরের ভূ-প্রকৃতির সাথে আমাদের দেশের ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা দিন।
ঘ. উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের ভূ-প্রকৃতির তুলনামূলক মূল্যায়ন করুন।

উপরের সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের আলোকে নিম্নের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখার চর্চা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১. সামিউল ইন্টারনেটের একটি প্রামাণ্যচিত্রে প্রাচীন সভ্যতার এক বিস্ময়কর নিদর্শন দেখতে পেলেন। প্রাচীন সেই শাসনামলে শাসকগণ একটি বিশেষ উপাধিতে ভূষিত হতেন। প্রজারা মনে করত যে রাজা ঈশ্বরের পুত্র। তাই রাজা একই সাথে ধর্মীয় প্রধান, দণ্ডদাতা ও রাষ্ট্রপ্রধান।

ক. সভ্যতা বলতে কী বুঝায়? ১
খ. প্রাচীন মিসর সভ্যতার লীলাভূমি- ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. সামিউলের ইন্টারনেটে দেখা প্রামাণ্যচিত্রটি কোন সভ্যতার কৃষি ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন? ৩
ঘ. বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার সাথে মিসরীয় কৃষি ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন। ৪

জাহিলিয়া যুগে আরব

ইউনিট ২

ভূমিকা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। মহান আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে আরবসহ সমগ্র বিশ্ব ছিল জাহিলিয়ার ঘোর তমাসায় আচ্ছন্ন। এ যুগে আইন-কানুন, নীতি নৈতিকতা, শিক্ষাসংস্কৃতি, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি, মানবতাবোধ, ধার্মিকতা, শুদ্ধতা এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি ছিল না। সর্বক্ষেত্রেই সর্বগ্রাসী বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। ইসলামের আবির্ভাবে এ ভুবনব্যাপী অমানিশার অবসান ঘটে এবং সত্যিকার সুন্দর প্রভাতের আলোকচ্ছটায় আরবসহ বিশ্বজাহান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই পাঠের ইউনিটসমূহ

পাঠ ২.১: জাজিরাতুল আরব: পরিচিতি ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য
পাঠ ২.২: আইয়ামে জাহিলিয়া
পাঠ ২.৩: জাহিলিয়া যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
পাঠ ২.৪: জাহিলিয়া যুগে আরবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা
পাঠ ২.৫: জাহিলিয়া যুগে আরবের ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক অবস্থা

পাঠ-২.১ জাজিরাতুল আরবঃ পরিচিতি ও ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- আরব দেশ তথা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম উপদ্বীপ জাযিরাতুল আরব সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আরবদের পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরবের আবহাওয়া ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**জাযিরাতুল আরব, আরবে বায়েদা, আরবে আরবা, হিজায ও যাযাবর**

আরবের অবস্থান ও আয়তন

ইসলামের জন্মভূমি আরব দেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম উপদ্বীপ। এটি এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। আরবের উত্তরে সিরিয়ার মরুভূমি, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে এটি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এদেশের মাটি পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা। তাই আরবের মক্কা নগরীকে 'উম্মুল কুরা' বা আদি নগরী বলা হয়েছে। তদানিন্তন আরবের আয়তন ছিল ১০,২৭,০০০ বর্গমাইল। আয়তনে এটি ইউরোপের একচতুর্থাংশ এবং আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ। উত্তর আরবের সামান্য কিছু স্থানে মরূদ্যান আছে, সেখানে লোকবসতি গড়ে ওঠে। এছাড়া প্রায় সমগ্র আরব অঞ্চল মরুময়। হিজায, নজ্‌দ্ এবং আল্-হাস্‌সা প্রদেশ নিয়ে আরব দেশ গঠিত। হাদ্‌রামাউত, ইয়েমেন ও ওমান নিয়ে দক্ষিণ আরব গঠিত। এ এলাকা উর্বর এবং প্রাচীনকালে এটিকে Arabia Felix বা সৌভাগ্য আরব বলা হতো।

আরবের নামকরণ

আরবকে কেন আরব নামকরণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। প্রসিদ্ধ কয়েকটি মতামত নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. আরব শব্দটির অর্থ হলো 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুন্দর ভাষায় কথা বলা'। যেহেতু আরবের অধিবাসীরা নিজেদের ভাষা ও পাণ্ডিত্যের সম্মুখে সমগ্র পৃথিবীর লোককে 'আজমী' (মূক, বোবা) বলে ভাবতে, এজন্য তারা নিজেদের আরব বা আরবি এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহকে আজম বা আজমি অর্থাৎ কথা বলতে অক্ষম বলে মনে করতো। ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি তাদের আরব বা আরবি নাম ডাকতে শুরু করে। ফলে তারা 'আরব' নামে পরিচিতি লাভ করে।

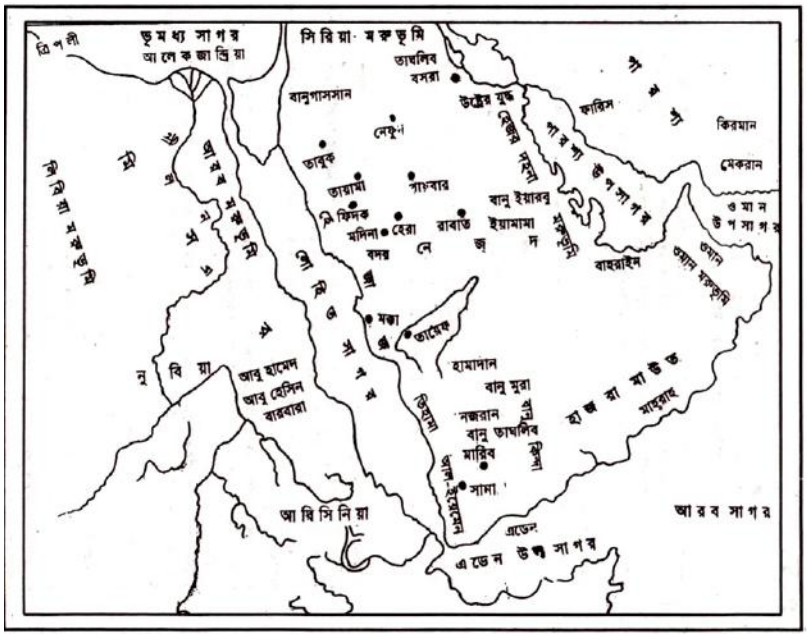

চিত্রঃ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সময় আরব

২. 'আরব' শব্দটি 'আল-আরবাতু' থেকে নির্গত হয়েছে যার অর্থ হলো 'লতাগুল্মহীন মরুভূমি'। যেহেতু এ অঞ্চল বৃক্ষলতাহীন মরুভূমি। তাই এ অঞ্চলটিকে আরব নামকরণ করা হয়েছে।

আবহাওয়া

আরব দেশের তিন দিক সাগরবেষ্টিত থাকার কারণে একে আরব উপদ্বীপ বা 'জাযিরাতুল আরব' বলা হয়। আরবে কোনো নদ-নদী নেই। অধিকাংশ অঞ্চলের আবহাওয়া গরম ও শুষ্ক। উচ্চভূমিতে গরমের সময় রাত নাতিশীতোষ্ণ হয়ে থাকে। শীতকালে কোনো কোনো সময় তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নিচে নেমে যায়। আরবের পূবালি হাওয়া অতীব আরামদায়ক। আরবের প্রাচীন কবিগণ তাঁদের রচিত কবিতায় পুবালি হাওয়ার প্রশংসা গেয়েছেন। আরবের একতৃতীয়াংশ মরুময় প্রকৃতির রুদ্রলীলাস্থল এবং মনুষ্য বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, শুষ্ক ও নিষ্করণ রৌদ্রতাপ পীড়িত, বৃক্ষলতাদিশূন্য এবং সেখানে লু-হাওয়া প্রবাহিত হয়। তবে ওমান, ইয়েমেন, তায়েফ ও মদিনায় বছরে দু'বার বৃষ্টিপাত হয়। এ সকল অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ও আবহাওয়া মোটামুটি ভালো।

উৎপন্ন দ্রব্য : আরব দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে প্রধান হলো খেজুর। তৎকালীন আরবে খেজুর গাছকে Queen of the trees বা 'গাছের রাণী' বলে অভিহিত করা হতো। এ গাছ ধনী-দরিদ্র সকলের বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিল। খেজুর ব্যতীত আরবদের জীবন কল্পনাই করা যেত না। আরবের উপকূল এলাকায় ফলমূল ও শাকসবজি জন্মাত। সেকালে ইয়েমেন সর্বাপেক্ষা উর্বর প্রদেশ ছিল। তথায় গম ও কফি অত্যধিক ফলত। আম্মান প্রদেশের কোনো কোনো এলাকায় ধানেরও আবাদ হতো। হাদরামাউত ও মিহ্‌রা নামক স্থানদ্বয় গুল এবং ধুনট গাছ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। আরব বিস্তীর্ণ মরুভূমির দেশ হলেও এর বিভিন্ন স্থানে সবুজ-শ্যামল দৃশ্য চোখে পড়ত। পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম (আ.)-এর প্রার্থিত দোয়া-"হে আমার প্রভু! তুমি এ (আরব) নগরীকে নিরাপত্তার স্থান বানিয়ে দাও এবং এর অধিবাসীদের ফলফলারি থেকে রিযিক দান কর।"(সুরা বাকারাহ,২:১২৬)

জীবজন্তু : অনেক প্রাচীনকাল থেকে আরবে উট, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল ও দুম্বা গৃহপালিত জন্তু হিসেবে সমাদৃত ছিল। আরবের বন্য জন্তুর মধ্যে হায়েনা, বাঘ, সরীসৃপ ও খেঁকশিয়াল প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। কবুতর, বাজপাখি, ঈগল, হুদহুদ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পাখিও আরবে বিদ্যমান ছিল। জীবজন্তুর মধ্যে উট এবং বৃক্ষের মধ্যে খেজুর গাছ আরববাসীর নিকট অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। মরুজীবনের একমাত্র সহায়-সম্বল ছিল উট। উট তাদের নিকট The ship of the desert বা 'মরুভূমির জাহাজ' নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি তাঁর *History of the Arabs* গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেন- The camel is the nomads' nourisher, his vehicle of transportation and his medium of exchange. The dowry of the bride, the price of the blood, the profit of maysir (gambling). The wealth of a Sheikh, are all computed in terms of camels.

আরব জাতি

আরব ভূমির প্রাচীন জাতিসত্তা সম্পর্কে কোনো সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে একথা ঠিক, বিভিন্ন সময়ে আরব দেশে বিভিন্ন জাতির লোক বসবাস করতো। আরব উপদ্বীপের আদিম অধিবাসীদের সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করা এখনো সম্ভব হয়নি। স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্দীপ্ত আরব জাতি প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা- **১.** অধনা লুপ্ত আরবে বায়িদা, ২. প্রকৃত আরব বা আরবে আরিবা ও ৩. আরবে মুস্তারিবা।

আরবে বায়িদা : আরবের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসীদের আরবে বায়িদা বল হয়। বায়িদা বা বাদিয়া অর্থ জঙ্গল। বায়িদাবাসীদের বেদুইন বলা হয়। তারা আরবের এত প্রাচীন বাসিন্দা, যাদের কোনো নিদর্শন এবং অবস্থার কোনো বিবরণ ঐতিহাসিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শুধু কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফ এবং আরবদের কিছু কবিতা ও পুরনো ধ্বংসাবশেষ থেকে তাদের অস্তিত্বের যৎসামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন- আদ (Aad), সামুদ (Samud), তাসম (Tasm), জাদিস (Jadis), আমালেকা (Amleka), প্রভৃতি প্রাচীন আরব গোত্রগুলো। বিভিন্ন সময় এ গোত্রগুলোর উত্থান ঘটেছিল, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন ও বিভিন্ন ধরনের পাপাচারের কারণে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রাচীন আরবের এ সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহকে বলা হয় আরবে বায়িদা।

আরবে আরিবা (প্রকৃত আরব বা বনু কাহতান) : আরবে আরিবা (Arabian Arabs) অর্থ- প্রকৃত আরব। আরবে বায়িদা জাতির বিলুপ্তির পর যারা প্রথম আরব দেশে আবাসস্থল গড়ে তোলে তাদের আরিবা বল হয়। তারা নিজেদের ইয়ারুব ইবনে কাহতান বা কাহতানের বংশধর বলে মনে করতো। তারা ইয়েমেন বা দক্ষিণ আরবে বাস করতো বলে তাদের ইয়েমেনিও বলা হতো।

আরবে মুস্তারিবা : হযরত ইবরাহীম এর সময় থেকে বিবি হাজিরা (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) মক্কায় বসবাস আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে যমযম কূপের সৃষ্টি এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর নিরলস প্রচেষ্টায় পবিত্র কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে নতুন নতুন বসতি স্থাপিত হতে থাকে। অন্যদিকে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তান-সন্ততিদেরও বংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরাই আরবে মুস্তারিবা নামে অভিহিত। আদনান নামক হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর এক বংশধর মুস্তারিবা গোত্রের

প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। হিজায, নজ্‌দ্‌, পেত্রা ও পালমিরা অঞ্চলে বসবাসকারী মুস্তারিবা গোত্রের নিযারি (Nizari) শাখা থেকে মুহাম্মদ (সা.)-এর কুরাইশ বংশের উদ্ভব হয়।

অধিবাসীদের শ্রেণিবিভাগ

ভূপকৃতির ভারতম্য অনুসারে আরবের অধিবাসীদের দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা- শহরের স্থায়ী বাসিন্দা ও মরুবাসী যাযাবর।

ক.শহরবাসী (Townsmen) : আরবের উর্বর তৃণ অঞ্চলগুলো স্থায়ীভাবে বসবাসের উপযোগী ছিল বিধায় সেখানে অসংখ্য শহর জনপদ গড়ে ওঠে। স্থায়ী বাসিন্দাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি। বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের ফলে এরা মরুবাসী বেদুইনদের তুলনায় অধিকতর রুচিশীল ও মার্জিত স্বভাবের ছিল। মরুবাসী আরবদেও অনেকেই যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে শহরে বসবাস করে। অন্যদিকে দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করতে না পেরে শহরের কিছুসংখ্যক স্থায়ী বাসিন্দাও বাধ্য হয়ে যাযাবরবৃত্তি গ্রহণ করে।

খ.মরুবাসী (Nomad) : আরবের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল স্বাধীনচেতা, বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ ও মরুবাসী বেদুইন। বেদুইনগণ জীবনধারণের জন্য মরুভূমির সর্বত্র ঘুরে বেড়াত এবং তৃণের সন্ধানে এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমিতে গমণ করতো। তাদের গৃহ ছিল তাঁবু, আহার্য ছিল উটের মাংস, পানীয় উট ও ছাগলের দুধ, প্রধান জীবিকা লুটতরাজ। কঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত যাযাবররা অন্যদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করতে বাধ্য হতো। কখনো আবার তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিত্তশালীদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করতো। হিট্টি বলেন, যাযাবরবৃত্তি একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা।

প্রাচীন আরবের ভৌগোলিক গুরুত্ব

কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ আরব উপদ্বীপ যুগ যুগ ধরে বিশ্বের নাভিকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আরবের পশ্চিমে লৌহিত সাগর ও সুয়েজ যোজক। পূর্বে পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগর। দক্ষিণে ভারত মগাসাগর। উত্তরের সীমারেখা আলেপ্পো রাজ্য ও ফোরাত নদী। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে আরব উপদ্বীপ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের মিলন স্থলে অবস্থিত। এশিয়ার মূল ভূখণ্ড ও আফ্রিকা মহাদেশের মাঝখানে অবস্থিত এ অঞ্চল ইউরোপ মহাদেশ থেকেও বেশি দূরে নয়। তাই এ উপদ্বীপকে যথাযথভাবেই তিন মহাদেশের মিলনকেন্দ্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অতীতকাল থেকেই ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে এ অঞ্চল বহুজাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের চলাচল পথ বা ক্যারাভান রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

উত্তর আরবের সামান্য কিছু স্থানে মরূদ্যান রয়েছে, সেখানে লোকবসতি গড়ে উঠেছে। এছাড়া প্রায় সমগ্র আরব অঞ্চল মরুময়। হিজায, নজদ এবং আল আহসা প্রদেশ নিয়ে আরব দেশ গঠিত। বর্তমানে সৌদি রাজবংশ কর্তৃক আরবের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। হাদরামাউত, ইয়েমেন এবং ওমান নিয়ে দক্ষিণ আরব গঠিত। আরব ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ মরুময়। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের মিলনকেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হলেও এদেশ যেন সমগ্র বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন। উত্তর-ভাগে 'নুফুদ' মরুভূমি এবং নুফুদ হতে আরম্ভ করে দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত প্রায় ৬০০ মাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে আরবের বৃহত্তম মরুভূমি 'আল-দাহনা' [আদ-রার, আল-খালি]।

আরবের প্রদেশসমূহ : ভৌগোলিক পরিবেশ বিবেচনায় আরবদেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. হিজায, ২. নজদ, ৩. ইয়ামেন, ৪. তিহামা, ৫. আরূজ।

হিজায : লৌহিত সাগারের পূর্বকূল ঘেঁষে সিরিয়া সীমান্ত হতে ইয়ামেন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে হিজায বলে। এ হিজাযই ইসলামের কেন্দ্রস্থল। এতে মক্কা, মদিনা তায়েফ, জেদ্দা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শহরগুলো অবস্থিত। মক্কা, মদিনা ও তায়েফের সাথে রাসূল (সা.) এর গভীর সম্পর্ক ছিল। এই হেজাজের পবিত্র ভূমির বরকতে আরবগণ বিশ্বের ইতিহাসে অতূলনীয় মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। জিদ্দা বিখ্যাত নদীবন্দর, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পানি পথে আগত সম্মানিত হাজীগণ অবতরণ করেন। হিজায শব্দের অর্থ হলো- পৃথক ও বিরত করা। যেহেতু হিজায অঞ্চলটি নজদ ও তিহামাকে মধ্যে পৃথক করেছে এজন্য এটি হিজায নামে অভিহিত হয়েছে। হিজাযের পশ্চিমাংশে লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে ফসলাদি উৎপন্ন হয়।

তিহামা : তেহামা আরবি শব্দটি 'তাহমুন' হতে নির্গত। অর্থ হলো প্রচণ্ড গরম বা তাপ। এ প্রদেশে অধিক গরম পড়তো বলে একে তিহামা নামে নামকরণ করা হয়েছে। এ প্রদেশটি লোহিত সাগরের তীর হতে সারাত পর্যন্ত বিস্তৃত।

আরূজ : আরূজ প্রদেশটি নজদের দক্ষিণ হতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইয়ামামা, বাহরাইন, উম্মান ও হাদরামাউত ইত্যাদি এ প্রদেশে অন্তর্ভূক্ত।

ইয়ামেন : হিজায থেকে আদন (Aden) পর্যন্ত লোহিত সাগরের কিনারা বেয়ে বিস্তৃত অঞ্চলকে ইয়ামেন বলে। এর উত্তরে হাদরামাউত, পূর্বে উম্মান এবং বাহরাইন, পশ্চিমে লোহিত সাগর অবস্থিত। এটি আরবের সর্বাধিক উর্বর ও চাষাবাদযোগ্য প্রদেশ। অতীতে এটি উন্নত ও উর্বর অঞ্চল হিসাবে বিখ্যাত ছিল। 'ইয়ামেন' আরবি শব্দ 'ইয়ামেন' (দক্ষিণ) হতে নির্গত। এটি আরব ভূখণ্ড এবং কা'বা ঘরের দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ার কারণে এ নামকরণ করা হয়।

নজদ : মধ্য আরবে ইয়ামেন হতে ইরা পর্যন্ত যে পাহাড়টি চলে গেছে তার পূর্ব অংশকে নজদ বলে। নজদের রাজধানী রিয়াদ। এটা হিজাযের পূর্বে এবং সিরিয়া মরুভূমির দক্ষিণে অবস্থিত। উঁচু ভূমিকে নজদ বলা হয়। এ অঞ্চলটি পার্শ্ববর্তী হিজায হতে উঁচু বলে একে নজদ বলে। এই প্রদেশের উত্তরাঞ্চলেই সংগঠিত হয়েছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'দাহিস' ও 'বাসুস্' যুদ্ধ। প্রতিটি যুদ্ধই প্রায় চল্লিশ বছর দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	**মানচিত্রে প্রাচীন আরবের বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করুন।**

আরবের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাগত অবস্থান কত?	আরবের কয়েকটি প্রাচীন অধিবাসীর নাম উল্লেখ করুন।	প্রাচীন আরবরা কয়ভাগে বিভক্ত?	'জাজিরাতুল আরব' অর্থ কী?

সারসংক্ষেপ :

অনুর্বর মরুভূমি ও সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে এ দেশটি কখনো আক্রমণকারীদের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়নি। তবে সর্বশেষ রাসুলের আগমনের প্রতীক্ষায় অনেকের ন্যায় ইহুদী-খ্রীস্টানরাও আরব ভূমিতে অপেক্ষার প্রহর গুনছিল। প্রাচ্য, প্রাশ্চাত্য ও উত্তর দিক থেকে আগত সকল বাণিজ্যিক পথগুলো আরব ভূ-খণ্ডের সাথে মিলিত হয়েছিল। ফলে আরব ভূখণ্ড বিশেষত মক্কা, জিদ্দা, তায়িফ, মদীনা, ইয়ামবু ও দুমাতুল জান্দালের সাথে ভারত, চীন, ইরাক, মিসর, রোম ও ইথিওপিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরবকে বিশ্ব সভ্যতার মিলনস্থলে পরিণত করে। ভৌগলিক পরিবেশ ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠির একটি চিত্র সামনে থাকলে আরব ভূমিতে রাসূলের আগমনের পরিপার্শ্বিক বিষয়াবলী সম্পর্কে সাম্যক ধারণা লাভ করা সহজ হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিন।

১। 'উম্মুল কুর'া বলা হয় কোন্ স্থানকে?
(ক) আরব (খ) মক্কা (গ) মদিনা (ঘ) বসরা

২। মুস্তারিবা গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
(ক) কাব (খ) মুররা (গ) মা'আদ (ঘ) আদনান

৩। আরবে খেজুর গাছকে Queen of the trees বলে অভিহিত করার কারণ-
i. এ গাছ ধনী-দরিদ্র সকলের বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিল;
ii. খেজুর ব্যতীত আরবদের জীবন কল্পনাই করা যেত না; iii. খেজুর আরবদের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য;
নিচের কোন্টি সঠিক?
(ক) i. (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বেদে সম্প্রদায়কে প্রায়ই দেখা যায়। তারা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নৌকায় ঘুরে বেড়ায়। নৌকা-ই হচ্ছে তাদের ঘর বাড়ী, সংসার সবকিছু। সাপ ধরা, সাপের খেলা দেখানো, বিভিন্ন ঔষধি গাছের শিকড় বিক্রি ইত্যাদি হচ্ছে তাদের পেশা। তারা নিদ্দিষ্ট স্থানে বেশিদিন স্থায়ী হয় না। যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ানোই তাদের জীবন।

(ক) জাজিরাতুল আরব অর্থ কী? ১
(খ) মরুভূমির জাহাজ বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকের বেদে সম্প্রদায়ের সাথে প্রাক ইসলামী আরবের কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য খুজে পাও ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) আরবের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার উপর ভৌগলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-২.২ আইয়ামে জাহিলিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আইয়ামে জাহিলিয়ার পরিচয় ও সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
- আইয়ামে জাহিলিয়া যুগের সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	**আইয়ামে জাহিলিয়া, অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ, মাৎসান্যায় যুগ, ঈসা (আঃ), ইয়াযদান ও আহেরমান ও তাওরাত**

আইয়ামে জাহিলিয়া

ইসলামের আবির্ভাব তথা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এ সময় আরবসহ সমগ্র বিশ্ব ছিল মূর্খতার ঘোর অন্ধকারে তমাসাচ্ছন্ন। এ যুগে আইন-কানুন, নীতি নৈতিকতা, শিক্ষাসংস্কৃতি, জ্ঞানবুদ্ধিবৃত্তি, মানবতাবোধ, ধার্মিকতা, শুদ্ধতা এবং আর্থাসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো সুষ্ঠুতা ছিল না; বরং সর্বক্ষেত্রেই সর্বগ্রাসী বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। ইসলামের আবির্ভাবে এ অমানিশার অবসান ঘটে এবং সত্যিকার সুন্দর প্রভাতের আলোকচ্ছটায় আরবসহ সমগ্র বিশ্ব সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

আইয়ামে জাহিলিয়ার পরিচয়

আইয়ামে জাহিলিয়া দুটি আরবী শব্দের সমষ্টি হলো- ১. আইয়াম ও ২. জাহিলিয়া। আইয়াম শব্দটি আরবি ইয়াওমুন শব্দের বহুবন। অর্থ হলো- দিন, যা লাইলুন বা রাতের বিপরীত অর্থে ব্যবহার হয়। তবে ইয়াওমুন শব্দের ব্যবহার সময়, কাল, যুগ, time, period, age ইত্যাদি অর্থেও হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেন- আমি মানুষের পরস্পর উন্নতি ও অবনতির যুগ পরিবর্তন করে থাকি। এখানে আইয়াম দিয়ে যুগ বুঝানো হয়েছে।

আর জাহিলিয়া শব্দটি আরবি জাহলুন শব্দ থেকে উৎলিত। অর্থ হলো- বর্বরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, তমসা বা অন্ধকার, Ignorace, darkness. তাই আইয়ামে জাহিলিয়া অর্থ তমসা বা অন্ধকার যুগ। ইংরেজিতে বলা হয় The age of Ignorance. ইসলামের ইতিহাসে এ শব্দটি নবী করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বেকার আরবদের অবস্থা সম্পর্কে ব্যবহার হয়। কেননা এ যুগে আরবরা সাধারণত স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে অজ্ঞতা ও মূর্খতার চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। যদিও কোনো ঐতিহাসিক 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বলতে হযরত ঈসা (আ.) এবং নবী করীম (সা.)-এর মধ্যকার 'ফাতরাতে অহী' তথা অহী মুলতবির সময়কে উদ্দেশ্য করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিকদের অধিকাংশের মতে, হযরত ঈসা (আ.)-এর পরবর্তী কালের কোনো উল্লেখ নেই। কেননা হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পর থেকেই ক্রমান্বয়ে সমগ্র আরবে মূর্খতাজনিত অন্ধকার ও পথভ্রষ্টতার অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করতে থাকে, যা পরবর্তীকালে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়।

আইয়ামে জাহিলিয়ার সময় ও ব্যাপ্তি

আইয়ামে জাহিলিয়ার সময়সীমা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানাবিধ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। বহুলালোচিত সেসব মতভেদ হচ্ছে-

ক. অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকের মতে, হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আইয়ামে জাহিলিয়া বলা হয়, কিন্তু এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এর অন্তর্বর্তীকালে মানুষকে হেদায়াত করার জন্য পৃথিবীতে অসংখ্য নবী রাসূলের আগমন ঘটেছিল। তাছাড়া পবিত্র কুরআনুল কারীমে ২৫ জন নবীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, "হযরত ঈসা "(আ.) ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যবর্তী সময়কালই আইয়ামে জাহিলিয়া।"

গ. ঐতিহাসিক ড. নিকোলসন ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এক শতাব্দীকালকে আইয়ামে জাহিলিয়া বলে অভিহিত করেছেন। পি.কে.হিট্টি এ মত সমর্থন করেছেন।

ঘ. প্রফেসর পি.কে.হিট্টি তাঁর প্রণীত 'হিস্ট্রি অব দা আরবস' গ্রন্থে আইয়ামে জাহিলিয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- The term Jahiliyah, usually rendered time of ignorance or barbarism in reality means the period in which Arabia had no dispensation, no inspired prophet, no revealed book.

ঙ. ঐতিহাসিক মুইর বলেন, "হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যবর্তী সময়কেই আইয়ামে জাহিলিয়া বলে।"

চ. ড. এস এম ইমামুদ্দিনের মতে, "হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের পূর্বে ৬১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক শতাব্দীকালকে আইয়ামে জাহিলিয়া বলে বোঝানো হয়েছে।"

ছ. কুরআন মাজীদে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববতী সময়কে জাহিলিয়া যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী-হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা জাহিলী যুগের ন্যায় ইসলামের আগমনের পরও বাইরে অবাধে বের হয়ো না।

জ. পবিত্র হাদীসে নববীর ভাষ্যমতে, মহানবী (সা.)-এর অহীপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী সময়কেই আইয়ামে জাহিলিয়া হিসেবে বোঝানো হয়েছে। নবী করীম (সা.) এক হাদীসে হযরত আবু যর (রা)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন- হে আবু যর! তুমি এমন ব্যক্তি যার মধ্যে জাহিলিয়া রয়ে গেছে।

অতএব আইয়ামে জাহিলিয়া বলতে আরবের অন্ধকার যুগকে বোঝানো হয়েছে, যা ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। উপরিউক্ত আলোচনায় আইয়ামে জাহিলিয়ার যে চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ইতিহাস বিশ্লেষকগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তারা বলেন, যে সময়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়, সে সময় দক্ষিণ আরব জ্ঞানগরিমায় উন্নত এবং আরববাসী সাহিত্য সংস্কৃতি, ঐতিহ্য চেতনাসহ নানা সৎ গুণাবলিতে ভূষিত ছিল। তাই জাহিলী যুগের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যে যুগে কোনো নবী রাসূল, ঐশী কিতাব না থাকায় আরববাসী নানা প্রকার অন্যায়-অনাচার, সামাজিক বিশৃংখলা, কুসংস্কার, ব্যভিচার ও মানবতাবোধের অধঃপতন, সর্বোপরি ধর্মীয় অবক্ষয়ের চরম সীমায় উপনীত হয়। জাহিলিয়া যুগে সমগ্র পৃথিবীই অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। পৃথিবীর সর্বত্র মানব সমাজ ছিল পথভ্রষ্ট। কোনো জাতিই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল না। তারা নবী-রাসূলদের প্রদর্শিত পথ ও শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টিরই তারা উপাসনা করতো।

প্রায় সকল সমাজেই দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিল। দাস-দাসীকে পণ্য দ্রব্যের ন্যায় হাট বাজারে বেচা-কেনা করা হতো। তাদের রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল শোচনীয়। শাসকরা প্রজাদের মৌলিক অধিকার হরণ করতো। শাসক কর্তৃক প্রজাদের ওপর নির্যাতন চালানো হতো। উত্তর-দিকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত তাতারীদের দাপট ছিল। তারা ভারত, ইরান ও ইউরোপে লুটতরাজ করতো। পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-সংঘাত লেগে থাকত। কোনো দেশেই শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল না।

আইয়ামে জাহিলিয়া ও বর্তমান সমাজ

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাহিলী যুগের সমাজ দর্শন, রাজনৈতিক চিন্তন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো সর্বোতভাবেই মানব জাতির স্বাভাবিক চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিপরীত পথে চলছিল। শুধু আরব নয়; সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাই মানবাধিকারের ব্যাপক অবমূল্যায়ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এমতবস্থায় শান্তির বার্তা নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব ছিল অনিবার্য। কিন্তু দুখের বিষয় হচ্ছে, জাহিলী সমাজের বিচিত্র ঘৃণিত প্রথা ও কর্মসমূহ আধুনিক সমাজে আবারো দেখা দিচ্ছে। জীবিত কন্যা সন্তানের হত্যার ধরণ পাল্টেছে মাত্র। আল্ট্রা সনোগ্রাফির মাধ্যমে কন্যা সন্তানের ভ্রূণ নিশ্চিত হয়ে প্রতিনিয়ত কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে জাহিলী সমাজের চেয়েও ঘৃন্য কায়দায় প্রকাশ্যে দিবালোকে হত্যা করা হচ্ছে। খুন, জখম, গুম যেন নতুন বর্বর সংস্কৃতিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। দারুন নদওয়া যেখানে আরব সমাজের সর্বদলীয় সংসদ ছিল, সেরকম কোন ধারণা এ সভ্য সমাজে খুজে পাওয়া যাবে কী? নারীকে পণ্যের মডেল বানিয়ে ভোগের বস্তুতে পরিণত করার এক জাহিলী উম্মাদনায় বিশ্ব আজ সয়লাব।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইয়ামে জাহিলিয়া সম্পর্কে ধারণা দিন।

সারসংক্ষেপ :

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত আরব দেশ সেমেটিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। আরবের মক্কা নগরীতে অবস্থিত কাবা ঘরের বদৌলতে আরব-বিশ্ব মানবতার মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। জীবন্ত কন্যা সন্তানের হত্যা, খুন, যুদ্ধ-সংঘাত প্রভৃতি নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমকালীন রোমান-পারস্য সাম্রাজ্য শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়। এ অঞ্চলে চরম অরাজকতা চলতে থাকে। ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ব্যক্তিতন্ত্র মানুষের টুটি চেপে ধরেছিল। মোট কথা মহানবী (সা:) এর জন্মের পূর্বে আরব তথা সমগ্র বিশ্বব্যবস্থায় এক অস্থিরতা বিরাজ করতে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আইয়ামে জাহিলিয়া শব্দে অর্থ কী?
   ক) অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ খ) প্রগতির যুগ
   ঘ) গোঁড়ামির যুগ ঘ) কালোছায়ার যুগ

২. আল কুরআনে কতজন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
   ক) ২৫ জন খ) ৩০ জন
   ঘ) ২৬ জন ঘ) ২৭ জন

৩. 'মাৎস্যন্যায় যুগ' কোন অঞ্চলে বিরাজমান ছিল?
   ক) ভারত খ) বাংলা
   গ) চীন ঘ) পাকিস্তান

৪. আধুনিক যুগে কন্যা সন্তানের প্রতি বৈষম্যের চিত্র কিরূপ?
   ক) ভ্রুণ হত্যা খ) কন্যার জন্মে মন খারাপ
   গ) ছেলে সন্তানের আকাংঙ্খা ঘ) সবগুলো।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

দীর্ঘদিন ধরে বাক্কা শহরসহ সমগ্র বিশ্বে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান ছিল। সামাজিক নিয়ম নীতি বলতে কিছু ছিল না। সমসাময়িক সকল সুযোগ সুবিধা থাকার পরেও প্রকৃত বিদ্বান ও সৎ লোকের অভাবে সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হচ্ছিল। নানা দল ও মতে বিভক্ত মানব সন্তানেরা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত ছিল। একসময় বাক্কাতে একজন মহৎ লোকের আবির্ভাব ঘটে। বাক্কা শহরসহ গোটা বিশ্বের অবস্থার উন্নতি ঘটে।

(ক) আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থ কী? ১
খ) জাহেলিয়া যুগের সময়কাল উল্লেখ করুন। ২
গ) উদ্দীপকের অবস্থার সঙ্গে জাহেলী যুগের সময়ের তুলনা দিন। ৩
ঘ) 'সমগ্র আরবই জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত ছিল।' আপনি এর স্বপক্ষে যুক্তি লিখুন। ৪

পাঠ-২.৩ জাহিলিয়া যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আরবের গোত্রীয় শায়খতন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- জাহিলী যুগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে জানতে পারবেন এবং
- জাহিলী যুগের দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**হস্তি বাহিনী, গোত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থা, জঙ্গে বুয়াস, তাগলিবের যুদ্ধ ও দারুন নদওয়া**

প্রাক ইসলাম যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় ভরপুর। না ছিল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা, না ছিল কোনো সংবিধান। মনগড়া মতবাদের ছায়ায় আদিম যুগের বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা হচ্ছিল। ঐতিহাসিক হার্বাট মুলারের ভাষায়- In Mohammad's Arabia there was no state- there were only scatered independent tribes and towns.

সাম্রাজ্যবাদের শিকার : কোনো কেন্দ্রীয় শাসকের নিয়ন্ত্রণে না থাকায় তৎকালীন আরব সাম্রাজ্যবাদী দু'পরাশক্তি রোমান ও পারস্যের লোলুপ দৃষ্টির শিকার ছিল। উত্তর আরব রোমানদের এবং দক্ষিণ আরব পারসিকদের কর্তৃত্ব বলয়ে ছিল। আবিসিনীয় আগ্রাসনভীতিও আরবকে সর্বদা শঙ্কিত রাখত। ইয়েমেন জবরদখলকারী আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান শাসক আবরাহার ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে কাবাঘর আক্রমণ করতে আসার ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে উত্তর ও দক্ষিণ আরব ব্যতীত সমগ্র আরবদেশই স্বাধীন ভূমি হিসেবে পরিচিত ছিল।

গোত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থা : মহানবী (সা.)-এর যুগে আরবের রাজনৈতিক অঙ্গনে কেন্দ্রীয় সরকারের অভাবে গোত্রতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। আরবরা ছিল বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। আরবিতে গোত্রকে 'কাবিলা' বলা হয়। প্রতিটি গোত্র বংশ হিসেবে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। গোত্রের বিভক্ত অংশগুলোকে একত্রে কাওম বলা হতো। কখনো কখনো কতিপয় গোত্র মিলে সহাবস্থানের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করতো। এসব চুক্তিকে 'আল আহনাফ' বা মৈত্রী চুক্তি বলা হতো। আরবদের সমাজ জীবনে গোত্রই ছিল একমাত্র নিরাপত্তার চাবিকাঠি। এজন্য গোত্রভুক্ত হয়ে বসবাস করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। স্বগোত্রীয় সদস্যদের প্রতি তারা যেমন সহানুভূতিশীল ও বন্ধুভাবপন্ন ছিল, তেমনি শত্রু গোত্রের প্রতি তারা চরম শত্রুতা পোষণ করতো।

নেতা নির্বাচন পদ্ধতি : আরবের গোত্রভিত্তিক শাসনব্যবস্থায় নেতা ছিলেন গোত্রীয় প্রধান। প্রত্যেক গোত্রে শায়খ নামে একজন দলপতি ছিলেন। বয়স, বিচার বুদ্ধি, সাহস, আর্থিক অবস্থা, অভিজ্ঞতা যাচাই বাছাই করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শেখ নির্বাচিত হতেন, আবার নির্বাচনের মাধ্যমেই শায়খ পরিবর্তন করা হতো। এজন্য তার মেয়াদকাল সম্পূর্ণরূপে নির্বাচকমণ্ডলীর সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল ছিল। আরবদের শেখের প্রতি আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। শায়খ-এর যে কোনো নির্দেশ পালনে তারা জীবনপণ প্রচেষ্টা চালাতো।

গোত্রীয় কলহ ও যুদ্ধ : প্রাকইসলাম যুগে ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে গোত্রীয় কলহের সূত্রপাত হতো। এ কলহের ধারাবাহিকতা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে বংশানুক্রমে চলতো। যেমন বনু বকরের সাথে বনু তাগলিবের যুদ্ধ চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে জঙ্গে বুয়াস এবং কুরাইশ ও হাওয়াযিন গোত্রের মধ্যে হারবে ফিজার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। লাগাতার যুদ্ধবিগ্রহের এ সময়কে আরবদের ইতিহাসে 'আইয়ামে হারব' বলা হয়েছে। সামান্য কারণে, যেমন পানির নহর ব্যবহার, জীবজন্তুর তৃণলতা ভক্ষণ, গবাদি পশু পালন প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে এক গোত্র অপর গোত্রের সাথে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো।

রাজনৈতিক ঐক্য ও স্থিতিশীলতার অভাব : প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য বলতে কিছুই ছিল না। রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন- Their political life was in

a thoroughly primitive level. এজন্যই তাদের রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ মোটেই ছিল না। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, স্থিতিশীলতার অভাবে তখন তাদের প্রশাসন পদ্ধতি খুব সহজে পরিবর্তন হয়ে যেত। সারা বছর ধরেই সবাইকে মানসিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে থাকতে হতো।

মন্ত্রণা পরিষদ : তৎকালীন মক্কায় 'আল-মালা' নামে একটি মন্ত্রণা পরিষদ গড়ে ওঠে। এ পরিষদ মক্কা এবং শহরতলীর শাসনব্যবস্থা তদারক করতো। বেদুইনদের মতো মৈত্রী জোট গঠন, বৈদেশিক বাণিজ্যক ও সামরিক চুক্তি সম্পাদনেও মন্ত্রণা পরিষদ সক্রিয় ভূমিকা রাখতো।

সংবিধানের অভাব : সংবিধান যে কোনো রাষ্ট্র বা সংস্থা সংগঠনের চালিকাশক্তি। নিয়মতান্ত্রিক কোনো দেশ বা সংগঠন গঠনতন্ত্র বা সংবিধান ছাড়া চলতে পারে না। জাহিলী যুগের আরবদের দেশ পরিচালনার উপযোগী কোনো সংবিধান ছিল না বলে তারা সুষ্ঠু কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারত না।

'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি : জাহিলী যুগের আরবদের মূলনীতি ছিল জোর যার মুল্লুক তার। সন্ত্রাসবাদ, সহিষ্ণুতা, গোত্রীয় যুদ্ধ ইত্যাদি পন্থায় আরবরা একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতো।

জঙ্গে বাসুস : প্রাকইসলাম যুগের আরবে সংঘটিত প্রসিদ্ধ যুদ্ধসমূহের মধ্যে বাসুসের যুদ্ধ অন্যতম। আরবের বনু বকর ও বনু তাগলিবের মধ্যে সংঘটিত এ যুদ্ধ ৪৯৪ থেকে ৫৩৪ সাল পর্যন্ত মোট ৪০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এ যুদ্ধে প্রায় ৭০ হাজার লোক নিহত হয়েছিল। উভয় গোত্রই পরস্পর আত্মীয় ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিল। উভয়ই নিজেদের ওয়ায়েরের বংশধর বলে দাবি করতো। একটি উষ্ট্রী জখম হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাসুস যুদ্ধের সূচনা হয়। উষ্ট্রীটির নাম ছিল বাসুস। এটির মালিক ছিলেন বনু বকর গোত্রের হাসসাম নামক এক ব্যক্তি। উষ্ট্রীটি বনু তাগলিবের কোনো এক ব্যক্তি হাতে আহত হয়েছিল।

জঙ্গে দাহিস : ইসলামপূর্ব যুগের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধজনিত সংঘাতসমূহের মধ্যে জঙ্গে দাহিস অন্যতম প্রসিদ্ধ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ গাত্ফান গোত্রের দুটি শাখা বনু আবস ও বনু যুবিয়ানের মধ্যে ৫৬৮ থেকে ৬৩১ সাল পর্যন্ত মোট ৬৩ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এ যুদ্ধে অনেক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ নেই। এ যুদ্ধে আরব বীর আন্তারা বিন শাদ্দাদ তাঁর বীরত্ব ও কবিত্বের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

গোত্রীয় জোট : পবিত্র নগরী মক্কায় অবস্থিত কাবা শরীফের কারণে মক্কা নগরী ও নগরবাসী কুরাইশদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ কারণে কুরাইশ গোত্রের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা এবং পার্শ্ববর্তী আরো কতিপয় গোত্রের মধ্যে একটি মৈত্রীজোট বা গোত্র-সংঘ রূপ লাভ করে। এ জোটের নেতাদের পরামর্শ অনুযায়ী একটি আন্তঃগোত্রীয় শাসনব্যবস্থাও গড়ে ওঠে।

মক্কার নগর রাষ্ট্রের মর্যাদা : আরবে কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কিংবা সংগঠিত কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠন না থাকলেও ধর্মীয় এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে মক্কায় অগ্রসর রাজনীতি ও নগর রাষ্ট্রের উন্মেষ হয়েছিল। মক্কা নগর রাষ্ট্র পরিচালনার মূলে ছিল কুরাইশ গোত্রপতিদের সমন্বয়ে গঠিত 'মালা' বা মন্ত্রণাপরিষদ। এ পরিষদ মক্কা নগর রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা তদারক করতো। এছাড়াও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বেদুইনদের সাথে মৈত্রীজোট গঠন করাও এ পরিষদের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মক্কার প্রশাসনিক ব্যবস্থা : কুরাইশদের একজন পূর্বপুরুষ 'কুসাই' ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর প্রাক্কালে স্বীয় পুত্র আবদুদ দারকে অলী নির্বাচন করেন। তিনি তৎকালীন মক্কার শাসনব্যবস্থা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। যথা-

১. হিজাবা : কাবা ঘর আবৃতকরণ।
২. সিকায়া: যম্যম্ কূপ থেকে হাজীদের পানি বিতরণ।
৩. রিফাদা: হজ্জ পালনকারী লোকদের পবিত্র নগরীতে সাদর সম্ভাষণ জানানো।
৪. নাদওয়া: কার্যকরী কমিটির সদস্যপদ।
৫. লিওয়া: পতাকা উত্তোলন করা।

দারুন নাদওয়া : কুসাই কাবাঘর সংস্কার ও মন্ত্রণাপরিষদ বিভক্তকরণের পাশাপাশি কাবাঘরের পাশে আরেকটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, যার নামকরণ করা হয় দারুন নদওয়া বা মন্ত্রণাপরিষদ। দারুন্ নাদ্ওয়ায় বসে নগরের অভিজাতবর্গ যে

কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন, কিন্তু নগর ও কাবাঘর বিষয়ক কার্যক্রম, যেগুলোর সাথে সর্বসাধারণের সংশ্লিষ্টতা ছিল, সেগুলোর জন্য সকল নাগরিক কাবা প্রাঙ্গনে সাধারণ সভা করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	আরবের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

'আল-মালা' কী ?	শায়খ নির্বাচনের তিনটি গুণ উল্লেখ করুন।	মক্কার পাঁচটি প্রশাসনিক ইউনিটের নাম লিখুন?	'দারুন্ নাদ্ওয়া' কোথায় অবস্থিত?

সারসংক্ষেপ :

আরব সমাজের মূলভিত্তি ছিল গোত্রপ্রথা। একই গোত্রের মধ্যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে কেউ অপরাধীকে সাহায্য করতো না, কিন্তু অপর কোনো গোত্র যদি কারো নিজ গোত্রের কাউকে হত্যা করতো, তাহলে সমগ্র গোত্রের সক্ষম ব্যক্তিরা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহনের সংঘাতে জড়িয়ে পড়ত। এক্ষেত্রে রক্তের পরিবর্তে রক্তের দাবি জানানো হতো। যাযাবর আরব গোত্রপ্রধানদের শায়খ বলে অভিহিত করা হতো। গোত্রকেন্দ্রিক মরুবাসী বেদুইনদের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য 'আসাবিয়াহ' বা গোত্র প্রীতি। গোত্রপ্রীতি ও রক্ত সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই এ কওম চেতনা পরবর্তীকালে আরব জাতি গঠন এবং ইসলামের বিস্তৃতিতে সহায়ক হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. দারুন নদওয়া নির্মাণ করেন কে?
   ক. কুসাই খ. কিলাব
   গ. আবদুল মুত্তালিব গ. কুরাইশ
২. জঙ্গে দাহাস কত বছর স্থায়ী হয়েছিল?
   ক. ১৩ খ. ১৪
   গ. ৬৩ গ. ৬৪
৩. বাসুস যুদ্ধের নামকরণ হয়-
   ক. স্থানের নামে খ. ব্যাক্তির নামে
   গ. জন্তুর নামে গ. পাহাড়ের নামে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

রাজশাহী অঞ্চলের বরেন্দ্র ভূমিতে সাঁওতাল উপজাতি বাস করে। তারা দলবদ্ধভাবে মাঠে কাজ করে। কেউ কোনো বিপদে পড়লে সকলেই স্বতস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তারা কখনও একাকী কোথাও বিচরণ করে না। সর্বদা দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে। দলীয় প্রধানের আদেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দলীয় প্রধানের আদেশই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

(ক) কোন যুদ্ধ চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল? ১
(খ) আল মালা বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত দলবদ্ধ হয়ে বসবাসের ধারণা গোত্র প্রথার সাথে কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা দিন। ৩
(ঘ) জাহেলী যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তি ছিল 'জোর যার মুলক তার'- বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-২.৪ জাহিলিয়া যুগে আরবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাহিলী সমাজের সামাজিক অবস্থাবলী এবং
- জাহিলী সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**দাসত্বপ্রথা, নারীর জীবন্ত কবরস্থকরণ, দাসত্বপ্রথা, সুদপ্রথা, ব্যাভিচার ও কুসংস্কার**

জাহিলিয়া যুগে আরবের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তারা মানবেতর জীবনযাপন করতো। তারা আইন কানুনের কোনো প্রয়োজন মনে করতো না। তারা বিশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করতো। আরবরা ছিল স্বাধীনচেতা। তাই তারা শাসনের কোনো পরোয়া করতো না। তারা অসংখ্য গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্রে গোত্রে শত্রুতা ছিল তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তুচ্ছ কারণে গোত্রে গোত্রে কলহ বেঁধে যেত এবং তা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকতো। খুনের বদলা নেয়ার জন্য তারা যুদ্ধ করতো। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে প্রায় ১৭০০ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় আরবে বংশভিত্তিক ও গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ প্রসঙ্গে মওলানা আকরম খাঁ বলেন, "প্রাক-ইসলাম যুগে সেখানে যে বংশগত ও গোত্রগত কৌলীন্য প্রভাব অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"

সামাজিক অবস্থা

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বিভিন্ন পাপাচার, ব্যাভিচার, দুর্নীতি, কুসংস্কার, অনাচার, অরাজকতা, ঘৃণ্য আচার-অনুষ্ঠান ও নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডে সমাজ কলুষিত হয়ে পড়েছিল। গোত্রভিত্তিক আরব সমাজের দুটো পৃথক শ্রেণি মরুবাসী বেদুইন এবং শহরবাসী আরবদের জীবনযাত্রা প্রণালি ছিল একই সূত্রে গাঁথা। উভয় শ্রেণির বৈবাহিক সম্পর্ক ও আচার অনুষ্ঠান, ধ্যানধারণা ও রীতিনীতি ছিল প্রায় একই রকম।

মদ ও জুয়া : ঐতিহাসিক খোদা বখ্‌শ-এর মতে, War, Women and Wine were three absorbing passions of the Arabs. অর্থাৎ, মদ, জুয়া ও নারী- এ তিনটি ছিল আরবদের মুখ্য নিত্যব্যবহার্য বস্তু। মদ এবং নর্তকী ছাড়া তাদের জীবন কল্পনাও করা যেত না। তারা মদ্যপানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। মাদকাসক্ত আরবরা যে কোনো গর্হিত কাজ করতে দ্বিধা করতো না। তৎকালীন আরব দেশে মদ্যপান ও জুয়া খেলা কত লোককে যে সর্বস্বান্ত করেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

নারীর অবস্থান : ঐতিহাসিকদের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী সে যুগে আরব, রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যসহ সমগ্র বিশ্বে সমভাবে নারীর অবস্থা ছিল সীমাহীন অবমাননাকর ও হৃদয়বিদারক। তারা ভোগের সামগ্রী ও অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হতো। সমাজে তাদের কোনো রকম মান-মর্যাদা বা অধিকার ছিল না। একজন পুরুষ যত খুশি বিয়ে করতো এবং যত খুশি তালাক দিতে পারত। তৎকালীন আরবে চার ধরণের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

প্রথমতঃ এক নারী-পুরুষের বিয়ে,

দ্বিতীয়তঃ এক ব্যক্তি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতো ও

তৃতীয়তঃ একজন স্ত্রীলোক একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতো।

চতুর্থতঃ পন্থাটি ছিল বর্তমান সময়ের পতিতালয়ের মতো। একজন রমণী তার গৃহের সামনে একটি নির্দিষ্ট পতাকা স্থাপন করে রাখত। এর মাধ্যমে লোকজন গৃহটি শনাক্ত করতে সক্ষম হতো। মোটকথা, মানবতা-বিবর্জিত জাহিলী যুগে নারীর কোনো মূল্যই ছিল না। নারীকে আপদ অশুভ বলে মনে করা হতো।

কন্যা সন্তানদের অবস্থা: জাহিলী যুগে কোনো ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানের জন্মে খুশি হতো না। কন্যার জন্ম সংবাদ দেয়া হলে তাদের চেহারা লজ্জায় কালো হয়ে যেত। এটা তাদের নিকট ছিল এক চরম লজ্জার ব্যাপার। অনেক পিতা এ চরম লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য, আবার অনেকে দারিদ্র্যের ভয়ে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠাবাধ করতো না।

দাসপ্রথা: প্রাচীনকাল থেকেই আরব সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। শুধু আরব নয়, সমকালীন সমগ্র বিশ্বেই দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। মানুষ মানুষের প্রভু, মানুষ মানুষের দাস। বাজারে পণ্যদ্রব্যের মতো শৃঙ্খলবদ্ধ করে তাদের বিক্রি করা হতো। বিভিন্ন যুদ্ধে বন্দি হয়ে আসা কিংবা জোরপূর্বক ধরে আনা মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলা পরিয়ে দেয়া হতো। কখনো বা পরিশোধে অক্ষম ঋণ গ্রহীতা ঋণদাতার ক্রীতদাসে পরিণত হতো। আবার অনেক সময় জুয়া খেলায় অনবরত হারতে হারতে ব্যক্তিটি বিজয়ী লোকের ক্রীতদাস হয়ে যেত। এভাবে ক্রীতদাস প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। দাস-দাসীদের সামাজিক ও ব্যক্তি অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। মনিবের ইচ্ছাই ছিল সবকিছু। এমনকি বিয়ের অধিকারও তাদের ছিল না। কেউ যদিও বা বিয়ের অনুমতি পেত, তবে তার সন্তানের মালিক হতো মনিব। সামান্যতম অপরাধেও দাসদের নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হতো। তাদের দুরবস্থা সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী বলেন- "ভৃত্যই হোক আর ভূমিদাস হোক, তাদের ভাগ্যে ক্ষীণ আশা তথা এক কণা সূর্যরশ্মিও কবরের এদিকে অর্থাৎ ইহজীবনে জুটত না।"

সুদপ্রথা: জাহিলী যুগের সমাজব্যবস্থায় সুদ ছিল শোষণের হাতিয়ার। সুদের পরিমাণ ছিল কখনো কখনো একশ ভাগ; আবার বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে স্থানভেদ দুশ ভাগ পর্যন্ত। প্রাক্ ইসলাম যুগে আরবে ইহুদিরা সুদের ব্যবসায় করতো। তারা দরিদ্র আরবদের থেকে এত উচ্চহারে সুদ আদায় করতো, অনেক সময় ঋণগ্রহীতা উচ্চহারে সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হতো। সুদের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে ঋণগ্রহীতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সাথে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকেও ঋণদাতা জোর করে নিয়ে যেত।

ব্যাভিচার : ব্যভিচার বেহায়াপনা আরব সমাজে একটি গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্যভিচারের মাত্রা এত অধিক ছিল, স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে অন্য লোকের সন্তান স্বগর্ভে ধারণের অনুমতি দিত। পিতার মৃত্যুর পর সন্তানরা বিমাতাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতো। একই সময়ে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকত। অনেক সময় ভ্রাতা ভগ্নি এবং সৎমা ও পুত্রের মাঝে বিয়ে সংঘটিত হতো। সামাজিক অনাচার ব্যভিচার, নৈতিক অধঃপতন, লাম্পট্য, চরিত্রহীনতা, মদ্যপান, জুয়া, লুটতরাজ, নারীহরণ, কুসীদ প্রথা প্রভৃতি নানা অব্যবস্থায় আরব সমাজ কলুষিত ছিল।

কুসংস্কার : কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে কুসংস্কারের বশবর্তী আরবরা তীরের সাহায্যে দেব মূর্তির সাথে পরামর্শ করে নিত। কোনো লোক মারা গেলে তার উট কিংবা ঘোড়া তার কবরের পার্শে এ বিশ্বাসে বেঁধে রাখা হতো, মৃতব্যক্তি কোনো এক সময় কবর থেকে উঠে কবরের পাশে বেঁধে রাখা সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে অজ্ঞাত গন্তব্যে যাত্রা করবে।

নিষ্ঠুরতা : জাহিলী যুগের আরব সমাজ ছিল নিষ্ঠুরতায় ভরপুর। অভিজাত আরবরা নিছক খেলাচ্ছলে নারীদের ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দিত। এতে হতভাগা নারীর মৃত্যু হলে তা প্রত্যক্ষ করে তারা আনন্দ উল্লাস করতো। কন্যা সন্তানদের তারা জীবন্ত কবর দিত এবং হাসতে হাসতে তারা একে অপরকে খুন করতেও দ্বিধা করতো না।

আভিজাত্য ও অহংকার : সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সব মানুষের মর্যাদাই আল্লাহর কাছে সমান। অথচ জাহিলী যুগে আরবের নেতৃস্থানীয় লোকেরা মানুষকে বহু দলে বিভক্ত করে রেখেছিল। গরিব, অসহায় লোকদের প্রতি ছিল তাদের চরম ঘৃণা। অহংকার, আত্মম্ভরিতা, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কারণে তাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ প্রকট আকার ধারণ করেছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আরবের ভৌগোলিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল। আরব উপদ্বীপের জমি মরুময় ও অনুর্বর হওয়ায় তা কৃষিকাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। সামান্য যে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হতো প্রয়োজন তুলনায় তা খুবই নগণ্য ছিল। তাই আরববাসীদের সর্বদা জীবন সংগ্রামে নিয়োজিত থাকতে হতো। মরুবাসী বেদুইনরা ব্যবসায-বাণিজ্য, শিল্প কারুকার্য বিংবা ভূমিকর্ষণ তাদের মর্যাদা হানিকর বলে মনে করতো। এজন্য তারা পশুপালন, শিকার ও দস্যুবৃত্তিকে জীবিকা নির্বাহের পন্থা হিসেবে বেছে নেয়। আরবের কয়েকটি অর্থনৈতিক শ্রেণী হলো:

গরিব যাযাবর: গরিব যাযাবর আরববাসীর আর্থিক অবস্থা ছিল সবচেয়ে বেশি শোচনীয়। পশুচারণ ও লুণ্ঠন করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। যাযাবররা এতই হত দরিদ্র ছিল যে, দিন এনে দিন খেত। ১০০০-এর বেশি সংখ্যাজ্ঞান তাদের ছিল না।

কুসীদজীবী ইহুদিঃ তৎকালে আরবে ধনী বণিকশ্রেণি ইহুদিরা সুদের ব্যবসা করতো। তারা কখনো কখনো শতকরা একশ, দেড়শ বা দু'শ গুণ পর্যন্ত সুদ নিত। সুদী কারাবারের নিয়মাবলি এতই জঘন্যতম ছিল যে, ঋণগ্রহীতা অনেক সময় সর্বস্বান্ত হয়ে যেত। চক্রবৃদ্ধি হাতের সুদের প্রচলন থাকায় গ্রহীতার পক্ষে কোনো দিনই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হতো না। মহাজন সুদের টাকার বিনিময় স্বরূপ ঋণগ্রহীতার ঘরবাড়ি, স্ত্রী, সন্তান এমনকি স্বয়ং খাতককেই তার দাস হিসেবে করায়ত্ত করতো।

কারিগর শ্রেণিঃ পৌত্তলিক আরবে কারিগর হিসেবে পরিচিত একশ্রেণির পেশাজীবী মানুষ ছিল। তারা হচ্ছে মূর্তি নির্মাতা শ্রেণি। আরবদের পূজ্য সকল মূর্তি এরাই নির্মাণ করতো। সমাজে এদের বেশ সম্মান ছিল। পৌত্তলিকদের ছাড়া ইহুদি, খ্রিষ্টানরাও মূর্তি তৈরি করতো। কাজেই তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিল।

শহরকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী : শহরবাসী আরবগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। প্রাক ইসলামী যুগে মক্কা বহির্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এ কেন্দ্র উত্তর ও দক্ষিণ আরবের পথে বিদেশের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেনে বিপুল অর্থ উপার্জন করতো। মক্কা ও মদিনার সম্পদ সমৃদ্ধিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবদানই সর্বাধিক। রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রথমা স্ত্রী বিবি খাদিজাতুল কুবরা (রা) এ সময়কার মর্যাদাসম্পন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন।

মক্কাকেন্দ্রিক ব্যবসাঃ প্রাকইসলাম যুগে হিজাযের প্রধান তিনটি নগরী- মক্কা, মদিনা ও তায়িফ খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল। দক্ষিণ হিজাযের নিম্নভূমিতে লোহিত সাগর থেকে প্রায় ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত মক্কা নগরী ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই অন্যতম প্রধান ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। কাবা শরীফের ধর্মীয় গুরুত্ব, উকায মেলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মক্কা নগরী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। মক্কার প্রায় ২০০ মাইল উত্তরে মদিনা শহর অবস্থিত। মদিনার সাথে ইয়েমেন ও সিরিয়ার বাণিজ্যপথ সংযুক্ত ছিল।

তায়িফকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থাঃ সে সময় তায়িফ ব্যবসায় বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে তায়িফে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য বিশ্বের বাজারে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হতো। মক্কার প্রায় ২০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত মদিনা ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত বাণিজ্যপথের সাথে সংযুক্ত ছিল। ভূমির উর্বরতার জন্য মদিনায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। সে সময় এখানকার খেজুর একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল হিসেবে সুপরিচিত ছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	আরবের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর একটি প্রতিবেদন তৈরী করুন।		
বেদুইন কারা?	আরবের প্রধান কৃষি পণ্যের নাম লিখ।	মক্কার অর্থনৈতিক নিদর্শন কী কী ?	কোন কোন দেশের সাথে আরবের ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় ছিল?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী (সা.) এর আগমনের পূর্বে আরবের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল বিপর্যস্ত। পুরুষরা যেমন একাধিক স্ত্রী, উপপত্নী, দাসদাসী রাখতে পারত, তেমনি নারীরাও একাধিক পতি রাখতে অথবা তালাক দিতে পারত। শুধু তাই নয়; ভাই বোনো বিয়ে এবং বিমাতাকে বিয়ে করার কুপ্রথাও তাদের মাঝে চালু ছিল। দাস-দাসীর উপর অত্যাচার, শ্রমিকের প্রতি অবিচার, ব্যভিচার, অনাচার এত সম্প্রসারিত হয়েছিল যে, সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ ও পারিবারিক কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল। উচ্চহারে সুদ গ্রহণ আরবদের নিকট কোনো দূষণীয় ব্যাপারে ছিল না। চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে মহাজন ঋণগ্রহীতার স্ত্রী ও সন্তানদের হস্তগত করে দাসদাসীরূপে বিক্রয় করতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মহানবীর আগমনের পূর্বে আরবে প্রায় কতটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়

ক. ১৭০০ খ. ২৭০০০

গ. ৭০০০ গ. অগণিত

২. জাহিলী যুগে কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হত-

ক. লজ্জার কারণে খ. খাদ্যের অভাবে

গ. সামাজিক বিড়ম্বনায় গ. ক, খ ও গ

৩. আরবে ব্যাপকহারে সূদ ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল কোন সম্প্রদায়?

ক. কূরাইশ খ. খ্রিষ্টান

গ. ইহুদী গ. ক, খ ও গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বক্তৃতায় শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জামিলা বলেন, "নারীর উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। আজো মেয়ের জন্মে অনেক বাবা- মা মন খারাপ করে থাকেন। এসব হীনমন্যতা ও অশিক্ষার কুফল মাত্র। আসুন দেশ ও সমাজের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক সুদ, ঘূষ ও মাদক দ্রব্যের বিলোপ সাধনের পাশাপাশি নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সোচ্ছার হই।

(ক) স্থলদস্যু কারা? ১

(খ) আরবের লোকেরা কন্যা সন্তানকে কেন জীবন্ত কবর দিত? ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে আরবের সমাজিক চিত্র তুলে ধরুন। ৩

(ঘ) চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ আরবদের জীবনকে বিষময় করে তুলেছিল- উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-২.৫ জাহেলি যুগে আরবের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাহিলী সমাজের ধর্মীয় অবস্থাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- জাহিলী সমাজের সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরবের বিখ্যাত কাব্যমালা সাবায়া মুআল্লাকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**পৌত্তলিকতা, মূর্তিপূজা, ত্রিত্ববাদ, কন্যা শিশুর জীবন্ত হত্যা, কুসংস্কার উকাজ মেলা, সাবায়া মুআল্লাকা ও হানিফ সম্প্রদায়**

ধর্মীয় অবস্থা

ধর্মীয় পাপাচার আর সামাজিক অনাচারের মিশ্রণে আরবে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। একত্ববাদের স্থলে বহু ঈশ্বরবাদ আরব সমাজকে চরম অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়। এ সময় আরবে মোটামুটি চার ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাসসম্পন্ন লোকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। যথা- ইহুদি, খ্রিস্টান, মূর্তিপূজক ও হানিফ সম্প্রদায়।

ইহুদিবাদ :

ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় ৭০০ বছর পূর্বে হিমারীয় রাজা আবু কাদির আসাদ দক্ষিণ আরবে ইহুদি ধর্ম প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে রাজা যুনাওয়াস শক্তি প্রয়োগে ইহুদি মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে উত্তর আরবের বিভিন্ন এলাকায় বনু নযির, বনু কোরায়যা এবং মদিনার উপকণ্ঠে বনু কায়নুকা প্রভৃতি ইহুদি উপনিবেশ ওঠে। ইহুদিরা অজ্ঞতাবশত জাহোবাকে বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা মনে করতো। তারা হযরত মুসা (আ.)-এর শিক্ষা ভুলে গিয়ে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। খোদায়ী বিধানের সাথে তারা নিজেদের মনগড়া বিধান যুক্ত করে।

খ্রিস্ট্রবাদ :

হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন আল্লাহর রাসূল। তিনি তাঁর উম্মতকে এক আল্লাহর দিকে আহবান জানিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ.)-কে উঠিয়ে নেয়ার পর তাঁর উম্মত অজ্ঞতাবশত একত্ববাদের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। তারা হযরত মরিয়ম (আ.)-কে আল্লাহর স্ত্রী, ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহসহ তিন স্রষ্টায় বিশ্বাস শুরু করে (*নাঊযু বিল্লাহি-মিন-যালিক*)। ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় দু'জন নবীর উম্মত হয়েও তারা নবীর বিশ্বাস রদপূর্বক নতুন মতবাদ চালুর মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাসে অনাচারের সৃষ্টি করে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের পূর্বে তারা প্রত্যেকেই দাবি করতো, সর্বশেষ নবী তাদের গোত্র থেকে আগমন করবেন। ইহুদি খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ই একে অন্যের বিরুদ্ধে সর্বদা বিদ্বেষ ছড়াতো। আল কুরআনে তাদের বিবাদের বর্ণনা এসেছে এভাবে-"ইহুদিরা বলত নাসারারা (খ্রিস্টান) সত্যের ওপর নেই; অন্যদিকে নাসারারা বলত ইহুদিরা সত্যের ওপর নেই, অথচ তারা উভয় সম্প্রদায়ই কিতাব অধ্যয়ন করতো।

পৌত্তলিকতা বা মূর্তিপূজা :

ইহুদি-খ্রিস্টানদের ছাড়া আরব দেশে ব্যাপকভাবে মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই কাবা গৃহকে পবিত্র স্থান মনে করা হতো। বিশ্বের বিভিন্ন জনপদ থেকে লোকেরা কাবায় হজ্জ করতে আসত। আরবরা কাবা গৃহে বিভিন্ন

গোত্রের পূজ্য ৩৬০টি মূর্তির অবয়ব স্থাপন করে সেগুলোর পূজা করতো। এ সকল মূর্তির মধ্যে পূর্ববর্তী নবী হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ঈসা ও মরিয়মের মূর্তিও ছিল। এছাড়া লাত, মানাত, ইয়াগুস, নাসরও ছিল অন্যতম প্রধান প্রধান মূর্তি। মনুষ্যাকৃতির হোবল ছিল কাবাঘরে স্থাপিত প্রধান বিগ্রহ।

কোনো আরব অনারব নয়, কোনো স্থানকালের জন্য নয়; বরং কুসংস্কারের সব জাল ছিন্ন করে তাওহীদের বাণী প্রচার করার জন্যই মহানবী (সা.) মক্কানগরীতে আবির্ভূত হন। তিনি অনন্ত কল্যাণ ও আপসহীন তাওহীদের প্রতীক। ঐতিহাসিক পি কে হিট্টি যথার্থই বলেন- The stage was set the moment was psychological, for the rise of a great religious and national leader. এ সময় মহান ধর্মীয় ও জাতীয় নেতার আবির্ভাবের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল এবং সময়ও ছিল মনস্তাত্ত্বিকতাপূর্ণ।

জাহিলিয়া যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ করে বলা যায়, তারা অধঃপতনের সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 'তোমরা অগ্নির অতল গহবরে নিমজ্জিত ছিলে।' পরিবেশ-পরিস্থিতি একজন মহান পুরুষের আবির্ভাবের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল, সময়টাও ছিল মনস্তাত্ত্বিকতাপূর্ণ। অবশেষে আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়ে আরবগণকে এক মহান ধর্মের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেন।

হানিফ সম্প্রদায় :

এমন ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেও আরবের কতিপয় লোক আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা স্বতন্ত্র দ্বীন পালন করতেন এবং কোনো প্রকার মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করতেন না। পৌত্তলিক আরবে তারা 'হানিফ' নামে পরিচিত ছিলেন। বিবি খাদিজার চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফল, উমাইয়া বিন আবিস সালত, আওস বিন সাওদা, কবি যুহায়র প্রমুখ বিশিষ্ট আরববাসী ছিলেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হানিফ সম্প্রদাভুক্ত। আরব তথা সমগ্র বিশ্বের নৈরাশ্যজনক ধর্মীয় কোনো এক ঐশ্বরিক ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের পূর্বাভাস সূচনা করেছিল। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন- Never in the history of the world was need so great, the time so ripe for the appearance of a deliverer. অথ্যাৎ "পৃথিবীর ইতিহাসে এ পরিপক্ব সময়ের মতো কোনো কালেই একজন উদ্ধারকারীর প্রয়োজনীয়তা এত বেশি অনুভূত হয়নি।"

সাংস্কৃতিক অবস্থা

প্রাক্ ইসলাম যুগে আরবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষপদ্ধতি অথবা সুরুচিপূর্ণ মার্জিত জীবনধারা গড়ে ওঠেনি। মক্কা, মদিনা ও অন্যান্য কয়েকটি বর্ধিষ্ণু শহরের অধিবাসীরা ব্যতীত আরবের অধিকাংশ লোকই মূর্খ ও নিরক্ষর ছিল। এতদ্সত্ত্বেও অসাধারণ স্মৃতিশক্তিবলে তারা ইসলামপূর্ব যুগের প্রচুর লোকগাথা, প্রবাদ, লোকশ্রুতি সংরক্ষণে সক্ষম হয়। তাদের সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। খতিব (বক্তা), শায়ির (কবি) এবং নাস্সাব (বিভিন্ন গোত্রের বংশ পরিচয় বা কুলজী বিশারদ।)

প্রবাদ বাক্য :

প্রবাদ বাক্য ছিল আরব সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান দিক। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বাস্তব জ্ঞানের পরিস্ফুটন ঘটেছিল এ সকল প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে। প্রবাদ ও গদ্য রচনা গীতিকাব্যের তুলনায় যদিও অপ্রতুল ছিল, তা সত্ত্বেও বিখ্যাত পণ্ডিত আল হাকিমের (লোকমান) রচনায় আরবি প্রবাদ বাক্য সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়েছিল। সে সময় বহু বিদিত আরবি প্রবাদ ছিল- "সৌন্দর্য তার জিহবার বাচনশীলতার মধ্যে নিহিত।" বুদ্ধিমত্তা তিনটি বস্তুর ওপর আপতিত হয়েছে- "ফরাসিদের মগজে, চীনাদের হস্তে ও আরবদের জিহবায়"।

গীতিকাব্য ও বিষয়বস্তু :

আরব সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন আরবি গীতিকাব্য বা কাসিদা সমসাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে অতুলনীয় সম্পদ। বংশ গৌরব, বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, যুগের বিবরণ, যুদ্ধের ঘটনা, উটের বিস্ময়কর গুণাবলি, প্রতিপক্ষের লোকদের বদনামসূচক

তীরবিদ্ধ কথামালা ছাড়াও নারী, নারীর সৌন্দর্য, প্রেম, যৌনজীবন সম্পর্কিত নগ্ন কথামালা, নারী-দেহের সৌন্দর্যের বর্ণনা, যুদ্ধের বিবরণ, রণসংগীত, ব্যঙ্গোক্তি, বংশগৌরব সম্পর্কিত গীতিকাব্য রচনা করা হতো। আরবরা যে নির্ভীক বীর, অতিথিপরায়ণ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল এবং কাপুরুষের মতো মৃত্যুভয়ে ভীত ছিল না, সে সম্বন্ধে আমরা তাদের কবিতা থেকেই অবগত হতে পারি।

কবি ও তাদের মর্যাদা :

আরব কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে ইমরুল কায়েস, তোরফা বিন আবদ, আনতারা বিন শাদ্দাদ, আমর বিন কুলসুম, হারেস, লবিদ বিন রবিয়া, কাব বিন যুহায়র প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রত্যেক গোত্রেরই আলাদা কবি থাকতেন। এ গোত্রীয় কবি ছিলেন গোত্রের মর্যাদার প্রতীক। সকলে তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। সমাজে কবিদের অতিমানবের মর্যাদা দেয়া হতো। তাদের কবিতায় উচ্চমানের সাহিত্য অলঙ্কার নিহিত ছিল।

বিনোদন :

জাহিলী যুগে আরবরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বিনোদনমূলক কর্মে অংশগ্রহণ করতো। উট ও ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতা আরবদের নিকট খুবই প্রিয় ছিল।

গদ্য সাহিত্য রচনা :

লিখন পদ্ধতির বিকাশের অভাবে জাহিলী যুগের আরবে গদ্যসাহিত্য রচনায় সমৃদ্ধি লাভ করেনি। তবে বংশ বৃত্তান্ত, গোত্রীয় কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস সংবলিত কিছু গদ্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল। কাব্যগাথার মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকে আরবরা নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতো। ইতিহাস চেতনা তাদের মধ্যে এতই তীব্র ছিল যে, পরবর্তীতে ইসলামের ইতিহাস কিংবা বিশ্ব ইতিহাস রচনা তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই সূচিত হয়েছিল।

উকায মেলা :

জাহিলিয়া যুগে প্রতিবছর নির্ধারিত সময়ে মক্কার অদূরে উকায নামক স্থানে একটি বাৎসরিক মেলা বসত। এখানে খ্যাতনামা আরব কবিদের মধ্যে কবিতা পাঠের আসর বসত। এখানে বিভিন্ন বিষয় যেমন- কাব্যগাথা, বীরত্ব ও বাগ্মিতার প্রতিযোগিতা হতো এবং শ্রেষ্ঠদের পুরস্কৃত করা হতো। এখানে গান বাজনা, নৃত্য প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হতো। অধ্যাপক পি.কে.হিট্টি এটিকে 'Ukaz fair was the Academic franchise of the Arabs- বলে অভিহিত করেন।

সাবয়া' মুয়াল্লাকা :

আরবের ওকায মেলায় সাহিত্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা কবিতা নির্বাচন করা হতো। প্রতি বছরের নির্বাচিত সেরা কবিতাটি কাবা-গৃহের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। 'মুয়াল্লাকা' অর্থ- ঝুলন্ত। এ ঝুলানোর কারণে এ কবিতাগুলোর নাম 'মুয়াল্লাকা' হয়েছে। এরকম সাতটি কবিতা বা 'সাবয়া মুয়াল্লাকা' সাহিত্যজগতে এক অমূল্য রত্ন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এছাড়াও দিওয়ানে হামাসা, কিতাবুল আগানী ও আল মুফাযিলাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

জাহিলিয়া যুগে আরবদের প্রশংসনীয় দিকসমূহ :

জাহিলিয়া যুগে আরবের কয়েকটি গোত্র ছাড়া প্রায় সকল স্থানের আরবগণই ছিল অশিক্ষিত ও সভ্যতা বিবর্জিত। তাদের জীবন ছিল বন্য প্রাণীয় মতো বর্বরতায় পূর্ণ। তবে তাদের জীবনে কিছু কিছু প্রশংসনীয় দিক ছিল যার বিবরণ নিম্নরূপ-

জাহিলী যুগের আরবগণ ছিল কষ্টসহিষ্ণু, নির্ভীক ও চির সংগ্রামী। মুরুময় রুক্ষ আরবে জীবনযাপন উপযোগী খাদ্য ও পানীয়ের বড় অভাব ছিল। বাঁচার জন্য তারা প্রকৃতির সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতো। আরবগণ ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয়দান এবং অত্যাচারিতকে রক্ষা করা তারা তাদের কর্তব্য বলে মনে করতো। আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য তারা নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিত। পরবর্তীকালে তাদের এ গুণাবলিকে লালন করার জন্য মহানবী (সা.) বলেন, "অন্ধকার যুগের আদর্শ গুণাবলির প্রতি লক্ষ কর এবং সেগুলোকে ইসলামের কাজে লাগাও। অতিথিকে আশ্রয় দাও, এতিম শিশুর প্রতি সদয় হও এবং আশ্রিতদের সাথে সদয় ব্যবহার কর।" জাহিলিয়া

যুগের আরবগণের একটি প্রশংসনীয় গুণ ছিল অতিথিপরায়ণতা। অতিথির থাকা খাওয়া এবং মর্যাদা রক্ষার জন্য তারা সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হতো না।

জাহিলিয়া যুগে আরবগণ কবিতা রচনা ও বক্তৃতায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। কবিতার মাধ্যমে তাদের সাহিত্য প্রতিভা প্রকাশ পেত। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "কাব্যপ্রীতিই ছিল বেদুইনদের সাংস্কৃতিক সম্পদ।" তাদের কবিতাগুলো 'কাসিদা' নামে খ্যাত ছিল। তিনি আরো বলেন, "এ কাসিদাগুলো ছন্দ এবং বিশদ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি'কেও অতিক্রম করেছিল।"

শিক্ষার্থীর কাজ	আরব সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস কেমন ছিল?

কে আরবে ইহুদী ধর্মের প্রচলন করেছিল ?	খ্রীস্টানদের তিনজন ইশ্বরের পরিচয় কী কী ।	হানিফ সমপ্রদায়ের তিনজন ব্যাক্তির নাম কী?	পৌত্তলিক বিশ্বাসের মূল বিষয় কোনটি?

সারসংক্ষেপ :

জাহিলী যুগের আরব সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ন্যায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনেও নানাবিধ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান ছিল। একদিকে ইহুদী ও খ্রীস্ট্রানরা মুসা ও ঈসা আ: এর শিক্ষাকে ভূলে গিয়ে এক আল্লাহর পরিবর্তে একাধিক ঈশ্বরের ইবাদাত করতে থাকে। খ্রীস্ট্রানরা স্বয়ং রাসুলকেই আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। নিজেদের খুশিমত রদবদল করতে গিয়ে ধর্মীয় নেতারা সমাজের শোষক শ্রেণীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে আরবরা কাব্য সাহিত্যে চর্চায় পারদর্শিতা অর্জন করলেও তার বিষয় বস্তু ছিল অশ্লীলতায় পূর্ণ। নারীর রূপ বর্ণনা আর স্বজাতিকে যুদ্ধে উদ্ধুদ্ধ করতে তারা কাব্য রচনা করত। সাবাআ' মুয়াল্লাকা ঐ যুগের আরবের বিখ্যাত কবিতাগুচ্ছ, যা আজো বিশ্ব সাহিত্য সম্ভারের এক উজ্জল সম্পদ বটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরবে ইহুদী ধর্ম প্রবর্তন করেন কে?
   ক. আবু কাদির আসাদ খ. আবু উবায়দা
   গ. আবুল ফজল ঘ. আবু হাফস

২. আরবদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূল ছিল-
   ক. প্রাচীন গোত্রতান্ত্রিক শাসন খ. গোত্র-প্রীতি
   গ. বংশ-গৌরব ঘ. আভিজাত্য

৩. সাবাআ' মুয়াল্লাকায় কতটি কবিতা ছিল?
   ক. সাত খ. সাতাশ
   গ. সাতশত ঘ. সতের

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

সমসেরাবাদ গ্রামের ইব্রাহিম সাহেব প্রতি বছর শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক বিষয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। উক্ত প্রতিযোগিতায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রতিযোগিরা বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় যারা ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান লাভ করে তাদেরকে আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই আয়োজনের ফলে ঐ এলাকার অধিবাসীরা শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

(ক) দারুন নাদ্ওয়া কী? ১

(খ) জাহিলী যুগের আরবদের ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা দিন। ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিযোগিতার সাথে জাহেলি যুগের কোন বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

(ঘ) অনুরূপ প্রতিযোগিতা তোমার সমাজে কী ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে? আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১	: ১. (খ)	২. (ঘ)	৩. (ঘ)	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২	: ১. (ক)	২. (ক)	৩. (খ)	৪. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩	: ১. (ক)	২. (গ)	৩. (গ)	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪	: ১. (ক)	২. (ঘ)	৩. (ঘ)	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫	: ১. (ক)	২. (খ)	৩. (ক)	

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা জীবন

ইউনিট ৩

ভূমিকা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় আল্লাহর বিধান ভুলে গিয়ে আরবসহ সমগ্র পৃথিবীর মানুষ ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। অত্যাচার, অনাচার, শোষণ, বর্বরতা ও মানবতা বিরোধী অপরাধে ছেয়ে গিয়েছিল তৎকালীন সমাজব্যবস্থা। মানবতার এ চরম দুর্দিনে পথহারা মানবজাতিকে সত্য, ন্যায় ও মুক্তির পথ দেখালেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। নবুওয়্যাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর স্বজাতির লোকেরা তাঁকে আল আমীন বা সত্যবাদী ব্যক্তি বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু নবুওয়্যাত লাভের পর থেকে স্বার্থবাদী লোকেরা তাঁর বিরোধীতা শুরু করে এবং এক পর্যায়ে এ বিরোধীতা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথীদের জীবন অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৩.১ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও প্রাথমিক জীবন
পাঠ ৩.২ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়াত লাভ
পাঠ ৩.৩ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কায় ইসলাম প্রচার
পাঠ ৩.৪ : ইসলাম প্রচারে কুরাইশদের বাধা ও ষড়যন্ত্র
পাঠ ৩.৫ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মিরাজ
পাঠ ৩.৬ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদীনায় হিজরত

পাঠ-৩.১ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- মহানবী (সা.)-এর শৈশব ও যৌবনকাল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মরুভূমি, কুরাইশ, সাদ গোত্র, হারবুল ফুজ্জারে, আল আমীন, বুহায়রা ও হালিমা**

রাসূল (সা.)-এর আরবে আগমনের প্রেক্ষাপট

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল প্রেরণের জন্য করুণাময় আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি আরবের মক্কাভূমির ওপর পতিত হলো কেন, এর কারণ অনুসন্ধান করলে একাধিক উত্তর পাওয়া যাবে। যেমন- মক্কা নগরী মোটামুটিভাবে ভূমন্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত, আরব দেশ থেকে যত সহজে অন্যান্য দেশে যাতায়াত করা যায়, অন্য কোনো দেশ থেকে তা আদৌ সম্ভব হয় না। সারা জগতের মুক্তির কান্ডারির ভূমন্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত মরুময় আরব দেশে আবির্ভূত হওয়াই সঙ্গত ছিল। আরব জাতি ব্যতীত অন্য প্রত্যেক জাতিই মানুষের রচিত এক একটা ধর্মপদ্ধতির অনুসারী ছিল। তাছাড়া পৃথিবীর সকল অনাচারের প্রতিকার ও সকল অবিচারের প্রতিবিধান করার জন্য যিনি আসবেন তাঁকে এমন দেশে আবির্ভূত হওয়াই সঙ্গত, যেখানে তিনি অল্প চেষ্টাতেই নিজের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কতিপয় উপযুক্ত সহচর পাবেন। আরব ছাড়া আর কোথাও মনে হয় এটা সম্ভব ছিল না। অন্য সকল দেশ ও অঞ্চলে তখন পুরোহিতদের প্রচন্ড প্রতাপে মানুষের জ্ঞান-বিবেক সম্পূর্ণরূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই মানবজাতির ত্রাণকর্তা, সর্বশেষ রাসূলকে প্রেরণের জন্য সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি আরব মরুভূমির মক্কা নগরীকেই মনোনীত করে।

বংশ পরিচিতি

হযরত ইবরাহীম (অ)-এর সুযোগ্য পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর অধস্তন বংশধরদের থেকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের গোড়াপত্তন হয়। 'কুরাইশ' উপাধি সর্বপ্রথম ফিহর গ্রহণ করেছিলেন। ফিহরের অধস্তন বংশধররাই কুরাইশ নামে পরিচিত। 'কুরাইশ' শব্দের অর্থ 'একত্র করা'। কেননা কুসাই মক্কার লোকদের একই সম্পর্কে সম্পৃক্ত করেছিলেন। এজন্য তাঁর গোত্রের নাম 'কুরাইশ' রাখা হয়েছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফিহরের স্বনামধন্য অধস্তন 'কুসাই' মক্কা নগরীসহ সমগ্র হিজাযে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে পবিত্র কাবা ঘরকে সমগ্র আরব দেশ থেকে মক্কা নগরীতে আগত লোকদের একত্র হওয়ার স্থানে পরিণত করেন।

৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মুত্তালিব হিজাযের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকাকালে আবিসিনিয়ার রাজা আবরাহা কাবাঘর ধ্বংস করার উদ্দেশে বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে মক্কা শরীফে আসে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আবাবিল নামক ক্ষুদ্র পাখির দল পাঠিয়ে তাদের সমূলে ধ্বংস করেন। পবিত্র কুরআনে সূরা ফীল-এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। আবরাহা হস্তিবাহিনী নিয়ে এসেছিল বলে এ বছরকে 'আমুল ফীল' বা হস্তির বছর বলা হয়। আবদুল মুত্তালিবের দ্বাদশ পুত্র আবদুল্লাহর সাথে ইয়াসরিব (মদিনা)-এর বনু যুহরা গোত্র প্রধান আবদুল ওহাবের কন্যা আমিনার বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিনি আমিনাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন এবং কিছুদিন পর বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। বাণিজ্য শেষে প্রত্যাগমনের সময় মদিনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাত্র ২৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আবদুল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে ৫টি উট, স্বল্পসংখ্যক বকরি ও ভেড়া এবং উম্মে আয়মান নাম্নী এক দাসী রেখে যান। এ সময় বিবি আমিনা সন্তানসম্ভবা ছিলেন।

জন্ম

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্মতারিখ নির্ধারণে ইতিহাসবিদদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক তাবারি, ইবনে খালদুন, ইবনে হিশাম প্রমুখ **১২** রবিউল আউয়াল নির্দেশ করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক আবুল ফিদা বলেন, দশ তারিখে হযরত (সা.)-এর জন্ম হয়েছিল। মিসরের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও ভূগোলবিদ মাহমুদ পাশা আল-ফালাকী গাণিতিক যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্মতারিখ **৫৭১** খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল মোতাবেক ৯ রবিউল আউয়াল সোমবার। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। জন্মের সপ্তম দিনে আব্দুল মুত্তালিব আরবের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনকে আকিকা উৎসবে করে, তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মদ', অর্থ- পরম প্রশংসিত। আর বিবি আমিনা পুত্রের নাম রাখেন 'আহমদ', অর্থাৎ পরম প্রশংসাকারী। মুহাম্মদ ও আহমদ ও উভয় নামই বাল্যকাল থেকে প্রচলিত ছিল। কুরআন মাজীদে রাসূল (সা.) এর দুটি নামেরই উল্লেখ আছে।

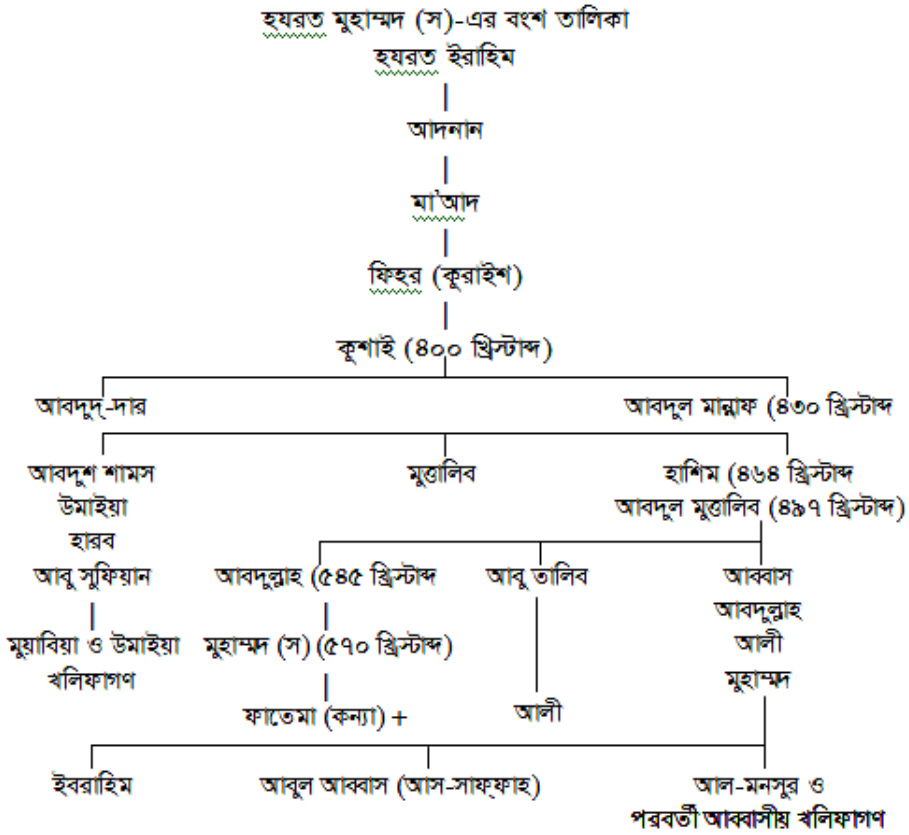

ধাত্রীগৃহে অবস্থান

জন্মের পর প্রথম দু'তিন দিন শিশু (সা.) মাতৃদুগ্ধ পান করেন। তার পর আবু লাহাবের সুওয়াইবা নাম্নী দাসী তাঁকে দুগ্ধ পান করান। তখনকার দিনে আরবে প্রচলিত প্রথানুযায়ী সম্ভ্রান্ত পরিবারে কোনো শিশু জন্ম নিলে তার স্তন্যদান ও লালন-পালনের ভার ধাত্রীর ওপর ন্যস্ত হতো। অবশ্য এজন্য ধাত্রীমাতা যথাযথ পুরস্কার ও সম্মানী পেত। মুহাম্মদ (সা.)-এর লালন-পালনের ভার মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন, উন্নতমনা, বিশুদ্ধভাষী বনু সাদ গোত্রের হালিমার হাতে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং সাদ গোত্রে প্রতিপালিত হয়ে তাদের বিশুদ্ধ ভাষা রপ্ত করেছি, এজন্যই আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী।" ধাত্রীর মাতা হালিমার কাছ থেকে মাতৃসদনে স্থানান্তরিত হওয়া ষষ্ঠ বছরে শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে মা আমেনা মদিনায় গিয়ে পিতৃকুলের সকলের সঙ্গে শিশু মুহাম্মদের সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং স্বামীর কবর যিয়ারত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। এজন্য উম্মে আয়মান নাম্নী পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে মদিনা যাত্রা করেন। মদিনায় পৌঁছে আমিনা শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর স্বামীর কবর যিয়ারত করেন ফিরার পথে মক্কা মদিনার মধ্যবর্তী 'আবওয়া' নামক স্থানে পৌঁছে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দাদা ও চাচার তত্ত্বাবধানে

মাতৃবিয়োগের দুই বছর যেতে না যেতেই কালের কঠোর হস্ত তাঁকে পিতামহ আবদুল মুত্তালিব স্নেহপূর্ণ বক্ষ থেকে অপসারিত করে। আবদুল মুত্তালিব ৮২ বছর বয়সে পরপারে পাড়ি জমান। দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব মুহাম্মদ (সা.)-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে কিশোর মুহাম্মদ পারিবারিক ও ব্যবসায়িক বিভিন্ন কাজে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

সিরিয়া গমন

আনুমানিক ৫৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বয়স যখন বারো বছর দু'মাস, তখন পিতৃব্য আবু তালিবের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে শামদেশে (সিরিয়া) যাত্রা করেন। এ সময় সিরিয়ার বসরা নগরের এক গির্জায় বুহায়রা নামক এক খ্রিস্টান ধর্মযাজক অবস্থান করতেন। এ যাত্রায় কুরাইশ প্রধানের অনেকেই আবু তালিবের সঙ্গী হয়েছিলেন।

আল আমীন উপাধি

বাল্যকাল থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দুর্দশাগ্রস্ত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ধ্যানে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। নম্রতা, বিনয়, সত্যবাদিতা, সাধুতা ও সৎস্বভাবের জন্য আরববাসী তাঁকে 'আল আমীন' বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করে। অবশেষে 'মুহাম্মদ' (সা.) নামের পরিবর্তে 'আল-আমীন' নামই বেশি পরিচিত হয়ে ওঠেন। দেখা হলেই লোকেরা বলত, "এই যে আমাদের আল-আমীন আসছেন।" বস্তুত আল-আমীন উপাধি লাভের মধ্যে আমরা এ সত্যই উপলব্ধি করি, ভবিষ্যৎ জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে বাল্যজীবনের চরিত্র মাধুর্যের ওপর। সত্যবাদিতা সে চরিত্র গঠনের প্রথম এবং প্রধান উপরকরণ।

হিল্‌ফুল্ ফুযুল গঠন

মহানবী (সা.)-এর জন্মের পূর্বে আরবে যেসব যুদ্ধ-সংঘাত একাধারে চলে আসছিল, তন্মধ্যে 'হারবুল ফিজ্জার' বা ফিজারের যুদ্ধই ছিল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। কুরাইশ এবং কায়িস্ গোত্রের মধ্যে এ যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। উকায মেলায় জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড় ও কাব্য প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্য করে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। এমন বিরতিহীন দ্বন্দ্বসংঘর্ষ, যুদ্ধ, হত্যা ও ধ্বংসলীলা, প্রলয় তাণ্ডব, সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকে মানুষকে মুক্তিদান ও সমাজে চুরি ডাকাতি, খুনাখুনি, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস, রাহাজানি বন্ধে রাসূল (সা.) এক সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিরাজমান অসহনীয় সামাজিক পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি একটা সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির তীব্র প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। রাসূল (সা.) ফেজারের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে পিতৃব্য ও গোত্রনেতা যোবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে হাশিম ও যুহরা প্রভৃতি বংশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ আবদুল্লাহ ইবনে জায়দানের গৃহে সমবেত হন এবং একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ প্রতিজ্ঞার উদ্যোক্তাদের অনেকের নামের মধ্যে 'ফযল' ধাতু ছিল বিধায় প্রতিজ্ঞাটির নাম 'হিলফুল-ফুযুল' বা ফযলদের প্রতিজ্ঞা নামে খ্যাত হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, প্রতিজ্ঞাগুলো ছিল নিম্নরূপ-

১. আমরা দেশের অশান্তি দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
২. বিদেশী লোকদের ধনপ্রাণ ও মানসম্মান রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
৩. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করব।
৪. জনসাধারণকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।

এ প্রতিজ্ঞা অনুসারে কিছুদিন পর্যন্ত বেশ কাজ হয়েছিল। তবে কালক্রমে ইসলামের বিস্তৃতি হওয়ার পর কুরাইশ দলপতিরা এ প্রতিজ্ঞার শর্ত ও হলফনামার কথা ভুলে যান। সবচাইতে বড় কথা হলো, ইসলামের আগমনে তা ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। অন্যদিকে পৌত্তলিকরা রাসূল (সা.) বিরোধী ছিল বলে হিলফুল ফুযুলের প্রতিজ্ঞা আর কার্যকর থাকেনি।

বৈবাহিক জীবন

আল-আমীন চাচা আবু তালিবের অনুমতি নিয়ে খাদিজা (রা:)-এর প্রতিনিধিরূপে সিরিয়ায় যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিল খাদিজা (রা:)এর বিশ্বস্ত কর্মচারী মায়সারা এবং একজন আত্মীয়। সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে বাণিজ্য করে প্রচুর লাভবান হয়ে আল আমিন মক্কায় ফিরে আসেন এবং হযরত খাদিজা (রা:)-কে হিসাবপত্র ও অর্থকড়ি বুঝিয়ে দেন। প্রচুর লাভ হওয়ায় খাদিজা (রা:) যুবক মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে উপযুক্ত পারিতোষিক দেন। ধীরে ধীরে আল-আমীনের প্রতি হযরত খাদিজা (রা:)-এর শ্রদ্ধা বেড়ে যায় এবং সে শ্রদ্ধা অনুরাগে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব

করেন। তখন আল-আমীন মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স ২৫ বছর আর হযরত খাদিজার ৪০ বছর। এ বয়সের একজন যুবকের পক্ষে এমন এক প্রৌঢ়া মহিলাকে বিয়ে করার বিষয়টি স্বাভাবিক ছিল না। চাচা আবু তালিবের অনুমতিক্রমে বিবি খাদিজা ও রাসূল (সা.)-এর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ পঁচিশ বছর তাঁদের এ দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হয়েছিল। হযরত খাদিজার জীবদ্দশায় তিনি অন্য কোনো নারীকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করেননি। খাদিজা বিয়ের পর পরই তাঁর সকল সম্পদ সম্পত্তি প্রিয় স্বামীকে দান করে দেন।

হাজ্‌রে আসওয়াদ পূনঃস্থাপন

কাবার স্থাপনা পাশ্ববর্তী পাহাড়ের তুলনায় নিম্নভূমিতে অবস্থিত থাকায় বর্ষার পানিতে স্রোত প্রবল বেগে তার মধ্যে প্রবেশ করে প্রায়ই ক্ষতিগ্রহস্ত হয়ে পড়ত। এ সমস্যার সমাধানকল্পে কাবার চারদিকে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল, কিন্তু একদা পানির স্রোতের বেগে তা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এজন্য কাবা গৃহ নতুন করে নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

কুরাইশ বংশের সকল গোত্রের লোকজন একত্রে মিলে-মিশে কাবা গৃহের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করে, কিন্তু 'হাজ্‌রে আসওয়াদ' বা কালো পাথর কারা যথাস্থানে স্থাপন করবে, তা নিয়ে মহাবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। প্রস্তরখানি স্থাপনের সাথে সামাজিক মর্যাদা ও বংশগত প্রাধান্যের সম্পর্ক ছিল। প্রত্যেক গোত্রের লোকরাই দাবি করতে লাগল, আমরাই প্রস্তর স্থাপনের একমাত্র অধিকারী। প্রথমে বচসা, তারপর তুমুল দ্বন্দ্ব-কোলাহল আরম্ভ হয়। এ কোন্দল-কোলাহলে চার দিন কেটে গেল, কিন্তু মীমাংসার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তখন চিরাচরিত প্রথানুসারে সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। যুদ্ধ যখন একেবারে অনিবার্য হয়ে উঠল, তখন জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া সকলকে আহবান করে বললেন, "আমার প্রস্তাব হচ্ছে, যে ব্যক্তি আগামীকাল ভোরে সর্বপ্রথম কাবাঘরে প্রবেশ করবে, তার ওপরই এ বিবাদ ফয়সালার ভার অর্পণ করা যাক। সে যে সিদ্ধান্ত করবে তাই আমরা মেনে নেব।" বৃদ্ধের এ সমীচীন প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হয়। পরদিন ভোরে দেখা গেল, মুহাম্মদ (সা.) সকলের আগে কাবাঘরে প্রবেশ করছেন। তখন সম্মিলিত কণ্ঠে আনন্দের রোল ওঠে- "এই তো আমাদের আল-আমীন। আমরা সকলেই তাঁর মীমাংসায় সম্মত আছি।" আল-আমীন তাদের মুখে সব ব্যাপার অবগত হয়ে একখানা চাদর বিছিয়ে নিজে প্রস্তরখানা তার মধ্যস্থলে স্থাপন করেন এবং নির্বাচিত গোত্র প্রতিনিধিদের বললেন, "এবার আপনারা প্রত্যেকেই এ চাদরের এক এক প্রান্ত ধরে পাথরখানা যথাস্থানে নিয়ে চলুন।" সকলেই রাসূলের অনুসরণ করলেন। যথাস্থানে উপনীতি হয়ে মুহাম্মদ (সা.) পুনরায় পাথরখানা নিজ হাতে তুলে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করেন। এভাবে বিবাদমান গোত্রগুলোর মধ্যে এক জটিল সমস্যার ফয়সালা হয়ে গেল।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সূক্ষ্ম বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসহ ব্যাপক সুনামের ফলে আল-আমীন একটি আসন্ন ভয়াবহ রক্তপাতের আশংকা থেকে আরব গোত্রগুলোকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুযায়ী, এ সময় আল-আমীনের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।

শিক্ষার্থীর কাজ	মহানবী (সা.)-এর জন্ম ও শৈশবকালীন ঘটনাসমূহ **চিহ্নিত** করুন।

বিশুদ্ধমতানুযায়ী মহানবী (সা.) এর জন্ম তারিখ কোন্‌টি?	আমূল ফিল কী?	কুরাইশ নামের উৎপত্তি কার নাম থেকে এসেছে?	হালিমা কে?

সারসংক্ষেপ :

আরবভূমিসহ সমগ্র পৃথিবীতে যখন মানবতার মর্যাদা ভুলণ্ঠিত হচ্ছিল, মহান আল্লাহর একত্ববাদের পরিবর্তে শিরকসহ নানা মতবাদের প্রসার ঘটেছিল, ঠিক তখনিই অখিরী নবী হযরত মুহাম্ম (সা.) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের পূর্বে পিতা এবং শৈশবে মাতৃবিয়োগের মাধ্যমে কঠিন বাস্তবতায় জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর স্বভাব ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলির মাধ্যমে জাহিলী সমাজে আল আমিন নামে খ্যাতি লাভ করেন। নবুয়াত লাভের পূর্বেই হিল্‌ফুল্ ফুযুল সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এবং যুব বয়সে কাবা ঘরের কালো পাথর স্থাপনের সমস্যার সমাধান করার মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের আনুষ্ঠানিক আস্থা অর্জন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ৫৭০ (খ) ৫৭৩
(গ) ৫৭৯ (ঘ) ৫৮২

২। 'আমুল-ফিল' বা হস্তিবর্ষ বলা হয় কোন খ্রিস্টাব্দকে?
(ক) ৫৭০ (খ) ৫৭৩
(গ) ৫৭৯ (ঘ) ৫৮২

৩। মহানবী (সা.)-কে 'আল-আমীন' বলা হয় কারণ তিনি-
(ক) আমানত রক্ষা ও সত্য বলতেন (খ) কর্তব্যনিষ্ঠায় অটুট ছিলেন
(গ) সৎ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন (ঘ) বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করতেন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মসজিদের উন্নয়নে অশংগ্রহণ নিয়ে কয়েকটি পরিবারের মধ্যে বিরোধ বাধে। প্রতিটি পরিবার নিজেরাই সম্পূর্ণ খরচ দিবে বলে দাবি করে। তখন মসজিদের ইমাম সাহেব তাদের মধ্যে উন্নয়ন কাজে সমান অংশীদারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন এবং পরবর্তীতে যেন গ্রামে এসব বিষয়ে অশান্তি না হয় সেজন্য কয়েকজনের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করেন।

(ক) সিরিয়া ভ্রমনের সময় কিশোর মহানবী (স:) এর সাথে কোন খ্রীস্টান পাদ্রীর সাক্ষাত হয়? ১
(খ) হিলফুল ফুজুলের পরিচয় দিন। ২
(গ) বিরোধ নিস্পত্তিতে ইমাম সাহেব কোন ঘটনাকে অনুসরণ করেছেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) ইমাম সাহেবের পদক্ষেপ সমাজে শান্তি বজায় রাখতে পারে। আপনি কি এর সঙ্গে একমত? ৪

পাঠ-৩.২ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়াত লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নবী ও নবুয়াত সম্পর্কে জানতে পারবেন
- ওয়াহী-এর পরিচয় জানতে পারবেন
- প্রথম অবতীর্ণ ওয়াহী

	মুখ্য শব্দ	**নবুয়াত, ওয়াহী, জিব্রাইল,হিরা গুহা, বুহায়রা ও ওরাকা ইব্নে নওফল**

নবুয়তের পরিচয়

'নবুয়াত' শব্দটি আরবী 'নাবাআ' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে-সংবাদ। সে হিসেবে নবী শব্দের অর্থ সংবাদ বাহক বা সংবাদ দাতা। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানব জাতির নিকট প্রয়োজনীয় খবরাখবর বা সংবাদ তথা আল্লাহর নির্দেশসমূহ পৌঁছে দেয়ার জন্য যারা সংবাদদাতার ভূমিকা পালন করেছেন, তারাই নবী। প্রত্যেক নবী রাসূলই মানবজাতিকে তাদের বিস্মৃত দায়িত্ব কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে দুনিয়াতে আগমন করেন। তাদের এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলেন। শিরক্-বিদআাত থেকে তাদের দূরে রাখেন। তাদের অজ্ঞতাপূর্ণ জাহিলী রসম-রেওয়াজ রহিত করেন। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করার পদ্ধতি শেখান। নির্ভূল ও সঠিক আইনের প্রচলন করে তা মেনে চলার নির্দেশ দেন।

ওয়াহী পরিচিতি

ওয়াহী অর্থ ইশারা, ইঙ্গিত, মনে কোনো কথা নিক্ষেপ করা, গোপনে কোনো কথা বা বাণী পাঠানো। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীদের নিকট যা প্রত্যাদেশ হিসেবে প্রেরণ করেন তাকে অহী বলে। ওয়াহী দুই প্রকার, যথা: (ক) ওয়াহী মাতলু: যার শব্দ ও অর্থ দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-অর্থাৎ কুরআন (খ) ওয়াহী গাইরি-মাতলু, যার ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে তবে ভাষা রাসূল (সা.)-এর, অর্থাৎ হাদীস। আদম (আ:) থেকে শুরু করে মহানবী (সা.) সকল নবী-রাসূলগনই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন।

প্রাথমিক পর্যায়ে ওয়াহী

তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর পূর্ণ হচ্ছিল, তখন মুহাম্মদ (সা.)-এর ভাবের আবেশ আরো গভীর হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় লোকালয়ের কোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে নির্ভৃত নির্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন থাকা তাঁর নিকট প্রিয় মনে হতে লাগল। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে হিরা পর্বত, চারদিকে জনমানবহীন বিস্তৃত মরূপ্রান্তর। সে পাহাড়ের গুহায় তিনি মাসের পর মাস অবস্থান করে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। একদিন যখন তিনি পূর্বের অভ্যাসমতো হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন জিব্রাইল (আ) অহী নিয়ে এসে তাঁকে বললেন, "ইকরা (পড়ুন)। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। দ্বিতীয়বারেও একই নির্দেশে রাসুল (সা.) নেতিবাচক জবাব দেন। একইভাবে তৃতীয়বার বললেন, পড়ুন। তখন রাসুল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কী পড়তে হবে? বললেন: "পড়ুন, আপনার প্রভূর নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ড থেকে। সে প্রভূর নামে পাঠ করুন, যিনি মহিমান্বিত; মানুষকে যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন।" (সূরা আলাক, ৯৬: ১-৫)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: আমি তাঁর থেকে শুনে শুনে শব্দ ও বাক্যগুলো উচ্চারণ করলাম। তিনি প্রস্থান করলে আমি ধ্যান থেকে উঠে পাহাড়ের গুহা থেকে বর হয়ে আসলাম। যখন পাহাড়ের অর্ধ পথ নেমে এসেছি, তখন আকাশ থেকে কণ্ঠ' শ্রুত হলো- 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিব্রাইল। আমি মুহূর্তে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখলাম, আকাশ জুড়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছেন- আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিব্রাইল। তারপর স্বপ্নের দৃশ্যাবলীর মতো তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরমুহূর্তে আমার ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক হৃৎকম্প শুরু হলো। আমি দ্রুত বাড়ির দিকে চলতে লাগলাম।

বাড়ি ফিরে রাসূল (সা.) জ্বরাক্রান্ত রোগীর মতো কাঁপতে লাগলেন এবং খাদিজাকে বললেন, "আমাকে কম্বল দিয়ে জড়াও।" যতক্ষণ না তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন, ততক্ষণ তাঁকে কম্বল দিয়ে আবৃত রাখা হলো। কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে রাসূল (সা.) হযরত খাদিজা (রা:) কে সার্বিক বিষয় ব্যক্ত করলেন। খাদিজা (রা:) রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: ভয়ের কারণ নেই, আল্লাহ আপনাকে ক্ষতির মধ্যে ফেলবে না। কেননা আপনি সর্বদা মানুষের কল্যানে কাজ করেন, দু:খীদের সাহায্য করেন এবং তাঁকে নিয়ে ওরাকা ইবনে নওফলের নিকট গমন করেন। তিনি হিব্রু ভাষা জানতেন এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের পণ্ডিত ছিলেন। রাসূল (সা.) এর নিকট পূর্বাপর সকল ঘটনা শুনে তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কুদ্দুসুন' (শুভ, শুভ)! তিনি 'নামুসুল আকবার (স্বর্গীয় বাণীবাহক জিবরাইল)। যিনি আপনার নিকট আগমন করেছিলেন, তিনি সেই দূত (ফিরিশ্‌তা), যিনি হযরত মূসা (আ) এর নিকট এসেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এভাবেই চল্লিশ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ রমযান কদরের রাতে নবুয়ত লাভ করেন। নবুয়তপ্রাপ্তির এ ঘটনা হাদীসে একাধিক জায়গায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার ওহী

আল্লামা ইবনে কাইয়িম নিম্নোক্ত কয়েক প্রাকারের ওয়াহীর কথা উল্লেখ করেছেন-

১. সত্য স্বপ্ন। স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর ওপর ওয়াহী নাযিল হতো।
২. ফেরেশতা তাঁকে দেখা না দিয়ে তাঁর মনে কথা বসিয়ে দিতেন। যেমন প্রিয়নবী (সা.) বলেছেন, রুহুল কুদ্দুস আমার মনে একথা বসিয়ে দিলেন, কোনো মানুষ তার জন্য নির্ধারিত রিযিক পাওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করে না। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো এবং ভালো জিনিস তালাশ করো। রিযিক পেতে বিলম্ব হলে আল্লাহর নাফরমানির মাধ্যমে রিযিক তালাশ করো না। কেননা, আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে, সেটা তাঁর আনুগত্য ছাড়া পাওয়া যায় না।
৩. ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওয়াহী নিয়ে আসতেন
৪. রাসূল (সা.)-এর কাছে ওয়াহী ঘণ্টাধ্বনির মতো টন টন শব্দে আসতো। এটি ছিল ওয়াহীর সবচেয়ে কঠোর অবস্থা। এ অবস্থায় ফেরেশতা তাঁর সাথে দেখা করতেন এবং প্রচণ্ড শীতের মওসুম হলেও প্রিয়নবী (সা.) ঘর্মাক্ত হতেন। তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়তো।
৫. মহানবী (সা.) ফেরেশতাদের তাঁর প্রকৃত চেহারায় দেখতেন। সেই অবস্থাই আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর ওপর ওয়াহী নাযিল হতো।
৬. ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলা। প্রিয় নবীর সাথে আল্লাহর কথা বলার প্রমাণ মিরাজের ঘটনায় রয়েছে।

এভাবে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী অবতীর্ণের মাধ্যমে মহানবী (সা.) নবী ও রাসূল হিসেবে আবির্ভুত হলেন। তার উপর অহী প্রচারের দায়িত্ব বর্তায়। মহানবী (সা.) এর দাওয়াতী কর্মকাণ্ডসমূহ তার জীবনের মতই সাধারণত দুভাগে ভাগ করা যায়-প্রথমত: মক্কা জীবন, এসময়টি ৬১০ সাল থেকে ৬২২ সন পর্যন্ত মোট ১৩ বছর। দ্বিতীয়ত: মদীনা জীবন, এ সময়টি ৬২২ থেকে ৬৩২ সন পর্যন্ত মোট ১০ বছর।

মহানবী (সা.)-এর নবুয়াতী ২৩ বছরে ইসলামের প্রতি মানুষকে আহবানের তিনটি পর্যায় উল্লেখযোগ্য যথা:

১. গোপনে ইসলাম প্রচার: অহী নাযিলের পর থেকে প্রথম তিন বছর।
২. প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার: নবুয়াতের চতুর্থ বছর থেকে দশম সন পর্যন্ত।
৩. মক্কার বাইরে আরব ও সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার: নবুয়াতের দশম বছর থেকে শুরু করে মহানবী (সা.) এর ওফাতকাল পর্যন্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ	ওয়াহী সম্পর্কে একটি ধারণা উপস্থাপন করুন।

ওয়াহী কী?	ওয়াহী কোন ফেরেশতার মাধ্যমে কার উপর অবতীর্ণ হয়?	ওয়াহী কত প্রকার ও কী কী?	প্রথম ওয়াহী কোনটি?

সারসংক্ষেপ :

৪০ বছর বয়সে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ লাভ করেন। বিপদগামী মানব জাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য নাযিল করা হয় আল কুরআন। হেরা গুহায় নাযিলকৃত কুরআনের প্রথম শব্দটি হচ্ছে 'ইকরা' বা পড়। ৬১০ থেকে ৬৩২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী নাযিলকৃত কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য একমাত্র অনুকরনীয় আদর্শ। কেয়ামাত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য পথ চলার পাথেয়। মানব জীবনের সকল সমস্যা ও জিজ্ঞাসার জবাব আল কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমে জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভে মানব জীবন ধন্য হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রথম অবতীর্ণ অহীর শব্দ কোনটি?

(ক) ইকরা (খ) ইখ্‌ফা

(গ) ইল্‌হাম্‌ (ঘ) কিরাঅ

২। ওয়াহী নিয়ে আসেন কোন্‌ ফিরিশ্‌তা?

(ক) মিকাইল (খ) জিব্রাইল

(গ) ইস্রাফিল (ঘ) আজরাইল

৩। প্রথম অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সূরা কোনটি?

(ক) ফাতিহা (খ) ইখলাস

(গ) আলাক (ঘ) আনফাল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

অধ্যাপক মো: আবুল কালাম ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয় পড়াতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের একটি গল্প শোনান। সেন্টমার্টিন দ্বীপের পথহারা মানুষদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করতে একদা একজন বিখ্যাত লোকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি দ্বীপ বাসীর জন্য নতুন বার্তা নিয়ে এলেন। মানুষের উপর অর্পিত সৃষ্টি কর্তার দেয়া দায়িত্বের ব্যাপারে তিনি তাদেরকে সতর্ক করলেন। প্রচলিত বিশ্বাসের পরিবর্তে নতুন বাণীতে মানুষ অভিভূত হয়। ক্রমেই দ্বীপঞ্চল ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী সে আহবান ছড়িয়ে পড়ে।

(ক) ওয়াহী অর্থ কী? ১

(খ) ওয়াহী- এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। ২

(গ) ওয়াহী নাযিলের ধাপগুলো বর্ণনা করুন। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের সেন্ট মার্টিন দ্বীপের ঘটনার সাথে মহানবী (সা.)-এর জীবনের ঘটনার সাদৃশ্য তুলে ধরুন। ৪

পাঠ-৩.৩ মক্কায় ইসলাম প্রচার ও কাফিরদের বিরোধিতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) কর্তৃক ইসলামের প্রচারের সূচনা কাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের পরিচয় জানতে পারবেন ও
- ইসলামের বিরুদ্ধে কোরাইশ কাফিরদের ষড়যন্ত্র আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত হবেন।

	মুখ্য শব্দ	**দ্বীনের দাওয়াত, গোপনে দ্বাওয়াত, প্রকাশ্যে দাওয়াত ও পৌত্তলিকতা**

ইসলামের দাওয়াত

নবী রাসূলদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান কাজ হলো দ্বীনের দাওয়াত। আর তাই দাওয়াত মুমিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিশন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এভাবেই মহানবী (সা.)-এর জীবনের প্রথম পর্ব শেষ হয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। তিনি সত্য প্রচারে আদিষ্ট হলেন, "হে আমার প্রিয় রাসূল! আপনার প্রভু আপনাকে যে সত্য দান করেছেন, তা প্রচার করুন।" (সূরা মায়িদা-৬৭)। তখন থেকে রাসূল (সা.) সত্য প্রচারে ব্রতী হন।

গোপনে ইসলাম প্রচার

প্রথম তিন বছর গোপনে প্রচার কার্য চালান। সর্বপ্রথম মুসলমান হলেন তাঁর সহধর্মিণী খাদিজা (রা:), তারপর পিতৃব্য পুত্র আলী (রা:), মুক্ত দাস যায়িদ বিন হারিসা ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বকর সিদ্দীক (রা:)। আবু বকর সিদ্দীক (রা:) ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেই বন্ধুবান্ধব ও সমমনাদের মাঝে ইসলাম প্রচার শুরু করে দেন। অচিরেই হযরত উসমান, আবদুর রহমান, সাদ, যোবায়ের, তালহা (রা:) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া হযরত আবু ওবায়দা, আবু সালামা, উসমান ইবনে মাযউন, সাঈদ ইবনে যায়িদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ প্রমুখও হযরত আবু বকর (রা:)-এর আহ্বানে ইসলামে দীক্ষিত হন। বস্তুত ইসলামের ইতিহাসের প্রথম তিন-চার বছর পর্যন্ত উপরিউক্ত মনীষীদের মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরাই ছিলেন রাসূলের প্রাথমিক সহচর। রাসূলের সুখে-দুঃখে তাঁরাই ছিলেন নিত্যসঙ্গী, সমব্যথী।

প্রকাশ্যে প্রচারের আদেশ

গোপন প্রচারের প্রথম তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর চতুর্থ বছরের প্রারম্ভেই প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ হয়- "আপনি আদিষ্ট বিষয় (আল্লাহ তায়ালার বাণী) প্রকাশ্যভাবে শুনিয়ে দিন।" (হিজর-৯৪) "আপনি আপনার পরিবার পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের (আল্লাহ তায়ালার) ভয় প্রদর্শন করুন।" (শুআরা- ২৯৪)

যেমন নির্দেশ তেমন কাজ। এ নির্দেশ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার অদূরবর্তী সাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং গোত্রপতিদের সবাইকে আহবান করে পর্বতের পাদদেশে জমায়েত করেন। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে বলেন- "হে কুরাইশ! আজ যদি আমি বলি, এ সাফা পর্বতের পশ্চাতে একদল প্রবল শত্রু তোমাদের আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষমান, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?" সবাই জবাব দিল, "নিশ্চয়ই করব, কারণ এ পর্যন্ত তোমাকে আমরা কোনো দিন মিথ্যা বলতে শুনিনি।" তিনি বললেন, "আমি এখন তোমাদের বলছি, তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে তোমাদের ওপর কঠিন শাস্তি আরোপিত হবে।" রাসূলের দাওয়াতী বাণী শ্রবণ করে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। এদের মধ্যে তাঁর চাচা আবু লাহাবও উপস্থিত ছিল।

এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) মনোবল চ্যুত হলেন না। নিরাশাও তাঁকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। এবার তিনি এক ভোজসভার আয়োজন করে আবদুল মুত্তালিবের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব হযরত আলী (রা:)-এর ওপর ন্যস্ত করেন। সকলেই ভোজসভায় উপস্থিত হয়। আহারান্তে তিনি ইসলামের কথা শুরু কররে সকলে হৈহুল্লোড় করে চলে যায়। কিছুদিন পর তিনি

আরেক ভোজসভার আয়োজন করেন। এবার তিনি আহারের পূর্বেই বক্তব্য শুরু করেন। সম্ভবত খাবার গ্রহণের পূর্বে বিশেষ কারণে শ্রোতারা চুপ থাকে। তাই সামনে নিয়ে সকল শ্রোতা চুপ করে বসে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "হে বনু মুত্তালিব! আমি তোমাদের জন্য এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি, যা আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই তার কওমের জন্য আনতে পারেনি। আমি তোমাদের আল্লাহর দিকে আহবান করছি। তোমরা যদি আমার ডাকে সাড়া দাও, তবে দুনিয়ার সকল ঐশ্বর্য তোমাদের দখলে আসবে। এবার বল, এ কাজে কে আমাকে সাহায্য করবে?" সমগ্র ভোজসভা একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। অকস্মাৎ আলী (রা:) দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "আমি আপনাকে সাহায্য করব। এভাবে সকল বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলাম বেড়েই চলল। মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল।

কুরাইশদের বিরোধিতার কারণ

ইসলাম হলো সাম্য, মৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও একত্ববাদের ধর্ম। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এ সত্য সুন্দরের আহবান কুসংস্কারাচ্ছন্ন কায়েমী স্বার্থবাদী কুরাইশরা মেনে নিতে পারল না। তারা ইসলাম প্রচারে তীব্র বাধার সৃষ্টি করল। তাদের এ বিরোধিতার পেছনে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল। যার বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো-

১. **ধর্মীয় কারণ :** ইসলাম ধর্ম কবুল করার অর্থ হচ্ছে নিজেকে সকল প্রকারের শিরক হতে মুক্ত করা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে আরববাসীকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকতে বললেন, তখন মূর্তিপূজক কুরাইশ সম্প্রদায় তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তাঁর ইসলাম প্রচারে বাধা সৃষ্টি করে।

২. **সামাজিক কারণ :** সাম্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্য হলো ধনী-নির্ধন, উঁচু-নীচু, আশরাফ-আতরাফ, সাদা-কালো সকলেই সমান। মুহাম্মদ (সা.) আরবে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে সমাজে বিরাজিত অত্যাচার-অনাচার, ব্যভিচার, দুর্নীতি, নরবলী, মদ্যপান, জুয়া খেলা, কুসিদ প্রথা, লুণ্ঠন ইত্যাদি পাপাচারের বিরুদ্ধে কথা বলেন। আরবরা তাই নবী (সা.)-এর বিরোধিতা করতো।

৩. **রাজনৈতিক কারণ :** কাবার বদৌলতে সমগ্র আরবের নেতৃত্ব কুরাইশদের কুক্ষিগত ছিল। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে পৌত্তলিক নেতৃবৃন্দ উদ্বেগের সাথে লক্ষ করল এভাবে ইসলামের শক্তি উত্থিত হলে, তাদের নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে যাবে। তাই উপায়ন্তর না দেখে তারা ইসলামের বিরোধিতা শুরু করে।

৪. **অর্থনৈতিক কারণ :** কুরাইশরা হজ্জের মওসুমে অনেক প্রকার আর্থিক সুবিধা ভোগ করতো। যদি মুহাম্মদ (সা.) প্রচারিত ধর্ম বিশ্বাসে একমত হয়ে মানুষ একত্ববাদের শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে পৌত্তলিকদের উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য তারা ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরোধিতা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**মক্কায় ইসলাম প্রচারে মহানবী (সা.)-এর প্রথমিক পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করুন।**

কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন?	গোপনে ইসলাম প্রচারের সময় ৩ জন মুসলিমের নাম লিখুন।	কোন সালে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়।?	মানবী (সা.) কোন পাহাড়ের পাদদেশে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেন?

সারসংক্ষেপ :

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে গোটা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। আর তাঁর প্রচারিত সত্য ধর্মেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ। কাফিররা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও তাঁকে এতটুকু দমিয়ে দিতে পারেনি; বরং ক্রমশ ইসলামের ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি বেড়েই চলেছে। অবশেষে কুরাইশদের বাধাসহ অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ আরবসহ সমগ্র পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কত সনে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন?

(ক) ৬১১ (খ) ৬১২

(গ) ৬১৩ (ঘ) ৬১৪

২। সর্বপ্রথম কুরআনের যে কথা মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অহী হিসেবে অবতীর্ণ হয়-

(ক) পড়ুন, আপনার রবের নামে (খ) লিখুন, আপনার প্রভুর নামে

(গ) বলুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই (ঘ) লিখুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই

৩। ওয়াহী অবতরণের অলৌকিক ঘটনা অবগত হয়ে হযরত খাদীজা (রা:) রাসূল (সা.)-কে প্রদান করেন-

i. সাহস ii. সহযোগিতা iii. উৎসাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জনাব জামিল সাহেব বিশ্রাম নগর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়র প্রধান শিক্ষক। গ্রামের মানুষ তাকে খুবই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে এবং যেকোনো পরামর্শের জন্য তার কাছে আসে। মাতবর শ্রেণির কিছু লোকজন গ্রামে মেলার নামে অশ্লীল নাচগানসহ, মদ-জুয়ার আসর বসায় বিভিন্ন অনৈতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজির মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ নষ্ট হয়। এই অবস্থায় আতিক সাহেব এগুলো বন্ধের আহ্বান জানালে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি তার উপর অমানবিক নিপীড়ন শুরু হয়।

(ক) নবী করীম (স) কত বছর বয়সে নবুয়তপ্রাপ্ত হন? ১

(খ) কুরাইশদের ইসলামের বিরোধিতা করার কারণ কী? ২

(গ) উদ্দীপকের ঘটনার সাথে নবী করীম (স)-এর কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ৩

(ঘ) উক্ত ঘটনা মহানবী (স) কিভাবে মোকাবেলা করেন? ৪

পাঠ-৩.৪ ইসলাম প্রচারে কুরাইশদের নির্যাতন ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইসলামের প্রচার-প্রসারের বিরুদ্ধে কুরাইশদের বিরোধিতার ঘটনাবলী জানতে পারবেন এবং
- মুসলমানদের উপর কাফিরদের নানারকম নির্যাতনের বিষয় জানতে পারবেন

	মুখ্য শব্দ	**আবু তালিব, আস ইবনে হিশাম, আওয়াদ ও আবুল হাকাম**

কুরাইশদের অত্যাচার ও নির্যাতন

মক্কার কুরাইশরা ছিল কাবার তত্ত্বাবধায়ক। কাবাকে কেন্দ্র করে তাদের গড়ে উঠেছিল বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি। পৌত্তলিকতার সাথে তাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থ উপার্জনের বিষয়টি জড়িত ছিল। তাই তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রচারিত একত্ববাদের ধর্ম ইসলামকে মেনে নিতে পারল না। তারা নতুন জীবনব্যবস্থা প্রচারকে একটা মহা ধৃষ্টতা বলে মনে করতে থাকে। ইসলামের প্রসারকে রুখতে নানা রকমের অত্যাচার শুরু করে।

আবু তালিবের সমর্থন

কুরাইশরা রাসূল (সা.)-এর চরম বিরোধিতায় লিপ্ত হলে চাচা আবু তালেব রাসূল (সা.)-এর প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন ঘোষণ করেন। আবু তালেব নিজে ইসলাম গ্রহণ না করেও মহানবী (সা.)-কে সর্বতভাবে সমর্থন করেন, এজন্য কুরাইশরা রাসূল (সা.)-এর চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও কিছুই করতে পারেনি।

আবু তালেবের কাছে কুরাইশ প্রতিনিধিদল

মুহাম্মাদ (সা.)-এর অনড় অবস্থান আর কঠিন সিদ্ধান্ত আঁচ করতে পেরে কুরাইশ নেতারা আর ধৈর্য ধরতে পারেনি। কুরাইশরা যখন দেখল তাদের অসন্তুষ্টিতে মুহাম্মদ(সা.)-এর কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না, অন্যদিকে আবু তালেবও তাঁকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন, সর্বশেষ তারা পরামর্শক্রমে একত্র হয়ে আবু তালেবের কাছে একে একে তিনবার প্রতিনিধি দল পাঠায়।

(১) প্রথম প্রতিনিধি দলে বিখ্যাত কুরাইশ নেতাদের মধ্যে ছিল উত্বা, শাইবা, আবু সুফিয়ান, আবু জাহল, আস ইবনে হিশাম, আওয়াদ, আবুল হাকাম প্রমুখ। তারা বলে, হে আবু তালেব! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের মাবুদদের গালি দিচ্ছে, দোষারোপ করছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের ভ্রষ্ট বলছে। এখন তুমি তাকে এসব থেকে বারণ কর, অথবা তার প্রতি সমর্থন পরিহার কর। অন্যথায় আমরা এ ব্যাপারে যে কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দ্বিধা করব না। আবু তালিব অযথা বাকবিতণ্ডা না করে বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কোমল ভাবে বুঝিয়ে তাদের বিদায় করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যথারীতি ইসলামের প্রচারের কাজে ব্যাপৃত থাকলেন।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ে কুরাইশ নেতারা আবু তালিবের নিকট গমণ করে বলল, 'হে আবু তালিব! বয়সে আপনি আমাদের চেয়ে বড়, সম্মান-মর্যাদায়ও উচ্চ, আমরা অনুরোধ করেছিলাম আপনি আপনার ভাতিজাকে আমাদের দেবমূর্তিদের বিরুদ্ধে বলা থেকে বারণ করবেন, কিন্তু আপনি তা করেননি। এখন আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। আপনার মাধ্যমে আমরা মুহাম্মদ (সা.) কে শেষবারের মতো সুযোগ দিয়ে আমরা আপনাকে সাবধান করছি। এতে যদি কাজ না হয়, তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে আমৃত্যু যুদ্ধ চালিয়ে যাব। এতদূর গড়াতে দেখে আবু তালিবও আর বিষয়টা সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। এতে তিনি বিব্রত হয়ে পড়েন, তাঁর জন্য সমস্যা ছিল তিনি সরাসরি ইসলামও গ্রহণ করতে চাননি; আর রাসূললুল্লাহ (সা.) নিহত বা অপদস্থ হোক তাও চাননি। তিনি এমনি চিন্তিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ডেকে বললেন- "ভাতিজা, তোমার স্বজাতি একত্র হয়ে আমার নিকট এসেছিল। তারা আমার সাথে কথাবার্তা বলেছে। তুমি আমার এবং তোমার নিজের ওপর করুণা কর। আমার ওপর এমন বোঝা অর্পণ করো না, যা বহন করতে আমি অসমর্থ।"

চাচার কথায় মহানবী (সা.) বললেন-"চাচা! আল্লাহর কসম, আমি যা কিছু করছি তা সবই আল্লাহর আদেশমাত্র। যদি এসব লোক আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তাহলেও আমি এ মহাসত্যের প্রচার ও নিজের কর্তব্য থেকে বিরত হতে পারব না। হয় আল্লাহ একে জয়যুক্ত করবেন, না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব, কিন্তু চাচা! মনে রাখবেন মুহাম্মদ কখনই নিজের কর্তব্য থেকে বিরত হবে না।" একথা শুনে আবু তালিবের অন্তর বিগলিত হয়ে গেল। তাঁর মনমানসিকতায় এ দৃঢ় উক্তির বিরাট প্রভাব পড়ে। তিনি বললেন, "ভাতিজা! তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত; তুমি তোমার কাজ করে যাও। তোমার ব্যাপারে তাদের সাথে আমার কোনো আপস হবে না; হতে পারে না।"

(৩) একপর্যায়ে কাফিররা যখন নিশ্চিত হয়ে গেল, আবু তালেবের কোনো অবস্থায়ই রাসূললুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ ত্যাগ করবেন না এবং তাঁর জন্য সমগ্র জাতির বিরোধিতা ও শত্রুতার তোয়াক্কা করেন না, তখন তারা আম্মারা ইবনে ওয়ালিদকে নিয়ে আবু তালিবের নিকট গিয়ে বলল, "আপনি তো আপনার ভাতিজার কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত। এখন আমরা আপনার নিকট আম্মার ইবনে ওয়ালিদকে নিয়ে এসেছি। সে কুরাইশদের মধ্যে অত্যধিক জ্ঞানী। তাকে আপনি আপনার ভাতিজার পরিবর্তে নিয়ে নিন, আর মুহাম্মদকে আমাদের হস্তে সমর্পনণ করুন।" এবারও আবু তালেব তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন

মুসলিমদের উপর নির্যাতন

প্রাথমিক পর্যায়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে লক্ষ্যবস্তু করা সমীচীন হবে না ভেবে কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর নির্যাতন আরম্ভ করে। হযরত ওসমান (রা:)-কে হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়। যুাবাইর ইবনুল আওয়ামকে চাটাইতে মুড়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া প্রদান করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে কাবা প্রাঙ্গণে অমানুষিক মারপিট করা হয়। সবচেয়ে অধিক অত্যাচারিত সে সকল ভাগ্যাহত দাস-দাসীরা, যারা মুসলমান হয়েছিল। নিষ্ঠুর উমাইয়া ইবনে খালফ বিলাল (রা:)-এর গর্দানে রশি লাগিয়ে দুষ্ট বালকদের হাতে সোপর্দ করতো। তারা তাঁকে অলি-গলিতে টেনে ফিরত। গ্রীষ্মেও প্রচণ্ড উত্তাপে উমাইয়া তাঁকে মক্কার বাইরে নিয়ে যেত এবং তাঁর শরীর থেকে কাপড় খুলে দুপুরের তপ্ত বালিতে শুইয়ে দিত। বেলাল (রা:) এ অবস্থায় কেল 'আহাদ আহাদ' বা "আল্লাহ এক, আল্লাহ এক" শব্দই উচ্চারণ করতেন।

উম্মে নুমার নাম্নী এক মহিলার ক্রীতদাস ছিলেন হযরত খাব্বাব (রা:)। জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দেয়ার ফলে তাঁর চামড়া গলে চর্বি বের হয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়। এমন অমানবিক ও পাশবিক অত্যাচারেও তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করতেন না; বরং মুখে 'আহাদ' নাম জপ করেই যেতেন। এতে তাঁদের ঈমান আরো মজবুত হতো।

আম্মার ইবনে ইয়াসারকেও মরুর তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে রাখা হত। কুরাইশরা তাকে মারতে মারতে বেহুঁশ করে ফেলত। তাকে পানিতে চুবানো হতো এবং জ্বলন্ত অংগারের উপর শোয়ানো হতো। আম্মারের মা হযরত সুমাইয়া (রা:)-কে ইসলাম গ্রহনের অপরাধে পাপিষ্ঠ আবু জাহল বর্শার আঘাতে পাশবিক পন্থায় হত্যা করে। ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফিরদের হাতে মুসলমানদের এটিই শাহাদাতের প্রথম ঘটনা। আম্মারের বাবা ইয়াসার (রা:)ও কাফিরদের নির্যাতনে শাহাদাত বরণ করেন। এছাড়াও আবুযর গিফারী, উম্মে শুরাইক, উসমান ইবনে মাযউন,আবু যর, সাঈদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, লুবাইনা, যুনাইরা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:)-প্রমূখ সাহাবীদের উপর নানা রকমের নির্যাতন করা হয়।

অন্যদিকে অত্যাচারের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। নারকীয় এসব অত্যাচার নির্যাতনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে রাসূল (সা.)-এর মন অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। তিনিও কাফিরদের থেকে রেহাই পাননি। তাঁকে অহরহ যাদুকর, পাগল, কবি ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করতো, নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো। তাঁর যাতায়াত পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, কাবা শরীফে সিজদারত অবস্থায় একদা আবু জাহল উটের নাড়িভূড়ি তাঁর ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেয়। তাঁকে অশালীন ভাষায় গালমন্দও করতো।

প্রস্তাব-প্রলোভন

শত অত্যাচার নির্যাতন সত্ত্বেও মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন দেখে কুরাইশ কাফিররা সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট চতুর ব্যক্তি উত্বা ইবনে রাবিয়াকে এক প্রলোভনের প্রস্তাব দিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করে। সে এসে বলল, "হে মুহাম্মদ! তুমি কি মক্কার রাজত্ব চাও? না কোনো বড় বংশে বিয়ে? নাকি বিপুল সম্পদরাজি? তার সবকিছুই আমরা তোমার জন্য ব্যবস্থা করতে পারি। তোমার কাছে আমাদের একটিমাত্র আবদার, তুমি বর্তমানে যা করছ, তা থেকে বিরত

থাকবে।" প্রত্যুত্তরে মহানবী (সা.) সূরা 'হা-মীম-সাজদা'-এর কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করেন। ওতবা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেগুলো শুনতে থাকে। তাতে তার চোখে-মুখে প্রতিক্রিয়ার ছাপ ফুটে ওঠে। সে গিয়ে কুরাইশদের বলে, "মুহাম্মদ যা বলে তা যাদুও নয়, কাব্যও নয়, তা অন্য কিছু। এ চেয়ে উত্তম কথা আমার কান আর কখনো শুনেনি। আমার মতে, তোমরা তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। যদি সে বিজয়ী হয়, তাহলে তোমাদেরই নাম; আর যদি আরবরা জয় লাভ করে তাতেও তোমাদের গৌরব" কুরাইশরা উতবার কাছ থেকে এ ধরনের পরামর্শ শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না; এতে তারা উতবার ওপর সন্দেহসূচক দৃষ্টি নিবদ্ধ কর তাকে যাদুর প্রভাবে ঘায়েল করা হয়েছে বলে অপবাদ প্রদান করে।

বয়কট

কুরাইশ কাফিররা নির্যাতনের সকল পন্থা চালিয়েও যখন ইসলামের প্রসারকে নিবৃত্ত রাখতে পারলনা, তখন তারা এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের আঁটে। নবুয়াতের সপ্তম বর্ষের মুহাররাম মাসে মক্কার সব গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহানবীর বংশীয় গোত্র বনু হাশিম-কে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যে, বনু হাশিম যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ(সা.)-কে তাদের হাতে সমর্পণ না করবে এবং তাকে হত্যার অধিকার না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য গোত্রগুলো তাদের সাথে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখবেনা, বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক রাখবেনা, লেন-দেন ও মেলা-মেশা করবেনা, কোন খাদ্য এবং পানীয়ও তাদের কোছে পৌঁছাতে দেবে না। শিয়াবে আবু তালেবে এ চুক্তির কারণে বনু হাশিম গোত্র দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত প্রায় বন্দী অবস্থায় দিনাতিপাত করেছিল। ক্ষুধা ও পিপাসায় বনু হাশিম ও মুসলমানরা অমানবিক কষ্ট ভোগ করেছিল। অবশ্য পরবর্তীতে হিশাম বিন আমর, যুহাইর ইবনে উমাইয়া, মুতয়াম ইবনে আদি, আবুল বুখতারী ও যাময়া বিন আসওয়াদ প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় এ চুক্তি বাতিল করা হয়।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

অমানবিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মহানবী (সা.) মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দেন। নবুয়াতের পঞ্চম বর্ষে **১১** জন পুরুষ ও চার জন নারী উসমান ইবনে আফ্ফানের নেতৃত্বে প্রথম হিজরত করে। উসমান (রা:) এর সাথে তদীয় স্ত্রী রাসূল তনয়া রুকাইয়াও গমন করেন। এর কিছুদিন পর ৮৫ জন পুরুষ ও **১৭** জন নারীর আরেকটি দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। পৌত্তলিক কুরাইশ কাফিররা আব্দুল্লাই ইবনে রাবীয়া ও আমর ইবনুল আসকে আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর দরবারে দূত হিসেবে পাঠায়, যাতে তারা মুসলমানদের সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে।

ইসলামের প্রচার-প্রসারে কর্তব্যনিষ্ঠা এবং ত্যাগ ছিল মহানবী (সা.)-এর একমাত্র সম্বল। সত্যের মহাসেবক, কর্তব্যের মহাসাধক মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন আত্মবিশ্বাস, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ত্যাগের পূর্ণতর আদর্শ। মানুষের উপেক্ষা ও হয়রানিতে তিনি কখনো হতোদ্যম হননি, আর না তাদের ওপর ক্ষুদ্ধ হয়েছেন; বরং এতে তাঁর কাজের প্রতি আগ্রহ আরো বহু গুণ বেড়ে গেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুসলমানদের উপর কুরাইশ কাফিরদের অত্যাচারের একটি চিত্র অংকন কর।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ কে ?	মুসলমানরা প্রথম কোন দেশে হিজরত করেছিল?	কোথায় বনু হাশিমকে বন্দী করে রাখা হয় ?	প্রথম হিজরতকারী দম্পতি কোন্‌টি?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী (সা.) নবুয়াত লাভের পর মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এতে অনেকেই উসলাম গ্রহণ করে। কাফিররা তাদের বিদ্যমান কতৃত্ব ও নেতৃত্ব বিলুপ্তির আশংকায় মহানবী (সা.)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। স্বয়ং মহানবী (সা.)-সহ সাধারণ মুসলিমদের উপর নানারকম নির্যাতন শুরু হয়। সবচেয়ে লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হন সমাজের দুর্বল শ্রেনীর পেশাজীবিরা। হযরত বিলাল. খাব্বাব, আম্মার, সুমাইয়াসহ প্রথমদিককার মুসলিমরা কাফিরদের নির্যাতনে নিস্পেষিত হন। তথাপি একজন মুসলিমও ইসলাম ত্যাগ করেননি। দৃঢ় মনোবল, মজবুত ঈমান ও অক্লান্ত ত্যাগের বিনিময়ে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা ইসলামের প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কুরাইশদরে অত্যাচার থেকে শিষ্যদের বাঁচানোর জন্য রাসূল (সা.) প্রথম রাজনৈতিক আশ্রয়ের হিজরত করতে বলেন-
(ক) আবিসিনিয়ায় (খ) সিরিয়ায়
(গ) জেরুজালেম (ঘ) মদিনায়

২। নাজাশী কোন্ দেশের বাদশাহ ছিলেন?
(ক) সিরিয়া (খ) মিসর
(গ) ইয়েমেন (ঘ) আবিসিনিয়া

৩। "আমুল হুযন" অর্থ কী?
(ক) দুঃখের বছর (খ) অশান্তি
(গ) দুঃসময় (ঘ) অসুস্থতাকাল

৪। কুরাইশরা মহানবি (সা.) ও তার পরিবারের সদস্যদেরকে তিন বছর পর্যন্ত কোথায় বন্দি অবস্থায় রেখেছিল।
(ক) শিয়াবে আব্দুল মুত্তালিব (খ) শিয়া উপত্যকা
(গ) শিয়াবে আবু তালিব (ঘ) তায়েফ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

কাজী এম ফজলুল কারীম সমাজের লোকদের দ্বীনের পথে চলার পরামর্শ দেন। প্রভাবশালীদের মহল তার এ দাওয়াতকে ভালো চোখে দেখেনি। তারা তার শত্রু হলো। এক পর্যায়ে সমাজপতিরা কাজীর পরিবারের সকল লোককে একঘরে করে রাখলেন। তারা হাট-বাজার থেকে কোনো খাদ্য সামগ্রী কিনতে পারতো না। ফলে সেখানে তারা অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতে লাগলো।

(ক) মহানবী (সা.) কত বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করেছিলেন? ১
(খ) তায়েফবাসীদের বিরোধিতার অন্যতম একটি কারণ- ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) ফজলুল কারীম সাহেবের ঘটনা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) ফজলুল কারীম সাহেবের পরিণতি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

পাঠ-৩.৫ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মিরাজ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.)-এর মিরাজের ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- মিরাজের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মিরাজ, রজব মাস, মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা**

মিরাজুন্নবী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার ইচ্ছায় দ্বীনের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সারওয়ারে কায়িনাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) মর্ত্যজগৎ রেখে অসীম স্বর্গজগৎ, সাত আসমান, বায়তুল মামুরসহ সৃষ্টি রহস্য অবলোকন ও উপলব্ধি এবং বেহেশত, দোযখ পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত যানে আরোহিত হয়ে সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং বান্দার জন্য অশেষ নেয়ামতসহ একাধিক ফরমান মর্ত্যের ধরায় নিয়ে ফিরে আসেন। বিশ্ব মানবকুলকে অবাক করে নবীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে সক্ষম, সিরাতে রাসূল (সা.)-এর এ মহান ঘটনাকে মিরাজুন্নবী (সা.) বলে অভিহিত করা হয়।

মিরাজ সংঘটিত হওয়ার সময়

নবুয়তের দশম বর্ষে মহানবী (সা.)-এর ৫০ বছর বয়সে রজব মাসের ২৭ তারিখ রাতে মিরাজ অনুষ্ঠিত হয়। আবার কেউ কেউ মিরাজের সময়কাল নবুয়তের একাদশ সন বলেও উল্লেখ করেন। সূরা বনি ইসরাঈলের শুরুতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- "মহিমান্বিত সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের সামান্যতম সময়ের মধ্যে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন, যার চারদিককে আমি বরকতময় করেছি; যেন আমি তাকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাতে পারি, নিশ্চয়ই তিনি অধিক শ্রবণকারী ও অধিক জ্ঞানি।" (বনী ইসরাঈল-১) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক রাতে কাবা চত্বরে যমযম ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যখানে ঘুমিয়েছিলেন। এ সময় তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন তাঁকে ডাকছেন। জেগে দেখলেন জিবরাঈল (আ) তাঁর শিয়রে দণ্ডায়মান, অদূরে 'বুরাক' নামক এক আজব বাহন অপেক্ষা করছে।

মিরাজের ঘটনাবলি

রাসূল (স.) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৫২ বছর। তিনি কা'বা শরীফের পার্শ্বে ঘুমিয়ে ছিলেন। হযরত জিব্রাইল (আ.) হঠাৎ তাঁকে জাগিয়ে তোলেন। তারপর তাঁর কাছে একটি পশু আনা হয়, যার রং সাদা এবং উচ্চতা খচ্চরের চাইতে একটু ছোট। এটি আলোর গতি সম্পন্ন ছিল বলে একে 'বুরাক' নামকরণ করা হয়। বুরাক শব্দের অর্থ 'বিদ্যুৎ গতি সম্পন্ন'। মহানবী (সা.) যখন বুরাকের ওপর আরোহণ করতে গেলেন, তখন তা নিজেকে সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করে তাঁকে সওয়া হতে বাধা দেয়। কিন্তু পরে হযরত জিব্রাইল (আ.) বুরাককে কষে ধরে বলেন, সাবধান ইতঃপূর্বে মহানবী (সা.) এর চেয়ে কোনো শ্রেষ্ঠ মানুষ তোমার ওপর আরোহণ করেনি। মহানবী (সা.) তাতে আরোহণ করেন এবং হযরত জিব্রাইল (আ.) এর সাথে একসঙ্গে সফর আরম্ভ করেন।

মদিনায় তাঁরা প্রথম যাত্রা বিরতি করেন এবং সালাত আদায় করেন। জিব্রাইল (আ) বলেন, এটা আপনার হিজরতের স্থান। মক্কা ত্যাগ করে পরে আপনাকে মদিনায় আসতে হবে। দ্বিতীয় বার যাত্রা বিরতি করেন সিনাই পাহাড়ে। মুসা (আ) আল্লাহর সাথে এই পাহাড়ে কথা বলেছেন। তৃতীয় বার যাত্রাবিরতি করেন হযরত ঈসা (আ) এর জন্মস্থান পশ্চিম জেরুসালেম বেথেলহেম। বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছার পর তিনি বুরাককে মসজিদে আকসার পশ্চিম দেয়ালের সাথে বাঁধেন। সেই দেয়ালের নাম হচ্ছে হায়েত আল-বুরাক বা বুরাক দেয়াল। তাঁর আগের নবীও এই একই দেয়ালে সাওয়ারী বেঁধেছিলেন। যখন তিনি সুলাইমান (আ.)-এর তৈরি মসজিদে (আকসায়) প্রবেশ করেন। তখন পৃথিবীর শুরু থেকে ঐ পর্যন্ত প্রেরিত সকল নবীকে উপস্থিত দেখতে পান। তাঁর উপস্থিতি উপলক্ষে সবাই জামায়াতে সালাত আদায় করেন। কে

ইমামত করে তা দেখার জন্য সবাই অপেক্ষা করছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) মহানবী (সা.)-কে হাত ধরে সামনে ইমামতের জন্য এগিয়ে দেন। তিনি সবাইকে নিয়ে সালাত পড়েন।

সপ্তম আসমানে তিনি বিরাট এক প্রাসাদ এবং বায়তুল মামুর দেখতে পান। বায়তুল মামুরের চারদিকে অসংখ্য ফেরেশতা তাওয়াফ করছে। বিরাট প্রাসাদের কাছে তিনি নিজের মতো এক ব্যক্তিকে দেখতে পান। তিনি হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ)। তারপর তাঁকে আরো ওপরে নেয়া হয়। তিনি 'সিদরাতুল মুন্তাহা' নামক স্থানে পৌঁছেন। এই স্থানটিকে আল্লাহর আরশ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের মধ্যে একটি শূন্য এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। রাসূল (সা.) লক্ষ্য করলেন, তাঁর সাথে আগত ফেরেশতারা এই পর্যন্ত পৌঁছে প্রয়োজনীয় বার্তা নিয়ে আসেন। এর ওপরে যাওয়ার অনুমতি নেই। এ স্থানেই রাসূল (সা.)-কে নেক লোকদের উদ্দেশ্যে তৈরি বেহেশত ও প্রতিশ্রুত পুরস্কার দেখানো হয়। ঐ বেহেশতী নেয়ামত সম্পর্কে ইতঃপূর্বে কেউ কানে শুনেনি এবং চোখেও দেখেনি। এ স্থানেই হযরত জিবরাঈল (আ) থেকে গেলেন। এবার রাসূল (সা.) একাকীই সামনে অগ্রসর হওয়ার পালা। যখন তিনি একটি উঁচু সমতল স্তরে পৌঁছেন তখন তিনি নিজেকে মহান আল্লাহ রাব্বুলআলামীনের দরবারে উপস্থিত দেখতে পান। তাঁকে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলার বিশেষ সুযোগ দেয়া হয়। এ রাতেই ৫ ওয়াক্ত সালাত বাধ্যতামূলক করা হয়।

সকাল বেলা উপস্থিত লোকদেরকে রাসূল (সা.) পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। মুখে মুখে রাসূল (সা.)-এর মিরাজের ঘটনা চারদিকে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু লোক হযরত আবু বকর সিদ্দিকের কাছে গিয়ে বিষয়টির সত্যতা জানতে চায়। তাদের আশা ছিল হযরত আবু বকর (রা:) যদি তা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ইসলামী আন্দোলন মক্কা থেকে সমূলে উৎপাটিত হবে। হযরত আবু বকর (রা:) পুরো ঘটনা শোনার পর মন্তব্য করেন, যদি রাসূল (সা.) বলে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই সত্য হবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমি প্রতিদিনই তাঁর কাছে ফেরেশতার আগমন ও আল্লাহর বার্তা নাযিলের খবর শুনি এবং তা বিশ্বাস করি। সে দিনই হযরত আবু বকর (রা:) 'সিদ্দীক' (সত্যবাদী) খেতাবে ভূষিত হন।

কাফিরদের প্রতিক্রিয়া

এ ঘটনা প্রকাশ হলে কাফিররা তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে অভিহিত করে। তাদের মধ্যে থেকে যারা বায়তুল মাকদাস ভ্রমণ করেছিল তারা পরীক্ষামূলক অনেক প্রশ্ন করে, মহানবী (সা.) ঠিক ঠিকভাবে সে সব প্রশ্নের জবাব দেন। তখন তারা আবার প্রশ্ন করল, পথে আমাদের বাণিজ্য বহর রয়েছে তা কোথায়, কখন আসবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কাফিরদের এ প্রশ্নেরও সঠিক জবাব দেন, কিন্তু এরপরও তাদের রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রবণতা কমেনি।

মিরাজ কী সশরীরে অনুষ্ঠিত হয়

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, মিরাজ শারীরিকভাবে ঘটেছিল। পক্ষান্তরে কারো কারো মতে, এ উপলব্ধি আধ্যাত্মিকভাবে ঘটেছিল। কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ মিরাজ বা নভোভ্রমণ শারীরিকভাবেই ঘটেছিল। তিনি সচেতন অবস্থায় সশরীরই আকাশ ভ্রমণ করেছিলেন।

গুরুত্বের বিচারে মিরাজ

মিরাজ শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়াতী যিন্দেগির এক আত্মোপলব্ধি। কেবল সীমার মধ্যে বসে আমরা যেমন অসীমকে সত্য করে চিনতে পারি না, শুধু অসীমের মধ্যে থেকেও সেরূপ সসীমকে চেনা যায় না। স্রষ্টাকে চেনার জন্য তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সৃষ্টিতে আসতে হয়েছিল; আবার সৃষ্টিকে চেনার জন্য তাঁকে স্রষ্টার কাছে যেতে হয়েছিল। এ জন্যই সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ হতে পেরেছিল। এটাই মিরাজের তাৎপর্য। অন্যদিকে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সমাজ, রাষ্ট্রে Secrecy ও Privacy বলতে কিছু বিষয় থাকে, যা সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয় না। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তা সংঘটিত হয়ে থাকে। মিরাজের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সেখানেই।

মিরাজের সার্থকতা বিচার

মিরাজের সার্থকতা কী? কেউ হয় তো এ প্রশ্নও করতে পারেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং পথপ্রদর্শক ও আদর্শ। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ তাকেই বলে যার পূর্ণতা সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা মিরাজ রজনীতেই সম্পন্ন হয়েছে। তিনি মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনার শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছেন। কাজেই আধ্যাত্মিক জীবনে যখন কারো আলোর প্রয়োজন হয়, তাকে বিশেষজ্ঞরূপে এ মরুভাস্করের চরণে শরণ নিতেই হয়। স্থান, কাল ও গতির ওপর মানুষের যে অপরিসীম শক্তি ও অধিকার আছে, জড় শক্তিকে সে যে আয়ত্ত করতে পারে, মানুষের মধ্যে যে বিরাট অতিমানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে, মিরাজ সে কথাই প্রমাণ করে। মহানবী (সা.)-এর হযরত ও

আহমদ নামকরণের উদ্দেশ্য এবং সার্থকতাও মিরাজের মধ্যে নিহিত। এ নাম দুটি যে চরম সত্য, তা মিরাজের রাতে প্রমাণিত হয়েছে। মিরাজ রজনীতে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পরম গৌরব দান করেন। কোনো ফেরেশতা বা কোনো নবী-রাসূল যেখানে উপনীত হতে পারেননি, মুহাম্মদ (সা.) সেখানে উপনীত হয়েছিলেন।

মিরাজ সম্পর্কে অভিযোগ এবং তা নিরসন

রাসূল (সা.)-এর স্ব-শরীরে মিরাজের ওপর কাফিররা যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো- প্রবীণ দার্শনিকরা আসমান ভেদ করে ওপরে গমণ করা অসম্ভব বলে মনে করে। পক্ষান্তরে নবীন দার্শনিকগণ আসমানের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না। অতএব, যখন আসমানের অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি, তবে দৈহিক মিরাজ কীভাবে সম্ভব? সর্বোপরি নবীন এবং প্রবীণ দার্শনিকগণ এ কথার ওপর একমত হন যে, ভূ-পৃষ্ঠের কিছুটা ওপরে শৈত্যমণ্ডল বিদ্যমান এবং প্রবীণ দার্শনিকদের মতে সেখানে অগ্নিমণ্ডল অবস্থিত। কোনো স্থূলকায় বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এ দু'টি স্থান নিরাপদে অতিক্রম করতে পার সম্ভব নয়। অতএব, নবী করীম (সা.)-এর স্ব-শরীর মিরাজ গমণের কথা বিবেক বিরুদ্ধ।

বাস্তব কথা হচ্ছে, এসব নিছক ধারণা মাত্র। জ্ঞান ও যুক্তির প্রেক্ষিতে এটা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। সকল তাওহীদবাদী ধর্মে আসমান ভেদ করে নবীদের জন্য আল্লাহর হুকুমে সহজ করা হয়েছে। ইহুদিদের মতে আম্বিয়ায়ে কিরামের স্ব-শরীর জীবিত অবস্থায় আসমানে অবস্থান করা এবং খ্রিস্টানদের নিকট হযরত ঈসা (আ)-এর জীবিত অবস্থায় আসমানে গমণপূর্বক তথায় অবস্থান করা এবং শেষ যামানায় আসমান থেকে অবতরণ করা স্বীকৃত।

মিরাজের শিক্ষাঃ

আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব মানা

মিরাজের প্রধান শিক্ষা হলো আল্লাহ রাব্বুলআলামীনের একত্ব ও সার্বভৌমত্ব এর স্বীকৃতি। সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থায়িত্ব, সংরক্ষণ, ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতি একমাত্র আল্লাহর দান। যিনি অসীম জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী, যাঁর ইচ্ছা ও আদেশ নিরঙ্কুশভাবে (absolutely) আসমান ও যমীনের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর মধ্যে সক্রিয় রয়েছে, যার হাতে রয়েছে জীবিকার চাবিকাঠি, জীবন-মৃত্যুর রশি এবং যিনি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। মানুষের আনুগত্য, দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য; এ ক্ষেত্রে অন্য কারো ইবাদত না করা, তার সাথে কাউকে শরীক না করা, অন্যকারো সার্বভৌমত্ব না মানা। মূলতঃ এ হচ্ছে মিরাজের প্রধান ও প্রথম শিক্ষা। এ শিক্ষাকেই কুরআনের সূরা বনী ইসরাইলে এভাবে বলা হয়েছে- তোমার রবের সিদ্ধান্ত যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব, আনুগত্য ও উপাসনা করবে না। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-২৩১)

পিতামাতার অধিকার সংক্রান্ত

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মৌল ইউনিট হলো পরিবার। তাই মিরাজের দ্বিতীয় শিক্ষায় তামাদ্দুনিক বিষয়ে পারিবারিক ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সূরা বনী ইসরাইলে বলা হয়েছে-"পিতামাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন অথবা দুজনই বৃদ্ধ অবস্থায় বেঁচে থাকেন, তবে তাদের সঙ্গে 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত করবে না। তাদের তুচ্ছজ্ঞান করবে না, তাদের সঙ্গে মিষ্ট ভাষায় কথা বলবে।" (সূরা বনি ইসরাঈল-২৩)

প্রথম আদেশ : পিতামাতাকে 'উহ্' বলা যাবে না।
দ্বিতীয় আদেশ: ধমক দেয়া, এটা যে কষ্টের কারণ আহা বলাই বাহুল্য।
তৃতীয় আদেশ: তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে নম্রস্বরে কথা বলতে হবে।
চতুর্থ আদেশ: পিতামাতার সাথে নম্র ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয় এবং আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে হতে পারে।
পঞ্চম আদেশ: তাঁদের প্রতি ভালো ব্যবহারের সাথে সাথে তাদের জন্য দোয়া করারও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- "হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"

ধনী-গরীবের পারস্পরিক সম্পর্ক

মিরাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে, সমাজে যারা বিত্তহীন, বাস্তুহারা, মযলুম, বৃষ্টিতে ভিজে রোদে পুড়ে, কোথাও মাথা গোজার জায়গা নেই, অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এদের সম্পর্ক বিত্তবানদে কর্তব্য সাহায্য ও সহযোগিতা করা। এ সম্পর্কে সূরা বলা হয়েছে- "আপন আত্মীয়-স্বজনদের পাওনা বুঝে দাও এবং মিসকীন ও পথিকদের হক বুঝিয়ে দাও। (সূরা বনী ইসরাইল-২৬)

মিতব্যয়িতা

মিরাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে- মানুষকে মিতব্যয়ী হতে হবে, যেন সে নিজের ব্যয়বাহুল্য দ্বারা নিজের ও অপরের সর্বনাশ ডেকে না আনে, কার্পণ্য করে সম্পদের পাহাড় তৈরি করাও যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন- "তোমরা হাতকে না একেবারে ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে ফেলবে, আর না একেবারে খুলে দেবে (কৃপণও হয়ো না এবং অমিতব্যয়ীও হয়ো না) জেনে রেখো তা করলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।" (সূরা বনী ইসরাইল-২৯)

দারিদ্র্যের জন্য সন্তান হত্যা

মিরাজের অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে দারিদ্র্যের ভয়ে, খাদ্যাভাব ও সাংসারিক অভাব-অনটনের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা না করা। বর্তমান বংশধরদের জীবিকার ব্যবস্থাপনা আল্লাহ যেভাবে করছেন, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্যও ঠিক তেমনি করবেন। এ প্রসঙ্গে সূরা আল্লাহ বলেন-"তোমরা অভাবের তাড়নায় স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তাদের ও তোমাদের জীবিকা দান করে থাকি।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩১)

ব্যভিচার ও অশ্লীলতা বর্জন করা

মিরাজের প্রধান শিক্ষা হচ্ছে উন্নত ও নৈতিক চরিত্রবান হওয়া, ব্যভিচার অত্যন্ত গর্হিত কাজ, তাই ব্যভিচার থেকে নিজে বিরত থাকতে হবে এবং সমাজ থেকে এটিকে মূলোৎপাটন করতে হবে। যৌন উত্তেজক সকল প্রকার সম্ভাব্য পথ ও উপায় উপাদান বিলুপ্ত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সূরা বনী ইসরাইলে আল্লাহ বলেন-"এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, অবশ্যই তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩২)

অন্যায়ভাবে হত্যা বন্ধকরণ

মানুষের জীবন আল্লাহর নিকট অত্যন্ত পবিত্র। তাই অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা হারাম। তাই, শুধু আল্লাহ প্রদেয় নির্দিষ্ট বিধান ব্যতিরেকে অন্য কোনো কারণে রক্তপাত করা চলবে না। আল্লাহ বলেন- "তোমরা ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করবে না এবং যে কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি তার উত্তরাধিকারীকে অধিকার দিয়েছি। যেন তারা হত্যা সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম না করে।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩৩)

এতিম-অসহায়দের সম্পদ ভক্ষণ

এতিমের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রাপ্ত বয়স্ক মুমিনদের কর্তব্য। যতদিন পর্যন্ত না তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। ততদিন তাদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার দিকে বিশেষ নযর দিতে হবে। আল্লাহ বলেন-"এতিমের মাল ভক্ষণ ও স্পর্শ করো না। একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩৪)

ওয়াদা পালন করা

আজকের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কূটনীতির নামে যে ভণ্ডামী চলে মিরাজের এ শিক্ষার মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ মানুষকে তার প্রতিটি অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির জন্য একদিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-"এবং অঙ্গীকারপূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩৪)

ব্যবসা নীতি

মিরাজের এ শিক্ষা ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন ও পণ্য-ক্রয়-বিক্রয়কালে সঠিকভাবে ওজন করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিমাপ যন্ত্রও নির্ভুল হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-"মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম, এর পরিমাণ শুভ।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩৫)

অহংকার বর্জন করা

মিরাজের সর্বশেষ শিক্ষা হচ্ছে মানুষকে গর্ব, অহংকার সহকারে চলাফেরা করা চলবে না। কারণ তার অহংকার না পারবে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে, আর না পারবে আসমানকে অতিক্রম করতে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-"পৃথিবীতে অহংকার ও

দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই তুমিতো ভূপৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না।"

শিক্ষার্থীর কাজ	**মিরাজের পরিচিতি তুলে ধরুন।**

'মিরাজ' কী?	মিরাজের রাত্রিতে মহানবী (সা.) কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ লাভ করেন?	আল-কুরআনের কোন্ সূরায় মিরাজের আলোচনা এসেছে?	মিরাজে মহাবী (সা.) কয়জন নবীর সাথে সাক্ষাত করেন?

সারসংক্ষেপ :

আল্লাহ তায়ালা তদীয় রাসূলকে তার অলৌকিক নিদর্শনাদী প্রদর্শনের জন্য পৃথিবীর সীমারেখা থেকে আরশে আযিমের কাছে নিয়ে যান। তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নামসহ বিশাল সৃষ্টিজগতের কুদরত দেখানোর মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে চলমান কষ্ট-মুসিবতকে পায়ে মাড়িয়ে আল্লাহর হুকুমের উপর অবিচল থাকার প্রেরণা দান করেন। মিরাজের ঘটনার পর পরই হিজরতের মাধ্যমে তার বাস্তব পর্যবেক্ষণ উদ্ভাসিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হযরত আবুবকর (রা:)-কে সিদ্দীক উপাধি দেয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি-

(ক) মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন (খ) ভণ্ড নবীদের দমন করেন

(সা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের দমন করেন (ঘ) মিরাজের ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন

২। নবুয়াতের কোন সালে মিরাজ সংঘটিত হয়?

(ক) দশম (খ) দ্বাদশ

(গ) একাদশ (ঘ) ত্রয়োদশ

৩। মিরাজের রাত্রে মহানবী মক্কা থেকে কোন শহরে গমন করেছিলেন?

(ক) মদীনায় (খ) তায়েফ

(গ) কূফা (ঘ) ফিলিস্তিন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রফেসর হায়দার একদিন শিক্ষার্থীদের এক অলৌকিক ঘটনার বিবরণ দেন। মধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাপারে বিজ্ঞানের স্পষ্ট ধারণার অনেক আগেই একজন মহামানব পৃথিবী ও সৌরজগতের সীমা ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। অনেকেই এ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু তাঁর অলৌকিক এ ভ্রমন বিষয়ে সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের অনেকের নানা প্রশ্নের জবাব তিনি তাৎক্ষণিক প্রদান করেছিলেন। বিজ্ঞানের আধূনিক আবিস্কারের কারণে তাঁর সেই ভ্রমণ বাস্তব সম্মতই মনে হয়।

(ক) মিরাজ অর্থ কী? ১

(খ) কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিরাজের ঘটনা সংগঠিত হয়? ২

(গ) উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করুন। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের শেষ লাইন দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে। আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৩.৬ মুহাম্মদ (সা.)-এর মদীনায় হিজরত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- হিজরতের ঘটনাবলী ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- সর্বোপরি মুসলিম জীবন ও সমাজে হিজরতের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	**হিজরত, আকাবার শপথ, দারুন নাদওয়া, 'সওর' পাহাড়, সুরাকা ইবনে মালেক, সহল ও সুহাইল**

মদীনাবাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার

হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন কুরাইশদের নিকট ইসলামপ্রচার করে নিরাশ হলেন তখন তিনি আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। হজ্জের সময় আরবের বিভিন্ন গোত্র হতে মক্কায় হজ্জের উদ্দেশ্যে এবং বাণিজ্যের জন্যে যারা আসত তিনি তাদের কাছে গমন করে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। সে সময় মদিনায় আরবের দুটি বিখ্যাত গোত্র আউস ও খাজরাজ বসবাস করতো। তাদের আদিবাস ছিল ইয়েমেনে। আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছিল। আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা শেষ নবীর আগমনের কথা জানত এবং তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তারা একজন নেতাও সন্ধান করছিল। তারা মদিনার ইহুদিদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিল যে, শেষ নবীর আবির্ভাবের সময় সমাগত।

বাইয়াতে আকাবা

আকাবার শপথ বা বাইয়াতে আকাবা ইসলামের ইতিহাসে তথা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা। রাসূল (সা.) এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা যখন বিরূপ, অধিকাংশ কুরাইশ যখন তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ, সহযোগিতার সকল পথ রুদ্ধ, ঠিক তখন বাইয়াতে আকাবার সূত্র ধরে রাসূল (সা.) ইসলাম প্রচারের এক অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পেলেন। মক্কার অদূরে আকাবা নামক উপত্যকায় এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এজন্যে একে 'আকাবার শপথ' বলে।

১. নবুয়তের দশম বর্ষে হজ্জের দিনগুলোতে মক্কা থেকে একটু দূরে আকাবা নামক স্থানে (বর্তমানে যেখানে 'মসজিদে আকাবা' অবস্থিত) ছয় জন লোক বসে কথাবার্তা বলছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন, তারা ইয়াসরিববাসী (মদিনা) খাযরাজ বংশীয় লোক। হজ্জের মৌসুমে তারা মক্কায় এসে শুনতে পেল, মুহাম্মদ নামে এক কুরাইশ নবুয়তপ্রাপ্ত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের ইসলামের শিক্ষা ও সত্যতার কথা বুঝিয়ে দিলেন। অবশেষে কুরআনের কতকগুলো আয়াত পাঠ করে তাদের আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় আর বলে, দেখ, ইহুদিরা যেন আমাদের আগেই ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিষিক্ত না হয়। একথা বলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এটাই আকাবার প্রথম বায়াত বা শপথ।

২. নবুয়তের একাদশ বর্ষে হজ্জের সময় মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের বারো জন লোক মহানবী (সা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামের বায়াত গ্রহণ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার সময় তাঁদের আবেদন অনুযায়ী দ্বীনি আহকাম শিক্ষা দেয়ার জন্য মহানবী (সা.) আমর ইবনে মাকতুম এবং মুসয়াব (রা:) কে তাদের সাথে প্রেরণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে একে দ্বিতীয় বায়াতে আকাবা বা আকাবার দ্বিতীয় শপথ বলা হয়।

৩. প্রথম ও দ্বিতীয় বায়াতে আকাবায় যেসব মুমিন শপথ নিয়ে মদীনায় গিয়ে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন, মুসয়াব (রা:) তাঁদের নেতা ছিলেন। সে বছর মুসয়াব (রা:) এর হাতে বহু লোক মুসলমান হন। তাঁদের মধ্যে ওসায়েদ ইবনে হোযায়ের এবং সাদ ইবনে মুয়াযও ছিলেন। এ দু'ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কারণে বনী আব্দুল আশহালের (আমর ইবনে সাবিত ছাড়া) সকল নরনারী মুসলমান হয়ে গেলেন। এভাবে মদীনায় দ্রুতগতিতে ইসলাম বিস্তৃত হতে থাকে। সে বছর মদিনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুখ্যাতি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষে হজ্জ কাফেলা বর্ধিত হারে মক্কাভিমুখে রওয়ানা করেছিল। এহজ্জ কাফিলায় আনসার মুসলিম এবং কাফিরদের বিরাট দল অংশগ্রহণ করে। এবার ৭৩

জন নারী পুরুষ মক্কায় এসে এক সাথে মহানবী (সা.) এর হাতে আকাবা নামক স্থানে তৃতীয়বারের মতো ওয়াদাবদ্ধ হয়ে নিম্নোক্ত বিষয়ে শপথ গ্রহণ করে:

১. আমরা এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করব, তাঁকে ব্যতীত আর কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে আল্লাহ বলে স্বীকার করব না, কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করব না।
২. আমরা চুরি, ডাকাতি করব না।
৩. আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হব না।
৪. কোনো অবস্থায়ই আমরা সন্তান হত্যা বা বলিদান করব না।
৫. আমরা কারো প্রতি মিথ্যারোপ করব না, কারে প্রতি অপবাদ আরোপ করব না।
৬. আমরা প্রত্যেক সৎকর্মে আল্লাহর রাসূলের অনুগত থাকব, কোনো ন্যায় কাজে তাঁর অবাধ্য হব না।

আকাবার শপথের গুরুত্ব

রাসূলের জীবনের একমাত্র মিশন ছিল ইসলামকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ভিত মূলত রচিত হয়েছিল আকাবার শপথের মধ্য দিয়ে। নিম্নে এর গুরুত্বের কিছু দিক তুলে ধরা হলো-

ক. আকাবার শপথের প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) মদিনায় ইসলাম প্রচারক প্রেরণ করেন। রাসূল (সা.) এর পাঠানো প্রতিনিধির ভূমিকায় মদিনায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে।

খ. মক্কার নির্যাতিত মুসলিম সমাজের জন্য নিরাপদ একটি আশ্রয় গড়ে ওঠে। আকাবার শপথের মাধ্যমে মদিনাবাসীরা মুসলমানদের সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। ফলে নির্যাতনের সম্মুখীন মুসলমানরা নিরাপদ আশ্রয়স্থল রূপে মদিনাকে গ্রহণ করে।

গ. নবুয়াত প্রাপ্তির পর মুহাম্মদ (সা.) নিরাপদে ইসলাম প্রচারের সুযোগ পাননি। আকাবার শপথের মাধ্যমে নিরাপদে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। মদিনাকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী সময়ে ইসলাম বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল।

ঘ. আকাবা ছিল রাসূল (সা.) কর্তৃক মদিনায় হিজরতের ভূমিকা স্বরূপ। এ শপথে অংশগ্রহণকারী রাসূল (সা.) কে মদিনায় আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁর সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এদিকে মক্কাবাসীদের নির্যাতন বৃদ্ধি পেলে রাসূল (সা.) মদিনাবাসীদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে হিজরত করেন।

কুরাইশদের ষড়যন্ত্র সভা : মক্কার কাফিররা মুসলমানদের সার্বিক বিরোধিতা ও ক্ষতি সাধনের নিমিত্তে সুচিন্তিত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কাফিররা যখন দেখল, মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসারীরা নিজ নিজ ধন সম্পদ, যুদ্ধসম্ভার, সন্তান সন্ততি নিয়ে মদীনায় চলে যাচ্ছে, তাদের সাথে মদিনার প্রভাবশালী আওস ও খাযরাজ গোত্র রয়েছে, তখন তাদের মনে ভবিষ্যতের জন্য ভীতির সৃষ্টি হয়। উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য কুরাইশ অকুরাইশ সকল গোত্রের লোকদের এক সভায় আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। একমাত্র কুরাইশদের আবদে মানাফ [রাসূলুল্লাহ (সা.) এর] বংশকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। কুরাইশদের এ ষড়যন্ত্রের কথা কুরআনে উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে- হে মুহাম্মদ (সা.), সে ঘোর বিপদের কথা স্মরণ কর, যখন কাফিররা তোমাকে বন্দি করে রাখবে, হত্যা করবে কিংবা তোমাকে (দেশ থেকে) বের করে দেবে- এ নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিল (আনফাল, রুকু ৪)

তখন আবু জাহল প্রস্তাব করল, আমার মতে তাকে অবিলম্বে হত্যা করে ফেলাই দরকার, তবে একা একজনকে হত্যা করলে মুত্তালিব ও হাশিম (আবদে মানাফ) বংশের লোকেরা হত্যাকারী বা তার গোত্রের ওপর চড়াও হয়ে প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ নাশ করার জেদ ধরবে। সেজন্য আমার মত হচ্ছে, আমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন যুবক তরবারি নিয়ে মুহাম্মদকে অনুসরণ করুক এবং সুযোগ পেলে একসঙ্গে আঘাত করে হত্যা করে ফেলুক। এ অবস্থায় আমাদের মধ্যে কোনো গোত্রই দল ছাড়া হতে পারবে না। পক্ষান্তরে, মুহাম্মদের গোত্র আমাদের সকলের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না। শোণিতপণ (দিয়াত) যদি দিতেই হয়, তবে আমরা ভাগ-বাটোয়ারা করে দেব। এ প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।

মুহাম্মদ (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র

রাসূল (সা.) তাদের এ ষড়যন্ত্র জানতে পেরে আল্লাহর নির্দেশে আবু বকর (রা:) কে সাথে নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যে রাতে কাফিররা রাসূলের বাসভবন ঘেরাও করেছিল, সে রাতেই তাদের অলক্ষে নিজের বিছানায় হযরত আলী (রা:) কে শুইয়ে রেখে বের হয়ে পড়েন। মক্কা হতে মদিনার দূরত্ব ছিল প্রায় ২০০ মাইল। রাসূল (সা.) ঐ রাতেই বেশি দূর যাওয়া নিরাপদ মনে করলেন না, তাই তারা তিন দিন তিন রাত মক্কার অদূরে 'সওর' নামক পাহাড়ের একটি নির্জন গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন। আবু জাহলের নেতৃত্বে আক্রমণকারীরা হযরতকে গৃহে না পেয়ে তাঁর পেছনে ছুটলেন।

কিন্তু তারা কোথাও তাঁকে পেলেন না। হযরত তিন দিন উক্ত গুহায় অবস্থানের পর চতুর্থ দিনে সেখান থেকে বের হয়ে কাফিরদের গতিবিধি লক্ষ্য রেখে অতি সাবধানে ভিন্ন পথে মদিনার দিকে চলতে থাকেন।

যাত্রাপথে প্রিয় জন্মভূমির পানে তাকিয়ে অশ্রুসজল নয়নে গভীর মমতায় তিনি বললেন, 'মক্কা! আমার প্রিয় জন্মভূমি মক্কা! আমি তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমাকে তোমার কোলে থাকতে দিল না। বাধ্য হয়ে তোমায় ছেড়ে চললাম। বিদায়!" এদিকে কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে না পেয়ে ঘোষণা দিল, 'মুহাম্মদ বা আবু বকরকে যে ব্যক্তি বন্দি করে আনতে পারবে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে।" পুরস্কারের আশায় তাঁদেরকে ধরার জন্য অনেকেই তাঁদের পেছনে ছুটল। হযরত পথের মধ্যে বেশ কয়েকজনের থেকে বড় ধরনের বাধার মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁরা ৬২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর (১২ রবিউল আউয়াল) সোমবার মদিনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে এসে পৌঁছেন। এর তিন দিনের মধ্যেই হযরত আলী (রা:) ও কুবায় এসে তাঁদের সাথে মিলিত হন। হযরত কুবায় ৪দিন অবস্থান করেন। তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। নবুওয়াতের পর রাসূলের হাতে নির্মিত এটাই প্রথম মসজিদ। তিন দিন পর শুক্রবার মদিনায় গিয়ে উপস্থিত হন। মদিনাবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁকে বিপুল উৎসাহে সাদরে গ্রহণ করেন।

মদিনায় নানা গোত্র নানা দল। সবাই প্রিয়নবীকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করে সৌভাগ্যবান হতে চাইল। হযরত ঘোষণা করলেন, আমার উট যেখানে গিয়ে থেমে যাবে, সেখানেই আমি অবস্থান করব। দেখা গেল রাসূলের বহনকারী কাসোয়া নামক উটটি বনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লায় এসে এতিম দু'সহোদর সহল ও সুহাইলের জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। হযরত জায়গাটি কিনে সেখানে মসজিদের নববী নির্মাণ করলেন। আর তৎসংলগ্ন আবু আইয়ুব আনসারীর বাসভবনে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। নবুওয়তের ১৩তম বছরে হিজরতের ঘটনা ঘটে। সে সময় মহানবী (সা.) এর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। মক্কা থেকে মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর এ সুপরিকল্পিত প্রস্থানকে ইতিহাসে হিজরত বলা হয়। তাঁর এ হিজরতকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৭ বছর পর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা:) চান্দ্র বছরের প্রথম মাস মহররমের প্রথম দিন (১৬ জুলাই) থেকে হিজরি সনের প্রবর্তন করেন।

হিজরতের কারণ

আল কুরআনের বিবরণে দেখা যায় যে, বিশ্ব ইতিহাসের বেশির ভাগ নবী-রাসূলগণই নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের পথ কাঁটায় ভরা; ফুল বিছানো নয়। রজনী যতই গভীর হয়, সোনালী ঊষার আবির্ভাব ততই নিকটবর্তী হয়। তাই আমরা দেখতে পাই, মক্কায় খোদাদ্রোহী শক্তির আঘাত যখন চরমে ওঠে তখন সত্যপন্থিরা মাতৃভূমির হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। হিজরতের মাধ্যমে ইসলামের মোড় ঘুরে যায়। তাই ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন- Hijrat is the greatest turning point in the history of Islam. এ হিজরতের মধ্য দিয়ে রাসূল (সা.) রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক পি কে হিট্টি এ প্রসঙ্গে বলেন, The seer in him now recedes into the background and the practical man of politics comes to the fore.

ক. মনস্তাত্ত্বিক কারণ

সর্বকালেই আম্বিয়ায়ে কিরাম, সংস্কারবাদী মনীষী ও মহামানবগণ জন্মভূমিতে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। আল্লাহর নবী রাসূলদের ক্ষেত্রে যেমন এ রীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি, তেমনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষেত্রেও এ রীতির ব্যতিক্রম হয়নি।

বদ্ধমূল ধারণায় আঘাত : চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠান, মূর্তিপুজা ও পূর্বপুরুষদের ধর্ম বর্জন করে আল্লাহর একত্ববাদের আহবান মক্কার কাফিরদের সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আপসহীন তাওহীদের ঘোষণা জড়বাদী কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুরাইশদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হানে। এজন্য তাদের মন মানসিকতাই দায়ী। সর্বদা তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুশমনিতে লেগে থাকত। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর তীব্র প্রতিবাদের কারণে কাফির কুরাইশরা তাঁর ওপর রুষ্ট ছিল।

আভিজাত্য ও অহংকার : ইসলামের সাম্য ও শান্তির বাণীতে যখন রক্ষণাশীল বিধর্মী কুরাইশদের মজ্জাগত আভিজাত্য ও কৌলীন্য প্রথা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হয়, তখন তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) সুস্পষ্ট ঘোষণা করেন, 'বংশ, জন্মে বা পৌরোহিত্যের জন্য মানষ কোনো বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারে না।' এ ঘোষণা কুরাইশদের কৌলীন্য

প্রথার ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ফলে কুরাইশরা ইসলাম ও ইসলামের বাণীবাহক রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নির্মূল করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করে।

স্বার্থবাদী সংঘাত : কুরাইশদের ইসলাম ও ইসলামের নবীকে মেনে না নেয়ার আরো একটি প্রকট কারণ ছিলো, ইসলাম নির্মল, নিষ্কলুষ, সরল ও জীবনযাপনের প্রেরণা যোগায়। আর ইসলামের সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের আহবান মক্কার রুক্ষ এবং মরুর দুরন্ত সন্তানদের পাশবিক লালসা, পাপাচার, নারী নির্যাতন, ব্যভিচার, কুসীদ প্রথা, মদ্যপান, জুয়াখেলা, নরবলি প্রভৃতির মূলে কুঠারাঘাত করে। এতে তারা ইসলাম, ইসলামের নবী ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম হিংস্র রূপ ধারণ করে। হিজরতের পেছনে এটাও একটা শক্তিশালী কারণ।

আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের আমন্ত্রণ : মহানবীর আগমনের পূর্ব সময়ে মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় জঘন্য অর্ন্তদ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এ সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী 'বুয়াস যুদ্ধ' কয়েক যুগ ধরে চলছিল তাতে কোনো সম্প্রদায়ই লাভবান হয়নি। এ অবস্থায় কলহরত আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যস্থতা এবং শান্তি স্থাপন করতে মদিনার বাসিন্দারা একজন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের অনুসন্ধান করছিল। তাই তারা রাসূল (সা.)-কে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত গুণাবলিসম্পন্ন বলে জানতে পেয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়।

রক্তের টান : মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় দিক দিয়েই মদিনাবাসীগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সহৃদয় ও আন্তরিক ছিল। তাই মেহমান হয়ে সেখানে গিয়ে দাওয়াতী কার্যক্রম চালানো সকল দিক দিয়ে সুবিধাজনক হবে ভেবে রাসূল (সা.) তথায় হিজরত করেন।

মুসয়াবের দাওয়াতী কার্যক্রম : ইসলামের দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরতের এক বছর পূর্বে হযরত মুসয়াবকে ইয়াসরিবে প্রেরণ করেছিলেন। মুসয়াবের প্রচারণায় নবী করীম (সা.) সম্পর্কে তথাকার অধিবাসীদের ভালো ধারণা জন্মে। তিনি গেলে ইসলামের প্রচারকার্য আরো বেশি হবে ভেবে তিনি মদিনা যেতে আগ্রহী হন।

খ. বাহ্যিক কারণ : হিজরতের কিছু বাহ্যিক কারণও ছিল, তা নিম্নরূপ-

কুরাইশদের অত্যাচার : আবু তালিব ও খাদিজা (রা:)-এর মৃত্যুর পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলামের সুমহান আদর্শের একান্ত অনুসারীদেরকে পূর্বেই কুরাইশদের অনেক অত্যাচার উৎপীড়ন ভোগ করতে হয়েছিল। এ অত্যাচারের ফলে তিনি সাহাবায়ে কিরামসহ মদিনায় হিজরতে বাধ্য হয়েছিলেন।

হত্যার ষড়যন্ত্র : কুরাইশরা ইসলামের অপ্রতিহত গতি প্রতিরোধ করতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হযে শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটে। আল্লাহ তায়ালা পূর্বেই রাসূল (সা.)-কে ওয়াহীর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিলে তিনি হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইতিহাসসিদ্ধ কারণ: বিশ্ব ইতিহাসের একটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হলো- Prophets are not honoured in their own lands. এ সত্যের শিকার হয়েছিলেন হযরত মুসা, ঈসা, ইউনুস, নূহ (আ)-সহ অনেক নবী রাসূল। সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ও একই পরিণতির শিকার হয়ে তাঁর দেশবাসী আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। এ কারণে তিনি হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বাণিজ্যিক কারণ : মক্কার মুসলিম ব্যবসায়ীরা মদিনার নিরাপদ অবস্থান থেকে সিরিয়ার সাথে অবাধ বাণিজ্য করে জীবিকা অর্জনে সক্ষম হবে, তাদের পরনির্ভর জীবন যাপন করতে হবে না, হিজরতের পেছনে এটাও অন্যতম কারণ।

আকাবার শপথ : ৬২০ এবং ৬২১ খ্রিস্টাব্দে আকাবার শপথের ফলে বহু মদিনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। এতে মদিনায় ইসলামের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সেখানে হিজরতের আমন্ত্রণ জানায়।

মক্কার প্রতিকূল জনমত : মহানবী (সা.) যে মিশন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, তার জন্য প্রয়োজন ছিল একদল যোগ্য লোকের, নিজের মিশন সফল করতে তিনি যাদের আনুকূল্য লাভ করবেন, কিন্তু মক্কায় আশানুরূপ এ ধরণের লোক তৈরি না হওয়ায় জনমত প্রতিকূলে প্রবাহিত হতে থাকে। এ কারণে তিনি মদিনায় হিজরতের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

হিজরতের ঘটনা

নির্দেশপ্রাপ্তি : হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হিজরতের আদেশ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরত করেন। হিজরতের আদেশ পৌঁছানোর সময় জিবরাঈল (আ) বললেন, আজ রাতে আপনি শয্যায় যাবেন না। তিনি ঠিক দুপুরে সিদ্দীকে আকবর (রা:)-কে হিজরতের সংবাদ দেন। রাতে আবু জাহল প্রমুখ কুরাইশ দুর্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর গৃহ বেষ্ট করে দাঁড়ায়। তিনি হযরত আলীকে নিজের বিছানায় চাদরে ঢেকে শুইয়ে দিয়ে কুরআনের একটি আয়াত- তেলাওয়াত করতে করতে বের হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘর ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে কাফিরদের ওপর এক মুষ্টি মাটি ছিটিয়ে দিয়ে সকলের

অলক্ষ্যে আবু বকর (রা:)-এর গৃহে চলে যান এবং তাঁকে নিয়ে মক্কার তিন মাইল দূরবর্তী সওর পর্বত গুহায় সাময়িক অবস্থান গ্রহণ করেন। যাওয়ার সময় হযরত আবু বকর (রা:)-এর পুত্র আবদুল্লাহ, কন্যা আসমা ও আয়িশাকে বলে গেলেন, তারা যেন প্রতিদিন সন্ধ্যারাতে চুপি চুপি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেয়। মহানবী (সা.) তিন দিন সওর গুহায় অবস্থান করেন। গুহার মুখে তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর নির্দেশে মাকড়সা জাল বুনে, পাখি বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে। কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসন্ধানে গুহার মুখ পর্যন্ত এসে পুরনো গুহা মনে করে ফিরে যায়।

পুরস্কার ঘোষণা : কুরাইশ বীরেরা দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করে মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসন্ধানে হন্তদন্ত হয়ে ফিরতে লাগল। কুরাইশ নেতারা ঘোষণা করল, মুহাম্মদ অথবা আবু বকরকে যে ব্যক্তি বন্দি করে আনতে পারবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। মুদলেজ গোত্রের সুরাকা ইবনে মালেক নামক এক অশ্বারোহী যুবক রাসূলুল্লাহ (সা.) (সা.)-এর সন্ধান পেয়ে সদলবলে আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়, কিন্তু কী আশ্চর্য! সুরাকা যখনই নিকটবর্তী হয়েছে, অমনি তার অশ্বের সম্মুখ পদদ্বয় ধূলিগর্ভে প্রোথিত হয়ে যায়। সে ভীত হয়ে পড়ে। অবশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করে ওয়াদা করে, সে আর রাসূলের পিছু ধাওয়া করবে না। সে তিনবার চূড়ান্ত চেষ্টা চালিয়েও রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্পর্শ করতে পারেনি।

সাদর অভ্যর্থনা : রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় শুভাগমন করছেন, পূর্বাহ্নে এ সংবাদ পেয়ে মদিনাবাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে ওঠে নগর প্রান্তরে এসে সূর্যের কিরণ প্রখর না হওয়া পর্যন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত চিত্তে মহানবী (সা.)-এর আগমন প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন। অন্যদিনের ন্যায় রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখের প্রতীক্ষার পর ঘরে ফিরছিলেন। এমন সময় জনৈক ইহুদি দুর্গের ওপর থেকে দেখতে পেল এক ছোট্ট কাফিলা মদিনা পানে অগ্রসর হচ্ছে। তার বুঝতে বাকি রইল না। তৎক্ষণাৎ সে উচ্চঃস্বরে চিৎকার করে ওঠে, মদিনাবাসী মুসলিমরা প্রস্তুত হও, তোমাদের নবী আসছেন। ইতোমধ্যে আমর ইবনে আওফ উচ্চঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি দেন। সাথে সাথে সবাই 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে লাগল। সে তাকবীরের আওয়াযে গোটা শহর মুখরিত হয়ে ওঠে এবং আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সবাই অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে বিনয় সহকারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়।

মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন : মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে যে উঁচু বসতি রয়েছে তাকে 'আলিয়া' বা কুবা বলা হয়। এখানে আনসারদের বহু পরিবার বসবাস করতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানকার আমর ইবনে আওফ গোত্রের কুলসুম ইবনে হেদাম-এর ঘরে ১৪ দিন অবস্থান করেন এবং এখানে ইসলামের প্রথম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মদিনাভিমুখে যাত্রা : ইবনে আওফ গোত্রের কুলসুম ইবনে হিদামের ঘরে ৪৪ দিন অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনাভিমুখে যাত্রা করেন। এ সময় কাসওয়া নামক উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। সে দিন ছিল শুক্রবার। পশ্চাতে ছিলেন আবু বকর (রা:)। উট সামনে এগিয়ে চলতে লাগল, ভক্তবৃন্দ তাঁর পশ্চাতে শ্রেণিবদ্ধভাবে নারায়ে তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে মিছিল সহকারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হচ্ছিল। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে তিনি বনী সালিম গোত্রের মহল্লায় উপনীত হন। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) একশ জন সাহাবী নিয়ে জুমুআর সালাত আদায় করেন। এটাই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জুমুআর সালাত।

হিজরতের সন-তারিখ : নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে হিজরত সংঘটিত হয়। সে সময় মহনবী (সা.)-এর বয়স ৫৩ বছর। সফল মাসের শেষে রবিউল আউয়ালের প্রথম দিকে সোমবার দিন তিনি মক্কা ত্যাগ করেন। সোমবার অথবা শুক্রবার ১২ রবিউল আউয়াল তিনি কুবায় পৌঁছান। সেখানে ৪ দিন অবস্থানের পর শুক্রবার মদিনা শহরের দিকে যাত্রা করেন। সে দিনই বিকেলে আবু আইউব আনসারী (রা:)-এর গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন।

হিজরতের গুরুত্ব ও ফলাফল

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরত বা মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় গমন একটি সাধারণ ঘটনা বলে মনে হলেও ইসলামের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অতুলনীয়। পি কে হিট্টির ভাষ্যমতে, হিজরতের মাধ্যমে মক্কী জীবনের অবসান এবং মাদানী জীবনের সূচনা হয়।

ধর্মীয় গুরুত্ব : হিজরতের মাধ্যমে মদিনায় ইসলাম একটি সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে সংখ্যারিষ্ঠের জীবনব্যবস্থায় এবং মদিনা মুসলমানাদের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। এ মদিনা নগরী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় ও খুলাফায়ে রাশিদার আমলে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় রাজধানী ছিল। এখানে এসে মহানবী (সা.) শুধু সম্মানিত মেহমানরুপেই সম্বর্ধিত হননি; বরং কালক্রমে তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্রেরও প্রধান হলেন। মদিনায় ইসলাম দিন দিন শক্তিশালী হতে লাগল। এতদিন পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনা স্বার্থকতায় রুপ নেয়।

রাজনৈতিক গুরুত্ব : মদিনায় হিজরতের পর ক্রমান্বয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন বাস্তববাদী বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। হিজরতের মাধ্যমে মদিনায় রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি হয়। ফলে সেখানে যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তা

ভবিষ্যত বৃহত্তর ইসলামী সমাজ গঠনে সহায়ক হয়। এ সম্বন্ধে পি কে হিট্টি বলেন, "হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দর্শন তাঁর জীবনের পটভূমিকায় স্থিতি লাভ করল, আর জেগে উঠল রাজনীতির বাস্তব জীবন।" ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হিজরতের মাধ্যমে মহানবী (সা.) আল্লাহর আদেশ পালন করেছেন।

সামাজিক গুরুত্ব : মদিনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিপুল কৃতিত্ব অর্জন করেন। সর্বপ্রকার সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করে তিনি দাস প্রথা লোপ, বিয়ে, তালাক ও উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি সামাজিক আইন-কানুন প্রবর্তন করেন। তিনি একটি নতুন সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং পারিবারিক সংগঠন নির্মাণ করেন, যা পূর্বের সকল বিধান ও সমাজ সংগঠন অপেক্ষা উন্নততর ছিল। হিজরতের মাধ্যমেই রাসূল (সা.) রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে সুপরিচিত হন এবং সমাজের সকল স্তরে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অলঙ্কৃত করেন।

যুগান্তকারী ঘটনা : মদিনায় হিজরত মহানবী (সা.)-এর জীবনের এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত। এর ফলে তাঁর সাফল্য ও বিজয়ের নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন- The Hijrat, with which the Makkan period ended and the Madinese period began, proved a turning-point in the life of Muhammad, leaving the city of his birth as a despised Prophet, he entered the city of his adoption as an honurded chief.

হিজরতের পর পরই মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় মুসলিমদের মিলনকেন্দ্র মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলাম প্রচারে সুযোগ-সুবিধা লাভ : মক্কায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কাবাসীদের অবর্ণনীয় জোর-জুলুম সহ্য করেছিলেন, কিন্তু হিজররেত ফলে তিনি তাদের নাগালের বাইরে এসে স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচার করার সুযোগ লাভ করেন। এখানে তাঁর নিজের এমনকি অনুসারীদেরও নিরাপত্তার কোনোই চিন্তা ছিল না। তাই তিনি নিশ্চিন্তে ইসলামের প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন।

রাষ্ট্র সংগঠন : মদিনায় মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম গোত্রীয় কলহ ও সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সব গোত্রের মধ্যে একতা স্থাপন করতে একটি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। কালক্রমে একে কেন্দ্র করেই বিশ্বজোড়া ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) নবপ্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান মনোনীত হন।

সনদ প্রবর্তন : মদিনায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বুঝলেন, মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে না পারলে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তাই তিনি একটি বিধিবদ্ধ সনদ প্রবর্তন করেন। এ সনদে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সযোগ-সুবিধা ও স্বার্থ নিশ্চিত করা হয়। ইতিহাসে এটি মদিনা সনদ নামে পরিচিত এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে সমাদৃত।

কলহের অবসান : মহানবী (সা.)-এর হিজরতের পর মদিনার বিবদমান সকল গোত্রের দ্বন্দ্বকলহের অবসান ঘটে। মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে আওস ও খাযরাজসহ সকল গোত্র কলহবিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলাম : মদিনায় হিজরতের ফলে ইসলাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে। দূত মারফত বিশ্বের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের নিকট মহানবী (সা.) ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সুযোগ লাভ করেন।

হিজরী সন প্রবর্তন : হিজরতকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রা:) এর শাসনামলে হিজরী সনের প্রবর্তন করা হয় যা হিজরতের ঘটনার স্মারক হিসেবে যুগ যুগ ধরে মানব জাতিকে আল্লাহর নির্দেশ পালনে ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত করবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**হিজরত সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।**

হিজরত শব্দের অথ কী?	হিজরতের সময় মহানবী (সা.)এর সফরসঙ্গী কে ছিলেন?	হিজরতের সাথে কোন গুহার নাম সম্পর্কিত?	হিজরতকে কেন্দ্র করে কোন সালের উদ্ভব হয় ?

সারসংক্ষেপ :

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আগমনের পর তাঁর নতুন জীবন শুরু হয়। তাঁর জীবনের এ অধ্যায় খুবই ঘটনা বহুল। মক্কায় থাকাকালীন সময়ে তিনি শুধু ধর্মপ্রচারকের ভূমিকায় ছিলেন। আর মদিনায় এসে তিনি রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদা লাভ করেন। ফলে ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান। ইসলামের সামাজিক ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে তিনি একাধারে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক সংস্কার, অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নতুন সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন। সাথে সাথে ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মক্কার কাফিররা কার নেতৃত্বে যুবকদেরকে দিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যাকারী দল গঠন করে?
(ক) আবু জাহল (খ) ওতবা
(গ) শায়বা (ঘ) আবু সুফিয়ান

২। আরবের দুটি বিখ্যাত গোত্র আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে ছিল-
(ক) বন্ধুত্ব (খ) মৈত্রীভাব
(গ) চরম শত্রুতা (ঘ) তুমুল যুদ্ধ

৩। মহানবী (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের মাধ্যমে দূর হয়-
i. মক্কা জীবনের লাঞ্ছনা ii. অবমাননা iii. ভয় ভীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

রসূলপুরের চৌধূরী ও পাটওয়ারী বংশের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিবাদ চলে আসছিল। বিবাদমান সিলসিলা অনুসারীদের মধ্যে কোন্দল, রেষারেষি, উগ্রভাবাবেগে সমাজ কলুষিত হয়ে পড়েছিল। এ সময় সুলাইমান শমসেরী উক্ত এলাকায় আগমন করে সকল বংশ ও অনুসারীদের মধ্যে বিভেদ-কোন্দল দূর করার লক্ষ্যে একটি শান্তি চুক্তি প্রণয়ন করেন। এতে রসূলপুরে স্থায়ী শান্তি, শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ক) মহানবী (সা.) কত সালে হিজরত করেন? ১
(খ) রাসূল (সা.) ও তাঁর পরিবারের গিরি সংকটের অবসান ঘটল কিভাবে? ২
(গ) সুলাইমান সাহেবের চুক্তিনামা ইসলামের ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) শান্তি প্রতিষ্ঠায় সুলাইমান শমসেরীর ভূমিকা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১	: ১. (ক)	২. (ক)	৩. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২	: ১. (ক)	২. (খ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩	: ১. (গ)	২. (ক)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪	: ১. (ক)	২. (ঘ)	৩. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫	: ১. (ঘ)	২. (গ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬	: ১. (ক)	২. (গ)	৩. (ঘ)

ইউনিট
৪

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মদিনা জীবন

ভূমিকা

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আগমনের পর তাঁর মাদানী জীবন শুরু হয়। তাঁর জীবনের এ অধ্যায় খুবই ঘটনাবহুল। মক্কায় থাকাকালীন সময়ে তিনি শুধু ধর্মপ্রচারকের ভূমিকায় ছিলেন। আর মদিনায় এসে তিনি রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদা লাভ করেন। ফলে ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান। ইসলামের সামাজিক ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে তিনি একাধারে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক সংস্কার, অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নতুন সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন। সাথে সাথে ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনের মাত্র দশ বছর মদিনায় অবস্থান করেছিলেন। এ সময়েই ইসলামের অধিকাংশ বিধান অবতীর্ণ হয়। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে তাঁকে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে অনেকগুলো সশস্ত্র যুদ্ধ করতে হয়েছে। তিনি ইসলামী আদর্শকে আরবের সমিান অতিক্রম করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। খুব কম সময়ের মধ্যে তিন বিশ্ব মানবতার কাছে একটি চিরন্তন কালজয়ী জীবনব্যবস্থা ও আদর্শ সমাজ কাঠামো উপহার দেন, যা ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। তাঁর জীবনের বিস্ময়কর সফলতা এখানেই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৪.১ঃ মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাথমিক কার্যাবলী
পাঠ ৪.২ঃ মদীনা সনদের গুরুত্ব
পাঠ ৪.৩ঃ বদর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল
পাঠ ৪.৪ঃ উহুদ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল
পাঠ ৪.৫ঃ খন্দকের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল
পাঠ ৪.৬ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধি
পাঠ ৪.৭ঃ মক্কা বিজয়
পাঠ ৪.৮ঃ হুনায়নের যুদ্ধ
পাঠ ৪.৯ঃ মুতার যুদ্ধ ও তাবুক অভিযান
পাঠ ৪.১০ঃ ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সম্পর্ক
পাঠ ৪.১১ঃ বিদায় হজ্জের ভাষণ ও মুহাম্মদ (সা.) এর শেষ জীবন

পাঠ-৪.১ মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাথমিক কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) এর মদীনা জীবনে প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মদীনায় বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠির পরিচয় জানতে পারবেন এবং
- মুহাজির ও আনসারদের পরিচয় সম্পর্কে সাম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ইয়াসরিব, ইহুদী, মুনাফিক, পৌত্তলিক ও 'আসহাবুস-সুফফা'**

মদিনা জীবনের প্রাথমিক কার্যাবলী

৬২২ সালের পূর্বে ইয়াসরেব নামক জনৈক আমালেকা নরপতি এ নগরী প্রতিষ্ঠা করে একে রাজধানী মনোনীত করেন। তাঁর নামানুসারে এ শহর ইয়াসরেব নামে অভিহিত হতে থাকে। মক্কা থেকে প্রায় আড়াইশ মাইল উত্তরে এ নগরী অবস্থিত। হিজরতের পর মহানবী (সা.)-এর সম্মানে ইয়াসরিববাসী এর নাম পরিবর্তন করে 'মদিনাতুন্-নবী' বা নবীর শহর' সংক্ষেপে মদিনা রাখেন।

মুহাজির ও আনসার ঃ মদিনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.)-এর সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয় মুহাজিরদের পুনর্বাসন নিয়ে। যেসব সাহাবী জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে হযরতের সঙ্গে মদিনায় চলে এসেছিলেন তাঁদেরকে 'মুহাজিরীন' বলা হয়। মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁদের অপরিসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা ছিল। তাঁরা ইসলামের জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, বিষয়-সম্পদ সব কিছু ছেড়ে এসে নিঃস্ব অবস্থায় মদিনায় আশ্রয় নেন। প্রিয় নবী (সা.) তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। প্রথমত: মদিনাবাসী আনসারদের সাথে মক্কার মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। দ্বিতীয়ত: আনসারগণ মুহাজিরদেরকে ভাই বলে গ্রহণ করেন এবং নিজেদের ধন-সম্পদে মুহাজির ভাইকে অংশ দেন।

মদিনাবাসী মুসলিমগণ মক্কা থেকে আগত উদ্বাস্তু মুহাজিরীন ভাইদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, দুঃখ দুর্দশায় সাহায্য করেছিলেন এবং মহানবী (সা.)-কে সকল অবস্থায় সাহায্য করেছিলেন। এজন্য তাঁদেরকে 'আনসার' (helpers) বা 'সাহায্যকারী' বলা হয়। এ আনসারদের সহায়তা না পেলে ইসলাম মদিনায় এবং সারা বিশ্বে হয়ত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত না। ধর্মভাইদের প্রতি এরূপ আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না।

মসজিদ নির্মাণ ঃ মহানবী (সা.) বনু নাজ্জার গোত্রের সাহল ও সুহাইল দু'জন ইয়াতিম বালকের এক খণ্ড জমি ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করেন। হযরত নিজেও নির্মাণ কার্যে অন্যান্যদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। মসজিদের দেয়াল তৈরি হয়েছিল ইট ও মাটি দিয়ে এবং ছাউনি দেয়া হয়েছিল খেজুর পাতার। এটাই 'মসজিদুন্নবী' বা নবীর মসজিদ। এখানে বসেই মহানবী (সা.) ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় সকল কাজ করতেন। কালক্রমে এটাই ইসলামের প্রধান মিলনকেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয়। এ মসজিদের সাথেই তাঁর পরিবারবর্গের বাসস্থান নির্মাণ করা হয়। সাহাবীদের মধ্যে এদেরকে 'আসহাবুস-সুফফা' বা 'চত্তরবাসী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। যাদের ঘরবাড়ি ছিল না তাদের বসবাসের জন্য মসজিদের একাংশ আলাদা করা হয়েছিল। আর এ মসজিদই পরবর্তীকালের মুসলিমদের জন্য মসজিদস্থাপনা তৈরীর অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

মদিনায় বিভিন্ন দল ও গোত্রের অবস্থা ঃ মুহাজির ও আনসার ছাড়াও মদিনায় বিভিন্ন শ্রেণির লোক বাস করতো। মদিনায় আদি অধিবাসী আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত ছিল। এদের দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে মদিনার ইহুদিরা নিজেদের স্বার্থের জন্য তাদেরকে শোষণ করতো। ইহুদিদের তিনটি শাখা ছিল। যথা- বনু কুরাইযা, বনু নাযির ও বনু কাইনুকা। বনু করাইযা ও বনু নাযীর আউস গোত্রের পক্ষে এবং বনু কাইনুকা ছিল খাযরাজ গোত্রের পক্ষে। ইহুদিদের কূটনৈতিক শত্রুতার ফলে 'বুয়াসের' ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের ফলে উভয় গোত্রের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।

তারা একজন ভালো নেতার সন্ধানে ব্যাস্ত ছিল। তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে একজন উত্তম নেতা হিসেবে পেয়ে সাদরে গ্রহণ করেন।

আদি পৌত্তলিক ঃ মদিনার আদি অধিবাসীদের মধ্যে একদল মূর্তি উপাসক পৌত্তলিকও ছিল। মহানবী (সা.)-এর আগমনে তারাও প্রথমে খুশি হয়েছিল এবং তাঁকে রক্ষা করার জন্য সংঘবদ্ধ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইসলামের শক্তির একক উত্থান ও বিকাশে পৌত্তলিকরা ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠেছিল। তবে এরা সময়ের ব্যবধানে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল।

ইহুদি ঃ মদিনার ইহুদিরা ছিল শক্তিশালী এবং স্বার্থান্ধ। তারা প্রথমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনা আগমনকে স্বাগত জানানোর জন্য মদিনাবাসীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) প্রথমে আসমানী ধর্ম হিসেবে তাদের ধর্মের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন করার জন্য তাদের কিছু রীতিনীতি গ্রহণ করেছিলেন। ইহুদিরা প্রথমে মনে করেছিল, তারা হযরতকে দলভুক্ত করতে পারবে। কিন্তু ইহুদিরা ছিল অভিশপ্ত জাতি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে সীমাহীন দুর্বৃত্ত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে সর্বশেষ বিশ্বনবী তা তারা ভালো করে জানত। তবুও চরম স্বার্থান্ধতার পরিচয় দিয়ে তারা রাসূল (সা.) ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল। ইহুদিদের মধ্যে তিনটি শাখা ছিল। যথা- বনু কুরাইযা, বনু নাযীর ও বনু কাইনুকা। এরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের ব্যবসায় চালিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

খ্রিস্টান ঃ খ্রিস্টানরা বসবাস করতো নাজরান অঞ্চলে। এদের ধর্মও বিকৃত ছিল। তবুও এরা ইহুদিদের মতো ততটা নিকৃষ্ট মানসিকতার ছিল না। মদিনার খ্রিস্টানগণও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনায় আগমনকে অন্যান্যদের সাথে স্বাগত জানায়। কিন্তু তারাও পরবর্তী সময়ে রাসূলের বিরোধিতা করে।

মুনাফিক গোষ্ঠী ঃ রাসূলের মদিনায় আগমনের পর আরো একটি নতুন উপদল সৃষ্টি হলো। এরা সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। হযরতের আগমনের পূর্বে সে মদিনার রাজ-ক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনায় আসার কারণে তার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এ মর্মজ্বালায় সে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও ইসলামের সাথে গোপন শত্রুতা শুরু করে। তার সাথে আরো অনেকে মিলিত হয়। এরা স্বার্থ হাসিল ও জনপ্রিয়তা লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু গোপনে এরা ইসলামের ভীষণ শত্রু ছিল। ইসলামের ধংসের জন্য এরা নানা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করতে থাকে। এদেরকে 'মুনাফিক' বলা হয়। এ শ্রেণির লোকগুলো প্রকাশ্য শত্রুর চেয়ে অধিকতর ভয়ানক ছিল। এরা কাফিরদের চেয়েও নিকৃষ্টতর।

বিভিন্ন বিধান প্রবর্তন ঃ দ্বিতীয় হিজরিতে রমযানের সাওম ফরয করা হয়। ঐ বছর ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের মহোৎসবও প্রবর্তিত হয়। দরিদ্র মুসলিমদের সাহায্য দানের জন্য এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। যাকাত প্রদান করা সাহেবে নেসাব ধনী মুসলিমদের জন্য ফরয বলে ঘোষিত হয়। এভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারাদি প্রবর্তনে যাকাত ব্যবস্থা চালু করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**মদীনার জনগোষ্ঠির পরিচয় বিশ্লেষণ করুন।**

আদি পৌত্তলিকরা কার ইবাদাত করত?	মদীনার ইহুদিদের প্রধান তিনটি শাখার নাম কী কী?	আনসার কারা?	মুনাফিকরা কাদের চেয়েও নিকৃষ্ট?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর স্থানীয় জনগণ তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানায়। মুহাজির ও আনসারগণ তাকে অনুসরণ করে। ইহুদিরা প্রথমদিকে মেনে নিলেও পরে ষড়যন্ত্র শুরু করে। মহানবী (সা.) মদীনার সকল জনগোষ্ঠির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি মদিনা মসজিদ নির্মাণ ও মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা এবং অ মুসলিমদের জন্য সনদ প্রণয়নের মাধ্য আন্ত:ধর্মীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মহানবী (সা.) কত খ্রিস্টাব্দে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন?
(ক) ৬১৯ (খ) ৬২০
(গ) ৬২১ (ঘ) ৬২২

২। মহানবী (সা.)-এর মদিনা জীবনের ব্যাপ্তি ছিল-
i. ৬২২-৬৩০ ii. ৬২-৬৩১ iii. ৬২২-৬৩২
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ও ii

৩। কত হিজরীতে রমজানের রোজা ফরজ হয়-
(ক) তৃতীয় (খ) দ্বিতীয়
(গ) প্রথম (ঘ) পঞ্চম

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

আফ্রিকায় এক জালিম রাজা ছিল। কেউ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পেত না। এক সময় সেখানে এক মহৎপ্রাণ ব্যাক্তির আবির্ভাব ঘটে। তিনি জনগনকে সাথে নিয়ে উক্ত জালিম রাজার সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। এতে রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের হত্যার আদেশ দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি পাশ্ববর্তী রাজ্যে গমন করেন। সে রাজ্যের জনগন তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। তিনি তার সকল বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সে রাজ্যকে একটি সমৃদ্ধশালী ও প্রজাহিতৈষী রাজ্যে পরিণত করেন।

(ক) মদীনার পূর্ব নাম কী? ১
(খ) মুনাফিকদের পরিচয় দিন। ২
(গ) উদ্দীপকের আলোকে মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন। ৩
(ঘ) 'ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণই হচ্ছে আনসার ও মুহাজিরদের সম্পর্ক' - উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.২ মদীনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে মদীনা সনদের শর্তাবলী জানতে পারবেন;
- মদীনা সনদের ঐতিহাসিক গুরুত্ত্ব উপলব্দি করতে পারবেন ও
- মদীনার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মদীনা সনদ, আনসার, মুহাজির, আউস, খাজরাজ ও ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধ**

মদিনা সনদ

মহানবী (সা.) প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করার পর সেখানে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র স্থাপন করার পরিকল্পনা করেন। মহানবী (সা.) মদিনার সংহতির চিন্তা করে সেখানকার অধিবাসীদের নিয়ে তথা পৌত্তলিক, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে এক লিখিত সনদ বা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। আর এ সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার ঘোষণা দেন। এ সনদকেই 'মদিনা সনদ' বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এ সনদের গুরুত্ব 'লীগ অব নেশন্স', বা 'জাতিসংঘ', 'চার্টার অব হিউম্যান রাইটস' বা জেনেভা কনভেনশনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। তিনি তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দ্বারা অবলোকন করলেন যে, মদিনা ও পাশবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলিমদের মধ্যে সহাবস্থান এবং সম্প্রীতি স্থাপিত না হলে একটি সুসংহত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই তিনি এ চার জাতির লোক নিয়ে একটি 'আন্তর্জাতিক সনদ' রচনা করেন। এ সনদের ৪৭ টি ধারা ছিল। এ সনদকেই 'মদিনা সনদ' বা æ**The Charter of Madina**' বলা হয়।

মদিনা সনদের ধারা বা শর্তসমূহ

আবু ওবাইদ তার *'কিতাব আল আমওয়াল'* নামক গ্রন্থে বলেন: সামাজিক নিরাপত্তা, বিচারব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় এবং বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। এ সনদ বলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনার সর্বাধিনায়ক ছিলেন। মদিনা সনদের প্রধান ধারাসমূহ নিম্নরূপ-

১. মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলিমগণ মদিনা রাষ্ট্রে সমান নাগরকি অধিকার ভোগ করবে এবং একটি জাতি (উম্মাহ) গঠন করবে।
২. সনদ অনুযায়ী মহানবী (সা.) মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং মদিনার সর্বোচ্চ বিচারলয়ের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হবেন।
৩. মদিনা রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকবে। সকল শ্রেণির লোক নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে।
৪. মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো পক্ষ মদিনার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনো ঘৃণ্য পক্ষে যোগ দিবে না।
৫. সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায়কে বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তির সাহায্যে সে বহিঃশত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
৬. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ বহিঃশত্রুর হামলার সময় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।
৭. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। এজন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে দোষী করা চলবে না।
৮. মদিনাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হলো এবং রক্তপাত, হত্যা, বলাৎকারসহ অপরাপর অপরাধমূলক কার্যকলাপ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হলো।
৯. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার পাপী ও অপরাধীকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে।
১০. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কারো মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে মহানবী (সা.) আল্লাহর বিধানানুযায়ী তার মীমাংসা করবেন।
১১. দুর্বল ও অসহায়কে সর্বোতভাবে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে।

১২. মহানবী (সা.)-এর পূর্বসম্মতি ব্যতিরেকে মদিনাবাসীগণ কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।
১৩. সনদে মক্কার কুরাইশগণকে সাধারণভাবে মদিনা রাষ্ট্রের শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়। তাদেরকে বা তাদের সাহায্যকারীদেরকে সহায়তা নিষিদ্ধ করা হয়।
১৪. সনদে বলা হয়, প্রত্যেক গোত্র সাধারণভাবে মহানবী (সা.)-এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মেনে চলবে। কিন্তু স্ব স্ব গোত্রীয় দলপতিদের গোত্রীয় প্রাধান্যও অক্ষুণ্ন থাকবে। প্রত্যেকটি গোত্র তাদের পূর্ববর্তী চুক্তিসমূহ এবং দেয় মৃত্যুপণ ও মুক্তিপণসমূহ এককভাবে প্রদান করবে। সেখানে মদিনা রাষ্ট্র কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।
১৫. সনদের শর্ত ভঙ্গকারীর ওপর আল্লাহর অভিসম্পাতের কথা বলা হয়।

মদিনা সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আরবের ইতিহাসে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুমহান উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি বা নেতা এমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেননি। শান্তি প্রতিষ্ঠার বাস্তব উদ্যোগের প্রেক্ষিতে মদিনা সনদ বিভিন্ন দিক দিয়ে বহু গুরুত্ব বহন করে। মহানবী (সা.) যে নিছক একজন ধর্মপ্রচারকই নন; বরং বিশ্ব ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক বিপ্লবী মহাপুরুষ ছিলেন, তাও এ সনদে প্রমাণিত হয়। উইলিয়াম মুইর যথার্থই বলেন- It reveals the man in his real greatness a mastermind not only of his own age but of all ages. রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মদিনা সনদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে তা সবিস্তার আলোচনা করা হলো-

প্রথম লিখিত সংবিধান

দিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত মদিনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। এর পূর্বে এরূপ কোনো মৈত্রী সংবিধান ছিল না। এটি তৎকালীন যুগেই নয়; বরং সর্বযুগে সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। ঐতিহাসিক মুইর বলে, "এ চুক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অসামান্য মাহাত্ম্য ও অপূর্ব মননশীলতার পরিচায়ক।" ড. হামিদুল্লাহ বলেন, "মোট ৪৭ টি ধারাবিশিষ্ট এ সনদ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র।"

ভ্রাতৃসংঘ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা ঃ 'মদিনা সনদ' মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসাদ্বেষ ও কলহের অবসান করে এবং বিপদে সবাই এক- এ নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে। মুসলিম ও অন্যদের সাথে সকল প্রকার পার্থক্য নিরসনে এর কার্যকারিতা ধারাগুলোর দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ঃ সে সময় আরবের মানুষদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরতের পর জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে রক্তের ভিত্তির স্থলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মদিনাবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রণীত মদিনা সনদই মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখে।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও উদারতা ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.) ধর্মীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রণীত মদিনা সনদ মুসলিম অ মুসলিম নির্বিশেষে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"- এ শর্ত দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে মহানুভবতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন তা বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

মসজিদে নববী নির্মাণ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমনের পূর্বে মদিনায় কোনো মসজিদ বা মুসলিমদের সালাত পড়ার সুনির্দিষ্ট কোনো স্থান ছিল না। তিনি মদিনায় আগমনের পর সে স্থানটিই মসজিদের জন্য ক্রয় করে দেন, যেখানে তাঁর উষ্ট্রী বসে পড়েছিল। কাঁচা ইটের প্রাচীর, খেজুর গাছের খুঁটি এবং খেজুর শাখার ছাদ দিয়ে মসজিদ নির্মিত হলো। মসজিদ সংলগ্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীদের জন্যও কক্ষ তৈরি করা হয়েছিল। এ মসজিদ নির্মাণে সাহাবীগণ কায়িক শ্রম দান করেন, যাতে মহানবী (সা.) নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ঃ সে কালের মানুষের মধ্যে গণতন্ত্রের কোনো ধারণাই ছিল না। মদিনা সনদ গোত্রপ্রথার বিলোপ সাধন করে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর সমাজ ও ধর্মীয় অনুশীলন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে। ফলে আদর্শ গণতন্ত্রের ভিত প্রোথিত হয়। ঐতিহাসিক পি.কে.হিট্টি বলেন, "মদিনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীকালে বৃহত্তর ইসলামী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।" স্বৈরাচারী শাসন অথবা শেখতন্ত্রের পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রে স্বীকৃতি লাভ করে। ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন, "মদিনা সনদের মাধ্যমে সত্যিকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সকল সদস্য একের প্রতি অন্যের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। ফলে তারা একটি নতুন সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।"

ধর্মীয় উদারতা ঃ মদিনা সনদ মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নির্বিঘ্নে যার যার ধর্ম পালনের নিশ্চিয়তা বিধান করে। মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা একে অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না- মহানবী (সা.) এ শর্ত দ্বারা যে মহানুভবতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন, তা বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। সর্বগুণে গুণান্বিত, সর্বশ্রেষ্ঠ যুগান্তকারী এ মহাপুরুষ বিশ্বে ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয়ে যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, উত্তরকালে তা বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে।

প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঃ মহানবী (সা.) তৎকালীন বিশ্বে ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয়ে যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, উত্তরকালে তা বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। পি.কে.হিট্টি যথার্থই বলেছেন, "মদিনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীকালে বিপুল বিস্তৃত ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন করে।"

মদিনায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন

ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ঃ মদিনায় মহানবী (সা.) ধনী ও গরিবের মধ্যে বৈষম্য সীমারেখা ছিন্ন করে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এক উন্নত সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। রাসূল (সা.) মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো সুদৃঢ় করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্যে পারস্পরি বন্ধুত্ব চুক্তি সম্পাদন করলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, প্রত্যেক আনসারের একজন করে মুহাজির বন্ধু থাকবে এবং প্রত্যেক মুহাজিরের একজন করে আনসার বন্ধু থাকবে। এরা একে অন্যের তত্ত্বাবধান করবে এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখে অংশ নেবে। এভাবে মুসলিমদের জন্য নিবিড় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হলো।

প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরীর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি

১. হযরত সালমান ফারেসী ইসলাম গ্রহণ ঃ এ বছর হযরত সালমান ফারেসী এবং ইহুদি ধর্মবিশারদ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মুসলিম হন। এ বছরই হযরত আবু উমামা ও আসাদ ইবনে যোরারা ইন্তেকাল করেন।

২. সালাতের বিধান পরিবর্তন ঃ সালাত নবুয়তের প্রথম দিকেই ফরয হয়েছিল, যা সকাল সন্ধ্যায় দু'রাকাত করে পড়া হতো। মেরাজের মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়। জুমুআ অবশ্য মক্কায় ফরয হয়েছিল, কিন্তু আদায় করার সুযোগ হয়নি। মদিনায় এসে যথারীতি জুমুআর জামায়াত পড়াও আরম্ভ হয়।

৩. জেহাদের নির্দেশ ঃ পূর্বে জিহাদের নির্দেশ ছিল না। প্রথম হিজরীর রমযান মাসে মুসলিমদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ হয়।

৪. **আযান প্রবর্তন ঃ** মদিনায় মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ্যে সালাতের আহবানের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। কেউ ঘণ্টাধনি, কেউ শিঙ্গা বাজানো আবার কেউ আগুন জ্বালাবার প্রস্তাব দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এগুলো কোনোটিই পছন্দ করলেন না। তিনি হযরত বিলালকে নামাযের জন্য (বর্তমান প্রচলিত বাক্যগুলোর দ্বারা) উচ্চঃস্বরে আহবান করতে বলেন। সেই থেকে বর্তমান আযান পদ্ধতি চালু হয়।

৫. কিবলা পবির্তন ও জিহাদের নির্দেশ ঃ হিজরী দ্বিতীয় সালে ইসলামের ইতিহাসে দু'টি বিরাট ঘটনার সূত্রপাত হয়। তার একটি হচ্ছে মুসলিম জাহানের জন্য নিজস্ব কিবলা নির্ধারণ, যা আজও প্রায় দেড়শ কোটি মানুষের অন্তরের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিগণিত। তখন থেকেই ইসলামের শত্রুরা তাঁর বিরোধিতার জন্য তরবারি ধারণ করে এবং মুসলিমগণ তা প্রতিহত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সহচরগণ মদিনায় আসেন এবং আনসারগণ তাঁদের আশ্রয় দেন তখন সমগ্র আরব একযোগে তাঁদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়।" তখন জিহাদের নির্দেশ সংবলিত আয়াত অবতীর্ণ হয়- "যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে, আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর।" (সূরা বাকার-১৯০)

শিক্ষার্থীর কাজ	**মদীনা সনদের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করুন।**

মদীনা সনদ কী ?	মদীনা সনদের ধারা কয়টি?	সনদে স্বাক্ষরকারী কয়েকটি সম্প্রদায়ের নাম লিখ।	মদীনা সনদে স্বক্ষরকারী কয়েকটি গোত্রের নাম উল্লেখ কর।

সারসংক্ষেপ :

মদীনার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য, ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে মদীনাতে একটি শান্তিপূর্ণ নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সর্বোপরি আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে মদীনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য মহানবী (সা.) যে লিখিত সনদ প্রদান করেন তাই মদীনা সনদ। এটি পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঐতিহাসিক মদিনা সনদে মোট কয়টি ধারা ছিল?
(ক) ৫৩টি (খ) ৫৪টি
(গ) ৪৭টি (ঘ) ৫৬টি

২। মদিনা সনদের ফলে সর্বতোভাবে স্বীকৃতি পেল-
i. নাগরিক অধিকার ii. সামাজিক মর্যাদা iii. ধর্মীয় স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। মদিনায় মহানবী (সা.)-এর আগমনের ফলে মদিনাবাসী-
i. সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় ii. বিভিন্ন গোত্র পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়
iii. ইহুদিদের সাথে সমঝোতার গড়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১২১৫ সালে যুক্তরাজ্যের "সারির রাজিমিডে" ম্যাগনাকার্টা সনদ রচিত হয়। রাজাজনের আমলে তিনি যেসব রাজনৈতিক সংকটের সম্মূখীণ হয়েছিলেন তা সমাধান করতেই এ সনদ প্রনয়ণ করেন।এ সময় প্রভাবশালী ব্যরনার জনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং লণ্ডন দখল করে নেয়। তাই তাদের মাঝে সমঝোতা স্মারক হিসেবেই এ দলীল সম্পাদিত হয়। ইহা 'ম্যাগনাকার্টা' নামে পরিচিত।

(ক) মদীনা সনদে কতটি ধারা রয়েছে? ১
(খ) মসজিদে নববীর পরিচয় দাও। ২
(গ) উদ্দীপকের আলোকে তোমার পঠিত সনদটি তুলে ধর। ৩
(ঘ) মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উক্ত সনদ ছিল মাইলফলক - উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

পাঠ-৪.৩ বদর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গাযওয়া ও সারিয়ার পরিচয় জানতে পারবেন
- বদর যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- বদর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**গাযওয়া, সারিয়ার, জিহাদ ও বদর যুদ্ধ**

গাযওয়া ও সারিয়ার পরিচয়

আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ নাযিল হওয়ার পর থেকে মুসলিমগণ কাফিরদের সাথে অনেকগুলো যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এগুলোর মধ্যে কতকগুলো যুদ্ধে মহানবী (সা.) নিজে অংশগ্রহণ করেছেন, আবার অনেক যুদ্ধে অভিজ্ঞ সাহাবীকে নিজের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। যেসব যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং অংশ নিয়েছেন সেগুলো 'গাযওয়া' এবং যে সকল যুদ্ধে তিনি নিজে অংশ নেননি, সেগুলোকে 'সারিয়া' বলে। বেশির ভাগ গাযওয়া ছিল বড় আর সারিয়া ছিল ছোট। মহানবী (সা.)-এর জীবনে গাযওয়ার সংখ্যা ২৩টি আর সারিয়ার সংখ্যা ৪৩টি। এ সকল যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদা মুতাবিক মুসলিমদের বিজয় দান করেন। তবে উহুদ এবং হুনায়নের যুদ্ধে মুসলিমদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। মুসলিমদের সমরনীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ দুটি যুদ্ধে তাদের আল্লাহ তায়ালা সাময়িক পরীক্ষায় ফেলেন।

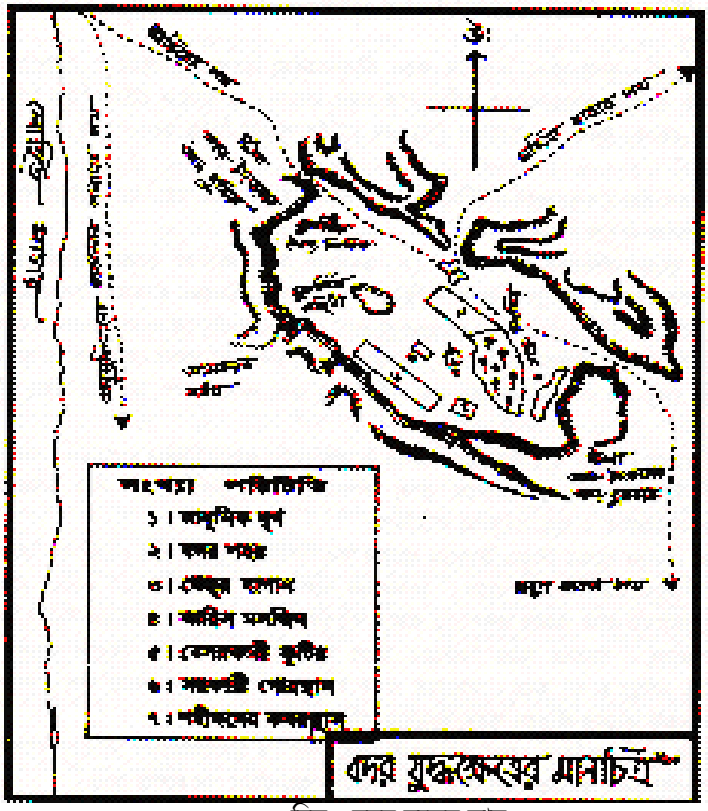

চিত্র : বদর যুদ্ধের স্থান

বদর যুদ্ধের কারণসমূহ

মদিনা থেকে প্রায় আশি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম বদর। তখনকার দিনে এখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। এখানেই দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমযান মোতাবেক ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ শুক্রবার ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সম্মুখযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা বাহ্যত যুদ্ধ মনে হলেও বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এর ফলে একটি সুমহান বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। এ কারণেই কুরআনের ভাষায় একে 'ইয়াওমুল ফুরকান' বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যে ইতিহাসবিদরাও এর গুরুত্ব স্বীকার করেন। ঐতিহাসিক পি কে হিট্টি তার '*History of the Arabs*' গ্রন্থে একে ইসলামের প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করেছেন। নিম্নে এ যুদ্ধের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো:

কুরাইশদের গাত্রদাহ ঃ মদিনায় মুহাম্মদ (সা.)-এর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর এ ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্ষমতা ও ইসলামের দ্রুত প্রসার কুরাইশদের মনে ঈর্ষা ও শত্রুতার উদ্রেক করে। তাই তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে মদিনা থেকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র আঁটে।

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ঃ পাপিষ্ঠ মুনাফিক দলের সঙ্গে যোগসাজশ করে ইহুদিরা সংঘবদ্ধ হয় এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) তথা ইসলামের ধংস সাধনের জন্য গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে।

অর্থনৈতিক কারণ ঃ নির্বিঘ্নে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার সুযোগ হারাতে হতে পারে, এ আশঙ্কায় কুরাইশরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ব্যবসায় ও মক্কার কাবা ঘরে গমনকারীদের চলাচল বন্ধ হলে সমূহ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে উপলব্ধি করে কুরাইশরা ইসলামের মূলোৎপাটনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "মক্কার ব্যবসায়ীরা সিরিয়া, মিসর, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে নিয়মিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করতো, কিন্তু মদিনা মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার ফলে মদিনার মধ্য দিয়ে কুরাইশদের একমাত্র বাণিজ্যপথ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।"

ইহুদিদে ষড়যন্ত্র ও শর্তভঙ্গ ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি ইহুদিরা সহ্য করতে পারেনি। তাই সুবিধাভোগী কিছু ইহুদি নেতা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের সাথে মিশে নানাভাবে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। বিশ্বাসঘাতক ইহুদিরা মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে কুরাইশদের মদিনা আক্রমণে প্ররোচিত করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহানুভবতা ও সহনশীলতার সুযোগে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলে তৎপর হয়ে ওঠে। ফলে বদর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়।

কুরাইশদের যুদ্ধের হুমকি ঃ মদিনাবাসীদের সঙ্গে মক্কার লোকদের বরাবরই ভালো সম্পর্ক ছিল, কিন্তু নবী করীম (সা.) ও তাঁর অনুসারীরা মদিনায় গেলে তাদের পূর্বের সে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। তাই কুরাইশরা মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেয়।

আবু সুফিয়ানের অপপ্রচার ঃ মক্কার কুরাইশ কাফির নেতা আবু সুফিয়ান ব্যবসায় বাণিজ্যে আবরণে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়ায় গমণ করে। এ কাফিলায় প্রায় ৫০,০০০ দিনার মূল্যের ধন-রত্নাদি ছিল। নাখলার যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে কুরাইশরা সিরিয়ায় গমনকারী কাফিলার মক্কায় নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। মক্কায় জনরব ওঠে, আবু সুফিয়ানের কাফিলা মদিনার মুসলিমদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। গুজবের সত্যতা যাচাই না করেই আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করে আবু জাহল এক হাজার সৈন্য নিয়ে আবু সুফিয়ানের সাহায্যার্থে বদর অভিমুখে রওয়ানা হয়।

কুরাইশদের দস্যুবৃত্তি ঃ বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে কুরাইশদের দস্যুবৃত্তিকে একটা বড় কারণ বলে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। মদিনার সীমান্তবর্তী এলাকায় কুরাইশ এবং তাদের অনুগত সহযোগী আরব গোত্রগুলো মুসলিমদের শস্যক্ষেত্রে জ্বালিয়ে দিত, ফলবান বৃক্ষ ধ্বংশ করতে এবং উট, ছাগল ইত্যাদি অপহরণ করতো। সুতরাং এহেন কার্যকলাপের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

নাখলা প্রান্তরে খণ্ডযুদ্ধ ঃ মদিনা সীমান্তে কুরাইশদের ক্রমবর্ধমান লুটতরাজ বন্ধ করার জন্য গোপন সংবাদ সংগ্রহে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা দল দক্ষিণ আরবের নাখলায় প্রেরণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরাইশ কাফিলাকে আক্রমণ করতে আদেশ না করা সত্ত্বেও আবদুল্লাহ (রা) ভুলবশত কাফেলার সঙ্গে সংঘর্ষে রত হলে নাখলায় এক খণ্ডযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধের ঘটনা

মদিনা আক্রমণের জন্য মক্কার কাফিররা প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসছে- এ সংবাদে রাসূলুল্লাহ (সা.) খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় আল্লাহর এ নির্দেশ পেয়ে চিন্তামুক্ত হন। "আল্লাহর পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে সীমালঙ্ঘন করো না, কারণ আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ (১৭ রমযান দ্বিতীয় হিজরী) রাসূলুল্লাহ (সা.) ২৫৬ জন আনসার এবং ৬০ জন মুহাজির নিয়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রণাসভার পরামর্শক্রমে গঠিত একটি মুসলিম বাহিনীসহ কুরাইশ বাহিনীর মোকাবেলার জন্য বের হন। মদিনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর উপত্যকায় মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে কুরাইশদের সংঘর্ষ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

আল-আরিসা পাহাড়ের পাদদেশে মুসলিম বাহিনীর শিবির স্থাপিত হয়। ফলে পানির কূপগুলো তাদের আয়ত্তে ছিল। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিম সৈন্য সমাবেশের জন্য এমন এক স্থান বেছে নেন যেখানে সূর্যোদয়ের পর যুদ্ধ শুরু হলে কোনো মুসলিম সৈন্যের চোখে সূর্য কিরণ না পড়ে।" প্রাচীন আরব-রেওয়াজ অনুযায়ী প্রথমে মল্লযুদ্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে হযরত আমীর হামযা, আলী ও আবু ওবায়দা কুরাইশ নেতা ওতবা, শায়বা এবং

ওয়ালিত ইবনে ওতবার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এতে শত্রুপক্ষীয় নেতৃবৃন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হয়। উপায়ন্তর না দেখে আবু জাহল নিজের বাহিনীসহ মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মুসলিমদের ওপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করতে লাগল, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা এবং সংঘবদ্ধ সুশৃঙ্খল মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করা কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অসামান্য রণনৈপুণ্য, অপূর্ব বিক্রম ও অপরিসীম নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে মুসলিমগণ বদরের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে কুরাইশদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। অপরদিকে আবু জাহল ৭০ কুরাইশ সৈন্যসহ নিহত হয় এবং সমসংখ্যক কুরাইশ সৈন্য বন্দি হয়। এ যুদ্ধে মাত্র **১৪** জন মুসলিম সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন।

বদর যুদ্ধের ফলাফল

বদর যুদ্ধ ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ এবং অবিস্মরণীয় এক ঘটনা। মুসলিম শক্তি এ যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব জয়ের সোপানে আরোহণ করে। এ যুদ্ধে কুরাইশ শক্তিকে পর্যুদস্ত করে মুসলিমরা প্রথম বারের মতো বিশ্বময় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার প্রসারের দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ঐতিহাসিক নিকলসন বলেন- The Battle of Badar is not only the most celebrated battle in the memory of Muslims, it was really also of a great historical importance. ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে ফলাফল আলোচনা করা হলো-

ঐতিহাসিক যোসেফ হেল বলেন, "বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বড় ধরনের সামরিক বিজয়।" এ যুদ্ধে কাফিরদের ওপর মুসলিমদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। বিশাল কাফির বাহিনী অল্পসংখ্যক মুজাহিদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে ইসলাম বিজয়ের যুগে প্রবেশ করে। হিট্টি যথার্থই বলেছেন- Islam recovered and passed on gradually from the defensive to the offensive. হিট্টির মতে, "বদরের প্রান্তরে সম্মুখ যুদ্ধে মুসলিমগণ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা তাদের পরবর্তী বিজয়ের পথকে সুগম করে। এ বিজয় দ্বীনের সূচনা করে এবং পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে ইসলাম পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পূর্বে ভারত উপমহাদেশ ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।"

বদরের যুদ্ধ মদিনা রাষ্ট্রকে সুসংবদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রে উন্নীত করে। বিজয়ীর বেশে মদিনায় ফিরে মহানবী (সা.) সুদক্ষ সমর নেতা, পরাক্রমশালী যোদ্ধা ও ন্যায়পরায়ণ শাসকে পরিণত হন। এমনকি বদর যুদ্ধে বিজয়ের ফলে মুসলিমদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। মুসলিমগণ প্রচুর গনীমত লাভ করে। এতে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হয়। বদরের যুদ্ধের বন্দিদের সাথে রাসূল (সা.) মহত্ত্বপূর্ণ উদার আচরণ করেন। ফলে তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। এতে ইসলামের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিজয় সাধিত হয়। এ যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে বিজয়ের যুগে প্রবেশ করে। সর্বোপরি বদর যুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক মুসলিম সেনার জয়লাভ ছিল একটি চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারক ঘটনা।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বদর যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলী চিহ্নিত করুন।**

বদর যুদ্ধের কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?	মদীনা থেকে বদর প্রান্তরের অবস্থান কত মাইল দূরে?	বদর প্রান্তরের অবস্থান কত মাইল দূরে?	কুরাইশদের ব্যবহৃত অস্ত্রসমূহের নাম লিখ?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী (সা.) তাঁর নবুয়াতী জীবনের **১৫**তম বছরে কুরাইশ কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথম যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তার নাম বদরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে দাম্ভিক কাফিরদের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। তৎকালীন যুদ্ধনীতি অনুযায়ী পরাজিত বন্দীদের হত্যা না করে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়ে মহানবী (সা.) মানবতার ইতিহাসে যুদ্ধনীতিতে এক নব দিগন্তের সূচনা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বদরের যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়?
   (ক) ৬২২ (খ) ৬২৪
   (গ) ৬২৫ (ঘ) ৬২৬

২. বদরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?
   (ক) ৩১০ (খ) ৩১৩
   (গ) ৩১৫ (ঘ) ৩২৫

৩. 'ইওয়ামুল কুরআন'- কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত?
   (ক) হস্তির বছর (খ) মিরাজের বছর
   (গ) বদরের যুদ্ধের দিন (ঘ) হজ্জের দিন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব আশরাফউদ্দিন ইসলামের ইতিহাসের ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামে কথায় কথায় যুদ্ধ বা লড়াই নিষিদ্ধ। তবে অন্যায় অবিচার ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ইসলাম কর্বদাই সোচ্চার এবং এক্ষেত্রে উসলাম প্রয়োজনে যুদ্ধকে সমর্থন করে। মূলত মদীনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একঠ নীতি নির্ধারণী যুদ্ধের মাধ্যমে। মুসলমানদের জন্য এটি ছিল একটি অগ্নি পরীক্ষা। সত্য মিথ্যার এ যুদ্ধে পরাজিত হলে মুসলমান রাষ্ট্র অংকুরেই ধ্বংশ হতো।

(ক) বদর যুদ্ধে কুরাইশদের নেতা কে ছিল? ১
(খ) গাফওয়া ও সারিয়ার পরিচয় দিন। ২
(গ) উদ্দীপকে ঈঙ্গিতকৃত যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করুন। ৩
(ঘ) মদীনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র সুদৃঢ় করনে এ যুদ্ধের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.৪ উহুদ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উহুদ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- উহুদ যুদ্ধের প্রকৃত বিজয়ী কারা তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- মুনাফিকদের সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**উহুদ, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, হিন্দা, আবু সুফিয়ান, আবু জাহিল, হামজা ও খালিদ বিন ওয়ালিদ**

উহুদ যুদ্ধ

মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় কুরাইশ কাফিরদের সাথে মুসলিমদের সংগঠিত দ্বিতীয় যুদ্ধের নাম উহুদের যুদ্ধ। মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে উহুদ পাহাড়। হিজরী তৃতীয় সালের শাওয়াল মাসে এ পাহাড়ের পাদদেশে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের কারণসমূহ নিম্নরূপ:

উহুদ যুদ্ধের কারণসমূহ

বদর যুদ্ধে অধিকাংশ কুরাইশ নেতার মৃত্যু সংবাদে সারা আরব জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে যায়। মক্কার অন্যতম নেতা আবু লাহাব এ দুঃসংবাদ শ্রবণে শয্যা গ্রহণ করে আর ওঠেনি। আবু সুফিয়ান প্রতিশোধের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। সে বলতে লাগল, আমি যতদিন না এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারি, ততদিন পর্যন্ত সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করব না, স্ত্রী স্পর্শ করব না। মোটকথা, কাফিররা স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলে ওঠে। বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর মুহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্বে বনু হাশিম সম্প্রদায়ের ক্রমোন্নতি উমাইয়াদের অসহ্য হয়ে ওঠে। তাই কুরাইশদের দুটি শাখা হাশিমী ও উমাইয়ার মধ্যে শত্রুতা শুরু হয়, যা কম-বেশি উহুদ যুদ্ধে ইন্ধন যোগাতে সাহায্য করে।

ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, বদরের বিপর্যয়ের পর ইহুদি কবি কাব বিন আশরাফ মক্কায় গমন করে কাব্য রচনা করে কুরাইশদের উত্তেজিত করতে থাকে। শুধু কুরাইশদেরই নয়, বেদুইনদেরও সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে তৎপর হয়। ফলে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "বদরে বিপর্যয়ের পর আবু সুফিয়ান ৪০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মদিনার সীমান্তে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও ধংসলীলায় মত্ত হলে মুসলিমরা তা প্রতিহত করতে অগ্রসর হয়, আর এতেই উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।"

উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী

৩০০০ সৈন্য সমেত আবু সুফিয়ান মদিনা অভিমুখে অগ্রসর হয়। তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৪ তারিখে মুহাম্মদ (সা.) জুমুআর সালাত আদায় করে সমবেত মুসলিমদের পরামর্শ সভায় বললেন, "এবার আমাদের নগর ছেড়ে দূরে গিয়ে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। তাতে বিপদ ঘটতে পারে। তোমাদের মত কী?" বায়োজ্যেষ্ঠ মুহাজির ও আনসারগণ সকলে মহানবী (সা.)-এর মতে সাড়া দেন, কিন্তু এ প্রস্তাব তরুণ দলের মনঃপূত হয়নি। তারা এ ব্যবস্থাকে কাপুরুষতা মনে করে মদিনার বাইরে গিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হওয়া সমীচীন ভাবে। শেষে অনেকেই তাদের মত সমর্থন করে।

হযরত মুহাম্মদ সকলকে রণসাজে সজ্জিত হতে নির্দেশ দেন। মোট এক হাজার সৈন্যের এ বাহিনীতে ২ জন মাত্র অশ্বারোহী, ৭০ জন বর্মধারী, ৪০ জন তীরন্দাজ, বাকি সকলেই বর্মহীন পদাতিক ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ৩০০ সৈন্য সমেত পথিমধ্য থেকে দলত্যাগ করে। উহুদ পাহাড়ের অপর পার্শ্বে গিয়ে রাসূল (সা.) একটি সুবিধাজনক স্থানে শিবির স্থাপন করেন- সম্মুখে যুদ্ধের ময়দান পেছনে পাহাড়। আবু সুফিয়ান তার বিরাট বাহিনী নিয়ে পূর্বেই উহুদ প্রান্তরে

অপেক্ষা করছিল। মুসলিম পক্ষের বামপার্শ্বে পর্বতগাত্রে একটি গিরিপথ ছিল। অনন্য সমরকুশলী মহানবী (সা.) এ গিরিপথের পশ্চাৎ দিক থেকে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা)-এর নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনী মোতায়ন করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের সেখানে অবস্থান করার হুকুম দেন।

উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মুসলিমদের হাতে শত্রু পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই ময়দানে টিকতে না পেরে কুরাইশরা পালাতে আরম্ভ করে। কুরাইশ সৈন্যদের পালাতে দেখে মুসলিমগণ পরিত্যক্ত সম্পদ মানে গনীমত সংগ্রহ করতে লেগে যায়। এ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ ভুলে গিরিপথে নিয়োজিত তীরন্দাজ বাহিনীও গনীমত সংগ্রহে নেমে পড়ে। ৫০ জনের মধ্যে মাত্র দু'জন শেষ পর্যন্ত গিরিপথ পাহারায় নিযুক্ত থাকেন। দূর থেকে সুচতুর খালিদ এ দৃশ্য দেখে তার অশ্বারোহী সেনাদল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে দু'জন তীরন্দাজকে অনায়াসে পরাজিত ও নিহত করে পশ্চাৎ দিক থেকে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করে। পলায়নপর কুরাইশ সৈন্যরাও ফিরে আসে। যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হয়। বীরবর হামযা ও মুসয়াব শহীদ হন। মুসলিম সৈন্যগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। বহু সাহাবা হতাহত হন। এবার কুরাইশরা মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে তীর ও অন্যান্য অস্ত্র প্রয়োগ করতে থাকে। উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সম্মুখের চারটি দাঁত মুবারক শহীদ হয় এবং ৭০ জন মুসলিম শাহাদাতবরণ করেন। কুরাইশদের পক্ষে ২৩ জন নিহত হয়। কয়েকজন সাহাবী নিজেদের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করার জন্য ব্যূহ রচনা করেন। বহু তীর তাঁদের শরীর বিদ্ধ করে। যুদ্ধের মাঠে এ খবর রটে গেল, মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছেন। এতে বহু মুসলিম হতোদ্যম হয়ে পড়েন। হযরত তালহা কাঁধে করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তুলে নেন এবং তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এবার বিক্ষিপ্ত সাহাবাগণ আবার মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে সমবেত হন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাগণ যাঁরা মাঠে ছিলেন সকলে পর্বতে আরোহণ করেন। কাফিররা উঠতে চেয়ে ব্যর্থ হয়।

উহুদ যুদ্ধের ফলাফল

উহুদ যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য ছিল ধৈর্যের অগ্নি পরীক্ষা। একথা সত্য, নিরবচ্ছিন্ন বিজয় কোনো জাতির ভাগ্যেই জুটে না। বিজয়ের আনন্দ ও পরাজয়ের গ্লানি সঙ্গী করেই বৃহত্তর সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে হয়। এজন্য প্রয়োজন ধৈর্যের। এ পরীক্ষায় মুসলিমগণ ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

ঈমানের দৃঢ়তা ঃ যুদ্ধোত্তরকালে আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে ইমরানে মুসলিমদের খাঁটি মুমিন হতে এবং হকের ওপর দৃঢ়পদ থাকতে নির্দেশ প্রদান করেন। এ যুদ্ধের ফলে মুসলিমদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেদিন যুদ্ধের প্রথম দিক জয় লাভ করেও পরবর্তীতে তাদের পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল। তাই পরবর্তী যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সেগুলোতে তারা মহানবী (সা.)-এর আদেশ নির্দেশ পুরোপুরি মেনেই যুদ্ধ করেছিলেন। ফলে বলা যেতে পারে, উহুদ যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য ঈমানী পরীক্ষা হিসেবে কাজ করেছিল।

ইহুদিদের মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গের শাস্তি ঃ ঐতিহাসিক পি.কে.হিট্টি বলেন, ইহুদি বনু নযির ও বনু কায়নুকা গোত্র মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে মদিনা থেকে বহিষ্কৃত হয়।

জয় পরাজয়ের অভিজ্ঞতা ঃ উহুদ রাণাঙ্গনে প্রাথমিকভাবে মুসলিমদের বিজয় এবং সে কারণে উল্লাস ও বিশৃঙ্খলাই পরবর্তীতে পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। অপরদিকে কুরাইশরা আপাত জয়লাভ করলেও এর কোনো সুফল ভোগ করতে পারেনি; বরং নৈতিক দুর্বলতাহেতু মনোবল হারিয়ে ময়দান ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

মুসলিমদের বীরত্ব বৃদ্ধি ঃ উহুদের পরাজয় মুসলিমদের বীরত্ব অধিকতর বৃদ্ধি করেছিল। মদিনায় প্রত্যাগমনের পর মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে মক্কাবাসী কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেন। এতে তারা অতুলনীয় সাহস, মনোবল ও বীর্যবত্তার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

পরবর্তী বিজয়ের পথ উন্মোচন ঃ উহুদ যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য ছিল এক বিরাট শিক্ষা। উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী নেতার আদেশ মানা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাই পরবর্তীতে কোনো যুদ্ধেই তারা আর এ ভুল করেননি। অতএব উহুদের পরাজয় মুসলিমদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথ উন্মুক্ত করেছিল।

কাফিরদেই পরাজয় ঘটে ঃ মুসলিমগণ যদি উহুদে পরাজিতই হতো, তাহলে কুরাইশরা মদিনা আক্রমণ করতো। কেননা মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যেই তারা এসেছিল। সুতরাং উহুদে তাদের পরাজয়ই হয়েছিল। কাফিররা সত্যিই যে মুসলিমদের

ওপর জয়ী হতে পারেনি, আবু সুফিয়ান তা ভালোভাবে বুঝেছিল। নতুবা যুদ্ধশেষে সে "আগামী বছর তোমাদের সাথে বুঝাপড়া হবে" কেন বলল?

উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা

প্রথমত, মুসলিম তরুণরা রাসূল (সা.) ও অন্যান্য সাহাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে না পেরে মদিনা শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। যুদ্ধ জয় অপেক্ষা গনীমত সংগ্রহ প্রবণতাই অনেকের মধ্যে ছিল প্রবল। মহানবী (সা.)-এর কড়া হুকুম সত্ত্বেও তীরন্দাজদের স্থান ত্যাগই এর প্রমাণ। নেতার আদেশ ও অভিমতের প্রতি এহেন অশ্রদ্ধা যে ভয়ঙ্কর দোষের, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল। এ যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার ফলে পরবর্তীকালে কখনো এ ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। কাজেই বলতে হবে, অমঙ্গলের মধ্য দিয়ে মুসলিমদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, শত্রুর শাণিত তরবারি মহানবী (সা.)-এর মস্তকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল; এমন দুর্যোগের মধ্যেও তিনি নেতার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, সংকট মুহূর্তেও তিনি বিচলিত হননি, কর্তব্য পালনে ভুল করেননি। বিক্ষিপ্ত মুসলিম সৈন্যদের তিনি একত্র করেছিলেন এবং তাঁর নৈতিক মনোবল রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এরূপ অবস্থায় পড়লে কিরূপ ধৈর্য ও ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োজন, উহুদ যুদ্ধ বিপর্যয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুসারীদের তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যদি মৃত্যু ঘটে তবে মুসলিমগণ কোন আলোকে এটা গ্রহণ করবে- নির্দেশিত পথে চলবে নাকি উদভ্রান্তের নতো পথ চলবে, মুসলিমদের এ পরীক্ষাও এখানে দিতে হয়েছিল।

সর্বোপরি, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে দোয়াকালাম, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ কবজ আর ওয়ায নসিহতই যথেষ্ট নয়। এ কাজে সমরনীতি, সমর কৌশল ও বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। সে ক্ষেত্রে সমরবিশেষে জীবনের বাজিও রাখতে হয়।

উহুদের যুদ্ধে কে চূড়ান্ত বিজয় কার?

বাহ্য দৃষ্টিতে যদিও পরাজয় মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলিমগণ এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। ইসলাম অগ্রগতি, আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে চলেছে বদর যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির এ পথে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতে পারে; কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। রাসূল (সা.)-এর জীবনকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে না দেখে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। এ দৃষ্টিকোণে দেখলে প্রকৃতপক্ষে উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় হয়েছিল; পরাজয় নয়। শত্রুজয় অপেক্ষা আত্মজয় করতে পারে কিনা, বিপদের দিনে ধৈর্যধারণ করতে পারে কিনা, জয়ের সঙ্গে পরাজয়কে তারা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে কিনা, সত্যের জন্য মরণ বরণ করতে প্রস্তুত আছে কিনা, এটার ছিল এ যুদ্ধের অন্তর্নিহিত পরীক্ষা। তাঁরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁরা বিজয়ী।

যদি মুসলামানগণ উহুদের যুদ্ধে পরাজিতই হতো; তাহলে কাফিররা মদিনা আক্রমণ করতো। কেননা তারা মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যেই এসেছিল। সুতরাং উহুদে কুরাইশদের পরাজয় হয়েছিল। মুসলিমদের ওপর কাফিররা যে জয়ী হতে পারেনি ভালোভাবে তা আবু সুফিয়ান বুঝেছিল। নতুবা যুদ্ধশেষে "আগামী বছর তোমাদের সাথে বুঝাপড়া হবে" বলল কেন? মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার জন্য যে সকল কুরাইশ নেতা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, উহুদ ও বদরে তাদের বেশিরভাগ নিহত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাদবাকি সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মুসলিমদের এতেও বিজয় হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	উহুদ যুদ্ধের বিভিন্ন দিক চিত্রিত করুন।

উহুদের পরিচয় কী ?	উহুদ যুদ্ধের দুই দলের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?	উহুদ প্রান্তর মদীনার কত মাইল দূরে?	পাহাড়ের পেছন থেকে আক্রমন করে মুসলিমদের পর্যূদস্থ করেছিল কে?

সারসংক্ষেপ :

মক্কার কাফিররা বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মুসলিমদের উপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তার নাম উহুদের যুদ্ধ। বাহ্যিকভাবে এ যুদ্ধে মুসলিমদের বেশী ক্ষতিসাধন হলেও সার্বিক বিচারে কাফিররাই পরাজিত হয়। এ যুদ্ধের শিক্ষা পরবর্তীকালে মুসলিমদের যুদ্ধনীতি প্রণয়নে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উহুদ যুদ্ধে মুসলিম ও কাফির সৈন্যসংখ্যার অনুপাত কত ছিল?
   (ক) ৭০০:৩০০০ (খ) ১০০০:৩০০০
   (গ) ৩১৩: ১০০০ (ঘ) কোনটাই নয়

২. উহুদ যুদ্ধের সময় কার নেতৃত্বে ৩০০ মুসলিম সৈন্য ফিরে গিয়েছিল?
   (ক) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (খ) আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস
   (গ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (ঘ) আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস

৩. উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ কোনটি?
   (ক) যুদ্ধোপকরণের অভাব (খ) গনীমতের মাল সংগ্রহ
   (গ) সিপাহ্সালারের নির্দেশ অমান্য (ঘ) কাফিরদের সৈন্যসংখ্যাধিক্য

৪. উহুদের যুদ্ধে নিম্নের কোন চরিত্র চিহ্নিত হয়?
   (ক) মুনাফিক (খ) মুশরিক
   (গ) কাফির (ঘ) অমুসলিম

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

হেদায়েতুল্লাহ একজন মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের পর বাড়ীতে ফিরে তিনি প্রতিবেশীদের বিভিন্ন বর্ণনা দিচ্ছিলেন। একটি যুদ্ধে তাদের দলের অনেক ক্ষতি হয়। বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধাও নিহত হয়। হেদায়েত সাহেবের কাধেঁও একটি বুলেট লেগেছিল। আলী হোসেন এর কারণ জানতে চাইল। হেদায়েতুল্লাহ বললেন, আসলে তাদের রণকৌশল ঠিকই ছিল। কিন্তু প্রথমদিকে তাদের আক্রমণে বেশ কিছু পাকিস্তানী হানাদার সৈন্য মারা যায়। এতে উল্লাসিত হয়ে সেক্টর কমাণ্ডারের নির্দেশ অমান্য করে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা প্রকাশ্যে এসে যুদ্ধ শুরু করে। ফলে সমগ্র টীমে বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্থানীরা অতর্কিত আক্রমণ করে। পরে অবশ্য এ ভূল থেকে তারা বিরাট শিক্ষা লাভ করে।

(ক) গানিমাহ কী? ১
(খ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পরিচয় দাও। ২
(গ) উদ্দীপকের ঘটনার সাথে মোহাম্মদ (সা.) কোন যুদ্ধ সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা দিন। ৩
(ঘ) উক্ত যুদ্ধের পরাজয়ই পরবর্তী যুদ্ধসমূহের সফলতা- উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.৫ খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধ (৬২৭ সাল)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিখা খননের মাধ্যমে শত্রুকে রক্তপাতের পরিবর্তে কৌশলে পরাজিত করার বিষয়ে জানতে পারবেন।
- খন্দক যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল জানতে পারবেন এবং
- ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**খন্দক বা পরিখা, সালমান ফারসী ও আহযাব**

আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ

বনু নযির গোত্র মদিনা থেকে নির্বাসিত হলে তাদের একাংশ হুয়াই বিন আখতাবের নেতৃত্বে খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। তারা আশেপাশের আরব গোত্রগুলোকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। হুয়াই মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের সঙ্গে ষড়যন্তে লিপ্ত হয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, একযোগে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করা হবে, যাতে তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সর্বত্র যুদ্ধের একটা সাজ সাজ রব পড়ে যায়। আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রায় ১০,০০০ সৈন্য মদিনা আক্রমণের জন্য একত্র হয়। কুরাইশ ব্যতীত তাদের মধ্যে বনু নযির, বনু ওয়ায়ল অন্তর্ভূক্ত ছিল। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাযার সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। পঞ্চম হিজরীতে আরবের বিভিন্ন গোত্রের গঠিত এ বাহিনী একযোগে মদিনা আক্রমণ করার কারণে এ যুদ্ধকে আহযাব বা দলসমূহের যুদ্ধ বলা হয়।

খন্দক যুদ্ধের নামকরণ

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ ঃ ফার্সি 'খান' থেকে খন্দক শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ পরিখা। মদিনার তিন দিকে ঘরবাড়ি ও খেজুর বাগান থাকায় তা প্রাচীর বেষ্টনীর ন্যায় নিরাপদ ছিল, কিন্তু উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিক ছিল উন্মুক্ত। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসি (রা)-এর পরামর্শ ও মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তে মহানবী (সা.) মদিনার উন্মুক্ত দিকে পাঁচ হাত গভীর এক পরিখা খনন করেন বিধায় একে পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। ঐতিহাসিক আমীর আলী এ যুদ্ধকে Battle of Confederates (সম্মিলিত শক্তিসমূহের যুদ্ধ) বলে অভিহিত করেছেন। আল কুরআনের সূরা আহযাবের ২০ নং আয়াতে 'আহযাব' নামকরণ স্বীকৃত হয়েছে।

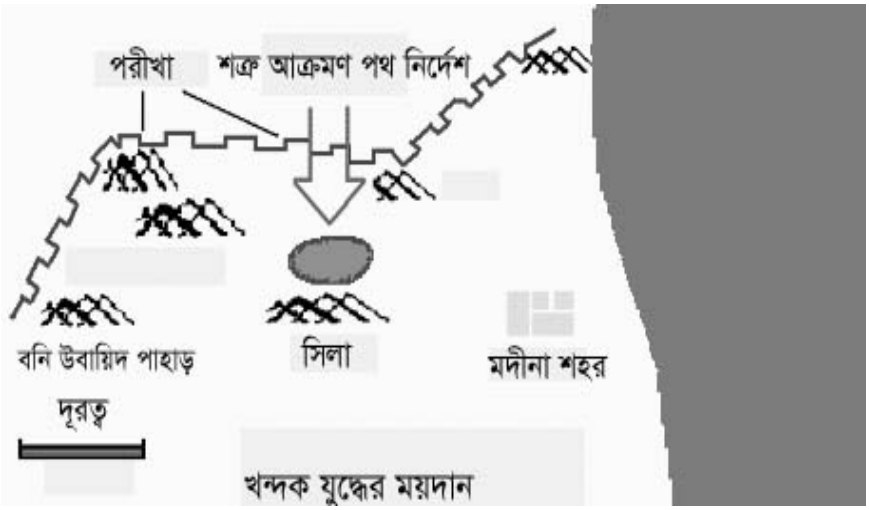

খন্দক যুদ্ধের কারণসমূহ

ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা ঃ বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ইহুদি বনু কায়নুকা ও বনু নযির গোত্রদ্বয়কে মদিনা থেকে নির্বাসিত করা হয়। তারা স্বভাবত কুরাইশদের সাথে হাত মিলায়। ইহুদি নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের সাথে পরামর্শ করতে থাকে। কেনানা ইবনে রবী গাতফান গোত্র গমণ করে তাদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে

উত্তেজিত করে তোলে। খায়বারে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাদের দেয়া হবে- এটাও স্থিরীকৃত হয়। গাতফান গোত্রের সাথে বনী আসাদ বংশের সন্ধি ও মিত্রতা ছিল, তারাও প্রস্তুত হয়। বনী সলিম এবং নবী আসাদ গোত্রও সম্মিলিত কাফির বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে। কাব বনু কোরায়যার সকলকে একত্র করে তাদের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত সন্ধিপত্রখানা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলে।

কুরাইশদের আশাভঙ্গ ঃ উহুদ যুদ্ধে কুরাইশরা আপাত জয়ী হলেও মদিনা দখলসহ পূর্ণাঙ্গ বিজয়লাভে ব্যর্থ হয়। তাছাড়াও তাদের সিরিয়ার বাণিজ্যপথ হুমকিপূর্ণ থেকেই যায়। এসব কারণে আশাহত কুরাইশরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরেকটি চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

মদিনা রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি ঃ ঐতিহাসিক মাসুদী বলেন, উহুদের বিপর্যয় পরবর্তীকালে মুসলিমদের নতুনভাবে ঐক্য সংহতির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে। মদিনা রাষ্ট্রের জাতি গঠন বা Nation building এবং State building প্রক্রিয়া মুসলিমদের শক্তিশালী করে তোলে। কাফির, মুশরিক ও ইহুদি ষড়যন্ত্রকারীদের তা সহ্য হয়নি, তাই তারা আরেকটি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি ঃ ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, বদর এবং উহুদে যুদ্ধ করেও মুসলিমগণ ক্লান্ত হয়ে পড়েনি; বরং ইসলাম প্রচারে তাদের প্রেরণা ছিল প্রত্যয়দৃপ্ত। কাফিররা তা মোটেই সহ্য করতে পারছিল না। তাই তারা সম্মিলিতভাবে মুসলিম উম্মাহকে সমূলে ধ্বংস করতে সংকল্পবদ্ধ হয়।

কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ঃ উহুদ যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করেছিল, পরের বছর তারা আবার মুসলিমদের সাথে শক্তি পরীক্ষা করবে, কিন্তু আবু সুয়িান ও তার অনুসারীদের এ আস্ফালন সত্যে পরিণত হয়নি। কাজেই এখন যুদ্ধ করতে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও শক্তিশালী আয়োজন দরকার। এ কথা ভেবে আবু সুফিয়ান সারা আরবময় ইসলাম, মুসলিম, ইসলামের নবী এবং মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ সৃষ্টির প্রয়াস চালায়।

খন্দক যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনা

রাসূলের পরামর্শ সভা ও যুদ্ধকৌশল নির্ধারণ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরাইশদের নেতৃত্বে সম্মিলিত আরব বাহিনীর অভিযানের সংবাদ পেয়ে সাহাবীদের ডেকে পরামর্শ করলেন। সালমান ফারসি (রা) ইরানি হওয়ার কারণে যুদ্ধে খন্দক বা পরিখা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি মত প্রকাশ করলেন, খোলা ময়দানে নেমে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না; বরং একটি নিরাপদ স্থানে সৈন্য মোতায়েন করে চতুষ্পার্শে পরিখা খনন করতঃ আগে থেকেই সে জায়গাটা সুরক্ষিত করে রাখাই হবে বিচক্ষণতার কাজ। সকলেই তাঁর এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। কাফির বাহিনী পরিখা দেখে বিস্মিত হয়। কারণ আরবরা এটা কখনো দেখেনি। বিশ দিন পর্যন্ত কোনো পক্ষই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়নি।

যুদ্ধের ঘটনাবলী ঃ শেষ পর্যন্ত কাফির বাহিনী ব্যাপক আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঘটনাক্রমে খন্দকের এক স্থানে প্রস্থ একটু কম ছিল। এ স্থান দিয়েই আরবের বিখ্যাত বীররা ঘোড়া হাঁকিয়ে অপর পারে গিয়ে ওঠে। আমর ইবনে আবদুদ ছিল তাদের মধ্যে শক্তিশালী। সে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধের আহবান জানায়। এ আহবানে মুসলিমদের পক্ষ থেকে এগিয়ে যান শেরে খোদা হযরত আলী (রা)। প্রথমে ইবনে আবদুদ আক্রমণ করলে আলী (রা) ঢাল দ্বারা এ আক্রমণ প্রতিহত করেন। যদিও তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছিল। আলীর অপর এক আঘাতে আবদুদের বাজু কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলী (রা) 'আল্লাহু আকবার' ধনি দিয়ে বিজয় ঘোষণা করেন। এরপর যেরার ও যোবায়র ময়দানে আসে। যুলফিকারের অজেয় বাহু উঠাতেই তারা পেছনে হটতে আরম্ভ করে। হযরত উমর (রা)-সহ অন্যান্য সাহাবীগণ সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করেন। অনেক কুখ্যাত কাফির নিহত হলো। এ সময় কাফিররা সব দিক থেকে তীর নিক্ষেপ করছিল। দিন যতই বাড়তে লাগল অবরোধকারীদের মনোবল ততই হ্রাস পেতে লাগল। দশ হাযার সৈন্যের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। আবার তখন ছিল শীতকাল। তার মধ্যে এক সময় এমন প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল, যাতে তাদের তাঁবুর রশিগুলো ছিঁড়ে গেল, খুঁটিগুলো উপড়ে পড়ল, অশ্বগুলো সৈন্যদের মাঝে ছুটাছুটি করতে লাগল, ডেগ-ডেগচি উল্টে গেল। মুসলিমদের জন্য এ ঝঞ্ঝা-প্রবাহ সৈন্য অপেক্ষা অধিক সমর শক্তির কাজ করে। প্রচণ্ড বায়ুর চাপে কুরাইশরা ভীত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে মনস্থ করল। আবু সুফিয়ান সৈন্যদের বলল, এ মাঠে পড়ে সংকীর্ণতার সম্মুখীন হতে চলেছি, এখানে থাকা উচিত নয়- এ বলে সে সৈন্যদের প্রত্যাবর্তনের আদেশ করে। এভাবে পরাজয় মেনে নিয়ে সবাই পালিয়ে যায়।

মুসলিমদের নিষ্কণ্টক বিজয় ঃ একটি মাত্র রাতের ব্যবধানে আল্লাহ কত পরিবর্তন এনে দিলেন। গতকাল যেখানে জাহান্নামের আগুন জ্বলছিল, আজ সেখানে জান্নাতের স্নিগ্ধ বারিধারা প্রবাহিত হচ্ছে। গতকাল যেখানে মিথ্যার ভয়ঙ্কর অভিনয় চলছিল, আজ সেখানে সত্য ও সুন্দরের মাহফিল বসেছে। কৃতজ্ঞতায় তখন মুসলিমদের অন্তর ভরে যায়। আল্লাহকে ধন্যবাদ জানায় তারা সদলবলে।

যুদ্ধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ

এ যুদ্ধে কুরাইশগণ প্রমাণ পেল, ইসলাম দুর্নিবার। তিন তিনবার তারা শক্তি পরীক্ষা করে দেখেছে, তিন তিনবারই তারা বিফল হয়েছে। এ যুদ্ধকে ইসলামের চূড়ান্ত যুদ্ধ বলা যেতে পারে। তারা বদরে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে, উহুদেও মুসলিমদের পরাজিত করতে পারেনি, খন্দকে তারা আরবের সমস্ত শক্তি নিয়েও পরাজিত হয়েছে। তাই খন্দক যুদ্ধের পর তাদের নৈতিক বল শক্তি ভেঙে পড়ে। একটা হীনতা ও পরাজয়ের মনোভাব তাদের সকলকে পেয়ে বসে। পক্ষান্তরে মুসলিমদের বুকে প্রবল নবপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়। নির্ভীক উন্নতশিরে বিশ্বের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তারা প্রস্তুত হয়। কোনো বাধাই তাদের আটকে রাখতে পারবে না, সকল শত্রুই যে তাদের পদানত হবে, ইসলাম যে সর্বত্র জয়যুক্ত হবে- এ কথা এ যুদ্ধের পর থেকে তারা সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করেন। এ যুদ্ধে জয় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহিমাও মর্যাদা শতগুণে বর্ধিত হয়।

আল্লাহ তায়ালার সাহায্য লাভ ঃ খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমগণ মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য সহযোগিতা লাভ করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল। অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যাদের তোমরা দেখতে না, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

ইসলামের অগ্রাভিযানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন ঃ খন্দক যুদ্ধ সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ও মুসলিমদের জয়লাভের ফলে ইসলামের অগ্রাভিযানে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। খন্দক যুদ্ধের পরের বছর হুদায়বিয়ার সন্ধি, পরবর্তী বছর উমরা, তার পরের বছর মক্কা বিজয় সাধিত হয়।

সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় ঃ খন্দক যুদ্ধে কুরাইশ, ইহুদি, বেদুইন, মদিনার মুনাফেক ও পৌত্তলিকরা সম্মিলিতভাবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, কিন্তু সর্বশেষ এ বাহিনীর শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। ঐতিহাসিক ইমামুদ্দিন বলেন, সম্মিলিত বাহিনীতে ভাঙনের ফলে মক্কাবাসীদের পরাজয় প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হয়।

মহানবীর মর্যাদা বৃদ্ধি ঃ পরিখার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মদিনাসহ সমগ্র আরব বিশ্বে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পাশবর্তী বহু জাতি গোষ্ঠি স্বেচ্ছায় মহানবী (সা.)-এর আধিপত্য ও নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং তাদের অনেকেই ইসলাম কবুল করে।

ইহুদিদের বহিষ্কার ঃ খন্দক যুদ্ধের পর বিশ্বাসঘাতক ইহুদি গোত্র বনু কুরায়যার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ গোত্রের অপরাধী যোদ্ধাদের হত্যা করা হয় এবং বাকি লোকদের বন্দি ও নির্বাসিত করা হয়।

ইসলামের প্রসার ঃ আহযাব বা খন্দক যুদ্ধের পর আরব উপদ্বীপ ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং আরবের অনেক গোত্র মদিনা রাষ্ট্রের সাথে স্বেচ্ছায় মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে ড. ইমামুদ্দিন বলেন, "এ যুদ্ধের পর অল্প সময়ে মধ্যে ইসলাম সমগ্র আরব এবং নিকর্টবর্তী দেশগুলোতে পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।"

শিক্ষার্থীর কাজ	খন্দকের যুদ্ধের পরিচয় দিন।

পরীখা কী?	কার পরামর্শে খন্দক খনন করা হয়?	খন্দকের যুদ্ধের মুসলিম-বিরোধী দলের নাম লিখুন?	খন্দকের যুদ্ধ প্রান্তরের চিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ ঃ

এ যুদ্ধে কুরাইশদের সামরিক শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পায়। পরিখার যুদ্ধ ইতিহাসের মোড় ঘুড়িয়ে দেয়। তাদের খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষ হয়, সম্মান বিনষ্ট হয় এবং মিত্রশক্তি ঘৃণায় তাদের দল ত্যাগ করে চলে যায়। পরিখার যুদ্ধ হযরত মুহাম্মদ (সা.) তথা মুসলিমদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) শত্রুদের হাত থেকে মদিনাকে রক্ষা করায় মদিনাবাসী তাঁকে একচ্ছত্র অধিপতি বলে সম্মান করতে লাগল। প্রতিপক্ষের বিরাট সেনাবাহিনীর ওপর মুসলিমদের এ বিজয় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা স্বেচ্ছায় মুসলিমদের মিত্র হয়। এরই মধ্যে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. খন্দক যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের অন্যতম কারণ কোনটি?
(ক) পরীখা খনন (খ) প্রাকৃতিক দূর্যোগ (গ) মুসলিম সামরিক কৌশল (ঘ) সব কয়টি

২. খন্দকের যুদ্ধের আরেক নাম কী?
(ক) আহযাব (খ) আহগায (গ) আবরার (ঘ) আহযার

৩. উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ কোনটি?
(ক) যুদ্ধোপকরণের অভাব (খ) গনীমতের মাল সংগ্রহ
(গ) সিপাহসালারের নির্দেশ অমান্য (ঘ) কাফিরদের সৈন্যসংখ্যাধিক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে মোকাবিলা করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেন। শত্রপক্ষ যেন এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রধান প্রধান ব্রীজ ভেঙ্গে দেয়া হয়। শত্রুর বোমা থেকে মানুষকে রক্ষার লক্ষে মাটি কেটে বাঙ্কার তৈরি করা হয়। ফলে শত্রুবাহিনী ভারী অস্ত্র ও ট্যাংক নিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। এসব যুদ্ধ কৌশল মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় অর্জনে সহায়তা করে।

(ক) আহযাব অর্থ কী? ১
(খ) সালমান ফারসির পরিচয় দিন। ২
(গ) বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের এ যুদ্ধকৌশল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন যুদ্ধকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) "উক্ত যুদ্ধকৌশল মুসলিম রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় করেছে।" উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.৬ হুদাইবিয়ার সন্ধি (৬২৮ সাল, ৬ষ্ঠ হিজরী)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- হুদাইবিয়ার ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	হুদাইবিয়ার, উমরাহ, সন্ধি, বাইয়াতুর রিদওয়ান, বুদায়েল ও ফাতহুম মুবিন

হুদাইবিয়ার সন্ধি

মুসলিমগণ নির্যাতিত হয়ে স্বদেশ ছেড়ে মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করার ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়। এ ছয় বছরে তাঁর একটিবারের জন্যও তারা মক্কায় আসতে পারেননি। কাবা শরীফের যিয়ারতের ভাগ্যও তাদের হয়নি। হজ্জ আদায় করতে না পারায়ও তারা কম মানসিক অশান্তিতে ছিলেন না। একদিন তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বললেন, আমরা কি আর কখনো মক্কায় যেতে পারব না? এরমধ্যে একদা মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেন, মক্কা শরীফে গিয়ে উমরা পালন করছেন। তিনি সাহাবাদের নিকট এ স্বপ্ন প্রকাশ করলে তারা মক্কায় গমন এবং খানায়ে কাবা যিয়ারত করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বপ্নের কথা শুনে সকলে মক্কা শরীফে গমনের জন্য প্রস্তুত হন।

সন্ধি প্রস্তাবঃ উসমান (রা)-কে আটক করে রাখলে জনরব ওঠে, কুরাইশরা তাকে হত্যা করেছে। জীবন উৎসর্গ করে মুসলিম যোদ্ধাগণ উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য রাসূলুল্লাহর হাতে হাত রেখে শেষ বাইয়াত নিলেন। এমনকি রক্তবিন্দু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত সকলেই লড়াই অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে মহানবীর হাতে শপথ গ্রহন করে, একে '*বাইয়াতুর রিদওয়ান*' বলা হয়। এতে কুরাইশরা ভয়ে পেয়ে যায় এবং উসমান (রা.)-কে মুক্তি ও সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে সোহায়লকে পাঠায়। মুসলিমদের পক্ষে হযরত আলী (রা:) সন্ধির কার্যাবলী সম্পাদন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সানন্দে তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সন্ধির শর্তাবলী

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তাবলী নিম্নরূপ

১. এ বছর মুসলিমগণ উমরা না করেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবেন। যদি মুসলিমগণ ইচ্ছা করে তাহলে পরের বছর তিন দিনের জন্য উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করতে পারবে। মুসলিমদের অবস্থানকালে কুরাইশগণ মক্কা নগর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেবে।
২. কুরাইশ ও মুসলিমদের মধ্যে আগামী দশ বছরের মধ্যে যে কোন প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে।
৩. আগমনকালে মুসলিমগণ শুধু আত্মরক্ষার জন্য কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোনো অস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না।
৪. আরবদের যে কোনো গোত্রের লোক হযরত মুহাম্মদ (সা.) অথবা কাফিরদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে কোনো বাধা নিষেধ থাকবে না।
৫. চুক্তির মেয়াদকালে জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হবে এবং একে অপরের ক্ষতিসাধন করবে না। কোনো প্রকার লুণ্ঠন অথবা আক্রমন চলবে না।
৬. কোনো মক্কাবাসী মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করলে মুসলিমগণ তাকে আশ্রয় দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে কোনো মুসলিম মদিনা থেকে মক্কায় আগমন করলে মক্কাবাসী তাকে প্রত্যাপর্ণ করতে বাধ্য থাকবে না। এছাড়া কোন নাবালক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে মুসলিমদের দলে যোগদান করতে পারবে না; হজ্জের সময় মুসলিমদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা হবে।
৭. মক্কার বণিকগণ নির্বিঘ্নে মদিনার পথ ধরে সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে পারবে।
৮. এ সন্ধি চুক্তি ১০ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
৯. সন্ধির শর্তাবলি উভয়পক্ষকেই পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে।

সন্ধির গুরুত্ব ও তাৎপর্য

হুদায়বিয়ার সন্ধির তাৎপর্য আলোচনা করলে প্রতীয়মান হবে, এতে বিধর্মী ও মুসলিমদের মধ্যে অন্ততপক্ষে দশ বছরের জন্য নিরবচ্ছিন্ন শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা করা হয়। যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে কুরাইশ ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সদিচ্ছা প্রকাশ পায়। কারণ কুরাইশরাও যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এ সন্ধির ফলে তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ব্যবসায়-

বাণিজ্যে অবাধ গতিবিধির নিশ্চয়তা লাভ করে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে-এর মহানুভবতা ও দূরদর্শিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ঃ আপতদৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলিমদের জন্য অপমানজনক মনে হতে পারে, সাহাবায়ে কেরামও তাই মনে করেছিলেন। কারণ এতে মুসলিমদের স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। উমর (রা.) এর মধ্যে এ বিষয়ে চরম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল, কিন্তু দূরদৃষ্টিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর এ সন্ধিচুক্তি মুসলিমদের অনুকূলে অনুভব করতে পেরেছিলেন। এ সন্ধির পরবর্তী সুফল লক্ষ্য করলেই এর সার্থকতা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠে।

একটি শর্ত প্রত্যাহার ঃ আবু বশির নামে একজন মুসলিম পালিয়ে মদিনায় গিয়েছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকেও ফেরত দিয়ে দেন, কিন্তু সে পরে ছুটে গিয়ে সিরিয়ার পথে ঈস পাহাড়ে আত্মগোপন করে। আবু বশিরের খবর শুনে মক্কার নির্যাতিত অনেক মুসলিম তার সাথে যোগদান করেন। তারা সিরিয়াগামী মক্কাবাসীদের ওপর আক্রমণ চালাত। এভাবে তাদের ভয়ে শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের ফেরত দেযার শর্তটি কুরাইশরা প্রত্যাহার করে নেয়।

পুরুষদের ফেরত দান ঃ সন্ধির শর্তে মক্কা থেকে আগত মুসলিমদের মদিনায় বসবাসের অনুমতি ছিল না, কিন্তু শর্তটি শুধু পুরুষদের বেলায় প্রযোজ্য ছিল, নারীদের বেলায় নয়। অতএব মক্কা থেকে কোনো নারী মদিনায় গেলে পরীক্ষা করে তাকে বসবাস করতে দেয়া হতো। মুসলিম নারীদের আশ্রয় দেয়া শুরু হলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তার জন্য কুরাইশরা পুরুষদের বিরুদ্ধে আরোপিত শর্তটিও তুলে নেয়।

যাতায়াত ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মক্কা ও মদিনার মধ্যে যাতায়াত নিরাপদ হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

মদিনা রাষ্ট্রের অগ্রগতি ঃ হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে মদিনার নগর রাষ্ট্র আরবের একটি বিশাল রাষ্ট্রে রূপ নিতে শুরু করে এবং মদিনা সরকার একটি কেন্দ্রীয় সরকারে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়।

নিরাপত্তা লাভ ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মদিনা সরকার সাময়িকভাবে একটি নিরাপদ সময় পায় এবং এ সময়টায় আন্তর্জাতিক যোগাযোগের দিকে মনোনিবেশের সুযোগ ঘটে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলাম ঃ এ সময়ই রোম সম্রাট, পারস্য সম্রাট, মিসর ও আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা, বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাধীন ও করদ রাজাদের নিকট পত্র যোগাযোগ শুরু হয়। ফলে ইসলাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করে। এগুলো সবই হুদায়বিয়ার সন্ধির পরোক্ষ ফল।

মুসলিমদের মর্যাদা বৃদ্ধি ঃ ঐতিহাসিক পি.কে হিট্টি বলেন, "এ সন্ধির ফলে মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং প্রথম বারের মতো কুরাইশরা তাদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক শক্তিরুপে লিখিতভাবে স্বীকার করে নেয়।"

কুরাইশদের ক্ষমতা হ্রাস ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে কুরাইশদের শক্তি দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। এ সন্ধি সম্পর্কে ঐতিহাসিক যুহরী বলেন, æThere was no man of sense and judegment amongst the idolators who not led thereby go to join Islam."

রাজনৈতিক বিজয় ঃ ঐতিহাসিক ইমামুদ্দিন বলেন, "হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলিমদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান করে এবং কুরাইশরা মুসলিমদের একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় রাজনৈতিক শক্তিরূপে স্বীকার করে নেয়।"

মদিনা রাষ্ট্রের সংহতি ঃ হিজরতের পর পরই মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে রাসূল (সা.) মদিনা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির ফলে একদিকে এ রাষ্ট্র শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কাফিরদের স্বীকৃতি লাভ করে, অপরদিকে এর শক্তি সুসংহত হয়।

কূটনৈতিক বিজয় ঃ এ সন্ধির অন্যতম শর্ত 'মক্কার লোক মদিনায় গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে'- পরবর্তীকালে মক্কাবাসীর ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয়। ফলে এ শর্তটি বাতিলের জন্য তারাই আবেদন জানায়। এভাবে মুসলিমগণ কূটনৈতিক বিজয় লাভ করেন।

মহানবী (সা.) এর নেতৃত্বের স্বীকৃতি ঃ ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। এ সন্ধিতে কুরাইশগণ মুসলিমদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তি বলে লিখিতভাবে মেনে নেয় এবং সর্বপ্রথম মদিনা প্রজাতন্ত্রকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং মুহাম্মদ (সা.) কে এর নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ইসলামের ছায়াতলে জনতা ঃ ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "এ সন্ধির মাঝখানে পূর্ণ এক বছর যেতেই দশ হাযার মুজাহিদসহ মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং মুসলিমগণ তাদের গড়া ইসলামী প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি পেয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেন।"

সুদূরপ্রসারী ফল ঃ এতদিন পর্যন্ত মুসলিম এবং কাফিরদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা ছিল না। সন্ধি হয়ে যাওয়ায় তাদের যোগাযোগ আরম্ভ হয়। বংশগত এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের দরুণ কাফিররা মদিনায় এসে মাসের পর মাস অবস্থান করতে থাকে। মুসলিমদের সাথে ওঠাবসার কথাবার্তায় ইসলামের আলোচনা প্রসারিত হতে থাকে। মুসলিম মাত্রই ছিলেন

আন্তরিক, সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সচ্চরিত্রতার প্রতীক। মুসলিমদের মধ্য থেকে যাঁরা মক্কায় যেতেন তাদের প্রত্যেকের উপযুক্ত গুণাবলি প্রকাশ পেত।

মক্কা বিজয় ঃ কুরাইশরাই সর্বপ্রথম হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি উপেক্ষা করেছিল। তার ফলস্বরূপ হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা বিজয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং অষ্টম হিজরী মোতাবেক ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এক রকম বিনা যুদ্ধে মক্কা জয় করেন।

ফাতহুম মুবীন (সুস্পষ্ট বিজয়)ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধিকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে 'ফাত্হুম্ মুবিন' বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে- إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। সত্যিই এটা ফাতহুম মুবীন ছিল। মুহাম্মদ (সা.) কে প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়ে অলক্ষ্যে তারা এই প্রথম তাঁকে এক অপারাজেয় শক্তিরূপে মেনে নেয়। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে স্বাক্ষর প্রকৃতপক্ষে তাদের আত্মসমর্পনের স্বাক্ষর। কুরাইশদের এটাই নিশ্চিত পরাজয়ের পূর্বাভাস।

শিক্ষার্থীর কাজ	হুদাইবিয়ার সন্ধির পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।

হুদাইবিয়ার কিসের নাম?	হিজরী কত সালে এ সন্ধি হয়?	এ সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী দুপক্ষে ব্যাক্তিদ্বয়ের নাম কী?	হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা কোন সূরায় বলা হয়েছে ?

সারসংক্ষেপ :

হুদাইবিয়ার নামক কূপের নিকটবর্তী স্থানে মক্কার কুরাইশ কাফির ও মুসলিমদের মধ্যে যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, তাই হুদাইবিয়ার সন্ধি। কাফিরদের হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রটনার বিরুদ্ধে মুসলিমরা মহানবী (সা.) এর নেতৃত্বে প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে কুরাইশরা ভয় পেয়ে যায়। তারা সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে মুসলিমদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করলে মহানবী (সা.) তা মেনে নেন। উমরা করতে না পারা, কুরাইশ কাফিরদের বাড়াবাড়ি ও প্রতারণা সত্বেও মহানবী (সা.) উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে রাজী হন। আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের শপথগ্রহণে এতই খুশি হন যে, তিনি কুরআনুল কারীমে এ চুক্তিকে 'ফাত্হুম্ মুবিন' বা 'স্পষ্ট বিজয়' বলে অভিহিত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?
(ক) ৬২৪ (খ) ৬২৫ (গ) ৬২৭ (ঘ) ৬২৮

২. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিধর্মী কুরাইশদের মন জয় করেন-
i. উদারতা দিয়ে; ii. মহানুভবতা দিয়ে; iii. ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে অর্জিত হয়-
i. মদিনা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি; ii. দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের অবসান; iii. শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের ইসলাম গ্রহণ।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও iii (খ) ii ও iii (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

নানাবিধ কারণে সংখ্যালঘু দলের নেতা আজমতউল্লাহ নিজ দেশ ছেড়ে স্বীয় অনুসারীদের নিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে নিজ দেশে ফিরে আসলে উগ্রপন্থীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। ফঠেল তিনি উগ্রপন্থীদের সাথে আলোচনা ও সমঝোতা সাপেক্ষে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। আপাত দৃষ্টিতে উক্ত সন্ধি সংখ্যালঘুদের প্রতিকুলে মনে হলেও পরবর্তীতে তা অনুকুল বলে প্রতিফলিত হয়।

(ক) হুদাইবিয়ার সন্ধির কার্যাবলীকে সম্পাদন করেন? ১
(খ) বায়তুর বিদরওয়ান কী? ২
(গ) উদ্দীপকের সন্ধির সঙ্গে তোমার পঠিত কোন সন্ধির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সন্ধির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.৭ মক্কা বিজয় (৬৩০ সাল)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আপনি মক্কা বিজয়ের ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মক্কা বিজয়ের কারণ ও এর সুদূর প্রসারী ফলাফল জানত পারবেন ও
- মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মক্কা বিজয়, বনী বকর গোত্র, বনী খুযায়া গোত্র ও রক্তপণ**

মক্কা বিজয়ের পটভূমি

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ছিল আরবের অন্যান্য জাতি সম্প্রদায় তাদের ইচ্ছামতো মুসলিম অথবা কুরাইশ যে কোনো পক্ষের সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দু'বছর কেটে অষ্টম হিজরীর রমযান আসল। সন্ধি মোতাবেক আরব গোত্রসমূহের মধ্য থেকে বনী খুযায়া গোত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে এবং তাদের শত্রুপক্ষ বনী বকর কুরাইশদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ দু'গোত্রের মধ্যে বহুদিন যাবৎ যুদ্ধবিগ্রহ চলে আসছিল। ইসলাম বিকাশের ফলে আরবরা মুসলিমদের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। কাজেই এ সময় তাদের পারস্পরিক লড়াই-সংঘাত বন্ধ থাকে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বনী বকর গোত্র তখন মনে করল, এখন প্রতিশোধ নেয়ার সময় এসেছে। তারা আকস্মাৎ বনী খুযায়ার ওপর আক্রমণ করে বসে। এতে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ যুদ্ধসম্ভার দিয়ে তাদের সাহায্য করে। ইকরামা ইবনে আবু জাহল, সাফওয়ান বিন উমাইয়া, সোহায়ল ইবনে আমর প্রমুখ রাত্রির অন্ধকারে মুখোশ পরে বনী বকরের সাথে যোগদান করেছিল। বনী খুযায়া অনন্যোপায় হয়ে হারাম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে। হারাম শরীফের মর্যাদা রক্ষা জরুরি মনে করে বনী বকর বিরত হয়, কিন্তু নওফেল বলল, "এরূপ সুবর্ণ সুযোগ আর মিলবে না।" শেষ পর্যন্ত হারামের অভ্যন্তরেই বনী খুযায়ার লোকদের হত্যা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ঘটনা জানতে পেরে অত্যন্ত মর্মহত হন। তিনি কুরাইশদের দূত মারফত জানিয়ে দিলেন, নিম্নলিখিত তিনটি শর্তের কোনটি তোমরা মেনে নেবে জানতে চাই? শর্ত তিনটি হলো-

১. যুদ্ধে নিহতদের রক্তপণ (দিয়াত) দেয়া হোক।
২. কুরাইশ বনী বকরকে সাহায্যদান থেকে বিরত হোক।
৩. অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল ঘোষণা করা হোক।

তখন কুরাইশ পক্ষ থেকে কুরতা বিন উমর ঘোষণা করল, আমরা তৃতীয় শর্ত মেনে নিলাম, কিন্তু দূত চলে যাওয়ার পর কুরাইশদের বোধোদয় হয়। তারা আবু সুফিয়ানকে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি নতুন করে স্বাক্ষর করার জন্য দূত হিসেবে পাঠায়। কিন্তু মুসলিমগণ তা মেনে নেয়নি।

মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অষ্টম হিজরী সনের ১৮ রমযান রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায় দশ হাজার অনুরক্ত ভক্ত সাথে নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। মুসলিম বাহিনী যথাসময়ে মক্কার নিকটবর্তী মাররুয যাহরান উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে শিবির স্থাপন করে। আরবদের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) সেনাবাহিনীকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আগুন জ্বালাবার নির্দেশ দেন, তাতে সমগ্র মরুভূমি ঝলমল করে ওঠে। কুরাইশ প্রধানগণ এ দৃশ্য দেখে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য হাকিম বিন হিযাম, আবু সুফিয়ান ও বুদায়লকে পাঠায়। তাঁবু প্রহরারত মুসলিম সৈন্যরা আবু সুফিয়ানকে ধরে ফেললেন। তাকে বন্দি করা হয়। পরে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানকে বললেন- আবু সুফিয়ান, তুমি গিয়ে মক্কাবাসীদের অভয় দাও- আজ তাদের প্রতি কোনোই কঠোরতা করা হবে না। তুমি আমার পক্ষে নগরময় ঘোষণা করে দাও-

১. যারা আত্মসমর্পণ করবে,
২. যারা কাবায় প্রবেশ করবে,
৩. যারা নিজেদের গৃহদ্বার বন্ধ করে রাখবে, অথবা
৪. যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, তাদের অভয় দেয়া হলো।

মক্কায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা.) হনুজ নামক স্থানে ঝাণ্ডা উড্ডীন করতে এবং সৈন্যদের নিয়ে হযরত খালিদ (রা)-কে উচ্চভূমির দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ করেন। মহানবী (সা.) মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেন, যতক্ষণ কেউ তোমাদের সাথে লড়াই না করবে, তোমরাও লড়াই করবে না। কুরাইশদের থেকে ইকরামা ও সাফওয়ান তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করে। এতে কুরয ইবনে জাবির ফিহরী ও কুনায়স ইবলে খালিদ ইবনে রবিয়া শহীদ হন। হযরত খালিদ প্রতিশোধ গ্রহণ আরম্ভ করলে যুদ্ধ বেঁধে যায়। এতে ৭০ জন কাফিরকে হত্যা করে ফেলেন।

বায়তুল্লায় প্রবেশ ও সালাত আদায় ঃ রাসুলুল্লাহ (সা.) আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে মসজিদে হারাম বায়তুল্লায় প্রবেশ করলেন। ভক্তিভরে তার চারপার্শ্বে তাওয়াফ করলেন ও হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। হযরত উমর ও আলী (রা:) কে বায়তুল্লাহ হতে ৩৬০ টি মূর্তি অপসারণ করে কাবাঘর পবিত্র করতে আদেশ দিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) কাবাঘরে প্রবেশ করে দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন ও তাকবিরের ধনিতে বায়তুল্লাহ মুখরিত হল। অতঃপর তিনি কাবাঘরের দরজা খুললেন।

মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব

ইসলামের বিজয় ঃ সুদীর্ঘ একুশ বছর ধরে মুসলিমরা কুরাইশদের যে অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করে আসছিলেন, এদিন তার পরিসমাপ্তি ঘটে। রক্ত দ্বারা নয়, মহানবী (সা.) প্রেম দ্বারা মক্কা বিজয় সম্পন্ন করেন। এরূপ রক্তপাতহীন বিজয় দুনিয়ার ইতিহসে নজিরবিহীন। মক্কা বিজয়ের অর্থই হচ্ছে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ইসলামের জয়। কেননা মক্কাই তখন ছিল পৌত্তলিকতার কেন্দ্রস্থল। অন্যদিকে এ বিজয় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এমন এক উচ্চাসন প্রদান করে, যার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে তিনি আরব উপদ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন। মক্কা বিজয়ের স্বাভাবিক পরিণতিই হলো সমগ্র আরবে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। মক্কা বিজয়ের অন্যান্য সুফল নিম্নরূপ-

১. আরব উপদ্বীপে মিল্লাতে ইবরাহীম প্রতিষ্ঠা হয়।
২. গোটা আরব দেশ মদিনার ইসলামী সরকারের অধীনে আসে।
৩. আরবের যে সকল গোত্র এত দিন পর্যন্ত ইসলাম বোঝেনি তারাও ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে পৌত্তলিকতার পক্ষে কথা বলার কেউ থাকল না।
৪. আরব উপদ্বীপে ইসলাম ছাড়া অপর কোনো ধর্মের অস্তিত্ব থাকেনি। অবশ্য এ অবস্থা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে আরো ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়।
৫. কাবা শরীফ তথা মসজিদুল হারাম এলাকা চিরকালের জন্য অমুসলিমদের আওতার বাইরে চলে যায়।
৬. মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলিমদের চিরকালের জন্য হজ্জ, উমরা ও তাওয়াফের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মক্কা বিজয়ের পর আজ পর্যন্ত এ তিনটি কাজ কোনো সময়েই ব্যাহত হয়নি।

ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "এ বিজয়ের ফলে মুসলিম হৃদয় বিশ্ব জয়ের ধারণা ও শক্তি সঞ্চয় করে এবং মহানবী (সা.) পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দূত প্রেরণ করতে সক্ষম হন।"

মক্কা বিজয় কী আক্রমণাত্মক?

ক. সন্ধিমূলক বিজয় ঃ ঐতিহাসিক ও ইসলামী চিন্তাবিদদের একাংশ মনে করনে, মক্কা বিজয় সন্ধির মাধ্যমে হয়েছিল; যুদ্ধের মাধ্যমে নয়। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন-

১. মক্কা বিজয়ে দিন মহানবী (সা.) মক্কার লোকদের বিভিন্নভাবে নিরাপত্তা দান করেন। আবু সুফিয়ানের সাথে পূর্বেই আলোচনার মাধ্যমে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছিলেন-
২. তদুপরি কোনো এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হলে সে এলাকার ভূমি মুসলিম মুজাহিদের মাঝে বণ্টন দেয়া হয়। অথচ মক্কা বিজয়ের পর তা করা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয়, যুদ্ধ নয়; বরং সন্ধির মাধ্যমেই মক্কা বিজিত হয়েছিল।

খ. আক্রমণাত্মক বিজয় ঃ ঐতিহাসিক এবং ইসলামী পণ্ডিতদের অধিক সংখ্যক মনে করেন, মক্কা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল। তারা যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, এ বিজয় অর্জন করতে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনী যুদ্ধ করে প্রায় ৭০ জন কাফিরকে হত্যা করেছিলেন। যুদ্ধ না হলে এমনটা হতো না। তবে এ অভিমত দুর্বল; বরং পূর্বোক্ত মতই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মক্কা বিজয় শুধু ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনাই করেনি; বরং এ বিজয় একটি সুবিশাল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রযাত্রা। এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে মক্কা তাওহীদের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই

ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন- That through all the annals of conquest there has been no triumphant entry like unto this one.

শিক্ষার্থীর কাজ	মক্কা বিজয় সম্পর্কে ধারণা দিন।

হিজরীর কত সালে মক্কা বিজয় সংঘঠিত হয়?	কোন ঘটনা মক্কা বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ?	কুরাইশরা কাবাঘরে কতটি মূর্তি স্থাপন করেছিল?	মক্কা বিজয়ের পূর্বে কোন ঘোরতর শত্রু ইসলাম গ্রহণ করে?

সারসংক্ষেপ :

এ সে মহান বিজয় যে বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন, রাসুলুল্লাহ, মুজাহিদ বাহিনী ও দ্বীনের আমীনদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। ইহা ছাড়া মক্কা শহর ও কাবা ঘরকে দুনিয়ার মানুষের জন্য হিদায়াতের বস্তুতে পরিণত করেছিলেন। কাফির ও মুশরিকদের হাত হতে এ ঘরকে মুক্ত করেছিলেন। এ মহান বিজয়ের ফলে আসমানের বাসিন্দাদের মধ্যে সুসংবাদ ও আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। এ বিজয়ে আল্লাহর মনোনীত দ্বীনে ইসলামে লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করতে লাগল। মহানবী (সা.) কোনরকম প্রতিশোধ গ্রহনের ইচ্ছার পরিবর্তে মক্কার শত্রুদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তাই মক্কা বিজয় একটি রক্তপাতহীন বিজয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মহানবী (সা.) কোন বিজয়ের পর সকলকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করেন?
   (ক) বদর যুদ্ধের (খ) খন্দক যুদ্ধের
   (গ) হুদায়াবিয়ার সন্ধির (ঘ) মক্কা বিজয়ের

২. কোন ঘটনার পর কাবা ঘর থেকে ৩৬০ টি মূর্তি অপসারণ করা হয়
   (ক) হিজরতের পর (খ) মক্কা বিজয়ের পর
   (গ) বদর যুদ্ধের পর (ঘ) কোনটিই নয়

৩. বিশ্ব ইতিহাসে রক্তপাতহীন বিজয় কোনটি
   (ক) হিজরত (খ) মক্কা বিজয়
   (গ) বদর যুদ্ধ (ঘ) কোনটিই নয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রাচীন কালে 'ক' রাজ্যে একজন সত্যবাদী ও জন নন্দিত নেতার আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহবান জানান। এতে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি তাকে ও তার অনুসারীদের সে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে। তাদের অনেককে হত্যা করে। ফলে তারা দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। অনেক বছর পর আশ্রিত রাজ্যের আরো অনেক লোকসহ তারা স্বদেশে ফিরে আসে। 'ক' রাজ্যের জনগণ এতে খুবই আতংকিত হয়। কিন্তু সে মহান নেতা সকলকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে ভালোবাসায় বুকে জড়িয়ে নেন।

(ক) কত সালে মক্কা বিজয় হয়? ১
(খ) হাজরে আসওয়াদ কী? ২
(গ) উদ্দীপকের ঘটনাটি হযরত মোহাম্মদ (স:) এর কোন ঘটনাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) 'মক্কা বিজয় ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র রক্তপাতহীন বিজয়'- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

পাঠ-৪.৮ হুনায়ুনের যুদ্ধ (৬৩০ খ্রি. ৮ম হিজরী)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হুনায়ুনের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**হুনাইন, বনু সাকিফ, বনু হাওয়াযেন, মালেক ইবনে আওফ, নাজরানের খ্রীস্টান, সানাতুল অফূদ, যেমাম ইবনে সালাবা ও তায়েফ দূর্গ**

হুনাইনের যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের পর অবশিষ্ট সমগ্র কুফরি শক্তি আরো একবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের পতনের প্রচেষ্টা চালায়। তায়েফের হাওয়াযেন ও সাকিফ গোত্র এতে নেতৃত্ব দেয়। তাদের সংগঠিত বিশ হাজার সৈন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করে। অষ্টম হিজরীর শেষভাগে হুনাইন প্রান্তরে তাদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ হয়। ইতিহাসে এটাই হুনাইনের যুদ্ধ নামে খ্যাত।

হুনাইন যুদ্ধের কারণ

ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "মক্কা বিজয়ের পর কাবা গৃহ মুসলিমদের হাতে চলে যায়। ফলে কাবা গৃহে সংরক্ষিত প্রতিমাগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে উৎখাত হয়। এ ঘটনা কাফিরদের কাছে অসহ্য ছিল। তাই তারা গোপনে গোপনে কাবা ঘর পুন: দখলের চেষ্টা করছিল।" বনু সাকিফ, বনু হাওয়াযেন, বনু জুযাম, বনু নাসর ও বনু সাদ গোত্রসহ বেশ কিছু গোত্র মন থেকে প্রতিমা পূজার মায়া ত্যাগ করতে পারছিল না। বিশেষ করে বনু সাকিফ ও বনু হাওয়াযেন গোত্রদ্বয় তাদের পৌত্তলিকতা ও নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্য মালেক ইবনে আওফের নেতৃত্বে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত তায়েফের নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে তাদের বসতি ছিল। তারা নানা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছিল। কুরাইশদের ন্যায় তারাও ছিল পৌত্তলিক। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত নানাভাবে তারা আরবের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধে সাহায্য করে আসছিল। এতদিন মক্কা ছিল কুরাইশদের হাতে। তাই তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করতো, কিন্তু যখন দেখল মুহাম্মদ (সা.) মক্কা জয় করে নিয়েছেন এবং কুরাইশ ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্ন দেখতে পায়। মুসলিম বাহিনী তাদেরও আক্রমণ করতে পারে- এ আশঙ্কায় তারা কালবিলম্ব না করে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের আয়োজন শুরু করে। তায়েফের বনু সাকিফ গোত্রও হাওয়াযিনদের সাথে যোগ দিয়ে কালবিলম্ব না করে তা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "বেদুইন পৌত্তলিক গোত্রগুলো মুসলিমদের বিনাশ সাধনের মাধ্যমে বাণিজ্য সুবিধাসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে একচেটিয়া প্রাধান্য বজায় রাখার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল।" সর্বোপরি, মুসলিমদের সার্বিক উন্নতি দেখে বেদুইন গোত্রগুলো বুঝতে পেরেছিল, তাদের মুসলিমদের কাছে হয়তবা আত্মসমর্পণ করতে হবে। এরূপ আশঙ্কা বোধ করে তারা মুসলিমদের ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

হুনাইন যুদ্ধের ঘটনা

এ সংবাদ মহানবী (সা.)-এর নিকট আসলে তিনি বনু সাকিফ ও হাওয়াযিনের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে হুনাইন উপত্যকায় বারো হাজার সৈন্য সমাবেশ করেন। শত্রু সৈন্যরা হুনাইন উপত্যকায় সমবেত হয়েছিল। এবার মুসলমনাদের সংখ্যা শত্রু সংখ্যা থেকে অধিক। তারা সর্বমোট ছিল বারো হাজার, তন্মধ্যে দশ হাজার মুহাজির। যুদ্ধের প্রথমদিকে পাহাড়ের উপত্যাকা ও চূড়া থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে মুসলিমদের নাজেহাল করে। যদি না আল্লাহর সাহায্য আসতো, তবে এ যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে নিতে বাধ্য হত। অবশেষে মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের বীরত্বে মুসলিমরা জয়লাভ করে।

হুনাইন যুদ্ধের ফলাফল

ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "এ যুদ্ধে কাফিরদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ৭০ জন কাফির নিহত আর ৬,০০০ জন বন্দী হয়। এ যুদ্ধে পরাজয় বরণের পর কাফিররা হতোদ্যম হয়ে পড়ে।" এ যুদ্ধে কাফিরদের অজস্র অস্ত্রশস্ত্রসহ ২৪,০০০ উট এবং ৪১,০০০ তোলা স্বর্ণ-রৌপ্য মুসলিমদের হাতে চলে যায়। অপর পক্ষে ৪ জন অথবা ৫ জন মুসলিম মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।" কাফিরদের শেষ অহংকারটুকুও এ যুদ্ধে বিলীন হয়। কারণ ২০ হাজার কাফির তাদের সৈন্যসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মুসলমানের কাছে এবারও পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমদের জয়লাভ করার পর পরাজিত শত্রুর অনেকেই তায়েফ দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিকল্পনা করে। মহানবী (সা.) আবু মুসার নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করলে তায়েফবাসী আত্মসমর্পন করে।

আরব গোত্রসমূহের রাসূলের দরবারে আগমন

মক্কা বিজয় পরবর্তী হুনাইনের বিজয়ের পর বিভিন্ন গোত্র থেকে দূত দল এসে মদিনায় ইসলাম কবুল করে অথবা নিজেদের লোকালয়ে মুসলিম হয়ে মদিনায় এসে তাঁর অনুমোদন নেয়। কোনো কোনো দূত দল রাজনৈতিক চুক্তির জন্য আসে, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। কেউ কেউ মুসলিম না হয়েই ফিরে যায়; পরে ইসলাম গ্রহণ করে।

সানাতুল অফূদ ঃ নবম হিজরীতে দূত দল আগমন শুরু হয়। এজন্য এ বছর ইতিহাসে 'সানাতুল অফূদ' বা 'দূত দল আগমনের বছর' নামে খ্যাত। এ দূত দলের সংখ্যা একশর ওপর ছিল। দু'চারটি ছাড়া অধিকাংশ দলই মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে এসেছিল। এদের মধ্যে দু'একজন বাদে সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। নিম্নে কয়েকটি বিখ্যাত দূত দল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সাকিফ গোত্রের দূত দল ঃ তাবুক অভিযানের পরে সাকিফ গোত্রের দূত দল মহানবী (সা.)-এর দরবারে আগমন করে। তিনি মসজিদে নববীর নিকট তাদের তাঁবু খাটানোর ব্যবস্থা করে দেন, যাতে তারা কাছে থেকে মুসলিমদের দেখতে এবং কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পায়। কয়েকদিন মদিনায় থাকার পর এ দূত দল ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) উসমান ইবনে আবুল আসকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করেন।

বিভিন্ন গোত্রের দূত দলের আগমন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন মসজিদে নববীতে বসে ছিলেন, এ সময় বনী সাদ গোত্রের নেতা যিমাম ইবনে সালাবা উষ্ট্রে আরোহণ করে মসজিদের একেবারে দরজায় এসে বাহন থেকে নেমে সরাসরি মজলিসে আসে এবং জিজ্ঞেস করে, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র কে? সাহাবগণ মহানবী (সা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করেন। তখন সে মহানবী (সা.)-কে বলল, "আপনার নিকট আমার কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে।" মহানবী (সা.) বললেন, যে ধরণের প্রশ্নই হোক জিজ্ঞেস করুন। অতঃপর তাঁকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করা হলে তিনি তার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন। এতে সে তখনই ইসলাম গ্রহণ করে গোত্রে ফিরে গিয়ে সমগ্র গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করে নেয়। এভাবে ইসলামের প্রসার হতে থাকে। এরপর ক্রমান্বয়ে বনু ফাযারা, বনু তামিম, বনু আবদুল কায়স, বনু হানিফা, বনু কাহতান এবং বনু হারিস প্রমূখ গোত্রসমূহ ইসলাম গ্রহণ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	হুনাইন যুদ্ধের ঘটনাবলী বিবৃত করুন।

কত সালে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়?	হাওয়াযিন গোত্রের নেতার নাম কী?	'সানাতুল-অফুদ' অর্থ কী?	হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমাতের তালিকা লিখ?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন ছিল বিধর্মী কাফিরদের নানা ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারে আকীর্ণ। মহান আল্লাহর তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামকে প্রচারের জন্য কাজ করতে গিয়ে শত্রুর ব্যপক বাধার সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য ছিল অনেক। মুসলিমদের জেহাদের ময়দানে অবিচল থাকার ফলে সরাসরি আল্লাহর যে সকল সাহায্য এসেছিল, হুনাইনের যুদ্ধ তাদের মধ্যে অন্যতম। মক্কার নিকটবর্তী গোত্রসমূহ এ যুদ্ধের অব্যাহতি পরে ইসলামের ছায়াতলে আত্মসমর্পন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন ঘটনার পর হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
(ক) বদর যুদ্ধের (খ) খন্দক যুদ্ধের
(গ) হুদায়াবিয়ার সন্ধির (ঘ) মক্কা বিজয়

২. কোন ঘটনার পর আরব গোত্রসমূহ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসে?
(ক) ওহুদ যুদ্ধের (খ) খন্দক যুদ্ধের
(গ) হুদায়াবিয়ার সন্ধির (ঘ) হুানাইনের যুদ্ধ

৩. হুনাইনের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
(ক) ৬৩০ (খ) ৬২৯
(গ) ৬২৮ (ঘ) ৬২২

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

অভিযান ও যুদ্ধ	মক্ক বিজয়:৬৩০ সাল	----------যুদ্ধ: ৬৩০ সাল	তাবুক অভিযান: ৬৩০ সাল
প্রতিপক্ষ	কুরাইশ	হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রদ্বয়	রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস

(ক) হুনায়ুনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নেতা কে ছিলেন? ১
(খ) সানাতুল অফুদ বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকের ছকটির শূন্যস্থানে কোন যুদ্ধের ইংগিত দেয়া হয়েছে? যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করুন। ৩
(ঘ) ‘ উক্ত যুদ্ধের পরে ইসলামের প্রচার বৃদ্ধি পায় ’- উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.৯ মুতার যুদ্ধ ও তাবুকের অভিযান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুতার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তাবুক যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**তাবুক, রোম সাম্রাজ্য, শোরাহবিল বিন আমরের, হিরাক্লিয়াস, মসজিদে যেরার, মুতার যুদ্ধ, যায়েদ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবি তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা**

মুতার যুদ্ধ

মুতা শাম (সিরিয়া)-এর অন্তর্গত 'বালক' রাজ্যে সীমান্তে অবস্থিত। অষ্টম হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ পর্যন্ত মুসলিমদের সাথে আরব এলাকার ইহুদি ও মুশরিকদের মোকাবেলা হয়ে আসছিল। এখন রোমীয় খ্রিস্টান রাজশক্তি মুসলিম ও ইসলামের বিস্তারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

যুদ্ধের কারণ ঃ যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, মহানবী (সা.) হারেস ইবনে উমায়র আযদীকে চিঠি দিয়ে শাম অথবা বসরায় প্রেরণ করেছিলেন। রোমকদের অধীন বসরার গভর্নর শোরাহবিল ইবনে আমর গাসসানী (যে অনেক আগে আরব থেকে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল) সব আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে মুসলিম দুতকে হত্যা করে। শোরাহবিলের অন্যায় হত্যাকাণ্ডে মহানবী (সা.) অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। ইহুদিদের অব্যাহত বিরোধিতার কারণে তাদের পক্ষ থেকে কিছুটা নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তিন হাজার মুসলিম সৈন্য সেখানে প্রেরণ করেন।

রাসূল (সা.)-এর নসিহত

মুতার যুদ্ধে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবি তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে বিশেষভাবে প্রেরণ করা হয়। সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয় হযরত হযরত যায়েদ (রা)-কে। সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, যায়িদ শহীদ হলে জাফর নেতৃত্ব দিবে, সে যদি শহীদ হলে জাফর ইবনে আবি তালিব, সেও যদি শহীদ হয় তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। মুসলিম বাহিনী প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) নসীহত করেন:

১. যেসব আল্লাহর বান্দা নিজেদের ইবাদতখানায় ইবাদতে রত থাকবে, তাদের ওপর হামলা করবে না।
২. কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি হাত বাড়াবে না।
৩. কোন শিশুকে হত্যা করবে না।
৪. কোনো বৃদ্ধ লোককে হত্যা করবে না।
৫. শস্যক্ষেত্র ও ফলবাগান ধংস করবে না।

ঘটনাবলী ঃ শোরাহবিল মুসলিম বাহিনীর অভিযান সংবাদ পেয়ে এক লক্ষ সুসজ্জিত সৈন্য নিয়ে মোকাবেলা করার জন্য অগ্রসর হয়। স্বয়ং রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত ছিল। মুসলিমগণ এ সংবাদ অবগত হয়ে খানিকটা ইতস্তত বোধ করছিলেন এবং কী করা যায় ভাবতে লাগলেন। এ আলোচনায় সিদ্ধান্ত হলো, মহানবী (সা.)-কে পত্র মারফত জানানো হবে, হয়ত তিনি সাহায্য প্রেরণ করবেন অথবা যে হুকুম করবেন তা পালন করা হবে। মুসলিম বাহিনীর এ রকম মানসিক দোদুল্যমান অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) মুসলিম সৈন্যদের বললেন, 'মুজাহিদগণ! তোমরা শাহাদাতের সন্ধানে বের হয়েছ। আজ একে কীরূপ দৃষ্টিতে দেখছ? আমরা শক্তি ও সংখ্যার ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ করি না, আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিতে যুদ্ধ করি। দুটি পুণ্যের মধ্যে একটি তো অবশ্যই আমরা লাভ করব; বিজয় অথবা শাহাদাত। তাঁর এ বক্তৃতায় মুসলিম বাহিনী নবপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সকলেই বলে ওঠেন, আবদুল্লাহ ঠিকই বলেছে। ফলে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত ক্ষুদ্র তিন হাজার সৈন্য এক লাখেরও অধিক খ্রিস্টান ফৌজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।
হযরত যায়িদ (রা) বর্শার আঘাতে শহীদ হন। হযরত জাফর (রা) তাঁর স্থান গ্রহণ করেন। তিনিও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। তাঁর এক হাত কেটে গেলে অপর হাতে ঝাণ্ডা ধারণ করেন। সেটি কেটে গেলে তিনি বাহু দ্বারা যুদ্ধ ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখেন। সর্বশেষ তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর পর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে নেন।

তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আবুদল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা) শহীদ হলে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) ঝাণ্ডা হাতে নেন। তিনি এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন যে, সেদিন তাঁর হাতে নয়টি তরবারি ভেংগে যায়। সেদিনই তিনি তাঁর যুদ্ধ অভিজ্ঞতার পূর্ণ পরিচয় দেন। চূড়ান্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে আল্লাহর মেহেরবানীতে পুরো ইসলামী ফৌজকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করেন। প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে দেড় দিন পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধের পর মুসলিম সৈন্যরা নিজেদের তুলনায় চল্লিশগুণ অধিক শত্রু সৈন্যকে ময়দান ছাড়তে বাধ্য করেন। এ যুদ্ধে শুধু বারো জন মুসলিম শহীদ হন এবং কাফিরদের পক্ষে হাযারেরও অধিক সৈন্য মারা যায়। এ যুদ্ধের পরই হযরত খালিদ (রা) 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারি) খেতাবে ভূষিত হন। মুসলিম গাযিদের ফেরার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) মুতার যুদ্ধক্ষেত্রে পর পর তিন জন সেনাপতির শাহাদাতের খবর শোনাচ্ছিলেন আর তাঁর চক্ষু বেয়ে টপ টপ করে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। অবশেষে তিনি বললেন, 'সাইফুম মিন সুয়ূফিল্লাহ' যুদ্ধের পতাকা বহন করেছে, আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করেছেন।

তাবুক অভিযান (৬৩০ খ্রি.)

সত্য-মিথ্যার সংঘাত পৃথিবীর ইতিহাসের চিরন্তন অনিবার্য অধ্যায়। ইতিহাসের এ রূঢ় বাস্তবতার ফলেই মহানবী (সা.)-এর ইসলামী মিশন ক্ষণিকের স্তব্ধতা নিয়ে অপশক্তির মুখোমুখি হয়েছিল। এভাবে ক্রমান্বয়ে মিথ্যার প্রচণ্ড শক্তির দপূ চূর্ণ করে বিশ্ব বিজয়ের সোপান আবিষ্কৃত হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসের এরূপ একটি ঘটনা হলো তাবুক যুদ্ধ। তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তদানীন্তন বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রোমানদের বিরুদ্ধে। হিজরী নবম সাল মোতাবেক ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মদিনা থেকে ৪০০ মাইল দূরে সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত তাবুক নামক স্থানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

তাবুক যুদ্ধের কারণ

রোম সাম্রাজ্যের অধীন সিরিয়ার শাসক শোরাহবিল বিন আমরের লক্ষাধিক খ্রিস্টান সৈন্যকে মুতার যুদ্ধে মুসলিমগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলে রোমান সম্রাট ক্ষুদ্ধ হন। ফলে তিনি মুসলিমদের সমুচিত শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুসলিম বিদ্বেষী-ইহুদি চক্র রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ প্রদান করলে তিনি এটাই নবোত্থিত মুসলিম শক্তিকে পর্যুদস্ত করার মোক্ষম সুযোগ বলে মনে করেন। রোমান সম্রাট এ মিথ্যা সংবাদে উৎসাহী হয়ে মদিনা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

রোমানদের অভিযান ঃ ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস মদিনা আক্রমণের বিষয়টি চূড়ান্ত করে। রোমান সাম্রাজ্যের অধীন লাখম, জুযাম, গাসসান, আমেলাহ প্রভৃতি কয়েকটি আরব গোত্রও প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে রোমান বাহিনীতে শামিল হয়। রোমানদের যুদ্ধাভিযানের খবর পেয়ে তা প্রতিহত করা এবং সিরিয়া অভিমুখী বাণিজ্যিক পথ নিরাপদ রাখার জন্য মুসলিম মুজাহিদগণ সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর পদাতিক সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০,০০০, আশ্বারোহী ৩০,০০০। মদিনা থেকে ৪০০ মাইল দূরে সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত তাবুক নামক স্থানে মুজাহিদ বাহিনী শিবির স্থাপন করে। রোমান সৈন্যরা মুসলিমদের বিরাট আয়োজন ও শক্তিসাহস দেখে সামনে অগ্রসর হয়নি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেখানে ২০ দিন অবস্থান করে রমযান মাসের মধ্যেই ফিরে আসেন।

তাবুক অভিযানের ফলাফল ঃতাবুক যুদ্ধে তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি রোমান বাহিনীর পরাজয়বরণের ফলে উত্তর আরবের সীমান্ত অঞ্চলের রোমানদের অধীনস্থ ছোট ছোট রাজ্যসমূহের প্রধানগণ মদিনা-রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে জিযিয়া কর প্রদানে সম্মত হয়। এ অভিযানের পর আরব উপদ্বীপ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনগণ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে।

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ঃ মুসলিমদের মধ্যে কীভাবে কলহ-বিবাদ বাধানো যায় মুনাফিকরা সর্বদা এ চিন্তায় মগ্ন থাকত। তাছাড়া অনেকদিন ধরে তারা এ চিন্তায় মগ্ন ছিল, কুবা মসজিদের মতো অন্য আর একটি মসজিদ এ বাহানায় তৈরি করা প্রয়োজন। যারা দুর্বল অথবা অন্য কোনো কারণে কুবার মসজিদে বা মসজিদের নববীতে যেতে না পারে, তারা এখানে এসে সালাত পড়বে। এ উসিলায় তাদের গোপন ষড়যন্ত্রের একটি কেন্দ্র তৈরি হবে। আবু আমের রাহেব নামক ধর্মত্যাগী ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে তাবুক অভিযানের পূর্বে কুবার মসজিদের কাছেই মুনাফিকরা একটি মসজিদ তৈরি করে। কুরআন মাজীদে একে মসজিদে যিরার বলা হয়েছে। প্রকাশ্যে তা মসজিদ ছিল, আসলে ছিল মুনাফিকদের একটি ষড়যন্ত্র ঘাঁটি। তাবুক থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ (সা.) যিয়াওয়ানে পৌছলে আল্লাহ তায়ালা এ মসজিদ প্রতিষ্ঠায় মুনাফিকদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি মালিক ইবনে দাখশাম ও মান ইবনে আদীকে আদেশ করেন, "যাও, মুনাফিকদের নবপ্রতিষ্ঠিত মসজিদটি জ্বালিয়ে ধংস করে দাও।" তৎক্ষণাৎ তাঁরা সে আদেশ পালন করেন। এভাবে তা ধংস হয়ে যায়।

তাবুক অভিযান থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফিরে আসার পর নবম হিজরীর যিলকদের শেষ বা যিলহজ্জের প্রথম দিকে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্বে তিনশ' হাজীর একটি দল হজ্জ সমাপনের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত

আলী (রা)-কে ঘোষণাকারী নকীব-এর দায়িত্ব দেয়া হয। কুরআন হাকীমে সে দিনের হজ্জকে 'হজ্জে আকবর' বলা হয়েছে। কেননা এ হজ্জই ইবরাহীম (আ)-এর অনুসৃত নীতির ওপর অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং অন্ধকার যুগের সমস্ত রীতিনীতি রহিত হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	তাবুক ও মুতার যুদ্ধের একটি ছক অংকন করুন।

তাবুক ও মুতার যুদ্ধ কোন্ কোন্ নগরীতে অনুষ্ঠিত?	এ দুটি যুদ্ধের সেনাপতিদের নাম লিখ।	কোন যুদ্ধে চারজন সাহাবী সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন?	কোন ঘটনায় মসজিদে যিরার প্রতিষ্ঠিত হয়?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় বড় দুটি গাযওয়াহ হলো মুতার যুদ্ধ ও তাবুক অভিযান। অভিযান দুটিই ছিল মক্কা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী অঞ্চল সিরিয়ার রোমান শাসকদের বিরুদ্ধে। এর মাধ্যমে আরবের সীমারেখার বাইরে গিয়ে ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করার প্রেরণা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়েই অনুমোদিত হয়। একদিকে তাবুক অভিযানে কৌশল অবলম্বন করে শত্রুকে ভয়-ভীতির মধ্যে রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে মুতার যুদ্ধে একাধিক মুসলিম সেনাপতির শাহাদাত বরনের ঘটনার মধ্যদিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনী যে কোন যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রশিক্ষণ লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হুনাইনের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
   (ক) ৬৩০ (খ) ৬২৯
   (গ) ৬২৮ (ঘ) ৬২২

২. হুনাইন ও তাবুকের অভিযান কোন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়?
   (ক) রোমান সাম্রাজ্যে (খ) গ্রীক সাম্রাজ্যে
   (গ) পারস্য সাম্রাজ্যে (ঘ) কোনটিই নয়

৩. কোন যুদ্ধে পর পর তিনজন মুসলিম সেনাপতি শহীদ হয়েছিলেন?
   (ক) হুনাইনের যুদ্ধে (খ) তাবুকের যুদ্ধে (গ) মুতার যুদ্ধে (ঘ) ক ও খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

ফরহাদ একজন দেশপ্রেমিক ও ধার্মিক সৈনিক ছিলেন। তিনি কোন এক অভিযানে সাধারণ সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু উক্ত যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির মৃত্যু ঘটলে তিনি তাৎক্ষনিকভাবে সে যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। হঠাৎ করে শত্রুদল তাকে ঘেরাও করে একে একে তার হাত দুটো কেটে ফেলে। তখন তিনি তার দেশের পতাকা বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরেন। এবং দেশের পতাকা সমুন্নত করে বীরত্বের সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

(ক) কত সলে মুতার যুদ্ধ সংগঠিত হয়? ১
(খ) মুতার যুদ্ধে প্রদত্ত মোহাম্মদ (স:) এর উপদেশগুলো লিখুন। ২
(গ) উদ্দীপকের ঘটনাটি কোন মুসলিম সেনাপতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? উক্ত যুদ্ধের বিবরণ দিন। ৩
(ঘ) ' তাবুক যুদ্ধের মাধ্যমে রোমানরা ইসলামের ছায়াতলে আসে'- যুক্তিসহ লিখুন। ৪

পাঠ-৪.১০ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইহুদিদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সম্পর্কের বিষয়ে জানতে পারবেন এবং
- খ্রিস্টানদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চুক্তির বিষয়ে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ইহুদি, তাওরাত, কাব বিন আশরাফ, বনু কায়নুকা, বনু নযির, বনু কুরায়যা, সেন্ট ক্যাথেরিন, নাজ্জাশি, আবু লুবাবা ও সাদ বিন মুয়াজ**

ইহুদীদের সঙ্গে রাসূল (সা.) এর সম্পর্ক

নবী হিসেবে গ্রহণ ঃ ইহুদিদের তাওরাত কিতাবে মহানবী (সা.) এর আগমন ও অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ ছিল। তাই ইহুদিরা তাওরাত পাঠ করে আগে থেকেই মদিনায় মহানবী (সা.) এর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং মক্কায় আবির্ভাব হওয়ার পররই ইহুদিরা তাঁকে মদিনায় আমন্ত্রণ জানায়।

সুসম্পর্ক ঃ ইহুদিদের আমন্ত্রণ, অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর ইহুদিরা তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং মহানবী (সা.) ও আহলে কিতাব হিসেবে তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন।

চুক্তি ঃ মদিনা সনদের মাধ্যমে মহানবী (সা.) জাতি হিসেবে ইহুদিদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করেন। মদিনা সনদের শর্ত ছিল, ইহুদিরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ করবে না। এতদভিন্ন আরো বহুবিধ শর্ত ঐ সনদে উল্লেখ ছিল। উহুদের যুদ্ধ পর্যন্ত ইহুদিরা এসব চুক্তি মেনে চলার পর পুনরায় শত্রুতায় মেতে উঠে।

রাসুল (সা.) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঃ উহুদ যুদ্ধে পর থেকেই ইহুদিরা মুসলিমদের প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বিভিন্নভাবে বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে এবং রাসুল (সা.) এর সার্বিক সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং কুরাইশদের নানাভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার ষড়যন্ত্রে প্ররোচিত করে।

প্রকাশ্য শত্রুতা ঃ ইহুদিরা মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে বদর যুদ্ধে মুসলিমদের সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে। উপরন্তু যুদ্ধ শেষে ইহুদি নেতা কাব মক্কায় গমন করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করতে নানা প্রকারে কুরাইশদের উসকানি দিতে থাকে। নিহত নেতাদের মর্সিয়া পাঠ করে সে কুরাইশদের মাঝে যুদ্ধের রব তুলে দেয়।

মহানবী (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র ঃ ইহুদি বনু কায়নুকা সম্প্রদায় কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের সাথে গোপনে পরামর্শ করে মহানবী (সা.) কে হত্যার চক্রান্ত করে। পরে তাদের এ চক্রান্তের কথা জানাজানি হয়ে যায়।

রাসূল (সা.) এর দৃঢ়তা ঃ ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে মহানবী (সা.) ইহুদিদের মদিনা থেকে বহিষ্কার করেন এবং তাদের একটি গোত্রের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা

ইহুদিরা মদিনায় নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে নানাভাবে বিশ্বাসঘাতকতা গ্রহণ করে। যেমন-

কাব বিন আশরাফের ষড়যন্ত্র ঃ উহুদ যুদ্ধের পর কাব বিন আশরাফ সদলবলে মক্কায় গমন করে কুরাইশদের সাথে আলোচনা পর্যালোচনাপূর্বক মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির প্রাক্কালে কাব ও কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান স্ব-স্ব দল নিয়ে কাবা ঘরের পর্দা ধরে শপথ করে, তারা মুসলিমদের এবং মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করবে।

রাসূল (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ঃ একদা মহানবী (সা.) বনু নাযির গোত্রে গমন করলে তারা গোপনে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে। তারা রাসূল (সা.) কে প্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়ে উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার হীন ষড়যন্ত্র করে। ইতোমধ্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী আসলে তিনি সতর্ক হয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করেন।

ইহুদিদের ঔদ্ধত্য ঃ একদা মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইসহ অন্যরা মহানবী (সা.) কে দূত মারফত খবর পাঠায়, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, তারা কিছুতেই তাঁকে মানবে না। মদীনা সনদের চুক্তি মোতাবেক তখন মহানবী (সা.) ইহুদিদের অবরোধ করেন এবং অস্ত্রশস্ত্র সমর্পনপূর্বক তাদের মদিনা ত্যাগের নির্দেশ দেন।

ইহুদিদের মদিনা থেকে বিতাড়নের কারণ

সন্ধির শর্ত ভঙ্গ ঃ ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে মদিনায় ইহুদিরা ঈর্ষান্বিত হয়ে ইসলামের সর্বনাশ করার জন্য মক্কার কুরাইশদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এভাবে তারা মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের মদিনা থেকে বিতাড়ন করেন।

বিভেদ সৃষ্টি ঃ নানা প্রকারের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিখ্যাত আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে মদিনার ইহুদিরা বিভিন্ন ধরনের ফায়দা হাসিলের চেষ্টা চালায়। ফলে মদিনায় অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় মহানবী (সা.) তাদের বিতাড়িত করেন।

সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত ঃ মহানবী (সা.) এর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তারা মদিনায় নানা ধরনের নাশকতামূলক কাজ চালাতে থাকে বিধায় মদিনার সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) তাদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হন।

বনু কায়নুকা গোত্রের বিতাড়ন ঃ ইহুদি বনু কায়নুকা গোত্র প্রথম মদিনা সনদ ভঙ্গ করে। তারা নানা ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে রাসুল (সা.) তাদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করেন। ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষায় তিনি এ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হন।

বনু নযির গোত্রের বিতাড়ন ঃ বনু নযির গোত্র মহানবী (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিল। তাদের এ অপতৎপরতা অপকর্মের শাস্তি স্বরূপ মহানবী (সা.) তাদের মদিনা থেকে বিতাড়নের নির্দেশ প্রদান করেন, কিন্তু তারা এ আদেশ অমান্য করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের প্রস্তুতি নেয়। পরবর্তীতে এক খণ্ড যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়ে মদিনা ত্যাগে বাধ্য হয়।

বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা ফল

খন্দক যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) ঘরে পৌঁছতে না পৌঁছাতে জিবরাঈল (আ.) এসে তাঁকে বললেন, আল্লাহর নির্দেশ, এখনি বনু কুরায়যার মহল্লা অবরোধ করতে হবে। মহানবী (সা.) সাহাবাদের বনু কুরায়যার মহল্লা অবরোধের উদ্দেশ্যে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন।

অবরোধ ঃ বনু কুরায়যা গোত্র তাদের দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিলে মুসলিম বাহিনী দুর্গ অবরোধ করে। একাদিক্রমে অনেকদিন অবরোধ চলল। শত্রুরা দুর্গ থেকে বের হলো না, সন্ধি প্রস্তাবও দিল না, তাই অবরোধ দীর্ঘ হতে হলো। অবশেষে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ল, এভাবে থাকলে হয়ত তাদের শুকিয়ে মরতে হবে। তারা আওস গোত্রের আবু লুবাবার সঙ্গে পরামর্শক্রমে আত্মসমর্পনের কথা ভাবল এবং পত্রযোগে জানাল, তারা আওস গোত্রের সাদ বিন মুয়াযের ফয়সালা মানতে রাজি। মহানবী (সা.) ও এ প্রস্তাবে রাযি হন।

বিচার ঃ যথাসময় সাদ বিন মুয়ায (রা) ফয়সালায় বসেন। ইহুদিরা ভেবেছিল, বনু কায়নুকা যেভাবে রক্ষা পেয়েছে তারাও সেভাবে রক্ষা পাবে। অনেকে হযরত সাদ (রা.) কে অনুরূপ করার জন্য অনুরোধও জানায়, কিন্তু তিনি ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেন। তিনি আদেশ দেন, "পুরুষ যোদ্ধাদের হত্যা এবং নারী ও শিশুদের দাস-দাসীতে পরিণত করা হবে।"

সত্য-বাস্তবতা ঃ পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে এ ঘটনা ঘটে। অন্যান্য ইহুদী গোত্রের ন্যায় বনু কুরায়যাও মুসলিমদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা মদিনা সনদের শর্ত লঙ্ঘন করে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। মদিনার মহিলাদের যে দুর্গে রাখা হয়েছিল সে দুর্গে হামলা চালায়। তাদের বিশ্বাসঘাতকার জন্য মদিনায় যে কোনো অঘটনা ঘটে যেতে পারত। এজন্য তাদের আর মদিনায় বসবাস করতে দেয়া বাঞ্ছনীয় ছিল না। কৃত অপকর্মের জন্য সাদ বিন মুয়ায (রা.) কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তিই তাদের প্রাপ্য ছিল। তাদের ওপর প্রদত্ত দণ্ড কঠোর হলেও তৎকালীন সামরিক পরিস্থিতির কারণে তা যুক্তিযুক্ত ছিল। বিশেষ করে তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদত্ত হওয়ায় কিছু বলারও ছিল না।

খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্ক

ইসলামের প্রাথমিক যুগে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিমদের সুসম্পর্ক ছিল। মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হযরত ওসমান (রা.) এর নেতৃত্বে একদল মুসলিম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং সেখানকার খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাশি তাঁদের আশ্রয় দেন। মদিনায় হিজরত করার পর সেখানকার খ্রিস্টানরাও মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করতো। তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ বন্ধুত্বসুলভ আচরণের কথা স্মরণ করে ষষ্ঠ হিজরীতে সিনাই পবর্তের নিকটবর্তী সেন্ট ক্যাথেরিন নামক এক গির্জার পাদরি ও অন্যান্য খ্রিস্টানদের সাথে একটি সনদ সম্পাদন করেন। এ সনদ খ্রিস্টানদের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সহনশীল নীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চুক্তির শর্তসমূহ

১. খ্রিস্টানদের ওপর কোনো কর ধার্য করা হবে না।
২. কোনো খ্রিস্টান ধর্মজাযককে গির্জা থেকে বহিস্কার করা হবে না।
৩. কোনো খ্রিস্টানকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে না।
৪. খ্রিস্টানদের কোনো গির্জা ভেঙ্গে সেখানে মসজিদ নির্মান করা হবে না।
৫. গির্জা মেরামত করার জন্য খ্রিস্টানরা মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা তাদের সাহায্য করবে।
৬. আরবের বাইরে খ্রিস্টান ও মুসলিমদের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তার জন্য আরব খ্রিস্টানদের দায়ী করা হবে না।

সনদের গুরুত্ব ঃ সংখ্যালঘুদের জানমাল ও ধর্মের নিরাপত্তায় এ সনদ একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "এ সনদ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অসাধারণ সহিষ্ণুতার একটি কীর্তিস্তম্ভ।"

শিক্ষার্থীর কাজ	মদীনা সনদ মানবজাতির প্রথম লিখিত সংবিধান- ব্যাখ্যা লিখুন।

কোন সনদের মাধ্যমে ইহুদিরা মহানবীর সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়?	কোন গোত্র আবু সুফিয়ানের সাথে পরামর্শ করে মহানবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে?	বনু কুরাইযার বিচার করেন কোন ব্যাক্তি?	কোন খ্রীস্ট্রান পাদ্রীকে মহানবী নিরাপত্তার সনদ প্রদান করেছিলেন?

সারসংক্ষেপ :

আরবের ইহুদি- খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায় মহানবী (সা.) এর আগমনের পূর্বে শেষ নবীর অপেক্ষায় ছিল। ঈসা (আ.) কর্তৃক সর্বশেষ নবীর আগমনের বিষয়ে তারা আশাবাদী ছিল যে, তিনি হয়ত তাদের স্ব স্ব বংশ থেকে আগমন করবেন। কিন্তু আরবের কুরাইশ বংশের নবী মুম্মদ (সা.) কে তারা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। তবে মহানবী (সা.) মদীনায় গমনের পর মদীনা সনদের মাধ্যমে ইহুদীসহ সকল গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে যে সহযোগীতামূলক চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, ইহুদিরা তার স্পষ্টত লংঘন করে। এমনকি তারা মহানবী (সা.)বিভিন্ন সময় হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়; বরং তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেই মদীনার ইহুদিদের বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১০

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রথম কিবলা কোনটি?
(ক) কাবা (খ) মদীনা মসজিদ (গ) বায়তুল মুকাদ্দাস (ঘ) বায়তুর দেওয়ান

২. কোন অঞ্চলের খ্রীস্ট্রানদের জন্য মহানবী (সা.) একটি লিখিত সনদ প্রদান করেছিলেন?
(ক) নাজরানের (খ) মদীনার (গ) বসরার (ঘ) সিরিয়ার

৩. কোন্ যুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কারণে বনু কুরাইযাকে মদীনা থেকে বহিস্কার করা হয়?
(ক) মুতার যুদ্ধ (খ) খন্দকের যুদ্ধ (গ) হুনায়ুনের যুদ্ধ (ঘ) বদরের যুদ্ধ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

গোত্র/দলের নাম	বনু নাযির	বনু কাইনুকা	বনু কুরাইযা	নাজরানের খ্রীস্টান
কার্যক্রম	রাসূল (স:) কে হত্যার চেষ্টা	মদীনা সনদের শর্ত ভঙ্গ	খন্দকের যুদ্ধে ষড়যন্ত্র	শান্তিচুক্তি

(ক) ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী ? ১
(খ) বনু নাযির গোত্র কিভাবে মহানবী (সা.) হত্যার চেষ্টা করেছিল? ২
(গ) মহানবী কর্তৃক খ্রীস্টানদের প্রদত্ত শান্তি চুক্তির একটি বিবরণ দিন। ৩
(ঘ) 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মোহাম্মদ (সা.) ছিলেন একজন অতুলনীয় আদর্শ' উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.১১ বিদায় হজ্জের ভাষণ ও মুহাম্মদ (সা.) এর শেষ জীবন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিদায় হজ্জ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- মহানবীর জীবনের অন্তিম মূহুর্তগুলো সম্পর্কে অবিহিত হতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**বিদায় হজ্জ, ইহরাম, যুল হুলাইফা, আরাফার ময়দান, ও ইতিকাফ বাকী**

বিদায় হজ্জ

মদিনায় দলে দলে বিভিন্ন গোত্রের দূত দল আসতে আরম্ভ করলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বুঝতে পারেন, তাঁর জীবনের মহান কর্তব্য শেষ হয়েছে এবং তাঁর জীবন প্রদীপ ফুরিয়ে আসছে। তাই শেষ হজ্জ বা 'হাজ্জাতুল বিদা' (বিদায় হজ্জ) পালনের উদ্দেশ্যে ১৫ যিলকদ, ১০ হিজরী, ১৩ জানুয়ারি ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক লক্ষের অধিক সাহাবী সহকারে মক্কার পথে রওয়ানা হন। ৬৩১ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে সূরা বারায়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি আরবের সকল গোত্রকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চার মাস সময় প্রদান করে বলেন, এ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না। এর ফলে পর বছর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.) হজ্জ উপলক্ষে লক্ষাধিক মুসলিমসহ মক্কায় গমন করতে সক্ষম হন। বিদায় হজ্জ পালনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সহধর্মিণীদের সঙ্গে নিয়ে যান। এ সময় কুরবানির জন্য তাঁর সাথে ১০০ উট ছিল।

যাত্রার ১৫ দিন পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কার ৬ মাইল দূরে 'যুল হুলাইফা' নামক স্থানে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে হজ্জের পোশাক বা ইহরাম পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেন। কাবা গৃহের চতুর্দিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করে তিনি মাকামে ইবরাহীম নামক স্থানে সালাত আদায় করেন। সাফা এবং মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সাত বার দৌড়ান। যিলহজ্জের অষ্টম দিনে আরাফার ময়দানে পৌঁছেন। হজ্জ সম্পন্ন করে আল্লাহর রাসূল (রা.) আরাফাতের জাবালে রহমত পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে উপস্থিত মুসলিমদের উদ্দেশ্যে এক অবিস্মরণীয় ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এ শেষ উপদেশমূলক ভাষণ মুসলিমদের হৃদয়ে চির সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বিদায় হজ্জের ভাষণকে ইতিহাসে প্রধান মানবাধিকার সনদ বলে অনেকে মন্তব্য করেন।

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ

- রাসূলুল্লাহ (সা.) ভাষণের শুরুতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বিশ্ব-প্রতিপালক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সমবেত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে বলেন-
- হে মুসলিমগণ! মনোযোগ সহকারে আমার কথা শোন। কারণ আবার তোমাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ আল্লাহ আমাকে নাও দিতে পারেন। এ দিন, এ মাস, সকলের জন্য যেরূপ পবিত্র, সেরূপ তোমাদের জীবন ও সম্পদ মহা প্রভুর সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত পরস্পরের নিকট পবিত্র ও হস্তক্ষেপের অনুপযুক্ত।
- স্মরণ রেখো, দুনিয়ার প্রত্যেক কাজের জন্য একদিন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

- হে প্রিয় সাহাবীগণ! তোমাদের সহধর্মিণীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের ওপরও তাদের তেমন অধিকার রয়েছে। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছে এবং তাঁরই আদেশমত তাদের তোমাদের জন্য বৈধ করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে।
- সর্বদা অন্যের আমানত হিফাযত করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে।
- আজ থেকে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। ঋণগ্রহীতা থেকে কেবল আসল অর্থ ফেরত নেবে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব জাতির 'খুনকা বদলা খুন' নীতি এখন থেকে নিষিদ্ধ হলো।
- দাস-দাসীদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার কর, যে বস্ত্র পরিধান কর, তাদের অনুরূপ খাদ্য-বস্ত্র দান করবে। তারা যদি ক্ষমার অযোগ্য কোনো আচরণ করে, তা হলেও তাদের মুক্তি দান করবে। স্মরণ রেখো, তারা আল্লাহর সৃষ্টি এবং তোমাদেরই মতো মানুষ।
- তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করো না, অন্যের দ্রব্য আত্মসাৎ ও অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না এবং কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না।
- হে মুসলিমগণ! আমার কথা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করতে চেষ্টা কর। স্মরণ রেখো, মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই এবং সমগ্র দুনিয়ার মুসলিম একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে, একই অবিচ্ছেদ্য জাতিসত্তায় আবদ্ধ। অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো কোনো জিনিস জোর করে নিতে পারবে না।
- স্মরণ রেখো, অঞ্চল ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলিম সমান। আজ থেকে বংশগত কৌলীণ্য প্রথা বিলুপ্ত হলো। সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কুলীন, যে স্বীয় কর্মে বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে আগ্রহী।
- পথপ্রদর্শক হিসেবে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কালাম (কুরআন মাজীদ) ও তাঁর প্রেরিত সত্যবাহক রাসূলের চরিত্রাদর্শ (হাদীস) রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দুটির অনুশাসন মেনে চলবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না।
- হে আমার উম্মতগণ, যারা এখানে সমবেত হয়েছ, তারা অনুপস্থিত মুসলিমদের কাছে আমার কথা পৌঁছে দেবে। যারা অনুপস্থিত তাদের আমার উপদেশের কথা জানাবে। কখনো কখনো উপস্থিত ব্যক্তিদের চেয়ে অনুপস্থিত ব্যক্তিরা অধিক স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়।
- নবী করীম (সা.) ভাষণ শেষে উর্ধ্বে হাত তুলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললেন, "হে প্রভু! আমি কি আপনার বাণী সঠিকভাবে জনগণের মধ্যে পৌঁছাতে পেরেছি?" উপস্থিত উম্মতগণ গগনভেদী আওয়ায করে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় পেরেছেন।' সে সময়, তিনি আল্লাহর কাছ থেকে ওয়াহী লাভ করেন।"(হে মুহাম্মদ), আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতও পূর্ণ করলাম, আর ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদা) পরিশেষে হযরত (সা.) আবেগজড়িত কণ্ঠে সমবেত জনগণকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা সাক্ষী, আমি আমার কর্তব্য পালন করছি। বিদায়! আল-বিদা।"

ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনসায়াহ্নে হজ্জ উপলক্ষে আরাফাত ময়দানে যে অভিভাষণ প্রদান করেছিলেন, ইসলাম ও মানবতার ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ বাণীতেই ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও মানব অধিকারের মূলনীতি বিঘোষিত হয়েছে। এতে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক ও বাস্তব উভয় শিক্ষাই বর্তমান রয়েছে। এ শিক্ষা মানব জাতিকে সত্যিকারের মুক্তি ও শান্তির সন্ধান দিয়েছে। মহানবী (সা.)–এর ভাষণের সকল দিক বাস্তবায়িত হলে আজকের এ সংঘাতময় মানব জীবন সর্বাত্মক সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

মানব জাতির ইতিহাসে বিদায় হজ্জের ভাষণ মানবাধিকারের একটি বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এ ভাষণের তাৎপর্য ইসলামের ইতিহাসে প্রোজ্বল ভূমিকায় দেদীপ্যমান। ঐতিহাসিক আমীর আলীর ভাষায়, মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ সর্বদিক দিয়েই তাৎপর্যবহ। এ ভাষণ ছিল বাগ্মিতাপূর্ণ ও উৎসাহ উদ্দীপক। সত্য-সুন্দর, কল্যাণ, আনন্দ, সাম্য, ন্যায় ও মানবতার মঙ্গল সাধন এবং অন্যায় দুষ্কৃতি থেকে বেঁচে থেকে সতর্ক সাবধান জীবনাচরণের জন্য মহানবী (সা.)-এর

বিদায় হজ্জের ভাষণ এক গুরুত্বপূর্ণ দলীল। এ ভাষণে বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব ঘোষিত হয়েছে এবং সাথে সাথে ঘোষিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-ই সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটবে না। নারী সমাজের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার ও সম্মানজনক আচরণ, সর্বোপরি নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রশ্নে সচেতন হওয়ার জন্য সবাইকে মহানবী (সা.) এ ভাষণে উপদেশ দিয়েছেন। এ ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) দাস-দাসীর প্রতি সদয় মানবোচিত সদ্ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। অধীনস্থদের অপমান নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়ে শান্তিতে রাখার কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বিদায় হজ্জের ভাষণে।

অন্তিম যাত্রার আয়োজন

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুহাম্মদ (সা.) উহুদ প্রান্তরে শহীদদের সমাধি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে তাঁদের জন্য প্রাণভরে দোয়া করেন। মদিনায় আগমন করে তিনি 'মাকবারায়ে বাকী' বা বাকী কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে দোয়া করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সফর মাসের শেষার্ধের প্রথম ভাগে তাঁর শিরপীড়ার সূত্রপাত হয়। ইন্তেকালের পাঁচ দিন পূর্বে তাঁর পীড়া বৃদ্ধি পায়। ঐ দিন রোগযন্ত্রণায় অস্থির অবস্থায় তিনি সমবেত নর-নারীকে সম্বোধন করে বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তাদের পরলোকগত নবী ও আলেমদের কবরগুলোকে উপাসনা মন্দিরে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা যেন এ মহাপাপে লিপ্ত না হও। খ্রিস্টান ও ইহুদিরা এ পাপে অভিশপ্ত হয়েছে। সাবধান, আমার কবরকে তোমরা সিজ্‌দারস্থল বানিও না।" পীড়ার একাদশ দিবসে তিনি আবু বকর (রা)-কে ইশারায় সালাতের ইমামতি করার আদেশ দেন। এমন সময় একটু আরামবোধ করলে ফযল ও আলী (রা)-এর স্কন্ধে ভর করে তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন এবং আবু বাকরের পাশে বসে সালাত আদায় করেন।

সালাতের পর উপস্থিত মুসল্লিদের সম্বোধন করে বললেন, "মুসলিমগণ! আমি তোমাদের আল্লাহর হাতে সমর্পণ করে যাচ্ছি। তাঁর আশ্রয়, তাঁর দান এবং তাঁর সাহায্যে তোমাদের সোপর্দ করে দিচ্ছি। আমার পরেও আল্লাহই তোমাদের রক্ষা করবেন। তোমরা নিষ্ঠা, ভক্তি ও সততার সাথে তাঁর আদেশ পালন করতে থেকো, তাহলে তিনি তোমাদের রক্ষা করবেন, এ আমার শেষ কথা, ভ্রাতৃবর্গ, এই শেষ।"

ইহলোকের শেষ দিন

সাহাবীগণ প্রত্যুষে উঠে ফজরের জামায়াতে সমবেত হয়েছেন। সালাত আরম্ভ হলো। এমন সময় মহানবী (সা.)-এর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আল্লাহর প্রিয়তম বান্দারা কীভাবে ইবাদতে মগ্ন আছে তা দেখার জন্য তিনি জানালার কাছে গেলেন। সাহাবাদের সালাত আদায়ের স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শন করে তিনি অতিশয় আনন্দিত হন। তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। এ সময় তিনি ব্যাথায় অস্থির হয়ে পড়েন।

আয়েশা (রা) বলেন, "(সে দিন) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) আসেন, তাঁর হাতে মিসওয়াক ছিল। সে সময় মহানবী (সা.) হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। আমি দেখলাম তিনি বারবার আবদুর রহমান বিন আবু বকরের হাতে থাকা মিসওয়াকের দিকে লক্ষ্য করছেন। তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পেরে আমি মিসওয়াক চিবিয়ে দিলে তিনি তা ধীরে ধীরে কয়েকবার দাঁতে বুলান। এরপর পানি দ্বারা মুখ পরিষ্কার করেন।" এরপর অন্তিম অবস্থা উপনীত হন। তিনি বারবার অচেতন হয়ে পড়েন, প্রত্যেক বার চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠছেন, "হে আল্লাহ! হে আমার পরম বন্ধু! হে আমার পরম সুহৃদ! আমাকে তোমার সাথে মিলিত কর।" যখন মৃত্যুর সব লক্ষণই দেখা দিয়েছে এমন সময় তিনি শেষবার চোখ মেলে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন- 'সালাত, সালাত, সাবধান! দাস-দাসীদের প্রতি সাবধান। অতঃপর তাঁর আত্মা পরম সুহৃদের সন্নিধানে মহাপ্রস্থান করে। (*ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*।) (বুখারী, মুসলিম)

শিক্ষার্থীর কাজ	বিদায় হজ্জের ভাষনে মানবাধিকারের দিকগুলো ব্যাখ্যা করুন।

স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা কী রকম হবে বলে ঘোষণা করা হয়?	দাস-দাসীদের খাওয়া পরার বিষয়টি কী রকম?	মানুষের কর্মের হিসাব কার কাছে দিতে হবে?	মানুষের জীবন ও সম্পদ কোন বিষয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ মুসলিম উম্মাহর সর্বযুগের জন্য পথ-প্রদর্শক। এ ভাষণ জাহিলী চিন্তা চেতনা ও কুসংস্কার থেকে আরববাসীসহ অনাগতকালের সকল মানুষের জন্য মানবাধিকারের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ ভাষণের মাধ্যমে মহানবী (সা.) ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজনীতি, পরিবারিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অনবদ্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। বিদায় হজ্জের ভাষনের মতাদর্শ বাস্তবায়ন করা হলে সংঘাতময় বিশ্বের অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরাফাতের কোন পাহাড়ের চূড়ায় মহানবী (সা.) ভাষন দিয়েছিলেন?
(ক) জাবালে রাহমাত (খ) জাবালে আরাফাহ
(গ) জাবালে নুর (ঘ) জাবালে হেরা

২. মহানবী (সা.) অসুস্থ থাকাবস্থায় কাকে সালাতের ইমামতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন ?
(ক) আলী (রা:) (খ) উমর (রা:)
(গ) উসমান (রা:) (ঘ) আবুবকর (রা:)

৩. বিদায় হজ্জের অমূল্য ভাষণে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আহবান জানান-
i. ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার
ii. বংশগত কৌলীণ্য প্রথা বিলুপ্ত করার
iii. শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও iii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

মিজান মোল্লা একজন মানবাধিকার কর্মী। তিনি একজন সুশিক্ষিত ও ধার্মিক ব্যক্তি। মানবাধিকার সংক্রান্ত গবেষণা করতে গিয়ে পৃথিবীর সকল ধর্মের মানবাধিকার সম্পর্কে তার অনেক ভাল জ্ঞান রয়েছে। "যুগে যুগে মানবাধিকার ও তার বাস্তবায়ন" শীর্ষক সেমিনারে বক্তৃতা কালে মিজান মোল্লা বলেন, বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ট।" তিনি মানবাধিকার রক্ষায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর গৃহিত সকল পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন। তিনি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণকে অনুধাবন ও অনুসরণ করার আহ্বান জানান।

(ক) বিদায় হজ্জ কত সালে হয়? ১

(খ) বিদায় হজ্জকে বিদায় হজ্জ বলা হয় কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে বিদায় হজ্জের ভাষণে প্রদত্ত ইয়াতীম ও দাস-দাসীর অধিকারসমূহ তুলে ধর। ৩

(ঘ) "মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ।"- ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১	: ১. (ঘ)	২. (গ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২	: ১. (গ)	২. (ঘ)	৩. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩	: ১. (খ)	২. (খ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪	: ১. (খ)	২. (গ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫	: ১. (ঘ)	২. (ক)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬	: ১. (ঘ)	২. (ঘ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭	: ১. (ঘ)	২. (খ)	৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮	: ১. (ঘ)	২. (ঘ)	৩. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯	: ১. (ক)	২. (ক)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১০	: ১. (গ)	২. (ক)	৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১১	: ১. (ঘ)	২. (ক)	৩. (ঘ)

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং সংস্কারসমূহ

ইউনিট ৫

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। পৃথিবীতে মহানবী (সা.) এর আগমনের মধ্য দিয়ে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ রুপ লাভ করে। আরব উপদ্বীপের কুরাইশ গোত্রে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বিচক্ষণ, প্রতিভাবান এই সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে, যার হাত ধরে আরব সমাজের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটে তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহর বিধান। গোত্রকলহের স্থান দখল করে ভ্রাতৃত্ববোধ, দাসপ্রথার অবসান ঘটিয়ে সকল মানুষ সাম্যের কাতারে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সমাজ একদা কন্যা শিশুর জীবন্ত কবর রচনা করেছিল, সেই সমাজ নারীদের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। নারীকে করে গৃহের সর্বময় কর্ত্রী। সমাজের স্তরে স্তরে আঁকড়ে থাকা সুদ প্রথা, লুটতরাজ, আর্থিক দুরবস্থাকে মহানবী (সা.) করেন বিদুরিত। সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে মহানবী (সা.) সকলকে নিয়ে সৃষ্টি করেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র যেখানে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। পরস্পর বিবাদমান গোত্রের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে তিনি সমগ্র আরববাসীকে একটি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এই ইউনিটে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র, কৃতিত্ব এবং তাঁর আনীত সংস্কারসমূহ আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : মহানবী (সা.) এর চরিত্র ও জীবনাদর্শ
পাঠ-৫.২ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মীয় সংস্কার
পাঠ-৫.৩ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সামাজিক সংস্কার
পাঠ-৫.৪ : মহানবী (সা.) এর রাজনৈতিক সংস্কার
পাঠ-৫.৫ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অর্থনৈতিক সংস্কার
পাঠ-৫.৬ : জাতি গঠনকারী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)
পাঠ-৫.৭ : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন

পাঠ-৫.১ মহানবী (সা.) এর চরিত্র ও জীবনাদর্শ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) এর চরিত্র ও গুণাবলির বিবরণ দিতে পারবেন ও
- মহানবী (সা.) এর জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মূর্ত প্রতীক, আল-আমিন, আদর্শস্বরুপ, শান্তির দূত, জীবনচরিত, আত্মার বিশুদ্ধতা, স্নেহবঞ্চিত ও জীবনদর্শন**

আল্লাহর প্রতি অবিচল ঈমানের মূর্ত প্রতীক ছিলেন মহানবী (সা.)। তিনি আল-আমিন (বিশ্বাসী) হিসেবে সকলের নিকট সুপরিচিত হন। তাঁর মাঝে ছিল না কোন ক্রোধ, হিংসা; ছিল শুধু ক্ষমা, করুণা আর স্নেহ। সততা, সাম্য আর সুবিচার ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।

চরিত্র :

মহানবী (সা.) পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি যার জীবনচরিত সমগ্র বিশ্বের মানুষের নিকট আদর্শস্বরুপ। তিনি ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী। মাত্র ছয় বছর বয়সে পিতা-মাতার স্নেহবঞ্চিত হয়ে, জীবনের প্রারম্ভ হতেই সকল প্রকার সৎ ও মানবিক গুণের অধিকারী হন। তিনি আল-আমিন (বিশ্বাসী) হিসেবে সকলের নিকট সুপরিচিত হন। তিনি ছিলেন আদর্শ রাষ্ট্র নায়ক, সমাজ সংস্কারক, বীরযোদ্ধা ও সমরনিপুণ। সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি ছিলেন অসহায় ও মজলুমের ত্রাণকর্তা। তিনি বলেছেন, "শান্তি দেওয়ার জন্য আমার আগমন ঘটেনি, শান্তির দূত হিসেবে আমি প্রেরিত হয়েছি।" আত্মার বিশুদ্ধতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা আর পরোপকার ছিল মুহাম্মাদ (সা.) এর চরিত্রের সর্বব্যাপি দিক। তিনি ছিলেন নম্র ও সরল জীবনযাপনকারী। ইসলামের অনুশাসন আর মহান আল্লাহর বাণী প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের চরম ও পরম আদর্শ। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। মানুষের মাঝে সাম্যের বাণী প্রতিষ্ঠা, সত্যের উপর ভিত্তি করে জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করা আর সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। তিনি পৃথিবীতে মানুষের জন্য ত্রাণকর্তারুপে আবির্ভূত হয়েছেন।

বিশ্বের রহমত স্বরূপ

মহানবী (সা.) এমন এক সময় পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, যখন সারা পৃথিবী জুলুম-অত্যাচার, অবিচার ও নির্যাতনে নিষ্পেষিত ছিল। তাই তিনি ছিলেন বিশ্বের রহমতস্বরূপ। সভ্যতা বিবর্জিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবজাতিকে ইসলাম ও তাওহীদের আলোয় আলোকিত করে সকল প্রকার অসাম্য ও ভেদাভেদ দূর করেন। বিশ্বমানবতার মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মহাপুরুষ।

আল্লাহতে আস্থা ও বিশ্বাস

মহানবী (সা.) এর চরিত্রের সর্বোৎকৃষ্ট ভিত্তি আল্লাহতে আস্থা ও প্রগাঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ সব সময় ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী থাকার কারণে ইসলামের চরম দুর্দিনেও তিনি আল্লাহতে বিশ্বাস হারাননি। দরিদ্র এতিম বালক অবস্থা হতে শুরু করে রাজ্য শাসকের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যেমন আরাম বিলাসিতায় গা ভাসাননি ঠিক তেমনি আল্লাহকে এক মুহূর্তের জন্যও অবচেতন মনেও ভুলে যাননি। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন, তা পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন তিনি।

আল-আমিন উপাধি লাভ

মহানবী (সা.) নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্বেই আরব সমাজে আমানতদার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আরব সমাজে সে সময় তাঁর বিশ্বস্থতার গুনে মুগ্ধ হয়ে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলে তাঁর নিকট তাদের ধন-সম্পদ, সোনা-দানা ও নগদ অর্থ গচ্ছিত

রাখতো। মহানবী (সা.) এ সকল গচ্ছিত সম্পদ চাহিবামাত্র তার মালিককে যথাযথভাবে ফেরত প্রদান করতেন। তাঁর এ সত্যনিষ্ঠার জন্য সকলের নিকট থেকে 'আল-আমিন' উপাধি প্রাপ্ত হন।

সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন

মহানবী (সা.) সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। ইসলাম পূর্ব আরব সমাজ থেকে অন্যায়, অত্যাচার, লুটতরাজ, ব্যাভিচার, হত্যা ও কুসংস্কার দূরীভূত করে সেখানে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অসহায়দের সাহায্য করা, গোত্রসমূহের মধ্যে যুদ্ধের পরিবর্তে সম্প্রীতি স্থাপন করে 'হিলফুল ফুযুল' বা শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে আরব যুবকদের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরও কখনো তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বিলাসী হননি। আবার মদিনায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে আরবের শাহানশাহ হয়েও সকল কাজ-কর্ম নিজের হাতেই করতেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি সরল, অনাড়ম্বর, নিরহংকার ও কর্তব্যপরায়ন ছিলেন অধিক প্রাচুর্যের মাঝে থেকেও।

বিনয়ী ও নম্রতা

বিনয়, নম্রতা, কোমলতা, পরোপকারী মনোভাব ও কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চরিত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। দাস-দাসী ও অধীনস্থ লোকদের প্রতি তিনি কোনদিন রূঢ় ব্যবহার করেননি বা কটুবাক্য দ্বারা কষ্ট দেননি। তাঁর ঘোরতর শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন সহাস্য বদনে। শোকার্ত ও দুঃখ পীড়িত মানুষকে সমবেদনা প্রদর্শণের পাশাপাশি তাদের সাথে মানবোচিত আচরণ করতেন।

দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনাদর্শ

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁর সমগ্র জীবন মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন। মানুষের সাথে কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্ট, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কথা-বার্তা বলতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা কখনো বলতেন না। চলাফেরায় কখনো তাঁর মাঝে চঞ্চলতা কিংবা অলসতার ছাপ লক্ষ্য করা যায় না। খাদ্য-খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি যে নজীর রেখে গিয়েছেন তা অতুলনীয়। তিনি কখনো পেট পূর্ণ করে খেতেন না। ক্ষুধা রেখেই খাওয়া শেষ করতেন। তিনি যেমন অতিরিক্ত খাবার খেতেন না ঠিক তেমনি কোন খাদ্য-খাবার অপচয় করতেন না। তাঁকে এক নি:শ্বাসে পানি পান করতে দেখা যায়নি। তিনি ধীরস্থিরভাবে পানি পান করতেন। পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ বিধায় সদা-সর্বদা পুত:পবিত্র থাকতেন। মার্জিত ও রুচিশীল পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। একটি অনুপম আদর্শ ও চরিত্রে যে সকল মহৎগুনের সমাবেশ থাকা উচিত, তার সবগুলোর সমাবেশ ঘটেছিল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনে।

সারসংক্ষেপ:

মানবজীবনের সকল প্রকার মহৎগুণের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে মহানবী (সা.) এর জীবনে। আল্লাহর প্রতি অবিচল ঈমানের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা আর সততাই ছিল তার জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র। তিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আল আমিন, বিশ্বের জন্য আর্শীবাদস্বরূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মহানবী (সা.) কত বছর বয়সে পিতা মাতাকে হারান?

ক) ৮ বছর খ) ৬ বছর

গ) ৫ বছর ঘ) ৯ বছর

২. সকল মুসলিম কেন মহানবী (সা.) এর জীবনদর্শন অনুসরণ করেন ?

ক) মহানবী (সা.) আমাদের নবী বলে

খ) মহানবী (সা.) এর নির্দেশিত পথই শ্রেষ্ঠ পথ

গ) অন্য মুসলিমকে অনুসরণ করে

ঘ) নিজের ইচ্ছায়

৩. মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করেন -

i) আল্লাহর বাণী

ii) ইসলামের অনুশাসন

iii) অন্যের উপর নিয়ন্ত্রণ

নিচের কোনটি সঠিক-

ক) i, ii, iii খ) i, ii

গ) ii, iii ঘ) i, iii

৪. তিনি পৃথিবীতে মানুষের ত্রাণকর্তারুপে আবির্ভূত হয়েছেন। এখানে কার কথা বলা হয়েছে।

ক) হযরত উমর (রা.) খ) হযরত মুহাম্মদ (সা.)

গ) হযরত আবু বরক (রা.) ঘ) হযরত উসমান (রা.)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

সুজানার দাদা তাকে বলল যে, মহানবী (সা.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। মানব জীবনের সকল প্রকার মহৎ গুণের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে মহানবী (সা.) এর জীবনে। সহজ-সরল জীবনযাপন করে তিনি এক অপূর্ব জীবনাদর্শের উদাহরণ রেখে গেছেন যা সবসময় অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

ক) কাকে 'আল আমীন' বলে ডাকা হতো ?

খ) মহানবী (সা.) কেমন জীবনযাপন করতেন তা ব্যাখ্যা করুন। ২

গ) মহানবী (সা.) এর আদর্শ অনুসরণ করে আপনি কীভাবে সুন্দর জীবন গঠন করতে পারো লিখুন। ৩

ঘ) "সকল প্রকার মহৎ গুণের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে মহানবী (সা.) এর জীবনে" উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৫.২ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মীয় সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) এর ধর্মীয় ক্ষেত্রে কী কী সংস্কার এনেছেন, তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মহানবী (সা.) এর ধর্মীয় সংস্কার ও শিক্ষা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**তাওহীদের বাণী, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, পৌত্তলিকতা, পরকালের জীবন ও ইসলামের স্তম্ভ**

মহানবী (সা.) ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম সংস্কারক। তাঁর আবির্ভাবের সময় আরব ও বহির্বিশ্বে প্রকৃত ধর্ম বলতে কিছুই ছিল না। সর্বত্র দেব-দেবী, জড় ও প্রকৃতির পূঁজা হতো। ধর্মের নামে অধর্মের চর্চাই হতো বেশি। এমন এক ধর্মহীন সমাজে মহান আল্লাহর রহমত হিসেবে মুহাম্মদ (সা.) আবির্ভূত হন ইসলামের শান্তির বাণী নিয়ে।

তাওহীদের বাণী প্রতিষ্ঠা

মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেন। তিনি এক আল্লাহর বাণী প্রচার করেন। তিনি আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহবান জানান, তিনি ঘোষণা করেন, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

পৌত্তলিকতার অবসান :

ইসলাম আগমনের পূর্বে আরববাসী ছিল পৌত্তলিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তারা পবিত্র কাবাগৃহে ৩৬০ টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। তারা বিভিন্ন জড় পদার্থ ও প্রাকৃতিক শক্তিকে উপাসনা করত। মুহাম্মদ (সা.) অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজে আল্লাহর একত্ববাদের কথা শোনান। তাদের মাঝে তাওহীদের (একেশ্বরবাদ) বীজ বপন করেন। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

আল্লাহ সকল ক্ষমতার অধিকারী- তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, রিজিকদাতা, আইনদাতা এই সার্বভৌমত্বের বিশ্বাস মহানবী (সা.) প্রচার করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "সার্বভৌমত্বের অধিকার একমাত্র আল্লাহ।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই।"

পরকালের ধারণা

ইসলাম পূর্ব যুগের আরবগণের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, পুনরুত্থান দিবস, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। মহানবী (সা.) তাদের মধ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করলেন। তিনি বললেন, এই দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর সকলের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে।

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের উপর ঈমান

মহানবী (সা.) পূর্ববর্তী নবী–রাসূলদের উপর ঈমান আনার আহবান জানান। তারা সকলেই এক আল্লাহর বাণী প্রচার করে গেছেন। তাই আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হলে পূর্ববর্তী নবী রাসূলের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক।

আল্লাহর ইবাদতে নিযুক্ত

মহানবী (সা.) মানব জাতিকে এক আল্লাহর ইবাদতে নিযুক্ত হতে আহবান জানালেন। তিনি প্রচার করলেন যে, মহান আল্লাহ একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। জড় উপাসনা, পৌত্তলিকতা ও মিথ্যা ধর্ম বিশ্বাস সমাজ হতে তিরোহিত করে তিনি এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান জানান।

শরীয়তের মূলনীতির শিক্ষা

মহানবী (সা.) ইসলামী শরীয়তের ৫টি প্রধান স্তম্ভ- ঈমান, সালাত, সাওম, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে শিক্ষা দেন। শরীয়তের মূলনীতিকে তিনি বিশ্ববাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেন। যা বিশ্ববাসীকে আলোর পথে চলতে সাহায্য করে।

সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত

মহানবী (সা.) আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি আহবান জানান। রমযানে ৩০ দিন রোযা রাখা, অবস্থা-সম্পন্নদের সঞ্চিত সম্পদকে পবিত্র করার জন্য যাকাত প্রদান ও সুস্থ সামর্থ্যবানকে হজ্জ করার প্রতি আহবান জানান। সালাত আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে। সাওম বা রোযা জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করে, যাকাত সম্পদের পবিত্রতা বিধান করে এবং সমাজে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য ঘোচাতে সাহায্য করে এবং হজ্জ মানুষের সকল পাপ হতে পবিত্র করে তোলে। মহানবী (সা.) মানব জাতির মাঝে শরীয়তের এই মৌলিক আদর্শকে তুলে ধরেছেন।

কুরআন- হাদীস

মহানবী (সা.) মানবজাতির সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য কুরআন ও হাদীসকে রেখে গেছেন। কুরআন আল্লাহর বাণী। অপর দিকে মহানবী (সা.) এর কথা, দৃষ্টান্ত ও মৌন সম্মতি নিয়ে হাদীস রচিত হয়েছে। এ দুটি গ্রন্থ মানবজাতির ইহকালীন জীবনের পথ নির্দেশক ও পারলৌকিক মুক্তির পাথেয়। যা মানব জাতিকে যুগে যুগে সঠিক পথে পরিচালিত করে চলেছে।

ইসলাম মানবজাতির জীবনদর্শন

মহানবী (সা.) ইসলামকে মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এটিই হচ্ছে মানবজাতির একমাত্র মুক্তির সনদ। ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও দর্শন সব কিছুর পথ-নির্দেশের এক চূড়ান্ত দলিল হচ্ছে ইসলাম। যা মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

সারসংক্ষেপঃ

পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়জন ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছে মহানবী (সা.) ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ধর্মকে মানুষের কল্যাণের সাথে সমন্বিত করেছেন। তার প্রচারিত ইসলাম ধর্ম ছিল মানব কল্যাণকামী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ধর্মের শিক্ষার মাধ্যমে তিনি মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করেছেন ও মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কাবাঘরে কয়টি মূর্তি ছিল ?
ক) ৬৩৫ টি ক) ৩০০ টি গ) ৩৬০ টি ঘ) ২৮৫ টি

২. আরববাসীরা ইসলামের বিরোধিতা করেছিল কারণ -
ক) ইসলাম শান্তির ধর্ম, তারা শান্তি পছন্দ করে না খ) ইসলামে মূর্তি পূঁজা নিষিদ্ধ, তারা মূর্তি পূঁজা করে
গ) ইসলামের আদর্শ তাদের স্বার্থ বিরোধী ঘ) ইসলাম সমতার কথা বলে, তারা সমতায় বিশ্বাস করে না।

৩. ইসলাম পূর্ব যুগে মানুষ ছিল -
i) মূর্তি উপাসক ii) জড় পূজারী iii) প্রকৃতি পূজারী
নিচের কোনটি সঠিক -
ক) i, খ) i, iii গ) i, ii, iii ঘ) ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

আবির ফুলপুর এলাকার বাসিন্দা। সে চুরি-ডাকাতি, হত্যা-লুণ্ঠন প্রভৃতি অপকর্মে লিপ্ত ছিল। সে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ মানতো না। মসজিদের ইমাম তাকে ইসলামের সুমহান আদর্শের বাণী শোনালেন। মহানবী (সা.) এর নির্দেশিত জীবনচরিত গঠন করতে বললেন। আবির ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণ করে একজন খাঁটি মানুষে পরিণত হল এবং এলাকায় তার সুনাম বাড়ায়; সে বুঝতে পারল মাহনবী (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামই একমাত্র শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম।

ক) ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ? ১
খ) ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে আরবের ধর্মীয় অবস্থা কেমন ছিল ? ২
গ) ইসলামের আদর্শের আলোকে তুমি কীভাবে সুন্দর জীবন গঠন করতে পারো লিখুন। ৩
ঘ) "ইসলাম মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে"- ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৫.৩ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সামাজিক সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) কর্তৃক সুসংগঠিত সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মহানবী (সা.) কর্তৃক সামাজিক সংস্কারসমূহ বিবরণ দিতে পারবেন ও
- মহানবী (সা.) কর্তৃক আদর্শ সমাজের চিত্র অনুধাবন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ভ্রাতৃত্ববোধ, দাসপ্রথা, শিশু হত্যা, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও হিলফুল ফুযুল**

পৃথিবীতে যে কয়জন সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছে, মহানবী (সা.) ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পরিচালিত সমাজের ভিত্তি ছিল সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ। সেখানে ছিল না কোন শ্রেণি ভেদাভেদ। মানবতার আদর্শে গঠিত সেই সমাজ ব্যবস্থায় ছিল পৃথিবীর যে কোন জাতির জন্য আদর্শস্বরুপ। তিনি সকল মানুষের মধ্যকার ভেদাভেদ ও বংশ-আভিজাত্যের গৌরব দূর করেন। এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের ভাই হিসেবে স্বীকৃতি দেন। সেই সমাজকাঠামোর মূল ভিত্তি ছিল ন্যায়বিচার। তিনি সকল প্রকার অসামাজিক কর্মকাণ্ড দূর করেন। মদ্যপান, জুয়াখেলা, হত্যা, লুটতরাজ, কন্যাশিশু হত্যা, সুদ প্রথা ও নারীর প্রতি অমর্যাদা ইত্যাদি অন্যায় কাজ দূর করেন।

দাস প্রথার বিলোপ

ইসলামপূর্ব আরব সমাজে দাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মহানবী (সা.) পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালনকারী। দাসদের জীবনের কোন মূল্য ছিল না। তারা ছিল তাদের প্রভুর সম্পত্তি। দাসদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত। তাদের সাথে পশুর ন্যায় আচরণ করা হত। তাদের কোন অধিকার ছিল না। ছিল না কোন সামাজিক মর্যাদা। পণ্য দ্রব্যের ন্যায় তাদের বাজারে ক্রয় বিক্রয় করা হত। মহানবী (সা.) সমাজে দাসদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি তাদের মুক্তির প্রতি আহবান জানান। তিনি নিজে অসংখ্য দাসকে মুক্তি দিয়েছেন। মুসলিম সামরিক বাহিনীর অন্যতম একজন সেনাপতি ছিলেন ক্রীতদাস যায়িদ। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে তাঁর সাহাবীগণও অসংখ্য দাসদের আযাদ করে দেন। হাবসী ক্রীতদাস বিলাল (রা.) কে হযরত আবু বকর (রা) মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

মহানবী (সা.) কর্তৃক অন্যতম সামাজিক সংস্কার ছিল সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। আরবের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা নিগৃহীত হতো। কন্যা সন্তানের পিতৃত্বকে আরবরা অভিশাপ হিসেবে মনে করত। নারীরা ছিল ভোগ-বিলাসের উপকরণ। তাদেরকে পণ্য-দ্রব্যের মত বেচা-কেনা করা হত। তাদেরকে পৈত্রিক সম্পত্তি ও স্বামীর সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হতো। সমাজে তাদের কোন মর্যাদা ছিল না। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) ঘোষণা করলেন " মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত"। তিনি নারীকে পুরুষের সঙ্গিনী ও সহযাত্রী রুপে ঘোষণা করেন। তিনি নারীদের পৈতৃক ও স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে ঘোষণা করেন। মূলত মহানবী (সা.) এর একক প্রচেষ্টায় সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হল। নারীরা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারিণী হিসেবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করলেন।

সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা

পৃথিবীর ইতিহাসে মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করেন। যেখানে ছিল না বংশগত, জন্মগত কিংবা ভাষাগত পার্থক্যের ভিত্তিতে মানুষের ভেদাভেদ। তিনিই ঘোষণা করেন যে, প্রত্যেক মুসলমান পরস্পরের ভাই ভাই।

মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। এই আদর্শের ভিত্তিতে তিনি সমাজে মানুষের মধ্যকার বৈষম্য ও শ্রেণি ভেদাভেদ দূর করতে সক্ষম হন।

তাওহীদের আদর্শে সমাজ প্রতিষ্ঠা

সমাজে প্রচলিত নানা অনাচার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, পৌত্তলিকতা, কুসংস্কারকে তিনি সমাজ হতে মূলোৎপাটন করেন। তিনি আল্লাহর একত্ববাদের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা- এই আদর্শকে কেন্দ্র করে তিনি সকল সামাজিক কর্মকাণ্ড ও সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত করেন।

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি

মহানবী (সা.) সমাজে সাম্যের বাণী প্রতিষ্ঠা করে। সকল মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। মানবতাই ছিল তার সমাজ ব্যবস্থর মূল ভিত্তি, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত। মিথ্যা অহমিকা, বংশীয় আভিজাত্য ও কুল মর্যাদা সমাজ হতে তিরোহিত করেন। মানবতার মহান আদর্শে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

শান্তিময় সমাজ

প্রাক-ইসলামী যুগের আরব সমাজে সর্বদা গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকতো। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কারণে ভয়াবহ যুদ্ধ লেগে যেত যা বেশ কয়েক বছর ধরে নিরন্তর চলতে থাকত, রক্তপাত ছিল অতি সাধারণ ঘটনা। মহানবী (সা.) মানব জাতিকে সংঘাত ও রক্তপাতহীন একটি সমাজ উপহার দেন। তিনি হিলফুল ফুযুল বা শান্তিসংঘ নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। হিজরতের পরে তিনি সকল জাতি-ধর্মের সমন্বয়ে মদীনা সনদ তৈরি করেন।

ভিক্ষাবৃত্তি ও অশ্লীলতা উচ্ছেদ

মহানবী (সা.) সমাজ হতে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করেন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে উৎসাহিত করেন। অনাচার, ব্যভিচার, মদ, জুয়া, পাপাচার ও চরিত্রকে কলুষিত করে এমন সব কর্মকাণ্ডকে সমাজ হতে উচ্ছেদ করেন।

নিষ্কলুষ সমাজ গঠন

মহানবী (সা.) সমাজ হতে আর্থ-সামাজিক অন্যায়, প্রতারণা, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, অসাধুতা ইত্যাদি দূরীভূত করেন। মানবকল্যাণকামী সুন্দর একটি সমাজ কাঠামো বির্নিমাণ করেন।

জ্ঞানার্জনে উৎসাহ

মহানবী (সা.) ঘোষণা করলেন যে, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয"। তিনি সমাজে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্বকে সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, যারা জানে ও যারা জানে না,উভয়ে সমান নয়।

সারসংক্ষেপঃ

মুহাম্মদ (সা.) সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি প্রাক-ইসলামী যুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন একটি সমাজকে ইসলামের আদর্শে একটি আলোকিত সমাজে রুপান্তরিত করেন। তিনি একত্ববাদ, সাম্য ও ভ্রাতত্বের বন্ধনে সমাজ গঠন করেন। নারী ও দাসের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজ হতে সংঘাত অনাচার, মিথ্যাচার দূরীভূত করেন। তাই তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. দাসরা কার সম্পত্তি ছিল ?

ক) সমাজের উচ্চস্তরের
খ) মহানবী (সা.) এর
গ) প্রভুর
ঘ) কারো নয়

২. মহানবী (সা.) নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন -

ক) নারীদের বেশি পছন্দ করতেন বলে
খ) নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সমাজের অগ্রগতির জন্য
গ) নারীরা অধিকার দাবি করেছিল
ঘ) পুরুষরা নারীদের অধিকার দিতে চেয়েছিল

৩. মহানবী (সা.) নারীদেরকে নিম্নের কোন আত্মীয়ের সম্পত্তির অংশের দাবীদার করেন -

i) স্বামী ও ভ্রাতা
ii) পিতা ও ভ্রাতা
iii) স্বামী ও পিতা

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, ii
খ) i, iii
গ) iii
ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক মোঃ রফিকউদ্দিন শ্রেণিকক্ষে মহানবী (সা.) এর জীবনচরিত আলোচনা করেন। তার ছাত্র জহির মহানবী (সা.) এর সমাজ সংস্কার সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন- মহানবী (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক যিনি অধঃপতিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব সমাজের দাসপ্রথা, কন্যা শিশু হত্যা, নারীর প্রতি অবহেলা দূর করে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

ক) ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন কে? ১
খ) মহানবী (সা.) কীভাবে নারীর মর্যাদা দান করেন ? ২
গ) তোমার এলাকার একজন সমাজ সংস্কারকের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিন। ৩
ঘ) "মহানবী (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক"- ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৫.৪ মহানবী (সা.) এর রাজনৈতিক সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) এর রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মহানবী (সা.) এর রাজনৈতিক সংস্কারসমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো।

	মুখ্য শব্দ	**আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, শাসনতন্ত্র, জিম্মী ও হুদাইবিয়ার সন্ধি**

মহানবী (সা.) তৎকালীন আরব সমাজে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তখন সমগ্র আরব উপদ্বীপ ছিল অসংখ্য গোত্রে-উপগোত্রে বিভক্ত। তাদের মধ্যে ছিল না কোন সম্প্রীতি। তাদের গোত্রপ্রীতি ছিল নিজের জীবন-অপেক্ষা মূল্যবান। তাই তাদের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। এরুপ শতাধিক বিচ্ছিন্ন আরব গোত্রকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে মহানবী (সা.) একটি সুশৃংখল আরব জাতি গঠন করেন। ইসলামের অনুশাসনের ভিত্তিতে একটি সুশৃংখল, শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র কায়েম করেন।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা

রাষ্ট্র পরিচালনা ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে মহানবী (সা.) আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন। সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তায়ালা। মানুষ কেবল আল্লাহর প্রতিনিধি, এই ভিত্তির উপর তিনি তার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন।

কুরআন-ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান

পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী। এতে রাষ্ট্র, সমাজ, মানবজীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাই কুরআন হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংবিধান। এই আদর্শের ভিত্তিতে তিনি তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

মদীনা সনদ

মদীনা সনদ প্রণয়ন ছিল মহানবী (সা.) এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটিই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র। ৪৭ টি ধারা সম্বলিত এই সনদে ধর্ম–বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থান এবং অধিকার ও কর্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মদীনা রাষ্ট্র গঠন

মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.) মদীনা সনদের উপর ভিত্তি করে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। এটিই মদীনা রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাত। একটি আধুনিক ও কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সকল উপাদান ও বৈশিষ্ট্য এ রাষ্ট্রের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। মদীনা রাষ্ট্র পৃথিবীর ইতিহাসে রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি আদর্শ উদাহরণ।

কেন্দ্রীয় শাসনকাঠামো

ইসলাম পূর্বযুগে আরবে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। শাসনকাঠামো ছিল গোত্রতান্ত্রিক। প্রত্যেক গোত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের শাসনকাঠামো প্রচলিত ছিল। শায়খ ছিলেন গোত্রের প্রধান নেতা। মহানবী (সা.) গোত্রতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটান। মদীনা রাষ্ট্রে তিনি একটি কেন্দ্রীয় শাসনকাঠামো তৈরি করেন।

ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে মহানবী (সা.)

মদীনা রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন মহানবী (সা.)। তিনি একাধারে রাষ্ট্রনায়ক, সমরনেতা, বিচারক, ঈমাম, আইনদাতা ও আল্লাহর রাসূল। মসজিদে নববী ছিলো তার প্রধান কার্যালয়। এখান থেকে তিনি শাসন পরিচালনা করতেন।

পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র

মহানবী (সা.) পরামর্শ ছাড়া একক কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। তিনি তাঁর বিচক্ষণ ও জ্ঞানী সাহাবীদের সাথে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। শাসনকার্যে বোধ, বিবেচনা, বিবেককে অগ্রাধিকার দিতেন।

মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ

মহানবী (সা.) গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সকল জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল নাগরিক নিজ নিজ মৌলিক অধিকার ভোগ করতেন। ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, অভিজাত-বেদুইন সকলেই রাষ্ট্রে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো।

যিম্মিদের নিরাপত্তা

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবসকারী অমুসলিম প্রজা বা যিম্মীগণ নিজ নিজ ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাদের জান-মালের হিফজত করেন। তারাও ছিলো ইসলামী রাষ্ট্রের স্বীকৃত নাগরিক।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

মহানবী (সা.) এর শাসনকাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ আঞ্চলিকতা নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ন্যায়বিচার পেতেন। অপরাধী যেই হোক তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হতো।

গণতান্ত্রিক শাসকাঠামো

মহানবী (সা.) গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর বীজ বপন করেন। তিনি ছিলেন ইসলামে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জনক। তাঁর শাসননীতি ছিল নিরপেক্ষ। যুদ্ধ সংঘাতের পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠাকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। তিনি মক্কার কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি স্থাপন করেন। মদীনার সকল ধর্ম, বর্ণের লোকের সাথে 'মদীনা সনদ' প্রণয়ন করেন। তিনি বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন ও সকলকে ক্ষমা করেন।

সারসংক্ষেপঃ

মহানবী (সা.) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে আদর্শ রেখে গেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি ঐক্যের ও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি সুসংহত রাষ্ট্র কাঠামো তৈরী করে গেছেন। জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা ও ধর্মীয় মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে গেছেন। তিনি গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামো প্রবর্তন করে গেছেন যা সকলের জন্য অনুকরণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরব সমাজ ছিল-

ক) কেন্দ্রশাসিত খ) বিচ্ছিন্ন গ) গোত্রভিত্তিক ঘ) প্রজাতান্ত্রিক

২. মহানবী (সা.) মদীনা সনদ প্রণয়ন করেন-

ক) নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য খ) মদীনার জনগণ চেয়েছিল তাই

গ) শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ঘ) আর্থিক নিরাপত্তার জন্য

৩. তৌফিক সাহেব বললেন 'x' ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান। এই আদর্শের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) রাষ্ট্র পরিচলনা করেন। 'x' নিচের কোনটি ?

ক) কুরআন খ) আরবে প্রচলিত প্রথা গ) হাদীস ঘ) জনগণের ইচ্ছা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা আসিফের কোমল মনকে ভাবিয়ে তোলে। সে এ ব্যাপারে তার শিক্ষকের সাথে আলোচনা করলে শিক্ষক বলেন- হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাই উত্তম রাষ্ট্র ব্যবস্থা। মদীনা সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হলে সকল রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ক) মদীনা সনদ কে প্রণয়ন করেন ? ১

খ) মহানবী (সা.) কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন ? ২

গ) বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা দূরীকরণে মদীনা রাষ্ট্রে অনুসৃত ব্যবস্থার বর্ণনা কর। ৩

ঘ) "মহনবী (সা.) কি গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?" তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

পাঠ-৫.৫ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অর্থনৈতিক সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) এর অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কারের বর্ণনা দিতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, হারাম, সুদ, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা, আল ফাই, আল-গানিমাহ, জিজিয়া, খারাজ, যাকাত ও সদকা**

একটি রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সুসংহত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আবশ্যক। মহানবী (সা.) তাঁর পরিচালিত মদীনা রাষ্ট্রে একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করেন এবং সেই সাথে প্রাক ইসলামী যুগের প্রচলিত বিভিন্ন অর্থ উপার্জন পন্থায় সংস্কার আনয়ন করেন।

বৈধ উপার্জনের আহবান

মহানবী (সা.) বৈধভাবে উপার্জনের আহবান জানান। হালাল পথে অর্থ উপার্জনের নির্দেশ দেন। অর্থ উপার্জনে প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াকে হারাম বলে ঘোষণা করেন।

লুটতরাজ উচ্ছেদ

প্রাক-ইসলামী যুগে চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ করাই ছিল অধিকাংশের প্রধান জীবিকা। তিনি সমাজ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় ও লুটতরাজ উচ্ছেদ করে সমাজকে কলুষমুক্ত করেন।

সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা

প্রাক-ইসলামী আরব সমাজে জঘন্য সুদ প্রথার প্রচলন ছিল। ঋনদাতা চড়া সুদ গ্রহণ করত। সুদ গ্রহীতা তা পরিশোধ করতে না পারলে তার সকল সহায় সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হত। এমনকি তার পরিবারের সদস্যদের কে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হত। মহানবী (সা.) এই জঘন্য প্রথাকে সমাজ হতে দূর করেন। তিনি সুদকে হারাম বলে ঘোষণা করেন।

প্রতারণা নিষিদ্ধ

মহানবী (সা.) অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রতারণা দ্বারা অর্থ আয়ের যাবতীয় উৎসকে বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন যে, "যে ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় নেবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

মদ ও জুয়া নিষিদ্ধ

প্রাক-ইসলামী আরব সমাজে জুয়া ও মদের ব্যবসার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মহানবী (সা.) মদ ও জুয়া সমাজ ও রাষ্ট্র হতে নিষিদ্ধ করেন।

পুজিবাদের উৎখাত

মহানবী (সা.) পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার উৎখাত করেন। তিনি সাম্যের ভিত্তিতে সমাজের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জনকে তিনি হারাম ঘোষণা করেন। হক এবং হালাল পথে অর্থ উপর্জনে উৎসাহিত করেন।

যাকাত ও সদকা

সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান কমাতে মহানবী (সা.) ধনীদের উপর যাকাত ফরজ করেন। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে একদিকে যেমন গচ্ছিত সম্পদের পবিত্রতা রক্ষা হয় অপরদিকে সমাজে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে সাহায্য করে। মহানবী (সা.) গরীব ও দুস্থদের মাঝে যাকাত ও সদকা প্রদানের নির্দেশ দেন। যাকাত প্রদান করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমদের জন্য আবশ্যিক। এই প্রসংগে পবিত্র কুরআনের ভাষা হচ্ছে "তোমরা সালাত আদায় কর ও যাকাত দাও।"

ইসলামী রাজস্ব ব্যবস্থার প্রণয়ন

মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মহানবী (সা.) ইসলামী রাজস্ব ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এই রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল জনকল্যাণমুখী যা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করেছিল। মহানবী (সা.) ভিন্ন ভিন্ন রাজস্বের উৎস নির্ধারিত করেছিলেন -

- যাকাত : ধনী ও অবস্থাসম্পন্ন মুসলিমের উপর ফরয। সঞ্চিত উদ্বৃত্ত সম্পদের পরিমাণ যদি স্বর্ণের হিসেবে ৭.৫ তোলা ও রৌপ্যের হিসেবে ৫২.৫ তোলা হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর যাকাত আদায় করা আবশ্যক।
- খারাজ : মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম কৃষকদের উপর রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ভূমিকর।
- জিযিয়া : মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী যিম্মি বা অমুসলিমদের নিকট হতে প্রাপ্ত সামরিক বা নিরাপত্তা কর।
- আল-গানিমাহ : যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি, যার একভাগ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হত এবং চারভাগ যুদ্ধের সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করা হত।
- আল ফাই : রাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্পত্তি যেমন: পতিত জমি, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি, অরণ্য হতে যে অর্থের আগমন ঘটত, সেই অর্থ রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যয় করা হত। এই উৎসটি আল ফাই নামে পরিচিত।

সারসংক্ষেপ:

মহানবী (সা.) প্রাক ইসলামী যুগের নানাবিধ অর্থনৈতিক অনাচার সমাজ হতে দূর করেন । তিনি বৈধভবে অর্থ উপার্জনে উৎসাহিত করেন। বিভিন্ন প্রকার পরিমিত রাজস্ব উৎসের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন্ ধরনের সম্পদের উপর যাকাত প্রদান করতে হয়?

ক) ধারকৃত সম্পদ খ) মোট অর্জিত সম্পদ
গ) সঞ্চিত উদ্বৃত্ত সম্পদ ঘ) অন্যের রক্ষিত সম্পদ

২. মহানবী (সা.) যাকাত বাধ্যতামূলক করেন-

ক) নিজে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য খ) বিত্তবানদের উচিত শিক্ষা দিতে।
গ) জনগণ যাকাত দিতে চেয়েছিল ঘ) রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য

৩. মহানবী (সা.) এর উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সংস্কার-

i) যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করা ii) জিযিয়া কর
iii) খারাজ কর

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, iii খ) ii, iii গ) i ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

শুক্রবারে জুমুআর খুতবায় ইমাম সাহেব মহানবী (সা.) এর সময়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলি বর্ণনা করেন। তিনি আফসোস করে বলেন- প্রত্যেক মুসলমান, যাদের উপর যাকাত ফরয তারা যদি যাকাত শোধ করত এবং ইসলামী বিধি মোতাবেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা হতো তাহলে কোন রাষ্ট্রে অভাব অনটন থাকতো না।

ক) যাকাত কোন ধরনের ইবাদত ? ১
খ) কোন মুসলিম কখন যাকাত পরিশোধ করবে ? ২
গ) মহানবী (সা.) এর রাজস্বের উৎসগুলো আলোচনা করুন ? ৩
ঘ) "মহানবী (সা.) মদীনা রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন" ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৫.৬ জাতি গঠনকারী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এক জাতি গঠনে মুহাম্মদ (সা.) এর পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাতির ঐক্য সাধনে মহানবী (সা.) এর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**প্রজ্ঞা, শ্রেষ্ঠ সংগঠক, বংশ মর্যাদা, বিশ্বজনীন, হিজরত ও গণতন্ত্রের সূচনাকারী**

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংগঠক। পৃথিবীর সবচেয়ে বিশৃংখল জাতিকে তিনি একই আদর্শের ছায়াতলে এনে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। জাতি গঠনে তার বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১) সুশৃংখল জাতিতে পরিণতকরণ : ইসলামের পূর্বে আরব জাতি ছিল বিশৃংখল, গোত্রে-উপগোত্রে বিভক্ত। তাদের মধ্যে ছিল না পারিবারিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ঐক্য। তিনি সকল বাধাকে অতিক্রম করে শত বিচ্ছিন্ন জাতিকে একটি সুসংবদ্ধ সুশৃংখল জাতিতে পরিণত করেছিলেন।

২) একই আদর্শে একীভূতকরণ : আরব সমাজে রক্তের মর্যাদার মাধ্যমে সমাজ গঠিত হত। বংশ মর্যাদা, আভিজত্য ছিল তাদের সমাজের ভিত্তি। কিন্তু মহানবী (সা.) একমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে একটি জাতিকে গড়ে তোলেন। মূলত আরবের ইতিহাসে রক্তের পরিবর্তে শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের এটাই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা।

৩) বিশ্বজনীন জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা : মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের আদর্শের অনুসারে কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক, আঞ্চলিক, সীমারেখা, দেশ, কাল, বর্ণ, ভাষা, গোত্র ইত্যাদি পেরিয়ে সার্বজনীন একক মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

৪)মানবতাবোধের উন্মেষ : মহানবী (সা.) আরবের গোত্রপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। গোত্র কিংবা রক্তের ভিত্তিতে নয় বরং মানবতার আদর্শে তিনি জাতি গঠন করেন। যেখানে মানুষের কল্যাণকামিতাই ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রে মূল ভিত্তি।

৫) সমন্বিত জাতি গঠন : মহানবী (সা.) ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক, আনসার, মুহাজিরদের সমন্বয়ে মদীনা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন যেখানে সকলের সামাজিক, রাজনৈতিক ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃত ছিল। অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত। এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

৬) মদীনা সনদ : একক জাতি গঠনে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ ছিল মদীনা সনদ। হিজরতের কিছুদনি পরেই মহানবী সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণের অধিকার সম্বলিত 'মদীনা সনদ' প্রদান করেন। এতে ৪৭ টি ধারা ছিল। এই ৪৭ টি ধারার মাধ্যমে মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রত্যেকের অধিকার, কর্তব্য, জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মুহাম্মদ (সা.) সকলের সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করেন।

৭) পররাষ্ট্রনীতি : পররাষ্ট্রের প্রতি মুহাম্মদ (সা.) শান্তি ও সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রে তার দূত বিনিময় করেন, ইসলামের প্রতি আহবান জানান। তিনি রোমান ও পারস্য সম্রাটের নিকট ইসলামের বাণী প্রেরণ করেন।

৮) নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা : প্রাক-ইসলামী যুগের আরব সমাজে কোন রাজনৈতিক ঐক্য বা রাষ্ট্র পরিচালনার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল না। সমাজ ও মানুষের জীবন আবর্তিত হতো গোত্রতন্ত্র বা শায়খতন্ত্রের মাধ্যমে। কিন্তু মহানবী (সা.) মদীনা সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ করেন। তিনি সকল মানুষের অংশগ্রহণে একটি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। তিনি ছিলেন সেই শিশু রাষ্ট্রের জনক।

৯) সংবিধান প্রণেতা : মহানবী (সা.) ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সংবিধান প্রণেতা। তাঁর রচিত 'মদীনা সনদ' পৃথিবীর ইতিহাসে রচিত প্রথম সংবিধান। ঐতিহাসিকগণ এই প্রসঙ্গে বলেন, "বিশ্বনবী (সা.) একাধারে ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকের ভূমিকা পালন করেন।"

১০) গণতন্ত্রের সূচনাকারী : মহানবী (সা.) এর রচিত শাসনব্যবস্থা ছিল গণতেন্ত্রর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের মতামতকে গ্রহণ করেছেন। পারস্পরিক ভেদাভেদ ও বিদ্বেষকে দূর করে করেছেন, বহুধা বিভক্ত জাতিকে একই রাষ্ট্রে বসবাস করার উপযোগী করে গড়ে তুলেন। এভাবে তিনি গণতন্ত্রের বীজ বপন করে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।

সারসংক্ষেপ:

মহানবী (সা.) ছিলেন একটি জাতির প্রতিষ্ঠাতা । তিনি বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র, বর্ণে বিভক্ত বিশৃংখল একটি জাতিকে সাম্য, মৈত্রী ও গণতন্ত্রের আদর্শে একীভূত করেছেন। তিনি ছিলেন মদীনা রাষ্ট্রের সংগঠক ও সর্বাধিনায়ক। তিনি বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি ও রাষ্ট্র গঠন করেন। যেখানে সকল বৈষম্য ও ভেদাভেদ দূর করে সকলকে একই আদর্শ ও চেতনায় আবদ্ধ করতে সক্ষম হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মহানবী (সা.) কত সালে বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ করেন ?

ক) ৫২৮ সালে খ) ৬৩০ সালে গ) ৫৭০ সালে ঘ) ৬২৮ সালে

২. মহানবী (সা.) বিদেশে দূত প্রেরণ করেছিলেন -

ক) যুদ্ধের কথা জানান দিতে খ) আর্থিক সাহায্যের জন্য

গ) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ঘ) কোনটিই নয়

৩. মহানবী (সা.) ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন -

i) ইহুদীদের ii) হিন্দুদের iii) খ্রিস্টানদের

নিচের কোনটি সঠিক

ক) ii, iii খ) i, ii গ) i, iii ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ইসলাম বিষয়ক সেমিনারে একজন বক্তা মহানবী (সা.) এর জীবনী আলোচনার সময় বললেন, মহানবী (সা.) একজন সফল জাতি গঠনকারী ছিলেন। তিনি মদীনায় সকল ধর্মের সমন্বয়ে অভিন্ন জাতি গঠন করেন এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

ক) মহানবী (সা.) কোথায় রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন? ১

খ) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি মহানবী (সা.) এর আচরণ কেমন ছিল? ২

গ) 'মহানবী (সা.) বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত' বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রদর্শিত পথ কি অনুসরণ করা উচিত? যুক্তি দিন? ৩

ঘ) "মহানবী (সা.) একজন সফল জাতিগঠনকারী ছিলেন" উক্তিটি মূল্যায়ণ করুন। ৪

পাঠ-৫.৭ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) এর কৃতিত্ব সম্পর্কে জানবেন।
- মহানবী (সা.) এর কৃতিত্ব সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**পৌত্তলিকতা, সম্প্রীতি স্থাপন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্রনায়ক, আনসার ও মুহাজির**

মহানবী (সা.) ছিলেন সমগ্র বিশ্বের মাঝে এক নজিরবিহীন কীর্তিমান পুরুষ। তিনি ছিলেন আল্লাহর ঐশীবাণীর বাহক। তিনি যুগ-যুগান্তরে আরব সমাজের পৌত্তলিকতার অবসান ঘটিয়ে ইসলামের সুমহান বাণী প্রতিষ্ঠা করেন।

সমাজ সংস্কারক

গোত্র প্রথায় আবর্তিত সমাজে তিনি গোত্র কলহ দূর করেন। সকল গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেন। সমাজ হতে ব্যাভিচার, দাস প্রথা, লুণ্ঠন, নৈরাজ্য দূর করেন। সমাজে নারীকে তার অধিকার ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের পৈত্রিক ও স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার করেন। তিনি সমাজে দাসদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজনৈতিক সংস্কার

তিনি মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের (ইহুদী, খ্রিষ্টান, মুসলিম) অধিকার ও কর্তব্য সম্বলিত মদীনা সনদ প্রদান করেন যা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি সকলকে নিয়ে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠন করেন। তিনি ধর্মভিত্তিক মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বিভক্ত আরবদের নিয়ে একটি সুসংহত আরব জাতি গঠন করেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার

সমাজের নাজুক অর্থনীতিকে পিছনে ফেলে তিনি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। সুদ প্রথা, লুটতরাজ ও ঘুষ নিষিদ্ধ করেন। ইসলামের বিধান অনুযায়ী রাজস্ব ব্যবস্থা (যাকাত, খারাজ, জিজিয়া, আল ফাই, গানীমাহ) প্রণয়ন করেন। এভাবে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়।

আরব জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা

তিনি গোত্রে উপগোত্রে বিভক্ত মরুবাসী আরব বেদুইনদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী আরব জাতি প্রতিষ্ঠা করেন। আরব জাতীয়তাবোধকে তিনি সকল বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরেন। তিনি সমগ্র আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন।

আদর্শ নেতা

মহানবী (সা.) ছিলেন একন সফলতম রাষ্ট্রনায়ক, সমরবিশারদ আর বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর জীবন-যাপনকারী, কঠোর পরিশ্রমী ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী। তিনি অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন একটি জাতিকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা উপহার দিতে সক্ষম হন।

ধর্ম সংস্কারক

মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম সংস্কারক। তিনি পৌত্তলিকতার অবসান ঘটিয়ে ইসলামের মূলনীতির উপর সমাজ পরিচালিত করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্র ছিল একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। তিনি আল্লাহর একত্ববাদকে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত

মহানবী (সা.) পরস্পর বিচ্ছিন্ন আরব জাতিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। গোত্রপ্রীতির পরিবর্তে ভ্রাতৃত্বপ্রেম সকলের মধ্যে জাগ্রত করেন। মদীনায় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধনের সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। মহানবী (সা.) ছিলেন বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। তিনি বিশ্বে শান্তির বাণী প্রচারের জন্য প্রেরিত হন। তিনি পরধর্মের প্রতি ছিলেন সহিষ্ণু, পররাষ্ট্রের প্রতি তাঁর বাণী ছিল শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের। বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের জন্য তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাঁর দূত প্রেরণ করেছিলেন। তিনি মানুষের মাঝে ভেদাভেদ দূর করেন।

জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করণ

মহানবী (সা.) কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ করেননি, তিনি রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল শ্রেণির মানুষকে একাত্মবোধে আবদ্ধ করেন ও মহান আদর্শ, উদ্দেশ্য ও গন্তব্যের পথে পরিচালিত করেন। এই ভাবে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এই প্রসংগে P. K. Hitti বলেন, æOut of the religious community of al-Madinah the later and larger state of Islam arose."

ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

মহানবী (সা.) মুসলিম অমুসলিম এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি জাতি গঠন করেন। মদীনা রাষ্ট্রে তিনি সকলের অংশ্রগ্রহণ ও সমন্বয়ে শক্তিশালী-ইসলামী প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি করেন।

গণতন্ত্রের বীজ বপনকারী

মহানবী (সা.) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি সকল ক্ষেত্রেই ছিলেন গণতন্ত্রমনা। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের বীজ বপন করেন।

সারসংক্ষেপঃ

যুগে যুগে মহান আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব-মানবকে পথ প্রদর্শনের জন্য যে সকল মহাপুরুষদের পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে একমাত্র মহানবী (সা.) তাঁর কাজে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছেন। তিনি সর্বশেষ রাসূল হয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে কীর্তি লাভ করেছেন। *Encyclopedia Britannica* – তে বলা হয়েছে, æof all the religious personalities of the world Muhammad was the most successful."

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মদীনা রাষ্ট্র ছিল-

ক) বর্বরতাপূর্ণ খ) ধর্মভিত্তিক

গ) স্বৈরতান্ত্রিক ঘ) ধনতান্ত্রিক

২. "মহানবী (সা.) একজন সফলতম রাষ্ট্রনায়ক" কারণ-

ক) তিনি দীর্ঘ দিন রাষ্ট্র শাসন করেন খ) গণতান্ত্রিক মদীনা রাষ্ট্র গঠন করেন

গ) নিয়মিত রাজনীতি চর্চা করেন ঘ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন

৩. তিনি ছিলেন পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, ধর্মসংস্কারক, অর্থনৈতিক সংস্কারক ও বিশ্ব শান্তির দূত। উদ্দীপকে কার কথা বলা হয়েছে?

ক) হযরত মুসা (আ.) খ) হযরত মুহাম্মদ (সা.)

গ) হযরত ঈসা (আ.) ঘ) হযরত আদম (আ.)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-

বাংলা ২য় পরীক্ষার উত্তরপত্রে আযমী তার "প্রিয় ব্যক্তি" রচনায় মহানবী (সা.) সম্পর্কে বর্ণনা করল। তাঁর জীবনচরিত আলোচনা ও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব উক্ত রচনায় সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

ক) মদীনায় কোন্ কোন্ ধর্মাবলম্বীরা ছিল? ১

খ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) এর কৃতিত্ব লিখুন? ২

গ) তোমার প্রিয় ব্যক্তির কৃতিত্ব আলোচনা করুন। ৩

ঘ) "মহানবী (সা.) ছিলেন সফলতম রাষ্ট্রনায়ক "- ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ : ১. (গ) ২. (ক) ৩. (ঘ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ : ১. (গ) ২. (গ) ৩. (গ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ : ১. (গ) ২. (খ) ৩.(গ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ : ১. (গ) ২. (গ) ৩. (ক)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ : ১. (গ) ২. (ঘ) ৩. (ঘ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬ : ১. (ঘ) ২. (গ) ৩. (গ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭ : ১. (গ) ২. (ক) ৩. (ঘ)

ইউনিট
৬

খুলাফায়ে রাশিদীন

ভূমিকা

খিলাফত হচ্ছে একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইবনে-খালদুনের মতে, " খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা মহানবী (সা:)- এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে। সেই কারণে খলীফার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রনীতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা ।" মহানবী (সা:)- এর পর যারা তাঁর আদর্শ ও দাওয়াত প্রচারণার দায়িত্ব পালন করেছেন তাদেরকে বলা হয় খলিফা। এই খলীফা ও খিলাফতকে ঘিরেই মুসলিমদের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে একদিকে যেমন ইসলামের সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসার, ঠিক অপরদিকে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অপব্যবহার, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও সর্বোপরি ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। মহানবী (সা:)- এর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসন শুরু হয় যা ছিল মূলত মহানবী (সা:)- এর শাসনতন্ত্রের সম্প্রসারিত রূপ। পরবর্তীতে খিলাফত একটি ইহলৌকিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সঠিক পথে পরিচালিত চার জন শাসনকাল কখনোই পুরোপুরি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনকাল (৬৩২-৩৪) ছিল পুরোটাই রিদ্দা যুদ্ধে পরিপূর্ণ। হযরত উমর ফারুক (রা.) এর সময় (৬৩৪-৪৪) পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বিজিত হয় এবং সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠে। হযরত উসমান (রা.) এর শাসনকালের (৬৪৪-৫৬) প্রথম পর্ব ছিল শান্তি ও বিজয়ের যুগ কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিস্বার্থপরতা ও গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। শেষ খলীফা হযরত আলী (রা:) এর সময়ে (৬৫৬-৬১) মুসলিমগণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং খিলাফতের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম বিশ্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ধর্মভিত্তিক খিলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র নির্ভর খিলাফতের আবির্ভাব ঘটে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এই ইউনিটে খুলাফায়ে রাশেদীনদের ক্ষমতায় আরোহণ, তাঁদের চরিত্র, কৃতিত্ব ও আনীত সংস্কারসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১০ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ ঃ খলীফা ও খিলাফত
পাঠ-৬.২ ঃ হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ।
পাঠ-৬.৩ ঃ রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।
পাঠ-৬.৪ ঃ হযরত আবু বকর (রা.) এর বিজয় অভিযানসমূহ
পাঠ-৬.৫ ঃ হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনব্যবস্থা ও চরিত্র
পাঠ-৬.৬ ঃ হযরত উমরের (রা.)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ
পাঠ-৬.৭ ঃ হযরত উমরের বিজয় অভিযানসমূহ-
পাঠ-৬.৮ ঃ হযরত উমর (রা.) এর প্রশাসনিক সংস্কার
পাঠ-৬.৯ ঃ হযরত উমর (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ-৬.১০ ঃ হযরত উসমান (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ
পাঠ-৬.১১ ঃ হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ-
পাঠ-৬.১২ ঃ হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার ঘটনা ও ফলাফল
পাঠ-৬.১৩ ঃ হযরত উসমান (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ-৬.১৪ ঃ হযরত আলী (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত
পাঠ-৬.১৫ ঃ উষ্ট্রের যুদ্ধ
পাঠ-৬.১৬ ঃ সিফফিনের যুদ্ধ
পাঠ-৬.১৭ ঃ হযরত আলী (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ-৬.১৮ ঃ খুলাফায়েরাশেদীনের শাসনব্যবস্থা।

পাঠ-৬.১ খলীফা ও খিলাফত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলীফা ও খিলাফত সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।
- খলীফা হওয়ার গুণাবলী ও নির্বাচন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**খলিফা, 'বায়াৎ', কুরাইশ বংশ, পরামর্শ সভা ও নির্বাচকমণ্ডলী**

খলীফা হচ্ছে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। খলিফাকে ঘিরেই মুসলিম শাসনব্যবস্থা আবর্তিত হয়। খলীফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর যিনি বা যারা তাঁর আদর্শকে বলবৎ রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন তাদের বলা হয় খলীফা বা প্রতিনিধি। প্রধান চারজন খলীফা হলেন- হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.)। মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর এই চার জন প্রসিদ্ধ সাহাবী রাসূল (সা.) এর দেখানো পথ অনুসারে মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন, এরাই ইসলামের ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশিদীন নামে পরিচিত। খিলাফত হল ধর্মীয়-রাজনৈতিক একটি প্রতিষ্ঠান।

এক নজরে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কাল

খলিফা	খিলাফতের সূচনা	সমাপ্তি	সময়কাল
হযরত আবু বকর (রা)	১৩ই রবিউল আউয়াল ১১হি.	২২ শে জমাদিউল উখরা ১৩হি.	২ বছর ৩ মাস ৯ দিন
হযরত উমর ফারুক (রা)	২৩শে জমাদিউল উখরা ১৩হি.	২৬শে যিলহজ্জ ২৩ হিজরি	১০ বছর ৬ মাস ৩ দিন
হযরত উসমান (রা)	১লা মুহাররম ২৪ হিজরি	১৮ই যিলহজ্জ ৩৫ হিজরি	১১ বছর ১১ মাস ১৭ দিন
হযরত আলী (রা)	২৪শে যিলহজ্জ ৩৫ হিজরি	১৭ই রমযান ৪০ হিজরি	৪ বছর ৮ মাস ২৩ দিন
হযরত ইমাম হাসান (রা)	২২শে রমযান ৪০ হিজরি	রবিউল আউয়াল ৪১ হিজরি	৬ মাস ৮ দিন

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান খিলাফত

ঐতিহাসিক মজীদ খাদ্দুরী বলেন, "খিলাফত হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইহলৌকিক নেতৃত্বের একটি প্রতিষ্ঠান।" সুতরাং খিলাফত হচ্ছে মহানবী (সা.) এর আদর্শকে নেতৃত্বদানকারী এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। খলীফা হওয়ার জন্য অবশ্যই কিছু গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-কুরাইশ বংশোদ্ভুত, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, চারিত্রিক শুদ্ধতা, প্রজ্ঞাবান, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

খলীফা নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি ছিল সর্বসম্মত ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। বিশিষ্ট জ্ঞানী ও আলেম ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরামর্শসভার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হতো। নির্বাচকমণ্ডলীর সুপারিশক্রমে কোন ব্যক্তি খলীফা নির্বাচিত হতেন এবং সবশেষে জনগণ কর্তৃক 'বায়াৎ' অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হতো। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উক্ত খলীফা মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে যেতেন যা উমাইয়া যুগ থেকে রাজতন্ত্রে পরিণত হয়।

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ ছিল ইসলামের ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়। এ সময় কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে পূর্ণ ইসলামী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালিত হতো। কিন্তু উমাইয়া বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ইসলামের শাসননীতি ও আদর্শের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এই প্রসংগে Syed Ameer Ali বলেন, The accession of the Ommeyades did not imply a change of dynasty; it meant the reversal of a principle and the birth of new factors. এ সময় হতে খিলাফত আমলের প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় এবং ইসলামি প্রজাতান্ত্রিক শাসন

কাঠামোর পরিবর্তে বংশানুক্রমিক ও রাজতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর সূত্রপাত ঘটে। এই সময় যে সমস্ত পরিবর্তন রাষ্ট্রের কাঠামো ও শাসননীতিতে প্রবেশ করে তা হলো-

রাজতন্ত্রের আবির্ভাব

মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশিদীনের চারজন খলীফা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের সমর্থনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া (রা.) ৬৭৬ খ্রিঃ তাঁর জৈষ্ঠ্য পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের সূচনা করেন।

সারসংক্ষেপঃ

মহানবী (সা.) এর আদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান ছিল খিলাফত আর খলীফা ছিলেন তার কার্যনির্বাহক। আর খলীফা নির্বাচিত হতেন যোগ্যতা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খলীফা শব্দের অর্থ কী?
   ক) সর্বময় কর্তা খ) নেতা
   গ) প্রতিনিধি ঘ) মালিক

২. "খলীফা নির্বাচন প্রক্রিয়াটি গণতান্ত্রিক" কেননা-
   ক) ঐতিহাসিকরা এটাকে গণতান্ত্রিক বলেন খ) এটি একটি নির্বাচন তাই
   গ) খলীফা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত ও জনগণ কর্তৃক আনুগত্য লাভ করেন
   ঘ) কোনটিই নয়

৩. খিলাফত হচ্ছে-
   i) খলীফার দপ্তর ii) জনসমাবেশ স্থল iii) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

নিচের কোন্‌টিসঠিক
   ক) i, ii খ) ii, iii গ) i, iii ঘ) i, ii, iii

৪. একজন মনীষীর ইন্তিকালের পর থেকে খিলাফতের কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির ?
   ক) হযরত আবু বকর (রা) খ) হযরত আলী (রা)
   গ) হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘ) হযরত ওসমান (রা)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মোঃ জসীম উদ্দীন "যুবসংঘ" নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানটি চলতে থাকে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলে যান যে, যোগ্যতা অনুসারে গণতান্ত্রিক উপায়ে এই সংঘের প্রধান নির্বাচিত করতে হবে যেন যোগ্য ব্যক্তি এটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

ক) খলীফা বলতে কী বুঝায় ? ১
খ) "খোলাফায়ে রাশেদীনে" মোট কতজন খলীফা ছিলেন? ২
গ) উদ্দীপকের যুবসংঘ ও খিলাফতের মধ্যে পার্থক্য কি? ৩
ঘ) খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে খলীফা নির্বাচন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন? ৪

পাঠ-৬.২ হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আবু বকর (রা.) এর বংশ পরিচয় ও প্রাথমিস জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও ইসলামের প্রতি তার ভালবাসা ও অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতিতে আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত লাভ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ইসলামের ত্রাণকর্তা, সিদ্দীক (বিশ্বাসী), আনসার ও মুহাজির**

বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রা.)-ই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (স.) এর জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম রক্ষায় নিজ সমুদয় সম্পদ যেমন দান করেছিলেন তেমনি খিলাফতে আসীন হয়ে অন্যায়ের সাথে কোন প্রকার আপোষ করেননি। একারণেই তাকে 'ইসলামের ত্রাণকর্তা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন

হযরত আবু বকর (রা.) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের তায়িম গোত্রে ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাল্যনাম ছিল আবদুল্লাহ; ডাক নাম ছিল আবু বকর (কুনিয়া)। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি 'সিদ্দীক (বিশ্বাসী)' খেতাব লাভ করেন। আবু বকর (রা.) এর পিতার নাম ছিলো আবু কোহাফা এবং মাতার নাম ছিল উম্মুল খায়ের সালমা। যৌবনে আবু বকর তাঁর নৈতিক আদর্শের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন। আবু বকর (রা.) পেশায় একজন কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের সেবা

বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রা.)ই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন মানুষকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিলেন। তখন আবু বকর (রা.) বিনা দ্বিধায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তার প্রচেষ্টায় অনেকেই ইসলাম কবুল করেন এবং হযরত বিলাল (রা.) সহ অনেক দাসকে তিনি শৃঙ্খলামুক্ত করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর "ইসলামের সেবায় আবু বকরকে কেউ অতিক্রম করেতে পারেনি।"

মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ভক্তি

৬২২ খ্রিস্টাব্দের হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.) এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক ও হুনাইনের যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.) এর অসুস্থতার সময় তাঁর স্থলে ইমামতি করেন। এতে বুঝা যায় যে, নবীজী (সা.) আবু বকর (রা.)কেই তাঁর অবর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত বলে মনে করতেন।

সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব

মহানবী (সা.) এর কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিল না। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তিনি তাঁর ওফাতের সময় উত্তরাধিকারীও মনোনীত করে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পর কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন? এই প্রশ্ন নিয়ে মুসলিম জাহানে এক বিরাট সমস্যা দেখা দিল [P.K Hitti বলেন- æThe caliphate is therefore the first problem Islam had to face."
এই প্রশ্নে মুসলিমগণ আনসার ও মুহাজীর এই দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মদীনার সংকটময় পরিস্থিতির আনসারগণ সাদ বিন ওবায়দাকে এবং একদল মুহাজীর হযরত আলী (রা.) কে উক্ত পদের জন্য মনোনীত করেন।

খিলাফত লাভ

ইসলামের সংকটময় সময়ে হযরত উমর (রা.) এবং আবু উবায়দাকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) সহ ছাকিফা বানী সায়িদা গৃহে অবস্থান করছিলেন। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করলে হযরত উমর (রা.) বয়স, অবস্থান, পদমর্যাদা,

সম্মান ইত্যাদি বিবেচনা করে হযরত আবু বকর (রা.) কে ইসলামের প্রথম খলীফা বলে ঘোষণা করে তাঁর হাত স্পর্শ করে বায়াৎ গ্রহণ করেন। সাদ ব্যতীত সমস্ত মহল হতে মুসলিম জনতা তাঁকে খলীফা বলে অভিবাদন জানাল।

খলীফার উদ্বোধনী ভাষণ

খলীফা নির্বাচিত হবার পর হযরত আবু বকর (রা.) সকলের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এই ভাষণে গণতান্ত্রিক চেতনা ফুটে উঠেছে যা ছিল আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল বক্তব্য। এতে খলীফার স্বৈরাচারী মনোভাবের নিষিদ্ধতা এবং জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থার স্বরুপ প্রকাশ পেয়েছে। আর সকল কিছুর উর্ধ্বে ইসলামী শরীয়তের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.) এর খলীফা নির্বাচনে মুসলিম বিশ্বের প্রথম ভয়াবহ সংকট দূরীভূত হয়। তাঁর নির্বাচনে গণতন্ত্রের জয় হয়। এর পর থেকে মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের সূত্রপাত হয়। তাঁর খিলাফত প্রাপ্তি যুক্তিসঙ্গতও ছিল। ইসলামের জন্য তিনি যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং দূরদর্শিতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ধর্মপরায়ণতা এবং অন্যান্য গুণে তিনি নিঃসন্দেহে অধিক উপযুক্ত ছিলেন। খলীফা হওয়ার পর আবু বকর (রা.) সমবেত মুসলিমদেরেকে উদ্দেশ্যে করে ভাষণ প্রদান করেন। উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে তিনি খলীফা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জনগণকে অবহিত করেন। একজন খলীফাকে যে স্বেচ্ছাচারী নীতির পরিপন্থী ও গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করতে হয় তা তিনি অকপটে প্রকাশ করেন এবং তিনি যে ইসলামী শাসন প্রবর্তনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দান করেন।

সারসংক্ষেপঃ

দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা, ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি দিক দিয়ে যোগ্যতম হওয়ায় আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন। খলীফা হিসাবে তিনি তার দায়িত্ব পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আবু বকর (রা.) কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) আওস গোত্রে খ) খাজরাজ গোত্রে
গ) নাদির গোত্রে ঘ) তায়িম গোত্রে

২. মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল কেন?
ক) দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বলে খ) বিদেশীদের আক্রমণে
গ) খলীফা নির্বাচন নিয়ে ঘ) বিভিন্ন গোত্রে যুদ্ধ হয়েছিল বলে

৩. আবু বকর (রা.) এর খলীফা নির্বাচন যুক্তিসঙ্গত ছিল। কারণ-
i) তিনি ছিলেন বয়োঃজ্যেষ্ঠ ii) ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ iii) তার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল
নিচের কোন্‌টিসঠিক-
ক) i, iii খ) i, ii, iii গ) i, ii ঙ) i, ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রসুলপুর গ্রামে, গ্রামপ্রধান নির্বাচনে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হলো। এতে গ্রামবাসী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কেউ অর্থের জোরে, কেউ গায়ের জোরে গ্রামপ্রধান হওয়ার দাবী জানাল। কিন্তু পরবর্তীতে গ্রামের বিজ্ঞ, দানশীল, অভিজ্ঞ, পরোপকারী রহিম মিয়া গ্রামপ্রধান নির্বাচিত হওয়ায় সকল গ্রামবাসী তার আনুগত্য মেনে নেয়।

ক) ইসলামের প্রথম খলীফা কে ছিলেন ? ১
খ) ইসলামের সেবায় আবু বকর (রা.) এর অবদান সংক্ষেপে লিখুন। ২
গ) উপরের ঘটনার সাথে আবু বকর (রা.) এর জীবনের কোন ঘটনা মিলে যায়- ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) "আবু বকর (রা.) এর খলীফা নির্বাচন যুক্তিসঙ্গত ছিলো" আপনি কি তা মনে করেন। ৪

পাঠ-৬.৩ রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রিদ্দা যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রিদ্দা যুদ্ধের কারণ ঘটনা ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**স্বধর্মত্যাগী, নবুয়্যতের মোহ, ভণ্ডনবীর, বনু ইয়ারুব গোত্র ও রিদ্দার যুদ্ধ**

হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে সংগঠিত রিদ্দার যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক বিপদস্বরুপ এই যুদ্ধে আবু বকর (রা.) কঠোরহস্তে বিদ্রোহীদের দমন করেন।

রিদ্দা যুদ্ধ

'রিদ্দা' আরবী শব্দ। এর অর্থ প্রত্যাবর্তনকরণ বা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া। মহানবী (স.) এর মৃত্যুর পর এক শ্রেণির মুসলিম ইসলাম ধর্মকে বর্জন করে, তাদের পৌত্তলিকতায় প্রত্যাবর্তন করে। ইসলাম প্রচারের পর মক্কা ও মদীনা কেন্দ্রীক ইসলাম ধর্ম সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। এই সময় মহানবীর মৃত্যুর পরে কতিপয় ভণ্ডনবীর আবির্ভাব ঘটল, কেউ কেউ পৌত্তলিকতায় ফিরে গেল। সমগ্র আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল। ইসলামের প্রথম খলীফা এই সকল স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, যা ইতিহাসে 'রিদ্দার যুদ্ধ' হিসেবে পরিচিত। ঐতিহাসকি P.K Hitti বলেন- æ The short caliphate of abu- Bakr (632-4) was mostly occupied with the so-called *riddah* (secession, apostasy) wars."

রিদ্দা যুদ্ধের কারণ

ক) ইসলাম প্রচারের স্বল্পতা ঃ

মহানবী (স.) এর জীবদ্দশায় কেবলমাত্র বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতিরাই ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতেন। পরবর্তীতে গোত্রপতিদের অনুসরণে গোত্রের অন্যান্য লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করত। এর ফলে সকলের নিকট ইসলামের আদর্শের বাণী ও সৌন্দর্য সঠিকভাবে অনুধাবন করা হতো না। তাই তারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগে তৎপর হয়ে উঠে।

খ) যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি ঃ

ইসলামের অনুশাসন অনুসারে আর্থিকভাবে অবস্থাসম্পন্নদের জন্য যাকাত প্রদান করা আবশ্যক কিন্তু তৎকালীন আরব উপদ্বীপের অভিজাত শ্রেণির জন্য যাকাত প্রদান করা ছিল তাদের আভিজাত্যের জন্য হুমকিস্বরুপ। তাই তারা ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর হয়ে উঠে।

গ) মদীনা রাষ্ট্রের প্রাধান্য অস্বীকার ঃ

পূর্বে আরব গোত্রগুলি ছিলো পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন। তাই যখন মদীনা রাষ্ট্রের একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো তখন এই বিচ্ছিন্ন গোত্র গুলো এই প্রাধান্যকে তাদের জন্য হুমকিস্বরুপ মনে করলো। তারা ইসলামের ভ্রতৃত্ববোধ কে অস্বীকার করলো। ইসলাম ধর্ম থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিতে তৎপর হয়ে উঠল।

ঘ) নবুয়্যতের প্রতি মোহ ঃ

স্বার্থান্বেষী কিছু আরব নবুয়্যতকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করেছিল। তারা এর মহান উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যকে বুঝতে সক্ষম হয়নি। তাই অনেক ভণ্ডনবীর আবির্ভাব ঘটলো। অনেক গোত্রপতি নবুয়্যতের দাবী করলো। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন (তোলায়হা, সাজাহ, মুসায়লামা ও আসওয়াদ আল- আনসি)

ঘটনাপ্রবাহ

খলীফা আবু বকর (রা.) স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তিনি আরবের বিভিন্ন প্রান্ত হতে সৈন্য সমাবেশ ঘটালেন। সমগ্র সেনা বাহিনীকে তিনি **১১** টি ভাগে বিভক্ত করে এক এক ভাগকে এক এক অংশে প্রেরণ করলেন। তিনি মদীনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করলেন। মুসলিম সেনাপতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- খলিদ বিন ওয়ালিদ, ইকরাম, শুরাহবিল, মুহাজির বিন আবি উমাইয়া উল্লেখযোগ্য। হযরত আবু বকর (রা.) সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। মদীনা ছিলো সেনাবাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। এই সকল যোগ্য সেনাপতির নেতৃত্বে একে একে সকল ভণ্ডনবীকে পরাজিত করা হলো। বিদ্রোহী গোত্রগুলো একের পর এক পরাজিত হল এবং খলীফার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

ফলাফল

ক) এই যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইসলামের বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।
খ) বিভিন্ন গোত্র যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হয়।
গ) ইসলাম সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত হয়।
ঘ) মদীনা রাষ্ট্রের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভণ্ডনবীগণ ও তাদের পতন

হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে একটি উল্লেযোগ্য ঘটনা হচ্ছে কতিপয় ভণ্ডনবীদের আবির্ভাব। যারা ছিলো রিদ্দা যুদ্ধের অন্যতম অনুঘটক। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মৃত্যুর পরে কতিপয় আরবগোত্র প্রধান নিজেদের মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবি জানায়। তারা নবুয়্যাতের মহান তাৎপর্যকে অসম্মান জানায় এবং এটিকে একটি সম্মানজনক পদ বলে বিবেচনা করে। এদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন-

আসওয়াদ আল আনসি ঃ

সে ছিলো ইয়েমেনের বাসিন্দা। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবদ্দশায়ই (৬৩১-৩২) সে নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করেন। সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ও ইয়েমেনের মুসলিম শাসনকর্তাকে পদচ্যুত ও বিতাড়িত করে। সে অন্যান্য আরব গোত্রের সহোযোগিতায় বিদ্রোহ করে, কিন্তু সে তার নিজ আত্মীয় ফিরোয দায়লামী কর্তৃক নিহত হয়। এই ঘটনা ঘটে মহানবী (স.) এর ওফাতের কিছুদিন পূর্বে।

তুলায়হা ঃ

সে ছিলো নজদের অধিবাসী । আবু বকর (রা.) খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) কে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বুজাকার যুদ্ধে তুলায়হা খালিদ কর্তৃক পরাজিত হয়। সে ছিলো বনী আসাদ গোত্রের লোক। তার পরাজয়ের পরে বনু আসাদ গোত্রকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয় এবং গোত্রটি ইসলাম কবুল করে নেয়।

সাজাহ ঃ

বনু আসাদ গোত্রে অভিযানের পর খালিদ (রা.) বনু তামিম গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এই ধর্মত্যাগী গোত্রটির প্রধান ছিলো ভণ্ড নবুয়্যাতের দাবীদার একজন নারী, সাজাহ। সে বনু তামিমের উপগোত্র বনু ইয়ারুব গোত্রের অধিবাসী ছিলো। বনু ইয়ারুব গোত্র তাকে নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালে সাজাহ অপর ভণ্ডনবী মুসায়লামার সাথে মিলিত হয় এবং তাকে বিবাহ করে।

মালিক বিন নুবায়রা ঃ

বনু ইয়ারবু গোত্রের নেতা ছিলো মালিক বিন নুবায়রা। নুবায়রা আনুগত্য অস্বীকার করলে, খালিদ তাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং যুদ্ধে সে নিহত হয়।

মুসায়লামা ঃ

ভণ্ড নবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলো মুসায়লামা। প্রথমে ইকরামা ও শুরাহবিল (রা.)-কে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। কিন্ত তাঁরা ব্যর্থ হলে, ৬৩৩ খ্রি: খালিদ (রা.) তাকে ইয়ামামার যুদ্ধে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধটি একটি প্রাচীরঘেরা বাগানে সংঘটিত হয়েছিলো ও এতে অসংখ্য লোক মারা যায়। তাই ঐতিহাসিকেরা একে 'Battle of the Gardens of Death' বা মৃত্যু উদ্যান যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

সারসংক্ষেপঃ

রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগী যুদ্ধ ছিল ইসলাম ও মদীনা রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরুপ। অবশেষে খলীফা আবু বকরের নেতৃত্বে মুসলিমগণ স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. "রিদ্দা যুদ্ধ" কোন খলীফার সময়ে হয়?

ক) হযরত আলী (রা.) খ) হযরত উমর (রা.)

গ) হযরত উসমান (রা.) ঘ) হযরত আবু বকর (রা.)

২. আবু বকর (রা.) ভণ্ড নবীদের দমন করেছিলেন। কারণ তারা -

ক) শক্তিশালী ছিল খ) খলীফা পদের দাবী করেছিল

গ) নবুয়্যতের দাবী করেছিল ঘ) অমুসলিম ছিল

৩. আবু বকর (রা.) স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কারণ তারা-

i) যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে ii) ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধকে অস্বীকার করে

iii) নবুয়্যতের দাবী করে

নিচের কোন্‌টিসঠিক

ক) i, iii খ) i, ii

গ) ii, iii ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

হোসেন আলী কলেজের ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক আবুল কাসেম হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রিদ্দা যুদ্ধের আলোচনা করলেন, যা তার সময়ে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবু বকর (রা.) কঠোর হস্তে স্বধর্মত্যাগীদের দমন করেন।

ক) রিদ্দা শব্দের অর্থ কী? ১

খ) কয়েকজন ভণ্ডনবীর নাম লিখুন। ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত "রিদ্দা" যুদ্ধের ফলাফল কী কী ছিল- তুলে ধরুন। ৩

ঘ) "রিদ্ধা" যুদ্ধের পিছনে কি কি কারণ ছিল বলে আপনার মতামত লিখুন। ৪

পাঠ-৬.৪ হযরত আবু বকর (রা.) এর বিজয় অভিযানসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফত কালে পারস্য ও সিরিয়া অভিযান সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- এই সব অভিযানে সংঘটিত যুদ্ধ এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মুসান্না, খালিদ বিন ওয়ালিদ, হাফির যুদ্ধ ও The Lady Castle.**

আবু বকরের খিলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি অব্যাহত থাকে। তাঁর সময়কালে পারস্য ও সিরিয়ায় মুসলিমদের বিজয় নিশান উড্ডীন হয়।

পারস্য অভিযান ঃ

রিদ্দা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পারস্যের অধিবাসীগণ স্বধর্মত্যাগীদের সাহায্য করেছিল। তাই পারস্যবাসীর এরুপ মনোভাব ভবিষ্যতে এ মদীনা রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরুপ বিবেচনা করে হযরত আবু বকর (রা.) পারস্যে মুসলিম অভিযান প্রেরণ করলেন। প্রথম পর্যায়ে (৬৩৩ খ্রি:) মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন মুসান্না, তার অধীনে ছিল প্রায় ৮,০০০ সৈন্য । কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সেনাপতি মুসান্না সংকটজনক অবস্থার সম্মুখীন হলেন। অত:পর খলীফা শ্রেষ্ঠ মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) কে প্রেরণ করলেন। এই দুই সেনাপতি উবাল্লা নামক স্থানে মিলিত হল, এতে করে মুসলিমবাহিনীর সামর্থ্য বেড়ে গেল। এই মিলিত সেনা বাহিনী পারস্যবাহিনীর সঙ্গে হাফির নামক স্থানে মিলিত হল।

হাফিরের যুদ্ধ ঃ

এই যুদ্ধ 'হাফির' অর্থাৎ শৃংখলের যুদ্ধ বা (Battle of Chain) নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে পারস্যের সেনাপতির সেনা বাহিনীকে শৃংখলের মত বিন্যস্ত করেছিলেন, তাই এই যুদ্ধকে বলা হয় 'শৃংখলের যুদ্ধ'। যুদ্ধে পারস্যবাসী পরাজিত হয়। পারস্যের সেনাপতি 'হরমুজ' খালিদ (রা.) এর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। The Lady Castle বা হাফির যুদ্ধের পর মুসলিমবাহিনী আরো অগ্রসর হতে থাকেন। ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর তীর ঘেষে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের নিকটবর্তী জনৈকা রাজকুমারী দ্বারা পরিচালিত একটি দুর্গ মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এটি ইতিহাসে মহিলা দুর্গ (The Lady's Castle) নামে সর্বাধিক পরিচিত।

হীরা বিজয় ঃ

অপর একটি পারসিক সেনাবাহিনীকে উলিসের যুদ্ধে পরাজিত করে বীর যোদ্ধা খালিদ (রা.) হীরা অধিকার করেন। হীরার অমুসলিম শাসনকর্তা মুসলিম বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করেন, খলীফার নিকট আনুগত্য জানান। এই সময় হীরার খ্রিস্টান অধিবাসীদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করা হয়। খলীফা তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আনবার অধিকার ঃ

হীরা বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী আরো সামনে অগ্রসর হয়ে ফোরাত নদীর তীর ঘেঁষা আনবার দখল করেন। সেনাপতি খালিদ (রা.) এরপর আইনুত্-তামার ও দুমায় মুসলিম বিজয় সম্পন্ন করেন।

সিরিয়া অভিযান ঃ

সিরিয়া তখন রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এর শাসক ছিলেন হিরাক্লিয়াস। রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায়, হিরাক্লিয়াস রাসূলের প্রেরিত দূতকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাসূলের মৃত্যুর পর কালক্রমে তার এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। হিরাক্লিয়াস রিদ্দা যুদ্ধে বিদ্রোহীদের উস্কানিদাতা ছিলেন এবং সিরিয়া ও আরব সীমান্তবর্তী বেদুইন গোত্রের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাই খলীফা এই ওমকির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন।

এছাড়াও শুরাহবিল কর্তৃক মহানবীর দূতকে মূতা নামক স্থানে হত্যা করা হলে, মুসলিমদের এই প্রতিশোধ নেওয়া আবশ্যক হয়ে দাড়ায়। কারণ এটি ছিল আন্তর্জাতিক চুক্তির অপমান।

আজনাদাইনের যুদ্ধ ঃ

প্রথমে আবু বকর(রা:) উসামার নেতৃত্বে সৈন্য বাহিনী সিরিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। পরে ৬৩৪ খ্রিঃ সিরিয়ার আজানদাইন নামক স্থানে মুসলিম সেনাবাহিনী সিরিয়া বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেয়। অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনী জয়ী হয়। হিরাক্লিয়াস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে এন্টিয়কে আশ্রয় নেয়। মুসলিমরা সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক দখল করে নেয়। এই সময় মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আমর-ইবনে আল আস, সুরাহবিল-ইবনে-হাসানাহ, ইয়াজিদ-ইবনে-আবী-সুফিয়ান এবং আবু-উবাইদা-ইবনে-জাররাহ। মুসলিম সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৬,০০০ অপর পক্ষে হিরাক্লিয়াসের সাথে ছিল প্রায় এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) হীরা জয়ের পর, হীরা ত্যাগ করে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু-বকর (রা.)-যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তাঁর নিকট এই পারস্য বিজয়ের সংবাদ পৌছায়।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত আবু বকর (রা.) স্পল্প মেয়াদের খিলাফতকালে সিরিয়া ও পারস্যে বিজয় ছিল উল্লেখযোগ্য মুসলিম বিজয়। ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এ সকল অভিযান প্রেরণ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হযরত আবু বকর (রা.) প্রথম অভিযান কোথায় প্রেরণ করেন?
   ক) সিরিয়ায় খ) ইসরাইলে
   গ) পারস্যে ঘ) মেসোপটেমিয়ার

২. আবু বকর (রা.) এর বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান প্রেরনের মূল কারণ ছিল-
   ক) রিদ্দা যুদ্ধে ঐ সকল অঞ্চল স্বধর্মত্যাগীদের সহায়তা করেছিল।
   খ) রাজ্য প্রতিষ্ঠা গ) অর্থনৈতিক ঘ) ঐ সকল অঞ্চল বর্বরতাপূর্ণ ছিল

৩. আবু বকর (রা.) অভিযান প্রেরণ করেন-
   i) পারস্য ii) স্পেন iii) সিরিয়া
   নিচের কোন্‌টি সঠিক
   ক) i, ii, iii খ) i, ii গ) i, iii ঘ) ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারতবর্ষ অভিযান করেন। তাঁর এই অভিযান ধর্মীয় অপেক্ষা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিলো। তিনি বিজিত অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম প্রচার করেন নি।

ক) হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি কে ছিলেন ? ১
খ) 'হাফির' বা 'শৃংখলের' যুদ্ধ সম্পর্কে লিখুন? ২
গ) হযরত আবু বকর (রা.) এর সিরিয়া অভিযানের কারণ কি ছিল? ৩
ঘ) রাজ্য বিজেতা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.) এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৬.৫ হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনব্যবস্থা ও চরিত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানবেন ও
- হযর আবু বকর (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	উত্তরসূরী, রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী, মজলিশ-ই-শুরা, ভণ্ডনবী ও ইসলামের ত্রাণকর্তা

ইসলামী রাষ্ট্রের এক সংকটময় অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) রাষ্ট্রের হাল ধরেন। তার উপর খিলাফতের মহান দায়িত্ব আরোপিত হয়। তিনি ছিলেন রাসূল (স.) এর যোগ্য উত্তরসূরী। রাসূল (সা.) এর দেখানো পথ অনুসারে তিনি রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী পরিচালনা করেন।

গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক ঃ

তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। তার শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল গণতন্ত্র। তার খিলাফতে নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। বায়াত গ্রহণের পর সকলের উদ্দেশ্যে উদ্বোধনী ভাষণটি গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর স্পষ্ট মনোভাবের স্বাক্ষর বহন করে।

পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন ঃ

হযরত আবু বকর ছিলেন পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবীদের দ্বারা পরিচালিত 'মজলিশ-ই-শুরা' এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। তিনি এর মাধ্যমে কুরআন ও হাদীস অনুসরণে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তিনি বলতেন, "আমাকে আল্লাহর খলীফা বলিও না, আমি কেবল আল্লাহর রাসূলের খলিফা।"

রাষ্ট্র সংগঠক ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন একজন সত্যিকারের রাষ্ট্র সংগঠক। মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পরের সমগ্র আরব জাতি ইসলামের পথ হতে দূরে সরে যায়, যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ভণ্ডনবীদের আবির্ভাব ঘটে। সেই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে তিনি শক্ত হাতে রাষ্ট্রের হাল ধরেছিলেন। রাষ্ট্রকে একটি সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে P.K Hitti বলেন- æ The peninsula was now united under abu-Bakr by the sword of khalid."

ইসলামের ত্রাণকর্তা ঃ

ইসলামে খেদমতের জন্য খুব কম সংখ্যক লোকই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন। তন্মধ্যে আবু বকর (রা.) অগ্রগণ্য। ইসলামের প্রতি তাঁর ত্যাগ ও সেবা ছিল অপরিসীম ও অপরিমেয়। তাই তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বা 'Savior of Islam' বলা হয়।

কুরআন সংরক্ষণ ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনামলে সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইয়ামামার যুদ্ধে অসংখ্য কুরআন-এ হাফিযের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পবিত্র কুরআন এর অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। তখন হযরত আবু বকর (রা:) বিশিষ্ট সাহাবীদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। মহানবী (স.) এর প্রধান ওয়াহী লেখক ও সচিব যায়িদ বিন সাবিত (রা.)-কে প্রধান করে এই সংকলনের কার্যাবলি পরিচালিত হয়। এই কুরআন সংকলন করে তিনি শুধু কুরআনের হেফাযতই নিশ্চিত করেননি, বরং তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রকে ভবিষ্যৎ সংকট হতে রক্ষা করেন।

হযরত আবু বকর (রা.) এর চরিত্র ঃ

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর(রা:) ছিলেন অসামান্য চারিত্রিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর চারিত্রিক কোমলতা ও মাধুর্যতা ছিল আকর্ষণীয়। তিনি বিদ্বান ও অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। রাসূল (সা.) তাকে সিদ্দীক বা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করেন। ইসলামের প্রতি তার অনুরাগ ছিলো অসীম। তিনি নবী করীম (সা.) কে ছায়ার মত

অনুসরণ করতেন। মহানবী (সা.) এর সকল আদর্শের প্রতিফলন তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিলো। যদিও তিনি ব্যক্তি জীবনে সরল ও কোমল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তথাপি ন্যায় বিচার ও ইসলামের আদর্শের ক্ষেত্রে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রিদ্দা যুদ্ধে ভণ্ডনবীদেরকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। আরব গোত্রগুলো যখন যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তিনি যাকাত আদায়ের ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ় মনের অধিকারী। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই ইসলামের ত্রাণকর্তা।
তিনি ছিলেন সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী। তিনি বায়তুল মাল হতে যৎসামান্য ভাতা গ্রহণ করতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রি করে বায়তুল মালে গচ্ছিত করেন।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা। তিনি ছিলেন মহানবী (সা.) এর যোগ্য উত্তরাধিকারী। তিনি ইসলামের সংকটজনক অবস্থায় অসামান্য অবদান রাখতে সমর্থ হন। শাসনব্যবস্থায় তিনি ছিলেন সুদক্ষ ও কঠোর এবং চারিত্রিক দিক থেকে তিনি ছিলেন কোমল ও অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. প্রধান ওয়াহী লেখক কে ছিলেন?
ক) হযরত আবু বকর (রা.) খ) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)
গ) হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রা.) ঘ) হযরত উমর (রা.)

২. হযরত আবু বকর (রা.) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন?
ক) ইসলামের সংকটজনক মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য খ) মহানবী (সা.) তাঁকে এই উপাধি দেন
গ) মদীনাবাসীকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন ঘ) আবু বকর (রা.) এর অন্তিম ইচ্ছা ছিল

৩. আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলন করেন-
i) ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফিয নিহত হন ii) কুরআন অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়
iii)মহানবী (সা.) বলেছিলেন
নিচের কোন্‌টি সঠিক
ক) i, iii খ) i, ii, iii গ) ii, iii ঘ) i, ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

হোসেন মিয়া রুপপুর গ্রামের কল্যাণে নিয়োজিত একজন একনিষ্ঠ প্রতিনিধি। জনগণের সুখ দুঃখ, দুর্দশা, দুঃসময়ে সর্বদা এগিয়ে আসে মানুষটি। বিপদে বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত। রুপপুর গ্রামের সংকটজনক অবস্থায় তিনি এর হাল ধরেন। তার নিরলস প্রচেষ্টায় পিছিয়ে-পড়া, কুসংস্কারছন্ন, সংঘাতপূর্ণ গ্রামটি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করে।

ক) বয়স্কদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন কে? ১
খ) আবু বকর (রা.) কে সিদ্দিক উপাধি দেয়া হয় কেন ? ২
গ) "উদ্দীপকের হোসেন মিয়া যেমন গ্রামের সংকটজনক অবস্থার উত্তরণে তেমনি আবু বকর (রা.) মুসলিম জাহানের সংগঠক হিসেবে কাজ করেন।" ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) হযরত আবু বকর (রা.) কে কেন ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় ? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-৬.৬ হযরত উমরের (রা.)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উমর (রা.) এর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে জানবেন ও
- কীভাবে তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হলেন সে সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	আদ্দিয়া বা আদিয়া গোত্র, আল ফারুক, ওয়াহী লেখক ও মক্কা বিজয়

হযরত উমর (রা.) ৫৮৩ খ্রিঃ কুরাইশ বংশের 'আদ্দিয়া' বা আদিয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু হাফস। তাঁর পিতার নাম ছিল খাত্তাব ও মাতা হানতামা। হযরত উমর ছিলেন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী ব্যক্তি। তিনি কুস্তিতে পারদর্শী ছিলেন। তৎকালীন কুরাইশ বংশে যে ১৭ জন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন তার মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ব্যবসা ছিলো তার প্রধান পেশা। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন ইসলামের ঘোর বিরোধী । একদিন আবু সুফিয়ানের কুমন্ত্রণায় হাতে উদ্ধত তরবারী নিয়ে মহানবী (স.) কে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে তিনি তার ভগ্নি ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সায়িদ এর গৃহ হতে কুরআনের বাণী শুনে বিমোহিত হন। তার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষনাৎ রাসূল (স.) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন তার বয়স ছিল ৩৩ বছর। মহানবী (সা.) তাকে 'আল ফারুক' বা সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী উপাধি দেন। এটি ছিলো ইসলামের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

ইসলামের প্রতি খেদমত ঃ

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমর (রা.) ইসলামের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি সবকটি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা। তাবুক অভিযানের সময় তিনি তাঁর মোট সম্পত্তির অর্ধেক যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করেন। তিনি হিজরতের পরে মহানবী (সা.) কে মসজিদে আযান প্রচলনের পরামর্শ দেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে সালাত আদায় করতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর খলীফা আবু বকরের হাতে তিনিই সর্বপ্রথম বায়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেন।

খিলাফত প্রাপ্তি ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) যখন গুরুতর অসুস্থ তখন তিনি মুসলিম বিশ্বের জন্য একজন খলীফাকে মনোনয়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সকল গুণ ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে তিনি হযরত উমর (রা.) কে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনীত করেন। এজন্য তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। তিনি হযরত উসমান (রা.), আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), আনসার ও মুহাজিরদের কাছে তার মনোভাব প্রকাশ করলেন। সকলেই তার অভিমতকে গ্রহণ করলো। আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) তাঁর কঠোরতার প্রতি খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। খলীফা তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, তার উপর দায়িত্ব বর্তালে তিনি কোমল হয়ে যাবেন। তারপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান (রা.) এর দ্বারা একটি মনোনয়পত্র তৈরি করালেন। উপস্থিত জনতা তাঁর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল ও গ্রহণ করলেন।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত উমর (রা.) এর জীবন ছিল ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁর খিলাফত লাভ মুসলিম বিশ্বের জন্য ছিল আশির্বাদ স্বরুপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হযরত উমর (রা.) কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

ক) ৫৭০ সালে
খ) ৪৮৩ সালে
গ) ৫৮০ সালে
ঘ) ৮৩ সালে

২. হযরত উমর (রা.) কঠোর হওয়া সত্ত্বেও তাকে খলীফা নির্বাচনের পেছনে যুক্তি কী ছিল ?

ক) মহানবী (সা.) এর মনোনয়ন অনুযায়ী
খ) খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার সময় তিনি কোমল হয়ে যাবেন বলে
গ) জনগণ তাকে ভয় পেত বলে
ঘ) হযরত উমর (রা.) এর ইচ্ছা অনুযায়ী

৩. ইসলামের সেবায় উমর (রা.) এর অবদান হল-

i) নামাযের পূর্বে আযানের ব্যবস্থা করায়
ii) প্রকাশ্যে নামায আদায়ের ব্যবস্থা করায়
iii) তাবুক যুদ্ধে অর্ধেক সম্পত্তি দান করায়

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, iii
খ) i, ii
গ) ii, iii
ঘ) i, ii, iii

৪. একজন খলীফা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি উদ্ধত তরবারি নিয়ে মহানবী (সা.) কে হত্যা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। উদ্দীপকে কোন খলীফার কথা বলা হয়েছে?

ক) হযরত আবু বকর (রা.)
খ) হযরত উমর (রা.)
গ) হযরত ওসমান (রা.)
ঘ) হযরত আলী (রা.)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

তাশকিয়া শ্রেণিকক্ষে তার শিক্ষকের কাছ থেকে একজন সাহাবির কথা শুনলো, যিনি আল-ফারুক উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি মুসলিম সমাজের জন্য আযানের ব্যবস্থা করেন এবং প্রকাশ্যে নামায আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

ক) ইসলামের ২য় খলীফা কে ছিলেন ? ১
খ) হযরত উমর (রা.) কে আল ফারুক বলা হয় কেন ? ২
গ) উদ্দীপকে যে সাহাবির কথা বলা হয়েছে ইসলামের খেদমতে তাঁর অবদান লিখুন। ৩
ঘ) উমর (রা.) এর খিলাফত লাভের ঘটনা বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-৬.৭ হযরত উমর (রা.) বিজয় অভিযানসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উমরের শাসনামলে মুসলিমদের বিজয় অভিযান সম্পর্কে জানবেন;
- বিভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিমদের অভিযান সম্পর্কে জানবেন ও
- রোমানবাহিনীর সাথে মুসলিমদের সংঘঠিত যুদ্ধ সম্পর্কে জানবেন ।

	মুখ্য শব্দ	**জসরের যুদ্ধ, বুয়ায়েবের যুদ্ধ, নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ, ইয়ামুল আরমাছ ও ইয়ামুল উম্মদ**

খিলাফত লাভের পর হযরত উমর (রা.), হযরত আবু বকর (রা.) এর ন্যায় সীমান্ত সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধন করলেন। তিনি ইসলামের পতাকা, দুটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাম্রাজ্যের মাটিতে স্থাপন করলেন।

পারস্য বিজয় ঃ

পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল বর্তমান ইরাক, ইরান, মেসোপটোসিয়া থেকে অক্সাস নদী (আমুদরিয়া) পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময় বিভিন্ন ঘটনা ও কারণ মুসলিমদেরকে পারস্য বিজয় করতে উদ্বুদ্ধ করে।

পারস্য বিজয়ের কারণসমূহ ঃ

পারস্য সাম্রাজ্য ছিল তৎকালীন বিশ্বে এক উন্নত ও আধুনিক সভ্যতা। তারা সর্বাত্মক ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই সময় পারস্য ছিল ২য় খসরুর শাসন অধীনে।

ক) মুসলিম দূতকে হত্যা ঃ মহানবী (সা.) প্রেরিত দূত খুসরু পারভেজের দরবারে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলেন, পারস্যরাজ তাকে হত্যা করেন। এই ঘটনা ছিল নীতিবিরুদ্ধ।

খ) ভৌগোলিক অবস্থান ঃ ইরাক ও ক্যালদীয় অঞ্চল ছিলো ভৌগোলিকভাবে আরবের সীমান্তবর্তী। এই অঞ্চলে বসবাসকারী লোকজন তাদের আরবীয় গোত্রের আত্মীয় স্বজনকে সর্বদাই ইসলামের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা প্রদান করতো। এটা ছিলো মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তাই সীমান্তে নিরাপত্তা বিধান আবশ্যক ছিলো।

গ) অর্থনৈতিক কারণ ঃ পারস্য ছিল ট্রাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস (দজলা-ফোরাত) নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। এর মেসোপটেমিয়া অঞ্চল ছিল পৃথিবীর অন্যতম উর্বর উপত্যকা। যা ছিল কৃষি ও বাণিজ্যের জন্য সহায়ক। কিন্তু পারস্যবাসী আরবদের ঐ অঞ্চলে বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করে।

পারস্য বিজয়ের ঘটনাবলি ঃ

ক) ব্যবিলনের যুদ্ধ ঃ ৬৩৪ খ্রিঃ এই যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে খালিদ (রা.) কর্তৃক উলিসের যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে হীরা দখলকৃত হয়। এই সময় পারস্য রাজ খসরু হরমুজের নেতৃত্বে ১০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী মুসান্নার বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। মুসান্না ফোরাত নদী পার হয়ে শত্রুর বিপক্ষে ঝাপিয়ে পড়ে। শত্রুরা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধ 'ব্যবিলনের যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

খ) নামারিকের যুদ্ধ ঃ হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত কালে মুসান্না ও খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) হীরা দখল করেন। এটি ছিল তৎকালীন সাসানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে হীরা ছিল পারস্যবাসীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই পারস্যবাসীরা হীরা মুসলিমদের হাত থেকে উদ্ধারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। পারস্য সম্রাট এই দায়িত্ব অর্পন করেন পারস্যের কিংবদন্তী সেনাপতি রুস্তমের হাতে। মুসান্না তখন পারস্যের সীমান্তে অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি খলীফার নিকট সাহায্য কামনা করেন। ইতিমধ্যে খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করেন এবং হযরত উমর (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সাকীফ গোত্রের প্রধান আবু উবায়দাকে

সেনাপতি করে অতিরিক্ত সৈন্য হীরা পুনঃদখলে প্রেরণ করলেন। ৬৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নামারিক নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ সংগঠিত হলো। যুদ্ধে পারস্যবাসী পরাজিত হলো এবং হীরা পুনরায় মুসলিমদের অধীনে চলে এলো।

গ) জসরের যুদ্ধ ঃ নামারকের যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি পারস্যবাসী বেশিদিন ভেঅগ করতে পারছিলো না। অপর দিকে পারসি সেনাপতি বাহমানের নেতৃত্বে ফোরাত নদীর অপর তীরে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হলো। সেনাপতি আবু উবায়দা অভিজ্ঞ সেনাপতি মুসান্নার আদেশ অমান্য করে নৌকা দ্বারা সেতু নির্মাণ করে নদীর অপর তীরে শত্রুর মুখোমুখি হলেন। তাই এই যুদ্ধ জসর বা সেতুর যুদ্ধ নামে পরিচিত। কিন্তু যুদ্ধে পারস্য সেনা বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে মুসলিম বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়লো। সেতুকে ধ্বংস করা হলো যাতে মুসলিম বাহিনী পশ্চাদপদ হতে না পারে। আবু উবায়দা যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ হলেন। এবার মুসান্না সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।একদল অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে সেতু মেরামত করে মুসলিম বাহিনীর নিরাপদে নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করলেন। যুদ্ধে মুসলিমদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ৯০০০ সৈন্যের মধ্যে ৬০০০ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন। যুদ্ধটি (ত্রয়োদশ হিজরী রমযান মাস) ৬৩৪ খ্রিঃ এর অক্টোবর মাসে সংঘটিত হয়।

ঘ) বুয়ায়েবের যুদ্ধ ঃ জসরের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয় ও প্রাণহানি খলীফা হযরত উমর (রা.) কে দুঃখ ভারাক্রান্ত করলো। তিনি এর প্রতিকারের জন্য একদল সৈন্য পাঠান। কুফার কিছু দূরে বুয়ায়েবের নামক স্থানে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে পারস্য বাহিনী পরাজিত হল। তাদের সেনাপতি 'মাহরা' যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলো।

ঙ) কাদিসিয়ার যুদ্ধ ঃ পারসিকগণ ছিলো আত্মাভিমানী জাতি । তারা পরাজয়কে মেনে নিলো না। তারা আবারো সমর প্রস্তুতি শুরু করে দিল। মুসান্না ততোদিনে ইন্তেকাল করেছেন। হযরত উমর (রা.) আরেক বিখ্যাত সেনাপতি সাদ-বিন-আবি ওয়াক্কাস (রা.) কে সেনাপতি মনোনীত করলেন। পারসিক রাজা ইয়াজদিজার্দ সেনাপতি রুস্তমকে প্রেরণ করলেন। প্রথমে পারসিক সেনাপতির নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়, রুস্তম অস্বীকৃত হলে উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ৬৩৫ খ্রিঃ নভেম্বর মাসে কাদেসিয়ার প্রান্তরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ ৩ দিন স্থায়ী হয়েছিল। এই ৩ দিন আরবদের নিকট "ইয়াওমুল আরমাছ" (বিশৃংখলার দিন), ইয়াওমুল আগওয়াছ (সাহায্যের দিন) এবং ইয়াওমুল উম্মদ (দুর্দশার দিন) নামে পরিচিত। রুস্তম যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলো। এতে পারস্য বাহিনী বিশৃংখল হয়ে পলায়ন শুরু করে। কাদিসিয়ার যুদ্ধ ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ যুদ্ধ। এতে পারস্যের অহংকার ও শক্তি বহুলাংশে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

চ) মাদায়েন অধিকার ঃ মাদায়েন অর্থ দুই-শহর। এর পশ্চিম ভাগের নাম অলুকিয়া ও পূর্বভাগের নাম টেসিফোন। কাদিসিয়ার যুদ্ধে জয়লাভের পর সেনাপতি সাদ (রা.) খলীফার অনুমতি নিয়ে পারস্যের রাজধানী মাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করলেন। মার্চ, ৬৩৭ খ্রি: সাদ (রা.) মাদায়েন অধিকার করলেন এবং এখানে রাজধানী স্থাপন করেন।

ছ) জালুলার যুদ্ধ ঃ পারস্যরাজ মাদায়েন হতে প্রায় ১০০ মাইল দূরবর্তী হলওয়ালে আত্মগোপন করেন। সেনাপতি সাদ অপর সেনাপতি কাকার নেতৃত্বে এক সেনা বাহিনী প্রেরণ করলেন। আট দিন অবরুদ্ধ থাকার পর জালুলা দুর্গের পতন ঘটলো। এখানে একটি শক্তিশালী মুসলিম সেনা নিবাস স্থাপন করা হল। যুদ্ধের সময় ছিল ৬৩৭ খ্রি: ।

জ) নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ ঃ পারস্য চূড়ান্তভাবে বিজিত হয় নিহাওয়ান্দের যুদ্ধের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পারস্য সেনাপতি হরমুজান মুসলিমদের হাতে বন্দী হন এবং মদীনায় গিয়ে ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। অপরদিকে পারস্যবাহিনীর ক্রমাগত উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে খলীফা তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণে আহবান জানায়। দক্ষিণ পারস্যে মুসলিমরা অগ্রসর হলে ইয়াজদিজার্দ ১,৫০,০০০ সৈন্য সমাবেশ ঘটালেন। এর নেতৃত্বে ছিল ফিরুযান। মুসলিম সেনাপতি ছিল নুমান বিন মুকরান। উভয় পক্ষ হামাদানের নিকটবর্তী নিহাওয়ান্দে এসে যুদ্ধে লিপ্ত হল। ৬৪২ খ্রি: সংগঠিত এই যুদ্ধ নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে পারস্যবাসী চূড়ান্তভাবে মুসলিমদের নিকট পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী ফার্‌স, কির্‌মান্‌, মাক্‌রান্‌, সিজিস্তান্‌, খোরাসান্‌ ও আজার্‌বাইজান অধিকারে সক্ষম হয়। এটি ছিল একটি ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাস্য সাম্রাজ্যের উপর সর্বশেষ আঘাতটি আসে। তাই ইতিহাসে এই যুদ্ধের তাৎপর্য অত্যাধিক।

পারস্য বিজয়ের ফলাফল ঃ

পারস্য বিজয় আরবের মুসলিমদের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এই বিজয়ের ফলাফল ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকেই বিবেচ্য ছিল।

ক) ইতিবাচক ফলাফল ঃ

ইসলামের বিজয় ঃ পারস্য বিজয়ের মাধ্যমে পারস্যের প্রাচীন 'জরস্থুস্ত্রবাদ' ধর্মের অবসান ঘটে এবং পারস্যে ইসলামের বাণী প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঃ মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের মাধ্যমে প্রাচীন শক্তিশালী সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আরব খিলাফতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্থনৈতিক সুবিধা ঃ পারস্য বিজয়ের মধ্যে দিয়ে মুসলিমগণ মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের উর্বর ভূমি লাভ করে। কৃষি ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনির্মাণ ঃ পারস্যবাসী ছিল তৎকালীন বিশ্বে প্রাচীন সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। তথাকার জীবন প্রণালী ছিল আধুনিক এবং রুচিশীল। তাদের নিকট থেকে আরবগণ শিক্ষা, সামরিক কৌশল, আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে।

খ) নেতিবাচক প্রভাব ঃ

বিলাসিতার অনুপ্রবেশ ঃ পারস্যবাসীর ও পারস্য সভ্যতার সংস্পর্শে সরল ও অনাড়ম্বর আরবদের জীবনে বিলাসিতার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। তাদের কষ্ট-সহিষ্ণু ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনে ব্যাপক নেতিবাচক ছায়া পড়ে।

আরব-পারস্য রক্তের সংমিশ্রণ ঃ পারস্য বিজয় ও এই অঞ্চলে বসবাসের মাধ্যমে আরবগণ তাদের রক্তের বিশুদ্ধতা হারায়। যা ছিল বহুলাংশে আরবীয় গুণাবলি বর্জিত। পরবর্তী ইতিহাসে এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শিয়া মতবাদের বিস্তার ঃ

পরবর্তীতে পারস্য হতে শিয়া মতবাদের বিস্তার ঘটে। যা মুসলিম জাতিকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করে দেয়।

গ) মুসলিমদের রোমান সাম্রাজ্য বিজয় ঃ

রোমান সম্রাজ্য ছিল আরবের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসর নিয়ে রোমান বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। প্রাথমিসভাবে মহানবী (সা.) এর সময়ে রোমান-মুসলিম সুসম্পর্ক বজায় ছিল, পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে এই সম্পর্ক নষ্ট হয়।

বাইজানটাইন বিজয়ের কারণসমূহ ঃ

ভৌগলিক কারণ ঃ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন ছিল আরবের নিকটবর্তী। তাই সীমান্তে নিরাপত্তার জন্য এই বিজয় আবশ্যক ছিল।

মুসলিম দূত হত্যা ঃ মুতার খ্রিস্টান শাসক শুরাহবিল মহানবী (সা.) প্রেরিত দূতকে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে হত্যা করে। তাই মূতার যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

সীমান্তে গোলযোগ ঃ উদীয়মান মুসলিম শক্তির বিকাশ বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের জন্য ছিল ভীতিকর। তাই প্রায়ই তারা সীমান্তে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। সীমান্তে বসবাসকারী বেদুইনদেরকে মদীনা আক্রমণে প্ররোচিত করতো। তথাপি মুসলিম বণিকদের নিরাপত্তা ছিল না। তাই বাইজানটাইন আক্রমণ মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হয়ে দাড়ায়।

ঘটনা প্রবাহ ঃ ৬৩৪ খ্রি: আজনাদাইনের যুদ্ধে মুসলিমদের জয় লাভের সংবাদ আবু বকর (রা.)- এর মৃত্যু শয্যায় মদীনায় এসে পৌছে। পরবর্তী খলীফা হযরত উমর (রা.) খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) কে সিরিয়া বিজয় সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

দামেস্ক বিজয় (৬ অক্টোবর ৬৩৫)

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলিম বাহিনীর নিকট পরজিত হয়ে এন্টিয়কে আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি নতুন একটি সেনাবাহিনী মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) দামেস্ক অবরোধ করেন। দীর্ঘ ছয় মাস অবরুদ্ধ থাকার পর দামেস্ক মুসলিমদের অধিকার আসে।

ফিহল এর যুদ্ধ

দামেস্ক বিজয়ের পর মুসলিমগণ জর্ডানের দিকে অগ্রসর হয়। এই সময় রোমান সেনাবাহিনী জর্ডানে অবস্থান করছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে মুয়ায বিন জাবালের নেতৃত্বে আপস মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত স্থির না হওয়ায় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধে আবু উবায়দা (রা.) মুসলিম বাহিনীকে নেতৃত্ব প্রদান করেন। রোমানরা যুদ্ধে পরাজিত হলো। ইতিহাসে এটিই 'ফিহলের যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

হিম্‌স অধিকার (৬৩৫ খ্রিঃ)

হিম্‌স রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন শহর। ফিহল বিজয়ের পর, প্রায় বিনা বাধায় মুসলিমগণ হিম্‌স অধিকার করেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ (৬৩৬ খ্রিঃ)

বাইজান্টাইন অধিকার হতে গুরুত্বপূর্ণ ৩টি শহর দামেস্ক, হাম ও হিমস মুসলিমদের হস্তচ্যুত হয়। সম্রাট হিরাক্লিয়াস বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের এই অফুরন্ত ক্ষতি মেনে নিতে পারেনি। তিনি তার ভ্রাতা থিওডোরাসের নেতৃত্বে ২,৪০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এই সেনাবাহিনীর সদস্যরা ছিল মূলত আর্মেনিয়া, সিরিয়া ও রোমান খ্রিস্টানগণ। খ্রিস্টান বাহিনী ইয়ারমুকের প্রান্তে এসে পৌঁছাল। আবু উবায়দা (রা.) ও আমর (রা.) মুসলিম বাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছলে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ২৫,০০০ বেশি ছিল না। কিছুদিন পর খালিদ (রা.) ও এসে সেখানে পৌঁছান। ৬৩৬ সালের ২০ আগস্ট এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংগঠিত হয়। রোমানবাহিনী চরমভাবে পরাজিত হল। থিওডোরাস যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করলেন। যুদ্ধে রোমান বাহিনীর পরাজয়ের কথা শুনে হিরাক্লিয়াস কনস্টান্টিনোপল এ আশ্রয় গ্রহণ করলেন। যুদ্ধে প্রায় ৭০ হাজার রোমান সৈন্য হতাহত হল এবং ৩০০০ মুসলিম সেনা শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।

গুরুত্ব

কাদেসিয়া যুদ্ধের মতো ইয়ারমুকের যুদ্ধ ছিল একটি ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বাইজানটাইন শক্তির উপর মুসলিমরা চরম আঘাত হানতে সক্ষম হয়। সমগ্র সিরিয়া, তাদের পদানত হয়। পরবর্তীতে কিন্নীসিরিন, এন্টিওক, আলেপ্পো, টায়ার, সিওন প্রভৃতি রোমান অঞ্চল মুসলিমদের অধিকারে আসে।

৫) জেরুজালেম অধিকার (৬৩৭ খ্রিঃ)

জেরুজালেম অধিকার অভিযানে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন আমর ইবনে আল-আস (রা.) । তিনি জেরুজালেম অবরোধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলে, এর রোমান শাসক আরতাবুন শহর ত্যাগ করে পলায়ন করেন। কিছুদিন অবরুদ্ধ থাকার পর জেরুজালেমের খ্রিস্টান পাদ্রী সাফ্রীউনিয়াস মুসলিমদের সাথে সন্ধি করার প্রতি ইচ্ছা পোষণ করেন। সেনাপতি আবু উবায়দা (রা.) খলিফাকে এই সংবাদ প্রেরণ করলে খলীফা হযরত উমর (রা.) একজন মাত্র ভৃত্য সহকারে উটের পিঠে চড়ে জেরুজালেমে পৌছেন। উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। খলীফা খ্রিস্টানদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেরুজালেমের খ্রিস্টান অধিবাসী জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। খলীফা উমরের হস্তে জেরুজালেম নগরীর চাবি অর্পিত হয়।

৬) জাজিরা বিজয় (৬৩৮ খ্রিঃ)

রোমান সরকারের উস্কানিতে জাজিরাবাসী (যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০,০০০) মুসলিম শাসনের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেনাপতি আবু ওবায়দা (রা.) তাদেরকে পরাজিত করে জাজিরা দখল করেন। এরপর মুসলিম বাহিনী আর্মেনিয়া ও সাইলেসিয়া দখল করে। পরবর্তী সাত বছরের মধ্যে মুসলিম সাম্রাজ্য আরো বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময় (৬৩৩-৬৪০) সমগ্র সিরিয়া, প্যালেস্টাইন মুসলিমদের অধিকারে আসে। খলীফা হযরত উমর (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) কে ৬৪০ খ্রিঃ সিরিয়ার শাসক হিসেবে নিয়োজিত করেন।

মিসর বিজয় (৬৩৯-৬৪২ খ্রিঃ)

পারস্য ও সিরিয়া বিজয়ের পর মুসলিমগণ মিসর বিজয়ের দিকে অগ্রসর হয়।

মিসর বিজয়ের কারণ

সামরিক প্রয়োজন ঃ সামরিক দিক থেকে মিসরের অবস্থান ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মিসরে রোমান নৌ-বাহিনীর ঘাঁটি ছিল।

মুসলিম সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন হতে বিতাড়িত রোমান সৈন্য মিসরে আশ্রয় নেয়। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর ছিল বাইজানটাইন শাসকের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। তাই এটি ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য হুমকিস্বরুপ। তাই অতি সত্বর মিসর বিজয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

অর্থনৈতিক চাহিদা ঃ

আরব জাতি সর্বদাই উর্বর ভূমির অন্বেষণে থাকে। নীল নদের তীরে অবস্থিত মিসর ছিল উর্বর, সুজলা, সুফলা অঞ্চল। প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা ছিল এই নীলনদের দান। তাই অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করা ছিল এই অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঘটনাসমূহ ঃ

ক) হেলিওপলিসের যুদ্ধ (৬৪০ খ্রিঃ)

মুসলিমরা জেরুজালেম অধিকারের পর আমর ইবন আল-আস (রা.) পরবর্তী অভিযানের জন্য খলীফার অনুমতি কামনা করেন। খলীফার অনুমতি বিলম্বিত হওয়ার কারণে, আমর ব্যক্তিগত উদ্যোগে মিসরের দিকে অগ্রসর হলেন। ৬৩৯ খ্রিঃ আমর 'ওয়াদি আল-আবিশ' নামক স্থান অধিকার করলেন। পথিমধ্যে আল-ফামার বিবলস দখল করেন। এ সময় খলীফা কর্তৃক প্রেরিত যুবাইর-ইবন-আওয়াম ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে মিসরে এসে পৌঁছান। ৬৪০ খ্রিঃ মুসলিম সেনাবাহিনী হেলিওপলিসের যুদ্ধে রোমান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করল। রোমান সেনাপতি থিওডোরাস যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আলেকজেন্দ্রিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাইজানটাইন শাসনকর্তা সাইরাস ব্যবিলন দুর্গে আশ্রয় নিলেন। ৬৪১ খ্রিঃ মুসলিম বাহিনী ব্যাবিলন দখল করেন।

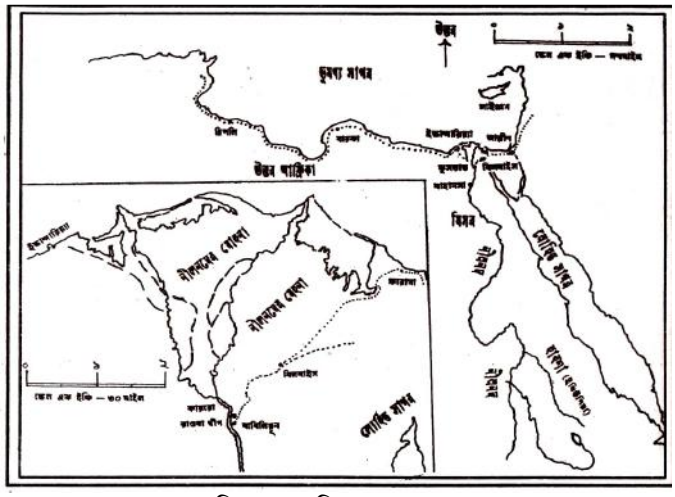

মিসরে মুসলিম সম্প্রসারণ

খ) আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় (৬৪২ খ্রিঃ) ঃ

আমর ইবনে আস বাইজান্টাইনদের বিখ্যাত নৌ-ঘাঁটি আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার অধিপতি ছিল থিওডোরাস। তিনি তখন সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করছিলেন। রোমান সম্রাট সিজার্স মুসলিমদের বিরুদ্ধে ৫০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সময় মুসলিম বাহিনীতে ছিল ২০,০০০ জন সৈন্য । যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ৬৪১ সালের ৮ই নভেম্বর।

গুরুত্ব ঃ আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় ছিল ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি ছিল একটি বিখ্যাত নৌ–ঘাঁটি। পরবর্তীতে হযরত উসমানের সময়কালে মুসলিম নৌবাহিনীর সম্প্রসারণ ঘটে। মুসলিমগণ ভূ-মধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ যেমনঃ সাইপ্রাস, ক্রীট, রোড্স, সিসিলি অধিকার করতে সক্ষম হয়।

মিসর বিজয়ের গুরুত্ব ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

রোমান ভূমি বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিমগণ উর্বর ভূমির দেশ সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসর অধিকার করে। কৃষি ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও মুসলিমদের উন্নতি সাধিত হয়।

সুয়েজ খাল খনন

খলীফা হযরত উমর (রা.) এর নির্দেশে আমর সুয়েজ খাল খনন করেন। এটি নীলনদের সাথে লোহিত সাগরের সংযোগ স্থাপন করে। এতে নৌ-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে।

ভূ-মধ্যসাগরে মুসলিম আধিপত্য

মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিম নৌবাহিনীর উন্নতি সাধিত হয়। মুসলিমগণ ভূ-মধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। এর বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়।

ফুসতাত নগরীর পত্তন

আমর ইবন আল-আস (রা.) বর্তমান কায়রোর নিকটবর্তী আল-ফুসতাতে একটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। এটিই পরবর্তীকালে বিখ্যাত ফুসতাত নগরী রুপে পরিচিত হয়।

বার্কা ও ত্রিপলী বিজয়

আমর ইবন আল-আস (রা.) আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় (ইফ্রিকিয়া) অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি বার্কা ও ত্রিপলী ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জয় করেন। এই অঞ্চলের খ্রিস্টানরা কর দিতে সম্মত হয় এবং সেখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত উমর (রা.) এর শাসনকাল ছিল মুসলিম ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। তাঁর সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়। সাসানিয়ান ও বাইজানটাইন সভ্যতার পতন ঘটে। ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে, আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রেষ্ঠ মুসলিম সেনাপতি খালিদ, মুসান্না, আবু ওবায়দা, সাদ এবং আমরের নৈপুণ্যে ইসলামী পতাকা দুইটি মহাদেশে উত্তোলিত হয়। এই সকল বিজয়ের মূল অনুপ্রেরণা ছিলেন খলীফা হযরত উমর (রা.)। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বিরাট সাফল্য অর্জন করে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক হতে মুসলিমগণ ভিনদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পারস্য চূড়ান্তভাবে বিজয় অর্জিত হয় কোন যুদ্ধের মাধ্যমে?

ক) বুয়ায়েবের যুদ্ধ খ) কাদিসিয়ার যুদ্ধ গ) জালুলার যুদ্ধ ঘ) নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ

২. মিসর বিজয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে কেন ?

ক) মুসলিম সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্য খ) মুসলিম সাম্রজ্যের পরিধি বৃদ্ধির জন্য
গ) নবী (স.) এর অছিয়ত পূরনের জন্য ঘ) খ্রিস্টানদের দমনের জন্য

৩. মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের প্রধান কারণ-

i) সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান ii) মুসলিম দূতকে হত্যা
iii) নৌবাহিনী গঠন
নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i, ii, iii খ) ii, iii গ) i, ii ঘ) i, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক আব্দুল করিম শ্রেণিকক্ষে একজন খলীফার রাজত্বকাল আলোচনা করেন যিনি পারস্য, সিরিয়া, জেরুজালেম মিসর প্রভৃতি অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করে বিজয় অর্জন করেন। তাঁর সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়। তাঁর অনুপ্রেরণায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

ক) কোন খলীফার সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয় ? ১
খ) হযরত উমর (রা.) এর পারস্য অভিযানের কারণ কী ছিল ? ২
গ) হযরত উমর (রা.) কীভাবে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য দখল করেন ? ৩
ঘ) হযরত উমর (রা.) এর সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়েছিল-ব্যাখ্যা কর ? ৪

পাঠ-৬.৮ হযরত উমর (রা.) এর প্রশাসনিক সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উমর (রা.) এর শাসন প্রণালী সম্পর্কে জানবেন।
- বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে জানবেন।
- তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের রাজস্ব, বিচার ও সামরিক বিভাগ সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	জবাবদিহিতামূলক শাসন, বায়তুল মাল, মজলিশ-উশ-শূরা, উমর (রা.) এর দিওয়ান ও হিজরী সন প্রবর্তন

মুসলিম শাসকদের মাঝে হযরত উমর (রা.) ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য ও বিচক্ষণ। তিনিই মূলত মুসলিম শাসনপ্রণালীর প্রকৃত প্রবর্তক। তিনি শুধু সুবিশাল ভূখণ্ডের শাসক ছিলেন না, তিনি এইসব বিজিত অঞ্চলে সুশাসনও কায়েম করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে S.M Imamuddin বলেন, æ He was not only a great conqueror but also classed for all time, among the best of rulers and most successful of national leaders."

হযরত উমর (রা.) এর শাসন প্রণালী ঃ

ক) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

হযরত উমর (রা.) ছিলেন একজন গণতান্ত্রিক শাসক। রাসূল (স.) যে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর প্রবর্তন করেছিলেন, হযরত উমরের সময়ে তা বিকশিত হয় পরিপূর্ণভাবে। তাঁর শাসনাধীন রাষ্ট্রে সকল মুসলিমদের সমান অধিকার ছিল। জিম্মি ও অমুসলিম প্রজারা জিযিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগ করতো। প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল। তাঁর শাসনপ্রণালী ছিল জবাবদিহিতামূলক। প্রত্যেক জণগণের অধিকার ছিল খলীফার কর্মকাণ্ডের উপর সমালোচনা করা। খলীফা যাতে একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র সৃষ্টি করতে না পারেন সে জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা ছিল।

রাষ্ট্র পরিচালনা হত পরামর্শ সভার সকল সদস্যদের অভিমতের উপর ভিত্তি করে। সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হত। ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ছিল রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি। বায়তুল মাল ছিল সম্পূর্ণরূপে জনগণের সম্পত্তি। খলীফা এ থেকে ন্যূনতম ভাতা গ্রহণ করতেন।

খ) মজলিস আল শূরা

পরামর্শ ব্যতিত কোন রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না। এই পরামর্শ সভার অনুমোদন ব্যতীত খলীফা এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। এটি দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। যথা:

- মজলিস আল-আম বা সাধারণ পরিষদ রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত এই সভায় নেওয়া হত। এখানে সাধারণ জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হত।
- মজলিস আল-খাস বা বিশেষ পরিষদ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেমন ঃ কাজী বা বিচারক নিয়োগ, প্রাদেশিক গভর্ণর, সামরিক বাহিনীর প্রধান ইত্যাদি নিয়োগের সিদ্ধান্ত এই সভায় নেওয়া হত। খলিফা, বিশিষ্ট সাহাবী, হাদীস বিশারদ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এই পরিষদের সদস্য ছিলেন।

গ) কেন্দ্রীয় শাসন

কেন্দীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি ছিলেন স্বয়ং খলীফা হযরত উমর (রা.)। তিনি কেন্দ্রের শাসন পরিচালনা করতেন। অভিজ্ঞ সাহাবীগণ ছিলেন তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা(রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তিনি প্রাদেশিক গভর্ণরদের যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতেন।

ঘ) প্রাদেশিক শাসন

খলীফার শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র রাষ্ট্রকে ১৪টি প্রদেশে ভাগ করে। প্রদেশগুলো হচ্ছে ঃ
১. মক্কা ২. মদীনা ৩. সিরিয়া ৪. বসরা ৫. কুফা ৬. ফারস ৭. কিরমান ৮. খুরসান ৯. মিসর ১০. ফিলিস্তিন ১১. মাকরান ১২. সিজিস্তান ১৩. আজারবাইজান ১৪. আল-জাজিরা।

ঙ) আল-ওয়ালী ও আল-আমিল

১. প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন প্রদেশপাল নিয়োগ করেন। প্রদেশপালকে বলা হত আল-ওয়ালী।
২. প্রত্যেক প্রদেশকে খলীফা অসংখ্য জেলায় বিভক্ত করেন। জেলার প্রধান ব্যক্তিকে আমিল বলা হতো। যথাক্রমে ওয়ালী এবং আমিল তাদের নিজ নিজ কাজের জন্য খলীফার নিকট দায়ী থাকতেন। প্রত্যেক হজ্ব মৌসুমে খলীফা তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হতেন। ওয়ালী ও আমিলগণ তাদের অঞ্চলে আরো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। তারা ছিলেন সামরিক প্রধান ও রাজস্ব সংগ্রাহক, প্রদেশ ও জেলার প্রধান বিচারক।

চ) কৃষি ও বাণিজ্য সংস্কার

খলীফা হযরত উমর (রা.) কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি জায়গীর প্রথা বিলোপ করেন, কৃষিতে কৃষকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেন। সেচের ব্যবস্থা করেন জমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতার উপর কর ধার্য করেন। বাঁধ সংস্কার ও খাল নির্মাণ করেন। তার নির্দেশে আমর ইবন আল আস (রা.) মিসরে সুয়েজখাল খনন করেন যা ৮০ বছর কার্যকরী ছিল। তিনি বণিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম করেন।

ছ) আদমশুমারী

হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম পরিকল্পিত ভাবে আদমশুমারী করার ব্যবস্থা করেন। রাজস্ব বন্টন ও রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে ভাতা প্রদানের জন্য এটি ছিল একটি বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ।

জ) রাজস্ব প্রশাসন

হযরত উমরের রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল যুগান্তকারী একটি সংস্কার। সুষ্ঠু রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মুসলিম রাষ্ট্রের আয়ের উৎস বৃদ্ধি পায়, সম্পদের সমবন্টন সম্ভব হয়। রাজস্বের বিভিন্ন উৎসগুলো ছিল যথাক্রমে-

যাকাত ঃ সকল সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর যাকাত প্রদান ফরজ ছিল। কোন মুসলিম ব্যক্তির যদি গচ্ছিত সম্পদের পরিমান ৭.৫ তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য মূল্যের সমান হয় এবং তা যদি এক বছর গচ্ছিত থাকে তবে তার জন্য যাকাত প্রদান করা ফরজ।

জিযিয়া ঃ এটি ছিল নিরাপত্তামূলক কর। মুসলিম রাষ্ট্রের বসবাসকারী অমুসলিম প্রজারা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগ করত।

গনিমাহ ঃ এটি ছিল যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য-সামগ্রী যার ১/১০ অংশ বায়তুল মালে রাখা হত এবং অবশিষ্ট ৯ ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যের মধ্যে বন্টন করা হতো।

খারাজ ঃ এটি ছিল ভূমিসর। মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজারা উৎপন্ন শস্যের ১/২ থেকে ১/৫ অংশ খারাজ প্রদান করত।

ওশর ঃ এটি মুসলিম প্রজারা উৎপন্ন শস্যের ১/১০ অংশ রাষ্ট্রের কোষাগারে প্রদান করতেন।

আল ফাই ঃ এটি ছিল রাষ্ট্রের খাসজমির (Crown land) আয়। এটি জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা হতো।

উশুর ঃ এটি ছিল বাণিজ্য কর । বাণিজ্যিক শুল্ক হিসেবে এটি মুসলিম বণিকদের কাছ হতে ২.৫ % ও অমুসলিম বণিকদের কাছ থেকে ৫% এবং বিদেশী বণিকদের কাছ হতে ১০% আদায় করা হতো।

ঝ) দিউয়ানুল খারায

রাষ্ট্রে বিভিন্ন উৎস থেকে রজস্ব সংগ্রহ এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্ধারণের জন্য খলীফা দিউয়ানুল খারায বা রাজস্ব বিভাগ নামে একটি প্রশাসনিক বিভাগ চালু করেন। এটি রাজস্ব সংগ্রহ ও রাষ্ট্রীয় কাজে এর ব্যয় এবং সুষম বন্টন নিশ্চিত করতো।

ঞ) বায়তুল মাল পুনর্গঠন

খলীফা হযরত উমর (রা.) বায়তুল মাল সংস্কার করেন। এটি ছিল সম্পূর্ণ ভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠান। সমস্ত রাজস্ব ও রাষ্ট্রীয় আয় এই কোষাগারে জমা হতো। এটি হতে পরবর্তীতে খলীফা ভাতা প্রদান করতেন।

ট) ভাতা প্রদান

সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীর বেতন পরিশোধের পর অবশিষ্ট অর্থ খলীফা তালিকা অনুসারে ভাতা (Pension) হিসেবে বন্টন করতেন। এটিতে অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। যথা-

- প্রথম স্তর: মহানবী (সা.) এর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যগণ;
- দ্বিতীয় স্তর: বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ;
- তৃতীয় স্তর: আবিসিনিয়ার হিজরতের পূর্বে ইসলাম কবুলকারীগণ;
- চতুর্থ স্তর: মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীগণ;
- পঞ্চম স্তর: সেনাবাহিনী পরিষদের সদস্যবৃন্দগণ;
- ষষ্ঠ স্তর: সাধারণ দুস্থ নারী-পুরুষ ও শিশু;
- সপ্তম স্তর: মক্কা বিজেয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারীগণ

মূলত এটি 'উমরের দিওয়ান' নামেই সমধিক পরিচিত।

ঠ) বিচার ব্যবস্থা

হযরত উমর (রা.) এর বিচার ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন। সুশাসন ও ন্যায় বিচার রক্ষা ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। ইসলামী আইন কানুন ও শরিয়ত মোতাবেক বিচার কার্য পরিচালিত হত। আইনের চোখে সকলেই ছিল সমান, এমন কি খলীফার এর উর্ধ্বে ছিলেন না। কাজী-উল-কুযাত ছিলেন প্রধান বিচারপ্রতি।

পুলিশ বিভাগ

অপরাধ দমন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য খলীফা পুলিশ বিভাগ সৃষ্টি করেন। তিনি জেলখানাও প্রতিষ্ঠা করেন।

গোয়েন্দা বিভাগ

খলীফার শাসনামলে তদন্ত ও গোয়েন্দা বিভাগও প্রবর্তিত হয়। এ বিভাগ খলীফার চোখ ও কান হিসেবে বিবেচিত হত।

ড) সামরিক বিভাগ

সামরিক বিভাগ ছিল রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। তিনি সমগ্র রাষ্ট্রে ৯ টি সামরিক জেলায় বিভক্ত করেন। ১) মদিনা ২) কুফা ৩) বসরা ৪) মিসর ৫) ফুস্তাত ৬) দামেস্ক ৭) হিম্স ৮) ফিলিস্তিন ৯) মসুল। সামরিক বিভাগকে বলা হত দিউয়ান আল জুন্দ। সামরিক অফিসার ও সৈন্য গণ পারিশ্রমিস পেতেন। সেনা বাহিনী অগ্র, পশ্চাৎ, মধ্যভাগ, ডান ও বাম হস্তে বিভক্ত ছিল। আমিরুল আশরাফ, কায়িদ ও আমির ছিল সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের অফিসার।

হিজরি সনের প্রবর্তক

খলীফা হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম হিজরী সনের প্রবর্তন করেন।

জনকল্যানমূলক কাজ

তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সংস্কার সাধন করেন। সেচ ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, চিকিৎসাকেন্দ্র, সরাইখানা, মসজিদ, ইত্যাদি নির্মাণ করেন।

সারসংক্ষেপঃ

খলীফা উমর (রা.) ইসলামের ইতিহাসে æUmar the Great" বা মহান উমর নামে পরিচিত। তিনি তাঁর শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ নমুনা স্থাপন করে গেছেন। তাঁর রাষ্ট্রকাঠামো ছিল আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সুষম। মহানবী (সা.) এর পর তিনি ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র নায়ক। তাঁর দেখানো রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসন পরবর্তীতে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাগণ আংশিক অনুসরণ করে গেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হযরত উমর (রা.) এর শাসন ব্যবস্থা ছিল-

ক) একনায়কতান্ত্রিক　　খ) স্বৈরতান্ত্রিক

গ) গণতান্ত্রিক　　গ) রাজতান্ত্রিক

২. খলীফা উমর রাষ্ট্রকে প্রদেশে ভাগ করেন-

ক) শাসনকার্যের সুবিধার জন্য　　খ) বেশি রাজস্ব আদায়ের জন্য

গ) নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে　　ঘ) জনগণের ইচ্ছা পূরণের জন্য

৩. হযরত উমর (রা.) শাসন প্রণালীর কোন কোন ক্ষেত্র সংস্কার করেন।

i) প্রশাসন ব্যবস্থা　　ii) রাজস্ব ব্যবস্থা

iii)সামরিক ব্যবস্থা

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i, ii　　খ) i, ii

গ) ii, iii　　ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মেয়র 'ক' এর শাসননীতিতে জনগণের মতামত প্রতিফলিত হয়। তিনি গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজান। তাছাড়া রাজস্ব ব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা প্রভৃতির সংস্কার করেন। শাসনকার্যে নিয়োজিত সকল স্তরের লোকদের তাদের দায়িত্ব পালনের উপর জোর দেন। এভাবে তাঁর এলাকায় তিনি একটি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করেন।

ক) হযরত উমর (রা.) তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে কতটি প্রদেশে ভাগ করেন ? ১

খ) হযরত উমর (রা.) আদমশুমারির প্রবর্তন করেন কেন ? ২

গ) মেয়র 'ক' প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করেন। উমর (রা.) এর প্রশাসন ব্যবস্থাও কি সুশৃঙ্খল ছিল? ৩

ঘ) প্রশাসনিক সংস্কারক হিসেবে উমর (রা.) কতটুকু সফল ছিলেন লিখুন। ৪

পাঠ-৬.৯ হযরত উমর (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলীফা উমর (রা.) এর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে জানবেন।
- তাঁর কৃতিত্বসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**জেরুজালেম, বায়তুল মাল, আরব অভিজাত্য, হিজরী সাল, যিম্মি, জিযিয়া কর, আদমশুমারী ও মুসলিম মনীষী**

খলীফা উমর (রা.) শাসনকাল ছিল ইসলামের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় একটি অধ্যায়। তিনি ছিলেন অনুপম চারিত্রিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। তার চারিত্রিক গুণাবলী কিংবদন্তী হয়ে আছে। অপর দিকে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রসংগঠক। তাঁর রাষ্ট্রসংস্করণ, প্রশাসনযন্ত্র ও জনকল্যাণমূলক কাজ পৃথিবীর ইতিহাসে তাকে 'Umar the Great' হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছে।

চারিত্রিক নৈপুণ্য ঃ

সহজ-সরল খলীফা

খলীফা উমর (রা.) ছিলেন তৎকালীন বিশ্বে অর্ধ-পৃথিবীর শাসক। তথাপি তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। সকল প্রকার ভোগ-বিলাস থেকে তিনি দূরে থাকতেন। সামান্য ভাতা তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিতেন। তাঁর আহার ছিল শুকনো রুটি ও খেজুর। তাঁর পরিধেয় একটি মাত্র জামা ছিল। তাতে ছিল অসংখ্য তালি। তিনি খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে পৃথিবী শাসন করতেন। কথিত আছে, পারস্য যোদ্ধা হরমুজ বন্দী অবস্থায়, খলিফাকে মদীনা মসজিদের মেঝেতে বসে শাসনকার্য পরিচালনা করতে দেখে আশ্চার্যান্বিত হন। অর্থাৎ অর্ধ-পৃথিবীর মালিক নিজেকে সকল প্রকার ভোগ-লালসা ও আরাম-আয়েশ থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন।

প্রজাদরদী শাসক

খলীফা উমর (রা.) ছিলেন প্রজাদরদী শাসক। তিনি নিজে রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে মদীনার রাস্তায় ঘুরে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখতে যেতেন। নিজ কাধে খাদ্য দ্রব্য বয়ে নিয়ে দুঃখীদের ঘরে পৌছে দিতেন। জেরুজালেম যাওয়ার পথে নিজ ভৃত্যকে একবার উঠের পৃষ্ঠে বসিয়ে নিজে লাগাম ধরে জেরুজালেম পৌঁছেন। রাতে অসহায় বেদুঈন স্ত্রীকে সাহায্যের জন্য নিজ স্ত্রী কুলসুমকে ধাত্রী হিসেবে মহিলার নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

ন্যায় বিচারক

হযরত উমর (রা.) ছিলেন ন্যায় বিচারক শাসক। তিনি আইনের স্বাধীনতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করেন। যোগ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে কাজী হিসেবে নিয়োগ করেন। মদ্যপানের অপরাধে নিজ পুত্রকে ৮০ টি বেত্রাঘাত করেন। খালিদকে তার সম্পত্তির হিসাব প্রদান করতে নির্দেশ দেন। অমান্য করলে খলীফা তাকে পদচ্যুত করেন। খ্রিস্টান নাগরিক জাবালকে তার ভৃত্যের সাথে নিষ্ঠুর আচরণের জন্য তাকে শাস্তি প্রদান করেন।

ইসলামের সেবক

খলীফা হযরত উমর (রা.) ছিলেন ইসলামের একজন একনিষ্ঠ সেবক। ইসলামের আদর্শকে তার শাসনে সমুন্নত রাখেন। মহানবী (সা.) এর আদর্শকে তিনি পূর্ণরুপে অনুসরণ করেন।

মানবতা ও সাম্য ঃ তাঁর অন্যতম চারিত্রিক গুণ হল মানবতাবোধ ও সাম্য। তিনি সকল প্রজার অধিকার নিশ্চিত করেন। সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ দূর করেন।

মমত্ববোধ
প্রজার প্রতি মমত্ববোধ আর পক্ষপাতহীন আচরণ এবং সম্পদের প্রতি অনীহা তাঁর চরিত্রকে অদ্বিতীয় করে রেখেছে।

হযরত উমরের কৃতিত্ব
হযরত উমর (রা.) শুধুমাত্র একজন প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি।

শ্রেষ্ঠ বিজেতা
খলীফা উমর (রা.) ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতা। তিনি তৎকালীন বিশ্বে মহাপরাক্রমশালী বাইজানটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য জয় করেন। তার সেনা বাহিনী মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি ছিলেন অর্ধ পৃথিবীর অধিপতি। এই প্রসংগে P.K Hitti বলেন, æ The conquest of the world receving its impulse under abu-Bakr reached its high water-mark under Umar...”

শ্রেষ্ঠ নরপতি
তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর প্রশাসন ছিলো অত্যন্ত যুগোপযোগী ও প্রজারঞ্জক। তাঁকে বলা হয় Administrative genius (প্রশাসনিক প্রতিভা)। তিনি তাঁর প্রশাসনের ক্ষেত্রে মেধার সমাদর করেছিলেন। তিনি প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করেন। প্রশাসনে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার করে প্রজাদের জন্য উপযোগী করেন।

সামরিক দক্ষতা
খলীফা নিজে একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর অধীনে মুসলিম ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিরা নতুন নতুন রাজ্য বিজয় করেছিল। সেনাপতি খালিদ (রা.), আমর ইবন আল আস (রা.), আবু উবায়দা (রা.), সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ছিলেন প্রতিভাবান সমরনায়ক। তাঁর সময়ে সামরিক প্রশাসনে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়।

গণতন্ত্রী শাসক
খলীফা উমর (রা.) ছিলেন একজন গণতান্ত্রিক শাসক। গণতন্ত্রকে সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি মজলিস-আল-শুরা প্রবর্তন করেন। পরামর্শ ছাড়া তিনি রাষ্টীয় কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না।

আরব আভিজাত্যকে রক্ষা
হযরত উমর (রা.) অন্যতম কৃতিত্ব ছিল আরব আভিজাত্যকে রক্ষা। তিনি বিজিত অঞ্চলে কোন মুসলিমকে জমি ক্রয় করতে ও বসবাস করতে নিষেধ করেন। তিনি খাঁটি আরব রক্তের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার
তিনি বায়তুল মালকে পুনর্গঠন করেন। এর অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করেন। ইসলামের আইন মোতাবেক ৬টি উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করেন। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

যিম্মিদের অধিকার
মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম যিম্মিদের অধিকার সংরক্ষণ করেন। তারা জিযিয়া করের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কতিপয় সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগ করত।

কৃষি সম্প্রসারণ ও হিজরী সাল প্রবর্তন
খলীফা উমর (রা.) শাসনকালে কৃষি ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। এর উন্নতির পথ সুগম হয়। তিনি সময় গণনার সুবিধার্থে হিজরী সাল প্রবর্তন করেন।

আদমশুমারী ও ভাতা পদ্ধতি
হযরত উমর (রা.) ক্রমানুসারে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করেন এবং এ লক্ষে আদমশুমারীর ব্যবস্থা করেন।

দাসপ্রথার উচ্ছেদ ও নারী অধিকার
দাসপ্রথার উচ্ছেদ ও যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির পেছনে হযরত উমর (রা.) এর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল। তিনি সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ

খলীফা ইসলামের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন স্থানে দূত প্রেরণ করেন। তাঁর সময় বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র কুফা, বসরা, ফুস্তাত নগরীর পত্তন ঘটে। পরবর্তীতে বিভিন্ন মুসলিম মনীষী এই সকল শহরে শিক্ষা লাভ করেন ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা শুরু করেন।

সারসংক্ষেপঃ

ইসলামের মহান খলীফা উমর (রা.) ছিলেন পৃথিবীর সকল মানুষ ও নরপতির জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তার চারিত্রিক মাধুর্য, সহনশীলতা, সত্যবাদিতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ইসলামের ইতিহাসে অদ্বিতীয় হয়ে আছে। তিনি ছিলেন মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রকৃত পক্ষে তিনিই মূলত আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন খলিফাকে 'Administrative Genius' বলা হয় ?

ক) হযরত আবু বকর (রা.) খ) হযরত উমর (রা.)
গ) হযরত উসমান (রা.) ঘ) হযরত আলী (রা.)

২. খলীফা উমর (রা.) খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রধান পদ থেকে বরখাস্ত করেন-

ক) যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন বলে খ) সম্পত্তির হিসাব প্রদানে অপরাগ হয়েছিলেন
গ) শত্রুর প্ররোচনায় ঘ) নিজের কৃতিত্ব বজায় রাখতে

৩. হযরত উমর (রা.) এর শাসনকালে-

i) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ii) সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে
iii) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়
নিচের কোন্‌টি সঠিক
ক) i, ii খ) ii, iii
গ) i, ii, iii ঘ) i, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

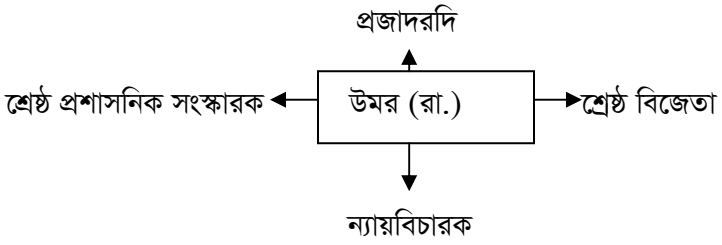

ক) কোন খলীফা হিজরী সাল প্রবর্তন করেন ? ১
খ) উমর (রা.) কেমন জীবন যাপন করতেন ? ২
গ) উদ্দীপকে বর্ণিত খলিফাকে ন্যায় বিচারক হিসেবে মূল্যায়ণ করুন ? ৩
ঘ) "হযরত উমর (রা.) সকল নরপতির জন্য আদর্শ" উক্তিটি মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৬.১০ হযরত উসমান (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উসমান (রা.)-এর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে জানবেন;
- হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফত লাভের পূর্বে ইসলামের প্রতি তাঁর অবদান সম্পর্কে জানবেন ও
- হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফত লাভ সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	**'গণী' , কুরাইশ বংশ, যুন্নুরাইন, আবিসিনিয়ায় হিজরত ও মদীনায় হিজরত**

প্রাথমিক জীবন ঃ ইসলামের তৃতীয় খলীফা ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তিনি আনুমানিক ৫৭৩ বা ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশের অন্যতম শাখা উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আফ্ফান ও মাতা ছিলেন আর্ওয়া। তাঁর ডাকনাম ছিল যথাক্রমে আবু আমর ও আব্দুল্লাহ। তাঁর পবিরার ছিল অত্যন্ত ধনী তিনি শৈশবে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি অল্প বয়স থেকেই কাপড়ের ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন। ব্যবসার মাধ্যমে তিনি প্রভূত সম্পদের অধিকারী হন। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। তাই তার নামের শেষে 'গণী' (সম্পদশালী বা ধনী) উপাধি যোগ করা হয়। তিনি ইতিহাসে উসমান গণী নামে সমধিক পরিচিত। হযরত উসমান (রা.) এর পূর্বপুরুষ ও রাসূল (সা.) এর পূর্ব পুরুষ একই ধারা থেকে আগত। পরবর্তীকালে মক্কার তত্ত্বাবধানকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং কুরাইশ বংশ হাশেমী এবং উমাইয়া এই দুটি উপগোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত উসমান (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মুহাম্মদ (সা.) যখন ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেন, তখন তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন (৩৪ বছর)। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনার সাথে তাঁর দেখা একটি স্বপ্নের ঘটনা জড়িত। একদা রাতে উসমান (রা.) স্বপ্নে এক মহান শক্তির দ্বারা আদিষ্ট হলেন-"ওগো ঘুমন্ত ব্যক্তি, জেগে ওঠ, মক্কায় আহমদ আগমন করেছে।" এই স্বর্গীয় বাণী তাঁর হৃদয়কে বিগলিত করে দিল। তিনি রাসূল (সা.) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার চাচা হাকাম (পরবর্তীতে আবু জেহেল) ছিলেন, ইসলামের ঘোর বিরোধী। সে হযরত উসমান (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। তাঁকে গাছের সাথে বেঁধে বেদম প্রহার করে কিন্তু শত অত্যাচার সয়ে তিনি দ্বীন ইসলাম থেকে বিচ্যুত হননি। হযরত উসমান (রা.) ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাসূল (সা.) এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে একজনের মৃত্যুর পর অন্যজনকে বিয়ে করেন। তাই তাঁকে বলা হয় 'যুন্নুরাইন' বা দুই-নূরের অধিকারী। রাসূল (সা.) উম্মে কুলসুমের মৃত্যুর পর বলেছিলেন যে- "আমার যদি আরেকটি কন্যা থাকতো তাহলে আমি তাকেও হযরত উসমান (রা.) এর সাথে বিবাহ দিতাম"।

খিলাফতের পূর্বে ইসলামের সেবা ঃ

আবিসিনিয়ায় হিজরত ঃ যখন ক্রমেই ইসলামের প্রসার হতে শুরু করলো, সেই সাথে মুসলিমদের উপর কুরাইশদের অত্যাচার, যুলুম বেড়ে যেত লাগলো। তখন মহানবী (সা.) এর নির্দেশে কতিপয় সাহাবী তাদের পরিবারসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। হযরত উসমান (রা.) তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। তিনি সেখানে দুই বছর অবস্থান করেন। এরপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। ৬২২ খ্রিঃ মদীনায় হিজরতের পরে মহানবী (সা.) এর সাথে মিলিত হন।

অর্থ-সম্পদ ইসলামের উদ্দেশ্যে দান ঃ হযরত উসমান (রা.) তাঁর উপার্জিত অগাধ অর্থ প্রাচুর্য ইসলামের উদ্দেশ্যে অকাতরে দান করেন। মদীনার মুসলিমদের পানীয় জলের কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি ২০,০০০ দিরহাম মূল্যের বীর রুমা কূপটি ক্রয় করে দেন। এটি ছিল মদীনার একমাত্র পানির কূপ, যা ছিল এক ইহুদীর মালিকানায়। মহানবী (সা.) মদীনায় মসজিদে নববী সম্প্রসারনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তিনি এর সংলগ্ন জমি ক্রয় করে দেন। তাবুক অভিযানের সময় মহানবী (সা.) যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য সকলের নিকট আহবান জানালে তিনি নগদ ১০০০ দিনার, ১০০০ উট ও ৭০ টি ঘোড়া এবং সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার বহন করেন। এতে রাসূল (সা.) তার উপর অত্যন্ত প্রীত হন এবং খুশি হয়ে বলেন, " আজকের পর যদি উসমান (রা.) এ জাতীয় কোন ভাল কাজ নাও করে, তাতে কোন ক্ষতি নেই।"

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ঃ বদর যুদ্ধে হযরত উসমান (রা.) অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কারণ তখন তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া অসুস্থ ছিলেন। তিনি রাসূল (সা.) এর আদেশে যুদ্ধযাত্রা হতে বিরত থাকেন। এছাড়া সকল যুদ্ধে তিনি বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ

করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরের সময় রাসূল (সা.) এর নির্দেশে তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মক্কার কুরাইশদের সাথে শান্তি আলোচনা করতে যান।

ওয়াহী লেখক ঃ হযরত উসমান (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.) এর অন্যতম প্রধান ওয়াহী লেখক। তিনি এই ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ ঃ খুলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন তিনি তাঁর প্রতিনিধি নির্বাচনে তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি মজলিস-আল-শুরার পরামর্শের প্রতি আহবান জানান। তিনি উসমান (রা.), আলী (রা.), তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন আউফ ও সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে নিয়ে গঠিত পরিষদের মধ্যে থেকে তৃতীয় খলীফা নির্বাচনের আহবান জানান। উপরে উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তি খিলাফতের জন্য যোগ্য ছিলেন। ইসলামের প্রতি সকলেরই অসামান্য ত্যাগ ও অবদান রয়েছে। তবে খিলাফতের গুরু দায়িত্ব সর্বাপ্রেক্ষা যোগ্য ব্যক্তির হাতে অর্পিত হওয়া আবশ্যক। হযরত আলী (রা.) ছিলেন মহানবী (সা.) এর জামাতা ও চাচাতো ভাই। তিনি বীরযোদ্ধা, জ্ঞানী ও বিদ্বান ছিলেন। খিলাফতের উপর তাঁর দাবী ছিল স্পষ্ট। আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন কিন্তু তিনি পূর্বেই খিলাফতের গুরুদায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করেন। যুবায়ির (রা.) হযরত উসমানকে সমর্থন করলেন। আব্দুর রহমান এই সময় মক্কা থেকে আগত হজ্জ পালনকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করলেন। সকলেই হযরত উসমান (রা.) এর পক্ষে রায় দিলেন। এভাবে হযরত উমর (রা.) এর ইন্তিকালের পর ৪র্থ দিনে হযরত উসমান (রা.) ইসলামের তৃতীয় খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তালহা (রা.)এই সময় মদীনার বাইরে অবস্থান করছিলেন। তিনি মদীনায় এসে যখন শুনলেন সকলেই এই নির্বাচন সমর্থন করেছে, তখন তিনিও হযরত উসমান (রা,) কে সমর্থন করলেন। তারপর একে একে সবাই খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করলেন। এই প্রসংগে W. Muir বলেন, æ It led to dissensions which for years bathed the Muslim world in blood."

সারসংক্ষেপঃ

হযরত উসমান (রা.) ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল যথাক্রমে 'গণী' এবং যুননুরাইন। তিনিই প্রথম আবিসিনিয়াতে হিজরত করেন। ইসলামের সেবার জন্য তিনি তাঁর ধন-ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর খলীফা নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ। যা পরবর্তীতে ইতিহাসের অনেক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনার সৃষ্টি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গনী শব্দের অর্থ কী?
ক) দানশীল খ) বিশ্বাসী গ) ধনী ঘ) দয়ালু

২. হযরত উসমান (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকেন কেন ?
ক) মহানবী (সা.) এর নির্দেশে স্ত্রী-রুকাইয়ার অসুস্থতার জন্য খ) নিজ ইচ্ছায়
গ) নিজের অসুস্থতার জন্য ঘ) আবিসিনিয়ায় গমন করার কারণে

৩. হযরত উসমান (রা.) এর দানশীলতার প্রমাণ বহন করে-
i) নবীজী (সা.) এর মেয়েকে বিয়ে ii) রুমা কূপ ক্রয় iii) তাবুক যুদ্ধে ১০০০ দিনার দান
নিচের কোন্‌টি সঠিক
ক) i, ii, iii খ) i, ii গ) ii, iii ঘ) i, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

হবিপুর গ্রামের মোড়ল আব্দুর রহিমের মৃত্যুর পর কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তির উপস্থিতিতে মোড়ল নির্বাচনের সভা বসল। সভায় চার পাঁচজন যোগ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হল। তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বিদ্বান, গ্রামের কল্যাণে যার অবদান বেশি এমন ইউনুস মিয়াকে মোড়ল নির্বাচন করা হলো। বাকী সবাই তার নির্বাচনকে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

ক) হযরত উসমান (রা.) কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন ? ১
খ) হযরত উসমান (রা.) কে যুননুরাইন বলা হয় কেন ? ২
গ) "উপরোক্ত ঘটনাটি উসমান (রা.) এর খলীফা নির্বাচন হওয়ার ঘটনা স্মরণ করায় এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে হযরত উসমান (রা.) এর খলীফা নির্বাচনের ঘটনাটি লিখুন । ৩
ঘ) ইসলামের সেবায় হযরত উসমান (রা.) এর অবদান মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৬.১১ হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উসমান (রা.) বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- অভিযোগসমূহের যথার্থতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ও
- সার্বিক পর্যালোচনার শেষে আপনি এর ভিত্তিহীনতা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**এশিয়া মাইনর, স্বজনপ্রীতি, কুরআন সংকলন, বায়তুল মাল, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, কাবাগৃহ সম্প্রসারণ ও ধর্মভীরু**

হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতকাল ছিল (৬৪৪-৬৫৬) অর্থাৎ ১২ বছর। এই ১২ বছরের খিলাফত কালকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। এর প্রথম ছয় বছর (৬৪৪-৬৫০) খ্রিঃ তিনি পূর্বাঞ্চল ও মধ্য এশিয়ায় অভিযান প্রেরণ করেন। পারস্যে বিদ্রোহ দমন করে মুসলিমরা খুরাসান, নিশাপুর, মার্ভ, বলখ, তুখারিস্থান প্রভৃতি অঞ্চল জয় করতে সমর্থ হয়। অপর দিকে এই সময়ে এশিয়া মাইনর, আর্মেনিয়া , ত্রিপলী ও সাইপ্রাস মুসলিম অধিকারে আসে। এই ছয় বছর ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি ও বিজয়ের কাল। তাঁর শাসনকালের শেষের ছয় বছর (৬৪০-৬৫৬) ঠিক তার বিপরীত স্রোত বইতে শুরু করে। রাজ্যময় অসন্তোষ, বিশৃংখলা দেখা দেয়। তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ আরোপ করা হয়। অভিযোগগুলো নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

ক) স্বজনপ্রীতি

তাঁর বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অভিযোগ ছিল স্বজনপ্রীতি। অভিযোগে বলা হয় যে, তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বিশিষ্ট সাহাবী ও জ্ঞানী বিচক্ষণ ব্যক্তির পরিবর্তে তাঁর নিজ পরিবারের অযোগ্য আত্মীয় স্বজনদের নিয়োগ করেন। প্রখ্যাত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ- হিট্টি, মুইর, ভন ক্রেমার এবং সৈয়দ আমীর আলী ও মাসুদীও এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। এর ফলে কুফা, বস্‌রা ও মিসরের লোকেরা তার উপর বিশেষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

১) কুফা ঃ পারস্য বিজয়ী সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে খলীফা উমর (রা.) কুফার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলে তাঁর স্থলে মুগীরাকে কুফার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু মৃত্যু শয্যায় হযরত উমর (রা.) এর ইচ্ছা অনুযায়ী সাদ (রা.)কে পুনরায় তাঁর পূর্বপদে নিয়োগ দান করা হয়। কিছুকাল পরে বায়তুল মালের অর্থ নিয়ে সাদ (রা.) ও কোষাধ্যক্ষ মাসুদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হলে, সাদ কিছুটা দোষী প্রমাণিত হয় এবং খলীফা উসমান (রা.) তাকে পদচ্যুত করেন। তাঁর স্থলে ওয়ালিদ বিন ওকবাকে নিযুক্ত করেন। ঘটনাক্রমে ওয়ালিদ ছিলেন খলীফার সৎ ভাই। তিনি মদ্যপানের দোষে সাব্যস্ত হলে, তাকে পদচ্যুত ও বেত্রাঘাত করা হয়। তার স্থলে জনগণ সমর্থিত সাঈদ-আল-আসকে কুফার শাসনপদে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সাঈদও ছিলেন খলীফার আত্মীয়। এভাবে তিনি কুফাবাসীর বিরাগভাজন হন।

২) বসরা ঃ আবু মুসা আনসারী ছিলেন খলীফা উমর কর্তৃক নিয়োজিত বসরার শাসকর্তা। তিনি উসমান (রা.) এর শাসনকালের ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা অতি নগণ্য একটি অভিযোগ পেশ করে, যেটি ছিল অসাম্যের অভিযোগ। খলীফা তাকে পদচ্যুত করেন এবং তার স্থলে আবদুল্লাহ ইবনে আমীরকে শাসক হিসেবে নিয়োজিত করেন। আব্দুল্লাহ ছিলেন খলীফার পিতৃব্য পুত্র। তিনি সুশাসক ছিলেন। তার সময়ে পারস্যের বিদ্রোহ দমন করা হয়। মার্ভ, নিশাপুর প্রভৃতি অঞ্চল মুসলিম অধিকারে আসে। কিন্তু তিনি খলীফার পরিবারভুক্ত হওয়ায় বিদ্রোহীরা তাকে সুনজরে দেখেননি।

৩) মিসর ঃ মিসর জয় করার পর সেনাপতি আমর ইবন আল আস খলীফা হযরত উসমানের অধীনে ৬৪৮ খ্রিঃ পর্যন্ত মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক ভাবে মিসরের রাজস্ব কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ ইবন সাদ ইবনে আবি সারাহ এর সাথে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দেয়। তখন খলীফা আমর এর স্থলে তার দুধভাই আব্দুল্লাহকে মিসরের গভর্ণর করে পাঠান। যদিও আব্দুল্লাহ একজন সফল গভর্ণর ছিলেন, তাঁর সময়ে রোমান আধিপত্য খর্ব করে কার্থেজ পর্যন্ত মুসলিম অধিকারে আসে তথাপিও বিদ্রোহীরা তাকে অপসারণের দাবী করে। তখন খলীফা বাধ্য হয়ে তার স্থলে বিদ্রোহীদের সমর্থিত মুহাম্মদ-বিন-আবু-বকরকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

সিরিয়া ঃ এই সময় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন সিরিয়ার গভর্ণর, যিনি হযরত উমর (রা.) আমলে নিয়োজিত হন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ রাজনৈতিক ও যোগ্য শাসক কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনিও উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তাঁর নিকট আত্মীয় ছিলেন। তাই হযরত উসমান (রা.) যখন মুয়াবিয়া (রা.) কে যোগ্যতার জন্য স্বপদে বহাল রাখেন তখন বিদ্রোহীরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। তারা এর প্রতিবাদ জানায়।

সমালোচনা-পর্যালোচনা ঃ

ক) স্বজনপ্রীতি

হযরত উসমান (রা.) রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে তার নিজস্ব আত্মীয়কে নিয়োগ দান করলেও তারা সবাই ছিলেন উক্ত পদের উপযুক্ত ও সময়ের বিচারে অন্যদের তুলনায় অধিকতর যোগ্য। তিনি মূলত রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা বিবেচনা করেই তাদের উক্ত পদের জন্য নির্বাচন করেন। তিনি যদি স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিতেন তাহলে তিনি বিদ্রোহীদের কোন কথাই শুনতেন না। তিনি তাদের চাহিদা মোতাবেক অনেক আত্মীয়কে পদ হতে অপসারণ করেছিলেন। জনগণের পছন্দের ব্যক্তিকে তাদের শাসনকর্তারূপে নিয়োগ দিয়েছেন এমনকি মদ্যপানের অভিযোগে একজনকে বেত্রাঘাতের দণ্ড প্রদান করেছিলেন। তার শাসনকালের প্রথম ৬টি বছর ছিল শান্তি ও শৃংখলার কাল। কিন্তু পরবর্তীকালে দুর্ভাগ্যবশত তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয় যা ছিল অমূলক।

খ) কুরআন শরীফ দগ্ধীভূত করণ

খলীফা উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের একটি অভিযোগ হচ্ছে তিনি কুরআন শরীফ দগ্ধীভূত করেন। কিন্তু যথাযথভাবে পর্যালোচনা করলে এই ঘটনার ভ্রান্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতের সময় মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। ইসলামের সম্প্রসারণ হয়। এতে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল যেমন-আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় কুরআন শরীফের পাঠ আবৃত্তি ও উচ্চারণ প্রণালীতে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারে মত পার্থক্য দেখা দেয়। তাই এ বৈচিত্র্য দূর করার জন্য ও কুরআনের উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য হযরত উসমান (রা.) কুরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। তিনি ৬৫১ খ্রি. যায়েদ বিন-সাবিত (রা.)এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কুরআনের বিশিষ্ট হাফিজগণ এই কমিটির সদস্য ছিলেন। এই কমিটির উদ্যোগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলো হস্তগত করা হয়। কুরআনের মূল পাণ্ডুলিপি রাসূল (সা.) এর অন্যতম স্ত্রী ও হযরত উমর (রা.) এর কন্যা বিবি হাফসার নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়। এতে দুই পাণ্ডুলিপির মধ্যে ব্যাপক বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। অত:পর এই সকল ভ্রান্তিপূর্ণ কুরআনের কপিসমূহ ভস্মীভূত করা হয়। সেই সাথে মূল পাণ্ডুলিপি সমগ্র সাম্রাজ্যে এক কপি করে প্রেরণ করা হয়। এই ঘটনাকে বিদ্রোহীরা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং খলীফার বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ আনে।

সমালোচনা ঃ কুরআন সংকলনের কাজ ছিল নিঃসন্দেহে একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সকলেই খলীফার এই কাজের প্রশংসা করেন। এই জন্য খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর উপাধি দেওয়া হয় 'জামিউল কুরআন' অর্থাৎ কুরআন সংকলনকারী। কিন্তু অন্যায়ভাবে মুসলিমদের উত্তেজিত করার প্রয়াসে বিদ্রোহীরা তার বিরুদ্ধে কুরআন ভস্মীভূত করার মত অবান্তর অভিযোগ আনেন।

গ) বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎকরণ

বিভিন্ন পাশ্চাত্য ঐতিহাসকিগণ খলীফা উসমান (রা.) এর উপর অমিতব্যয়ীতার অভিযোগ এনেছেন। তাদের মতে, তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে অর্থ-সম্পদ নিজ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করেন। এর ফলে রাজকোষের অর্থের সংকট দেখা দেয়। এই অভিযোগের ফলে জনগণ খলীফার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে বাস্তবতা এই যে, উমাইয়া বংশের কতিপয় লোক যেমন-সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর সিরিয়ার সকল ভূ-সম্পত্তি ও জাতীয় সম্পদ নিজ অধিকারভুক্ত করেন। তবে এটি ছিল সম্পূর্ণভাবে খলীফার অজ্ঞাতসারে। খলীফা এটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাই মুয়াবিয়া (রা.) এর ব্যক্তিগত দোষের ভাগিদার খলিফাকে করা সমীচীন নয়।

সমালোচনা ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খলীফা ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন স্বনামধন্য ধনী ব্যক্তি। তাঁর চরিত্র ছিল সরল ও মহানুভব। তিনি তাঁর নিজস্ব সম্পদ হতে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরকে সম্পদ বিলিয়ে দিতেন। অন্যদিকে তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করে। খলীফা বায়তুল মাল হতে কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না। তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকল প্রয়োজন নিজস্ব সম্পদ হতে ব্যয় করতেন। তাই খলীফার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক।

ঘ) আবু জার আল–গিফারীর নির্বাসন

আবু জার আল-গিফারী একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু ও জ্ঞানতাপস। হযরত উসমান (রা.) এর সময়ে এসে কতিপয় মুসলিম দুনিয়ার জীবনের প্রতি মোহ বিশিষ্ট হয়ে পড়ে। প্রভূত ধন-সম্পদ সঞ্চয় করতে আরম্ভ করে। ফলে অনেকেই আরাম-আয়েশ ও অপচয়ের পথ বেছে নেয়। এতে করে আবু জার আল-গিফারী সম্পদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তিনি প্রচার করেন যে, ধন সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য নয়, তা জনগণের প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য। যারা সম্পদ সঞ্চয় করবে তাদের স্থান হবে নরকে। বস্তুত এটিই ছিল একটি গোঁড়া সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। কৌশলী মুয়াবিয়া (রা.) তাকে সিরিয়া হতে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। এখানে তার এই মতবাদ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে খলীফা তাকে বোঝাতে চাইলেন যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চয় করা অন্যায় নয়। কিন্তু তিনি খলীফার সাথে দ্বিমত হলেন এবং এই ধরণের উচ্চাভিলাষী পরিবেশে থাকতে অস্বীকার করলেন। এক পর্যায়ে খলীফা বাধ্য হয়ে তাকে 'রাবাবা' নামক স্থানে নির্বাসিত করেন।

সমালোচনা

দুর্ভাগ্যবশত নির্বাসনের মাত্র দুই বছর পর আবু জার আল-গিফারী সেখানে মারা যান। তাঁর জনপ্রিয়তা ও তাঁর মতবাদকে সামনে রেখে বিদ্রোহীরা খলীফার বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু তখন খলীফা যা করছিলেন তা মূলত মদীনায় শান্তি-শৃংখলা রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজকে প্রশ্রয় দেননি। তাই আবু জার আল-গিফারীকে তিনি নির্বাসিত করেছিলেন।

সরকারী চারণভূমি ব্যবহার

সরকারী চারণভূমি ব্যবহার করা ছিল জনগণের এখতিয়ারের বাইরে। যুদ্ধে ব্যবহৃত উট, ঘোড়া ও অন্যান্য গবাদি পশুকে এই সরকারী চারণভূমিতে চরানো হতো যা ছিল জনগণের জন্য নিষিদ্ধ। যুদ্ধে ব্যবহৃত এই সকল গবাদি পশু ছিল সরকারী সম্পত্তি তাই খলীফা সরকারি চারণভূমি ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে, তিনি ব্যক্তিগত গবাদি পশুর জন্য উক্ত চারণভূমি ব্যবহার করেছিলেন। এতে করে তাঁর বিরুদ্ধে জনগণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

সমালোচনা ঃ এই অভিযোগটি ছিল সম্পূর্ণ অমূলক। খলীফার নিজস্ব পশু নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উক্ত চারণভূমি ব্যবহার করেছিলেন।

চ) কাবাগৃহ সম্প্রসারণ

খলীফা হযরত উমর (রা.) এর সময়ে কাবাগৃহের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়, এবং তা হযরত উসমান (রা.) এর আমলে শেষ হয়। এই কাজের জন্য কাবাগৃহ সংলগ্ন অনেক ব্যক্তির জমি অধিগ্রহণ করা হয়। হযরত উমর (রা.) এর সময়ে কেউ জমির মূল্য দাবি করেনি, কিন্তু হয়রত উসমান (রা.) এর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই জমির মূল্য দাবি করেন। পরবর্তীতে খলীফা জমির মূল্য পরিশোধ করতে চাইলে জমির মালিকগণ তা নিতে অস্বীকার করে। তারা রাজ্যের মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। শান্তি বজায় রাখার জন্য খলীফা তাদের কারারুদ্ধ করেন। এতে করে বিদ্রোহীরা খলীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে।

সমালোচনা

এই ছিল সম্পূর্ণরুপে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। খলীফা উসমান জমির মালিকদের উপযুক্ত অর্থ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা বিশৃংখলা করার অভিসন্ধি করে এবং খলীফার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি করে।

চ) ভাতা বন্ধ

তাঁর বিরুদ্ধে আরেকটি অমূলক অভিযোগ ছিল কতিপয় ব্যক্তির ভাতা বন্ধ করে দেওয়া যা ছিল কেবলমাত্র একটি ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা। আদুল্লাহ ইবনে মাসুদ ও হযরত উবাই (রা.)এর ভাতা ভুল বোঝাবুঝির কারণে বন্ধ করে দেন। তবে খলীফা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদের ইন্তিকালের পর তাঁর প্রাপ্য ভাতা তাঁর উত্তরাধিকারীকে পৌঁছে দেন।

বিদ্রোহীদের অভিযোগ ছিল মিথ্যা

এই সময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নানা রকম অভিযোগ আসতে শুরু করলে খলীফা পরবর্তী হজ্ব মৌসুমে রাষ্ট্রের সকল গভর্ণরকে মদীনায় এক হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এই সভায় বিদ্রোহী ও অভিযোগকারীদেরও আসার জন্য বলা হয়। যথাসময়ে প্রদেশিক গভর্ণররা মদীনার সভাতে উপস্থিত হলেও বিদ্রোহীরা কেউই উপস্থিত হলেন না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, বিদ্রোহীদের অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ রুপে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

এই সময় সভার ব্যক্তিবর্গ খলীফার নিরাপত্তার জন্য দেহরক্ষী ও পাহারাদার নিয়োগ ও বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সুপারিশ করলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু ও উদার প্রকৃতির। তাই তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে চাইলেন না। তাঁর জন্য কোন প্রকার দেহরক্ষীর প্রয়োজনীয়তাও তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন।

সারসংক্ষেপঃ

খলীফা হযরত উসমান (রা.) ছিলেন একজন আদর্শ খলীফা। যার প্রমাণ আমরা তাঁর শাসনকালের প্রথম ৬ বছরে লক্ষ করি। তাঁর সময়ে মুসলিম রাষ্ট্র সম্প্রসারিত হয়। কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু তাঁর ধর্মভীরুতা ও চারিত্রিক কোমলতার জন্য এই সময় তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ আসতে থাকে যার সবগুলোই ছিল ভিত্তিহীন। শুধুমাত্র রাষ্ট্রে বিশৃংখলা ছিল তাদের দূরভিসন্ধি। তাইতো খলীফা তাদের দাবি মেনে নেয়ার পরও তারা বিদ্রোহ অব্যাহত রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আবু জার আল-গিফারির মতবাদ কোন ধরণের ছিল ?

ক) সমাজতান্ত্রিক খ) গণতান্ত্রিক
গ) রাজতান্ত্রিক ঘ) বৈপ্লবিক

২. হযরত উসমান (রা.) অমিল ও অসামঞ্জস্যহীন সমস্ত কুরআনের কপি পুড়িয়ে ফেলেন কেন ?

ক) রাষ্ট্রের কুরআনের আবৃত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য
খ) সকলকে মূল কুরআনের অনুলিপি পাঠ ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করার জন্য
গ) হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও হযরত উমরের আদেশ মান্য করার জন্য
ঘ) সকলের মাঝে কুরআনের শিক্ষা সঠিকভাবে দান করার জন্য

৩. হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ

i) স্বজনপ্রীতি ii) বিলাসিতা iii) বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ

নিচের কোন্‌টিসঠিক

ক) i, ii খ) i, ii, iii গ) i, iii ঘ) ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

হোসেন আলী কলেজের অধ্যাপক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় একজন খলীফার খিলাফতকাল বর্ণনা করেন। তাঁর খিলাফতকালে ইসলামের বিস্তৃতির সুসময় বলে মনে হলেও তাঁর খিলাফতকালের শেষের দিকে মদীনায় বিদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা খলীফার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অমূলক অভিযোগ এনে বিদ্রোহ শুরু করে। খলীফার বিরুদ্ধে এসকল অভিযোগ ও বিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত।

ক) ইসলামের তৃতীয় খলীফা কে ? ১
খ) উসমান (রা.) কে 'জামিউল কুরআন' বলা হয় কেন ? ২
গ) উপরে উল্লিখিত বর্ণনা যে খলীফার সময় নির্দেশ করে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। ৩
ঘ) "উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো অমূলক" ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৬.১২ হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার ঘটনা ও ফলাফল



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার কারণ সম্পর্কে জানবেন।
- হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে জানবেন।
- হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলিম বিশ্বে এর কী প্রভাব পড়েছিল তা সম্পর্কে জানবেন।

	**মুখ্য শব্দ**	**উমাইয়া ও হাশেমী দ্বন্দ্ব, গণতান্ত্রিক শাসন, কুরাইশ ও অকুরাইশ দ্বন্দ্ব, সীমান্ত যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ও রাজতান্ত্রিক খিলাফত**

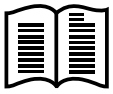

হযরত উসমান (রা.) এর উপর আনীত অভিযোগ সমূহের উপর ভিত্তি করে বিদ্রোহীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। খলীফা তখন তাদের প্রতি উদার মনোভাব প্রকাশ করেন। কারণ তিনি মুসলিমদের মাঝে এই বিভক্তি চাননি। কিন্তু তার এই শিথিলতার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে তার হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার কারণসমূহ

১) উমাইয়া ও হাশেমী দ্বন্দ্ব

প্রাক-ইসলামী যুগের আরবের উমাইয়া ও হাশেমী দ্বন্দ্ব, যা মক্কার রক্ষণাবেক্ষণকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়েছিলো তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উমাইয়ারা ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা বিজয়ের সময়। হযরত উমর (রা.) পর্যন্ত এই দুই গোষ্ঠী লোকের মধ্যে মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু উমাইয়া বংশের লোক হযরত উসমান (রা.) যখন খিলাফত গ্রহণ করেন, তখন হাশিমী গোত্র তা সহ্য করতে পারলো না। বিশেষ কওে হযরত আলী (রা.) এর পন্থীরা। তাই সেই প্রাচীন আরবীয় গোত্রের কলহ তাদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

২) কুরাইশ ও অকুরাইশ দ্বন্দ্ব

ইসলাম সম্প্রসারণে সকল মুসলিম কুরাইশদের সাথে সম্মিলিত ভাবে প্রাণপণ যুদ্ধ করে। কিন্তু তাদের সুযোগ সুবিধার প্রতি খলীফার দৃষ্টি সমানভাবে ছিল না। ক্ষমতা শুধু কুরাইশকেন্দ্রিক থাকবে এই ধারণাও অকুরাইশদের মনঃপুত হয়নি। উসমান (রা.) হযরত উমরের আরবীয় আভিজাত্য নীতি হতে সরে আসলেন, বিজিত অঞ্চলে কুরাইশরা তাদের বসতি স্থাপন শুরু করে। এতে করে কুরাইশ ও অকুরাইশদের মধ্যে নানান বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

৩) ইবনে সাবার অপপ্রচার

এমন অনেক লোক ছিলো যারা ইসলামকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য ইসলাম গ্রহণ করে। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ছিলেন সেই প্রকৃতির লোক। তিনি ছিলেন ইয়েমেনের এক নিগ্রো মাতার গর্ভজাত ইহুদি সন্তান। বসরার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ ইবনে আমিরের হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সে প্রচার করতে থাকেন যে, হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.) এর একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী। সুতরাং খিলাফতের অধিকার একমাত্র তারই। সে বসরা ও কুফায় এই মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। এ সকল প্রদেশের শাসকগণ তাকে নিজ নিজ শহর হতে বিতাড়িত করেন। তারপর সে মিসরে গমন করে এবং কতিপয় ব্যক্তির সমর্থন লাভ করে। তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাকিম বিন-জাবালা ও মুহাম্মদ বিন-আবু বকর। তার এই অপপ্রচারের ফলে বসরা, কুফা ও মিসরে খলীফা বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে।

৪) আনসার-মুহাজির দ্বন্দ্ব

মহানবী (সা.) মদীনায় আনসার ও মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কিন্তু খলীফা (রা.) এর শাসনামলে আনসারদের তুলনায় মুহাজিরদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদ হতে বঞ্চিত করা হয়। এতে তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

৫) অমুসলিমদের অসন্তোষ

বিভিন্ন বিধর্মী সম্প্রদায় যেমন ইহুদি, খ্রিস্টান, মাজিয়ান তারা সব সময়ই ছিল ইসলাম-বিরোধী। তারা রাষ্ট্রের সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও ইসলামের বিরোধীতা শুরু করে। কুরাইশদের উচ্চপদ লাভ তাদের মধ্যে ঈর্ষাকাতরতা সৃষ্টি করে। তারাও বিদ্রোহীদের সমর্থন করতে থাকে।

৬) কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ

বিদ্রোহীরা কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করতে শুরু করে। কেন্দ্রীয় শাসনে অনভ্যস্ত যাযাবর আরব জাতি এই শাসন মেনে নিতে পারেনি। হযরত উসমান (রা.) এর শাসনের শেষ ছয় বছর সীমান্ত যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে গণিমাতের উৎস বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের অয়ের অন্যতম উৎস ছিল আল ফাই ভূমি যা হযরত উমর (রা.) এর সময়ে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। এই কারণে আরব যোদ্ধারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং তারা আল ফাই ভূমির আয় দাবি করে। এই দাবি ছিল সম্পূর্ণরুপে বিদ্রোহী মনোভাব ও অযৌক্তিক। খলীফা উসমান (রা.) বহুলাংশে হযরত উমর (রা.) এর রাজস্ব নীতি পরিবর্তন করলেও তিনি এই দাবি মেনে নিতে পারেন নি। তাই সর্বত্র তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

৭) মারওয়ানের ধ্বংসাত্মক নীতি

মারওয়ান ছিল খলীফা উসমান (রা.) এর চাচাতো ভাই। তার অতীত ছিল কদর্যপূর্ণ। একবার বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে রাসূল (সা.) তাকে মদীনা হতে বহিষ্কার করেন। সে খলীফার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা হস্তক্ষেপ করেন। এই স্বার্থপর ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে উমাইয়াদের নিয়োগ করেন। হাশিমীদের সকল প্রকার ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখাই ছিল তার অন্যতম উদ্দেশ্য। মারওয়ানের এই ধ্বংসাত্মক নীতি খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানি হিসেবে কাজ করে।

হত্যার ঘটনা

পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন অভিযোগ ও কারণ সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ হতে (কুফা, বসরা ও মিসর) প্রায় ৭০০ বিদ্রোহী মদীনায় এসে উপস্থিত হন। তারা প্রাদেশিক গভর্ণরদের বিরুদ্ধে খলীফার নিকট অভিযোগ পেশ করেন। খলীফা তাদের নিকট দ্রুত এই প্রতিকারের ওয়াদা প্রদান করেন। পথিমধ্যে নিজ নিজ প্রদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় কুচক্রী মারওয়ান কর্তৃক প্রেরিত এক হাবশি দূতের হাতে খলীফা সীলমোহরসহ একটি পত্র বিদ্রোহীরা হস্তগত করেন। উক্ত পত্রে লিখা ছিল নিজ-নিজ প্রদেশের রাজধানীতে পৌঁছামাত্রই যেন বিদ্রোহীদের হত্যা করা হয়। মূলত এই পত্রটি ছিল মারওয়ানের হস্তে লেখা এবং এতে খলীফার সীল অন্যায়ভাবে মারওয়ান নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন। এতে বিদ্রোহীরা ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং মদীনায় ফিরে গিয়ে উক্ত পত্রের কৈফিয়ৎ দাবি করে। খলীফার আল্লাহর শপথ নিয়ে দাবি করেন যে, তিনি কোনভাবেই এই পত্র তৈরির আদেশ করেননি। এত বিদ্রোহীরা মারওয়ানের কূটচাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয় এবং মারওয়ানকে তাদের হাতে হস্তান্তরের জন্য দাবি জানায় কিন্তু খলীফা তাদের এই দাবী গ্রহণ করতে পারেনি। তখন বিদ্রোহীরা খলিফাকে অযোগ্য ঘোষণা করে এবং তার বাসগৃহ অবরোধ করে। খলীফার নিরাপত্তার প্রতি উদ্বিগ্ন হয়ে হযরত আলী, তালহা, যুবায়ের ও তাদের পুত্রদ্বয়ের সমন্বয়ে ১৮ জনের একটি দেহরক্ষী বাহিনী খলীফার বাসগৃহে পাহাড়ার ব্যবস্থা করা হয়।
এই সময় হজ্জের মৌসুমের শেষ হতে শুরু করে। তাই মদীনার লোকজন ফিরে আসার আগেই বিদ্রোহীরা খলিফাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তারা সম্মুখ দরজার পাহারাদারদের দ্বারা বাধাগ্রস্থ হলে দেয়াল টপকে ছাদের মাধ্যমে খলীফার গৃহে প্রবেশ করে। ৮২ বছরের বৃদ্ধ খলীফা এই সময় পবিত্র কুরআন পাঠে নিয়োজিত ছিলেন। মুহাম্মদ বিন আবু-বকর খলীফার দাড়ি ধরে টান দেন। খলীফা এই সময় তাকে তাঁর পিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে মুহাম্মদ বিন আবু বকর সেখান হতে দূরে সরে গেলেন। অত:পর অপর বিদ্রোহীরা খলীফাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। খলীফা স্ত্রী নায়লা তাদের বাধা দিতে এগিয়ে এলে তাঁর হাতের তিনটি আঙ্গুল কেটে যায়। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৬৫৬ খি ঃ ১৭ ই জুন (১৮ ই জিলহজ্ব, ৩৫ হিজরী)।

হত্যার ফলাফল ঃ

বিদ্রোহের/গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঃ হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইসলামে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ এবং কারবালার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ছিল এই হত্যাকাণ্ডের সুদূরপ্রসারী ফলাফল। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা ও পতনের পরও এই গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটেনি।

উমাইয়া ও হাশিমী গোষ্ঠীর উদ্ভব

মুসলিমদের ঐক্যে ভাঙ্গনের ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা উমাইয়া ও হাশিমী দলে বিভক্ত হয়ে যায়। উমাইয়া ও হাশিমী দ্বন্দ্ব আরো চরম আকার ধারণ করে।

খিলাফতের মর্যাদাহানি

এই হত্যাকাণ্ডের ফলে খিলাফতের পবিত্রতা নষ্ট হয়। খিলাফত ছিল জনগণের শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি। মহানবী (সা.) এর মহান আদর্শকে টিকিয়ে রাখা ও অনুসরণ করাই ছিল খিলাফতের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে অপঘাতে একজন ধর্মভীরু খলীফার মৃত্যু ঘটে এবং এই ঘটনা খিলাফতের ধর্মীয় মর্যাদাকে ব্যাপকভাবে আঘাত করে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব

এই হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দলে, উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তিরোহিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও গোড়া পন্থীদের উদ্ভব হয়। মুসলিম জাতি তখন শিয়া, সুন্নি, খারেজী প্রভৃতি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

মদীনার প্রাধান্য লোপ

হযরত উসমান (রা.) হত্যাকাণ্ডের পর মদীনার প্রাধান্য লোপ পায়। মদীনা খিলাফতের রাজধানীর মর্যাদা হারায়। পরবর্তী খলীফা হযরত আলী (রা.) কুফায় তার রাজধানী স্থানান্তর করেন। পরবর্তীতে রাজতান্ত্রিক খিলাফতের সময় দামেস্ক, বাগদাদ, কর্ডোভায় রাজধানী স্থাপন করা হয়।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও বিদ্রোহীদের অসন্তোষ, সেই সাথে মারওয়ানের কূটকৌশল খলীফা উসমানের হত্যাকাণ্ডকে প্ররোচিত করে। এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাবিধ কারণ। অবশেষে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ডের পর, মুসলিম বিশ্ব চরমভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট হয় নানা ধর্মীয় দল-উপদল সৃষ্টি হয়, সর্বোপরি খিলাফতের মর্যাদাহানি ও গণতন্ত্রের সমাধি ঘটে। তাই এই হত্যাকাণ্ড ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খলীফার সীলমোহর অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছিলো কে?

ক) মারওয়ান খ) ইবনে সাবা

গ) আবু জার-আল গিফারী ঘ) মুহাম্মদ বিন আবু বকর

২. বিদ্রোহীরা মদীনায় এসেছিলো কেন ?

ক) উসমান (রা.) কে হত্যা করতে খ) যুদ্ধ করার জন্য

গ) প্রাদেশিক গভর্ণরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে। ঘ) অনুষ্ঠানে যোগদান করতে

৩. উসমান (রা.) এর হত্যার পেছনে যাদের কর্মকাণ্ড দায়ী ছিল-

i) মারওয়ান ii) মুহাম্মদ বিন আবু বকর iii) ইবনে সাবা

নিচের কোন্‌টি সঠিক-

ক) i খ) i, ii গ) i, iii,iii ঘ) i, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

কবিতা তার ইসলামের ইতিহাস বইতে একজন খলীফার জীবনী পড়ার সময় তার হত্যাকাণ্ডের অংশ পড়ে বিস্মিত হয় কেননা এটি খেলাফতের ইতিহাসে প্রথম প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ড এবং অনৈতিক। এই হত্যাকাণ্ডের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

ক) হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার সময় তাঁর বয়স কত ছিল ? ১

খ) উসমান (রা.) হত্যার পিছনে মারওয়ানের ভূমিকা লিখুন ? ২

গ) উসমান (রা.) হত্যার ঘটনাটি লিখুন ? ৩

ঘ) "উসমান (রা.) এর হত্যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী" কথাটি ব্যাখ্যা করুন । ৪

পাঠ-৬.১৩ হযরত উসমান (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উসমান (রা.) এর চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে জানবেন।
- হযরত উসমান (রা.) এর কৃতিত্ব সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	**যুন্নুরাইন, জামিউল কুরআন, বায়তুল মাল, জমিদারী ও জায়গীরদারী প্রথা**

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা, মহানবীর ঘনিষ্ঠ সাহাবী। ইসলামের প্রতি তার ত্যাগ ও খেদমত ছিল বর্ণনাতীত। তার শাসনকালের শেষ অংশটি বিবেচনা না করলে তিনি ছিলেন একজন সফল ও কৃতিত্বপূর্ণ শাসক।

চরিত্র ঃ

মহানবী (সা.) এর নিত্যসঙ্গী

হযরত উসমান ছিলেন রাসূল (সা.) এর ঘনিষ্ঠ সাহাবা, তার একজন নিত্যসঙ্গী, তিনি মহানবী (সা.) এর সাথে ইসলাম প্রচারে সদা নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। তিনি মহানবী (সা.) এর অন্যতম ওয়াহী লেখক ছিলেন।

ইসলামের প্রতি খিদমত

হযরত উসমান (রা.) বিভিন্ন উপায়ে ইসলামের খিদমত করেন। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর প্রচুর অর্থ সম্পদ বিলিয়ে দেন। বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি মদীনায় এক ইহুদির কাছ থেকে রূমা নামক কূপটি ক্রয় করে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করে দেন। তিনি প্রায় দুই হাজার ক্রীতদাসকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। মসজিদে নববী সম্পসারণের জন্য তিনি নিজ অর্থে জমি ক্রয় করে দেন। তাবুক অভিযানের সময় তিনি এক তৃতীয়াংশ সেনা বাহিনীর ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। ১০০০ দিরহাম দান করেন এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০০০ উট দান করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরের সময় তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুরাইশদের সাথে সমঝোতা করতে তাদের নিকট গমন করেন।

যুন্নুরাইন উপাধি লাভ

তাঁর উপর রাসূল (সা.) এর স্নেহ ছিল অত্যাধিক। রাসূল (সা.) তাঁর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে একজনের মৃত্যুর পর অপর জনকে হযরত উসমান (রা.) এর সাথে বিবাহ দেন। এ জন্য তাঁর উপাধি হয় যুন্নুরাইন অর্থাৎ দুই জ্যোতির অধিকারী।

ধৈর্য ও নম্রতা

খলীফা উসমান (রা.) ছিল কোমল চরিত্রের অধিকারী। তাঁর সত্যবাদিতা, নম্রতা ও ভদ্রতা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলি তাকে মহানবী (সা.) এর নিকট অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছিল। তাঁর নম্র স্বভাবের কারণেই বিদ্রোহীদের অভিযোগের মুখে যখন তাঁর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল, তবুও তিনি তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করতে পারে নি।

তাঁর সরলতা ও ধর্মভীরুতার সুযোগ নিয়ে তাঁর নিকট আত্মীয়রা সর্বত্র বিশ্বাস ভঙ্গ করতে শুরু করে। তিনি তাঁর কোন দুর্নীতিগ্রস্থ আত্মীয়র প্রতি কঠোর অবস্থান নিতে পারেন নি। তিনি অযথা রক্তপাত ঘটাতে চাননি। এটি পরবর্তীতে তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা হিসেবে প্রকাশ পায়।

সহজ-সরল জীবনধারী

বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফা হওয়া সত্ত্বেও হযরত উসমান (রা.) সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন। তাঁর নিজস্ব অর্থ তিনি ইসলামের সেবায় বিলিয়ে দেন। বায়তুল মাল থেকে তিনি কিছুই গ্রহণ করতেন না। তিনি নিজ ব্যবসার আয় হতে সংসার পরিচালনা করতেন।

হযরত উসমান (রা.) এর কৃতিত্ব ঃ

সামরিক বিজয়

হযরত উসমান (রা.) সামরিক প্রশাসনের দিক থেকে একজন সফল খলীফা ছিলেন। তার শাসনামলের প্রথম ছয় বছর ছিল মুসলিম বিজয় অভিযানের কাল। এই সময় মুসলিম সেনা বাহিনীর অগ্রযাত্রা সুদূর কাবুল ও বেলুচিস্তান হতে পশ্চিমে ত্রিপলী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

নৌবাহিনী গঠন

হযরত উসমান (রা.) এর সময় সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গঠিত হয়। এই আরব নৌবাহিনীর মাধ্যমে মুসলিমগণ ভূমধ্যসাগরে, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে আধিপত্য বিস্তার সক্ষম হয়। ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দ্বীপ যেমন- সাইপ্রাস, রোড্স, সিসিলি, ক্রীট প্রভৃতি দখল করা হয়। ভূ-মধ্যসাগরে বাইজানটাইন শক্তিকে কোণঠাসা করা হয়।

কুরআন সংকলন

হযরত উসমান (রা.) এর অন্যতম কৃতিত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পবিত্র কুরআন শরীফকে ধারাবাহিক ভাবে সংকলন করা। এই কাজের জন্য তিনি 'জামিউল কুরআন' উপাধিতে ভূষিত হন। কুরআন কে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার কৃতিত্ব তিনি লাভ করেন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

তাঁর শাসনামলের প্রথমার্ধ ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার কাল। তিনি কুরআন ও হাদীস অনুসারে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি অনুসরণ করেন। জনগণের মতামতকে তিনি গ্রহণ করতেন।

পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা

হযরত উমর (রা.) ন্যায় হযরত উসমান (রা.) পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। মজলিস-আল-শূরার শাসন প্রণালী তিনি টিকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর রাজধানীতে বিশিষ্ট সাহাবীদের সঙ্গে নিয়মিত রাষ্ট্রীয় বৈঠকে মিলিত হতেন।

প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ

তিনি প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করেছিলেন। তার সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধিত হয়। তিনি সিরিয়ার মত বড় একটি প্রদেশকে ৩টি প্রদেশে ভাগ করেন। প্রত্যেক প্রদেশে একজন গভর্ণর নিয়োজিত ছিল। তিনি ৩টি প্রদেশের জন্য একজন গভর্ণরের উচ্চপদস্থ একজন গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করেন। সাইপ্রাস, রোডস দ্বীপসমূহ কে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বৃহৎ পাঁচটি প্রদেশের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন যথাক্রমে ঃ সিরিয়া- মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, মিসর- আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ, বসরা- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, কুফা- আবু মুসা আল আশ্সারী, কিন্নিসিরিন- মুসলিম ফেহরী।

বায়তুল মাল প্রশাসন

প্রথম দিকে বায়তুল মাল প্রশাসন ব্যবস্থার উপর খলীফার কড়া নযর ছিল। তিনি যোগ্য ব্যক্তিকে এর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ করেন। উকবা বিন আমের ছিলেন এর তত্ত্বাবধায়ক, যায়িদ বিন সাবিত (রা.) ছিলেন বিচারপতি।

জনহিতকর কার্যাবলি

হযরত উসমান (রা.) ইসলামের খিদমতে নিজের প্রচুর সম্পদ বিলিয়ে দেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। মদীনার মসজিদ সংস্কার করে তাতে কাঠের ছাদ ও প্রস্তরের স্তম্ভ সংযোজিত করেন। মাহজুর বাঁধ নির্মাণ করে মদীনাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করেন। মদীনায় অবস্থিত 'বনাত লা' ইলাহ নামক খাল থেকে আরমায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এতে উক্ত স্থান চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে। তিনি এছাড়া অসংখ্য রাস্তা-ঘাট সংস্কার, মসজিদ নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণও খাল খনন করেন।

সামরিক শক্তি বৃদ্ধি

সামরিক শক্তি হযরত উসমান (রা.) এর শাসনে বৃদ্ধি পায়। তিনি এক্ষেত্রে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর নীতি অনুসরণ করেন। সেনা বাহিনীর ব্যারাক সংখ্যা বৃদ্ধি, যুদ্ধের সরঞ্জাম, ঘোড়া ও উট ইত্যাদির সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেন।

জমিদারী ও জায়গীরদারী প্রথার উদ্ভব

হযরত উসমান (রা.) মুসলিমদেরকে বিজিত দেশে জমি ক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন। তা না হলে শহর ও গ্রামীণ লোকদের সাম্যতা রক্ষা হত না। শহরের লোকদিগকে গ্রামে বসবাস করতে না দিলেও, গ্রাম থেকে লোকেরা এসে শহরে

বসবাস করছে, এতে করে অনেক অশালীন উপকরণ গ্রাম হতে শহরে চলে আসছিলো। এই আদেশের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জমি ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রের জমিদারী ও জায়গীরদারী প্রথার সূত্রপাত হয়।

সারসংক্ষেপঃ

খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর চারিত্রিক কোমলতা, স্বভাবের বিনম্রতা ও ধৈর্যের জন্য ইসলামের ইতিহাসে এক স্বনামধন্য জায়গা দখল করে আছেন। তার মত নম্র সাহাবী আর কেউ ছিলেন না। তার শাসনের বিশৃংখলার সময়টুকু বাদ দিলে তা ছিল পুরোপুরি ইসলামের বিজয় ও সমৃদ্ধির কাল। সুষ্ঠু প্রশাসন যন্ত্র, জনকল্যাণমুখী শাসন আর মুসলিম বিজয় অভিযান ছিল তার শাসনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। প্রথম আরব নৌবাহিনী গঠন ও সাফল্য অর্জন ছিল ইসলামের ইতিহাসে তাঁর অন্যতম কীর্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. হযরত উসমান (রা.) কত বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন?

ক) ৯২ বছর বয়সে খ) ৮২ বছর বয়সে গ) ৭০ বছর বয়সে ঘ) ৭২ বছর বয়সে

২. খলীফা উসমান (রা.) খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ নির্ধারণ করতেন কিভাবে?

ক) নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খ) জনগণের মতামত অনুযায়ী

গ) কাজির পরামর্শ অনুযায়ী ঘ) মজলিস আল শূরার পরামর্শ অনুযায়ী

৩. খলীফা উসমান (রা.) মদীনা নগরীকে রক্ষা করেন-

i) বিদ্রোহীদের দমন করে ii) খাল খনন করে

iii) বাঁধ নির্মাণ করে

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i, ii খ) i গ) i, ii, iii ঘ) iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

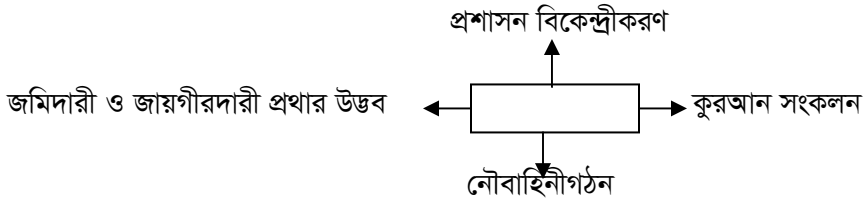

ক.'জামিউল কুরআন' কোন খলীফার উপাধি? ১

খ) উসমান (রা.) কেমন জীবনযাপনর করতেন ? ২

গ) উপরের উদ্ধৃতিতে যে খলীফার কৃতিত্ব তুলে ধরা হয়েছে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণে তার অবদান লিখুন। ৩

ঘ) জনকল্যাণে উসমান (রা.) এর কৃতিত্ব তুলে ধরুন। ৪

পাঠ-৬.১৪ হযরত আলী (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আলী (রা.) এর পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে জানবেন;
- তাঁর ইসলামের প্রতি খিদমত সম্পর্কে জানবেন ও
- তাঁর খিলাফতে নির্বাচনের ঘটনা সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	হাশিমী গোত্র, আবু তোরাব, অসি ও মসি, আমানত, হিজরত, মুসলিম পতাকাবাহী, বীর যোদ্ধা ও কিংবদন্তী বীর।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ

হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) ছিলেন ইসলামের ৪র্থ খলিফা। তিনি মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের অন্তর্গত হাশিমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের সাল ছিল ৬০০ খ্রিঃ অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর নবুয়্যত লাভের ঠিক দশ বছর পূর্বে। তাঁর পিতা ছিলেন আবু তালিব। সম্পর্কে তিনি রাসূল (সা.) এর চাচাতো ভাই। তার শৈশবে ডাক নাম ছিল আবু তোরাব ও আবুল হাসান। রাসূল (সা.) এর শৈশবে যেমন তার চাচা আবু তালিব তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঠিক তেমনি চাচার অস্বচ্ছল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.) এর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তাই রাসূল (সা.) এর সকল চারিত্রিক আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য ছোট বেলা হতেই হযরত আলী (রা.) এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

ইসলাম গ্রহণ ঃ

৬১০ খ্রিঃ আলী (রা.) এর যখন মাত্র ১০ বছর বয়স তখন রাসূল (সা.) নবুয়্যত প্রাপ্ত হন। রাসূল (সা.) আহবানে হযরত খাদীজা (রা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) ইসলাম কবুল করার পর, হযরত আলী (রা.) ছিলেন বালকদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি শৈশবেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি নযিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

ইসলামের সেবা ঃ

হযরত আলী (রা.) খুবই বালক বয়সে ইসলাম কবুল করেন। তিনি অর্থ সম্পদ দিয়ে ইসলামের সেবা না করতে পারলেও ইসলামের সেবায় তার কোন ঘাটতি ছিলো না। তিনি তাঁর জ্ঞান-বিদ্যা ও শৌর্য-বীর্য দ্বারা ইসলামের সেবা করে গেছেন। তাঁর দশ বছর বয়স হতেই তিনি রাসূল (সা.) এর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। এ ক্ষেত্রে অর্থের পরিবর্তে অসি ও মসি ছিল তাঁর ইসলামের সেবার মাধ্যম।

তিনি রাসূল (সা.) এর সার্বক্ষণিক সাথী ছিলেন। মক্কায় কুরাইশদের অত্যাচার যখন চরম পর্যায়ে পৌছায় তখন মহানবী (সা.) আল্লাহর পক্ষ হতে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ প্রাপ্ত হন। তখন রাসূল (সা.) এর নিকট আমানত হিসেবে গচ্ছিত কুরাইশদের বিভিন্ন সম্পদ মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রা.) কে রাসূল (সা.) বিছানায় শায়িত অবস্থা রেখে যান। কুরাইশরা রাসূল (সা.) এর বিছানায় হযরত আলী (রা.) কে দেখে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়। পরের দিন হযরত আলী (রা.) মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন।

বিবাহ ঃ

হিজরী প্রথম অথবা দ্বিতীয় বর্ষে ৬২৫ খ্রিঃ হযরত আলী (রা.) রসূল (সা.) এর কনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) কে বিবাহ করেন। হযরত আলী (রা.) রাসূল (স.) এর জামাতা হলেন, এতে তাদের ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি পেল। হযরত আলী ও ফাতিমার পরিবারে হাসান, হুসায়ন ও মুহসীন নামে তিন পুত্র এবং জয়নাব ও উম্মে কুলসুম নামে দুই কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাদের মধ্যে মুহসীন বাল্যকালে ইন্তেকাল করেন। হাসান ও হুসাইনের বংশধর সৈয়দ (নেতা) নামে পরিচিত।

২৯ বছর বয়সে হযরত ফাতিমা (রা.) ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.) হানাফীয়া গোত্রের এক নারীকে বিবাহ করেন এবং এখানেও তার কয়েকজন পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইবনুল হানাফিয়া।

হযরত আলীর শৌর্য-বীর্য ঃ

হযরত আলী (রা.) শৈশব থেকেই ছিলেন অসীম সাহসী। তাঁর তেজস্বীতা, শৌর্য-বীর্য তাঁকে বীর পুরুষ হিসেবে পরিচিত করেছে। তিনি ছিলেন অসি চালাতে সিদ্ধ হস্ত, বীর যোদ্ধা, কৌশুলী সমর নায়ক। তাঁর নাম শুনলে কুরাইশদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হত।

রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় সংঘটিত প্রায় সব কয়টি যুদ্ধেই বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাসূল (সা.) এর পতাকাধারী সেনাবাহিনীর অন্যতম স্তম্ভ। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি কুরাইশ বীর আমর ইবনে আবদুহকে পরাজিত ও নিহত করেন। এই যুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ রাসূল (সা.) তাকে 'জুলফিকার তরবারি' উপহার দেন।

উহুদের যুদ্ধে মুসলিম পতাকাবাহী মুসাব ইবনে উমাইয়া নিহত হলে, হযরত আলী (রা.) পতাকা বহনের দায়িত্ব পালন করেন। খন্দকের যুদ্ধেও তিনি অসম বীরত্বের পরিচয় দেন। খাইবার যুদ্ধে তিনি বনু সাদ গোত্রকে পরাজিত করেন, যারা ছিল ইহুদীদের সমর্থক। হুনায়নের যুদ্ধেও তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। তাবুক অভিযানের সময় রাসূল (সা.) এর নির্দেশে তিনি মদীনায় অবস্থান করেন। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল খাইবারে সুরক্ষিত কামুস দুর্গ বিজয়। এই দুর্গের ফটক তিনি একাই ভেঙ্গে ফেলেন। যা পরবর্তীতে ৭০ জন যুবক মিলেও বহন করতে পারছিল না। এই বীরত্বপূর্ণ কাজের পর রাসূল (সা.) তাকে 'আসুদল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দেন। হযরত আলী (রা.) ছিলেন হুদাইবিয়ার সন্ধির লেখক। মক্কা বিজয়ের সময় হযরত আলী (রা.) ইসলামী পতাকা বহন করেন। রাসূল (সা) এর নির্দেশে হযরত আলী (রা.) ইয়েমেনে ইসলাম প্রচার করেন এবং সেখানে ব্যাপক সফলতা অর্জনের পর তিনি ইয়েমেনের কাজী হিসেবে নিয়োজিত হন।

পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রতি আনুগত্য ঃ

হযরত আলী (রা.) তাঁর পূর্ববতী তিন খলীফার প্রতি সর্বদা আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। হযরত আবু-বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (র.) এর খিলাফত কালে তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা। তিনি মজলিশ-উস-শুরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তিনি রিদ্দা যুদ্ধের সময় স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। খিলাফতের নিরাপত্তার নিশ্চিত করে। তিনি নিজ কন্যা উম্মে কুলসুমকে হযরত উমর (রা.) এর সাথে বিবাহ দেন। হযরত উসমান (রা.) এর গৃহ-শত্রুপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হলে নিজ পুত্রদ্বয়কে পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত করে। এভাবে তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এসেছেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ ঃ

৬৫৬ খ্রিঃ ৭ই জুন বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.) কে হত্যা করলে মুসলিম রাষ্ট্রের চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তগুলোর একটি। কেউই খিলাফত-এর দায়িত্ব গ্রহণে তখন এগিয়ে এলেন না। মদীনাবাসী এই সময়ে নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে কুফাবাসী যুবাইর (রা.) কে এবং বসরাবাসী তালহা (রা.) কে খলীফা হিসেবে সমর্থন করলো। অপর দিকে এক দল লোক হযরত উসমান (রা.) এর বিচার দাবি করলো। এমতাবস্থায় মিসরের বিদ্রোহীদলের নেতা ইবনে-সাবা হযরত আলীকে খিলাফতের জন্য মনোনীতি করলো। কুফা ও বসরার বিদ্রোহীরাও এই দাবিকে সম্মতি জানালেন। অবশেষে ৬৫৬ খ্রিঃ ২৩ শে জুন সকল অবস্থা বিবেচনা করে হযরত আলী (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রসংগে Syed Ameer Ali বলেন æThe husband of Fatema united in his person the hereditary right with that of election."

সমালোচনা ঃ

হযরত আলী (রা.) এমন এক সংকটজনক মুহূর্তে খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণ করেন, যখন মদীনা ছিল বিদ্রোহী ও হত্যাকারীদের দখলে। একথা সত্য যে, হযরত আলী (রা.) খিলাফতের যোগ্য দাবিদার ছিলেন। কিন্তু তাঁর খলীফা নির্বাচন প্রক্রিয়াটি ছিল অগণতান্ত্রিক। তাই এর ফলাফল পরবর্তীতে ৩টি গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে লক্ষ করা যায়।

সারসংক্ষেপ:

হযরত আলী (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.) এর জামাতা ও চাচাতো ভাই। অসামান্য বীর ও শৌর্য বীর্যের প্রতীক। ইসলামের সেবায় তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা ও কিংবদন্তী বীর। খিলাফতের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অপরিসীম। হযরত উসামন (রা.) এর মৃত্যুর পর এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে ইসলামী রাষ্ট্রের ভবিষ্যত চিন্তা করে তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামে চতুর্থ খলিফা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আসাদুল্লাহ শব্দের অর্থ কি ?

ক) আল্লাহর তরবারী
খ) আল্লাহর সিংহ
গ) আল্লাহর আর্শিবাদপ্রাপ্ত
ঘ) আল্লাহর প্রিয়

২. হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন বীরপুরুষ কারণ-

ক) তিনি প্রচুর দৈহিক বলের অধিকারী ছিলেন
খ) তিনি বিদ্বান ছিলেন
গ) তিনি সকল যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন
ঘ) তিনি অনেক হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত করেন

৩. হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত লাভের পূর্বে নিম্ন বর্ণিত কারনে মুসলিম রাষ্ট্রে বিশৃংখলা ছিল -

i) পূর্ববর্তী খলীফার হত্যার বিচার দাবি
ii) মদীনাবাসীর দল বিভিন্ন দলে বিভক্ত
iii) ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াই

নিচের কোন্‌টি সঠিক -

ক) i, iii
খ) i, ii, iii
গ) ii, iii
ঘ) i, ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

'A' নামক খলীফা ইসলামের এক দুর্যোগময় মুহূর্তে খিলাফত লাভ করেন। পূর্ববর্তী খলীফার মৃত্যুর পর সৃষ্ট বিশৃংখল পরিবেশে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই বীরপুরুষ ইসলামের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ইসলামে তাঁর অবদান অনন্য হলেও নানা কারণে তাঁর খিলাফত লাভ প্রশ্নবিদ্ধ।

ক) সবচেয়ে কম বয়সে ইসলাম গ্রহণকারী খলীফা কে ? ১
খ) হযরত আলী (রা.) কে কেন 'আসাদুল্লাহ' উপাধি দেয়া হয় ? ২
গ) উপরে উল্লেখিত 'A' খলীফার খিলাফত লাভ সম্পর্কে লিখুন । ৩
ঘ) ইসলামের সেবায় 'A' খলীফার অবদান উল্লেখ করুন। ৪

পাঠ-৬.১৫ উষ্ট্রের যুদ্ধ



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আলী (রা.) খিলাফতের প্রাথমিক সংকট সম্পর্কে জানবেন;
- উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ ও ঘটনা সম্পর্কে জানবেন ও
- এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ড, সংকটজনক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, জামালের যুদ্ধ, হেজাজ।



হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ইসলামী রাষ্ট্রে সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। হযরত আলী (রা.) এই সময় বিদ্রোহীদের দ্বারা খলীফা নিযুক্ত হন, যদিও তার খিলাফতে সকলেই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। এই সময় হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি জানানো হয়। এবং এই প্রেক্ষিতে ইসলামে বেশ কয়েকটি গৃহ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তার মধ্যে প্রথমটি ছিল উষ্ট্রের যুদ্ধ।

হযরত আলী (রা.) সংকটসমূহ ঃ

উসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ দাবি

খিলাফত লাভ করেই হযরত আলী (রা.) ব্যাপক বিশৃংখলার সম্মুখীন হন। উত্তেজিত জনতা হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ দাবি করে। কিন্তু কতিপয় কারণে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করা তখন সম্ভব ছিল না। কারণ এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এতে জড়িত ছিল কুফা, বসরা, মিসরের সংঘববদ্ধ একটি গোষ্ঠী। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা সম্ভবপর ছিল না। এছাড়া বিদ্রোহীদের দলনেতা ইবনে সাবা ছিলেন স্বয়ং আলী (রা.) কে খিলাফতে নিযুক্তকারী। তাই তার বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এই পরিস্থিতি সকলে সমানভাবে বিবেচনায় আনলেন না। তালহা (রা.), যুবায়ির (রা.), রাসূল (সা.) এর স্ত্রী হযরত আয়িশা(রা.) হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি জানালেন।

প্রশাসনিক রদবদল

এই সময় প্রশাসনিক রদবদল সংকটজনক পরিস্থিতিকে আরো সংকটতর করে তোলে। এক্ষেত্রে খলিফা ইবন-উল-আব্বাস ও আল-মুগীরার উপদেশ অগ্রাহ্য করেন। তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়ার স্থলে সুহাইল ইবনে হানিফাকে নিযুক্ত করেন। বসরার শাসনকর্তা আব্দুল্লা ইবনে-আমীরের স্থলে উসমান বিন হানিফকে, মিসরের কায়েস বিন সাদকে ও কুফায় নতুন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সিরিয়ার শক্তিশালী গভর্ণর মুয়াবিয়া নির্দেশ অমান্য করলো ও আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকার করলো। তিনি হযরত আলী (রা.) এর বিরুদ্ধচারণ করতে শুরু করেন।

উমাইয়া ও হাশেমী দ্বন্দ্ব

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ড ও হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত লাভ এই যুগপৎ ঘটনার পূর্বেই হাশিমী ও উমাইয়া দ্বন্দ্ব আবারো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এর ফলে মুসলিমদের ৩টি ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়।

মুয়াবিয়া (রা.) এর বিরোধিতা ও উচ্চাভিলাষ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর চাচাতো ভাই। তিনি সিরিয়ার একজন কৃতিত্বপূর্ণ ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর রক্তাক্ত জমা ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তিত আঙ্গুল তিনি সিরিয়ার মসজিদে প্রদর্শন করেন এবং হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ দাবি করেন। মূলত এটি ছিল একটি রাজনৈতিক স্লোগান এবং এর নেপথ্যে ছিল মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ। যার প্রমাণ আমরা উষ্ট্রের যুদ্ধে দেখতে পাই।

উষ্ট্রের যুদ্ধ

এই প্রসংগে Joseph Hell বলেন, æ The muder of Othman was a signal for civil war." মুসলিমদের মধ্যে সংঘঠিত প্রথম গৃহযুদ্ধ ছিল উষ্ট্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের বীজ হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নিহিত ছিল।

কারণ

বিশিষ্ট সাহাবীদ্বয় তালহা (রা.) ও যুবায়ির (রা.) যদিও হযরত আলী (রা.) এর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেন, কিন্তু হত্যাকারীদের বিচারে খলীফার বিলম্ব তাদেরকে হতাশ ও অসন্তুষ্ট করেছিল; হযরত উসমান কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হযরত আলী (রা.) অপসারণ করলে তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয়; সৈয়দ আমীর আলীর মতে-তালহা ও যুবায়ের যথাক্রমে বসরা ও কুফার শাসনভার গ্রহণের জন্য খলীফার নিকট প্রস্তাব করলে, খলীফা তাদের এই দাবি নাকোচ করে দেন। এতে তারা খলীফার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়; কোন কোন ঐতিহাসিক ধারণা করেন যে, হযরত আলী (রা.) এর সাথে হযরত আয়িশা(রা.) এর ব্যক্তিগত মনোমালিন্য ছিল। কিন্তু তা সঠিক নয়। যদিও তাদের মাঝে একদা ভুল বোঝাবুঝি হয়, কিন্তু বিবি আয়িশাহযরত আলী (রা.) এর উপর কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ ছিল না। তিনি পরিস্থিতির চাপে, খলীফার শিথিল ভাব দেখে মক্কায় ফেরার পথে বিদ্রোহী তালহা ও যুবায়ের এর সাথে যোগ দেন। তিনি উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান করতে চেয়েছিলেন।

যুদ্ধের ঘটনাবলী

যুদ্ধটি ৬৫৬ খ্রিঃ সংঘটিত হয়। তালহা ও যুবায়ের মক্কা ও মদীনা হতে ৩০০০ সৈন্য নিয়ে বসরা দখল করেন। বিদ্রোহীদের সাথে বিবি আয়িশাঅংশগ্রহণ করেন। বসরার শাসনকর্তা উসমান বিন হানিফকে হত্যা করা হয়। এখানে কতিপয় ব্যক্তিকে যারা উসমান হত্যায় জড়িত ছিলেন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়। খলীফা আলী (রা.) কুফার পথে বিদ্রোহীদের প্রতিহত করার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কুফার শাসক আবু মুসা আনসারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে খলিফাকে সাহায্য করতে রাজি না হলে তিনি পদচ্যুত হন। ৯০০০ কুফাবাসী হযরত আলী (রা.) এর সাথে যোগদান করেন। বস্রায় হযরত আলী তালহা, যুবায়ের ও বিবি আয়েশার সাথে সাক্ষাৎ করেন, এবং আলোচনার মাধ্যমে এই সংকট এড়াতে উদ্যোগী হন। এতে তালহা (রা.), যুবায়ির (রা.) ও বিবি আয়িশা (রা.) সম্মত হন। কিন্তু বিদ্রোহীরা বিচলিত হয়ে রাতের অন্ধকারে উভয় শিবিরে অতর্কিত আক্রমণ চালালে, উভয় পক্ষ বিস্মিত হলেন। তারা পরস্পরকে আক্রমণের জন্য দায়ী করেন। প্রত্যুত্তরে হযরত আলী (রা.) অশ্বপৃষ্টে এবং হযরত আয়িশা (রা.) উস্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে তালহা ও যুবায়ের বসরার উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন এবং পথিমধ্যে দুইজন আততায়ী দ্বারা নিহত হয়। এবার যুদ্ধে হযরত আয়িশা(রা.) উস্ট্রকে লক্ষ করে বিপরীতপক্ষ আক্রমণ করলো। হযরত আয়িশা (রা.) যুদ্ধ থামাতে অসমর্থ হলেন। হযরত আলী (রা.) এর আদেশে বিবি আয়িশা (রা.)এর উটের পা কর্তিত হয়, হযরত আলী (রা.) বহু কষ্টে যুদ্ধ থামিয়ে বিবি আয়িশা(রা.)কে উদ্ধার করেন এবং তার ভ্রাতা মুহাম্মদ বিন আবু বকরের সাথে ৪০ জন মহিলার সহচার্যে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। এরপর হযরত আয়িশা (রা.) জীবনে আর কখনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। এই যুদ্ধে হযরত আয়িশা(রা.) এর বাহন উটটি আক্রান্ত হয় বলে, ইতিহাসে এই যুদ্ধ উষ্ট্রের বা (জামালের যুদ্ধ) নামে পরিচিতি লাভ করে। আরবীতে একে বলা হয় জংগে জামাল বা জামালের যুদ্ধ। আরবী জামাল অর্থ উট।

যুদ্ধের ফলাফল

উষ্ট্রের যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম গৃহযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমেই ইসলামে গৃহ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে প্রায় সাড়ে চার হাজার মুসলিম সৈন্য নিহত হয়। তবে এই যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বসরা, কুফা, মক্কার মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধের অবসান ঘটে। বসরা, কুফা ও মিসরে হযরত আলী (রা.) এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সিরিয়ায় তখনো মুয়াবিয়ার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বজায় থাকে। খলীফা কায়েস বিন সাদকে মিসরে, সুহাইল ইবনে-হানিফকে হেজায এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বসরার শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন।

অন্যদিকে বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রকে কেন্দ্রস্থল হতে শাসন করার জন্য এবং ইরাকীদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতিতে খলীফা মুসলিম রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা থেকে ৬৫৭ খ্রিঃ কুফায় স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.) কে এই সিদ্ধান্তের জন্য চরম মূল্য দিতে হয়। মদীনা রাষ্ট্র তার রাজধানীর মর্যাদা হারায়। আর খলীফা আলী হারালেন বিশিষ্ট সাহাবীদের সমর্থন।

সারসংক্ষেপ:

উষ্ট্রের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম গৃহযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমে মূলত হযরত উসমান (রা.) হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীরাই জয়ী হয়েছিল। এই যুদ্ধটি ছিল মূলত ভুল বোঝাবুঝি এবং শত্রুপক্ষের প্ররোচনার ফল। হযরত আলী (রা.) এবং তালহা (রা.), যুবায়ির (রা.) ও বিবি আয়িশা (রা.) কেউই এই অযথা রক্তপাত মূলক যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা সকলেই পরিস্থিতির শিকার হন এবং এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা পরবর্তী ইতিহাসে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১) উষ্ট্রের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর কোন স্ত্রী যুদ্ধ করেন।?

ক) খাদিজা (রা.) খ) হযরত আয়িশা (রা.)

গ) উম্মে সালমা ঘ) উম্মে কুলসুম

২) হযরত আলী (রা.) খিলাফত অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথমেই উসমান (রা.) হত্যার বিচার করতে অস্বীকৃতি প্রদান করেন কেন ?

ক) খিলাফতে ভাঙ্গন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায়

খ) খিলাফতে গৃহযুদ্ধ ও হানাহানি বৃদ্ধির আশঙ্কায়

গ) তার সন্তানদের বিপদে পড়ার আশঙ্কায়

ঘ) হত্যাকারীরা অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়ায়

৩) উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ-

i) হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী ii) আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন প্রকাশের দাবি

iii) হযরত আয়িশা(রা.) এর সন্তুষ্টি

নিচের কোন্‌টি সঠিক-

ক) i খ) i, ii

গ) ii, iii ঘ) i, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জমি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে রহিম ও করিম দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ বাধে। এক পর্যায়ে রহিমের মৃত্যু হলে তার পরিবারবর্গ এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা চালায়। এতে ইন্ধন যোগায় গ্রামের মোড়ল ইসহাক। ফলে বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে।

১. মুসলিমদের মধ্যে সংগঠিত **১ম** গৃহযুদ্ধ কোনটি? ১

২. "উস্ট্রের যুদ্ধ" নামকরণ করা হয় কেন ? ২

৩. উপরের উদ্দীপকটি যে যুদ্ধের ইঙ্গিত দেয় সে যুদ্ধের কারণগুলো উল্লেখ করুন। ৩

৪. উষ্ট্রের যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করুন ? ৪

পাঠ-৬.১৬ সিফফিনের যুদ্ধ



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জানবেন।
- সিফফিনের যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল সম্পর্কে জানবেন।
- খারেজী সম্প্রদ্রায় ও আলীর মধ্যে সংঘটিত নাহরাওনের যুদ্ধ সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মোড় পরিবর্তনকারী, রাজতন্ত্র, উসমানের রক্তাক্ত জামা, বাজেয়াপ্ত, মল্লযুদ্ধ, অভিনব কৌশল, দুমাতুল জন্দল, খিলাফত বিভক্তি, খারেজী সম্প্রদায়।**



হযরত আলী (রা.) এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত ইসলামের ইতিহাসের অসংখ্য মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়। আলী ও মুয়াবিয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের আদর্শের চ্যুতি হয় এবং ভ্রাতৃঘাতি দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যা ছিল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা। মূলত এই দ্বন্দ্বের সূত্র ধরেই খিলাফতের পবিত্রতা নষ্ট হয়, গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর সমাধি রচিত হয়। সেই সাথে সূত্রপাত হয় রাজতন্ত্রের। যার জনক ছিলেন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.)। তাঁর হাত ধরেই ইসলামে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনার সূত্রপাত ঘটে সিফফিনের যুদ্ধের মাধ্যমে।

আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব ঃ

প্রশাসনিক রদবদল

খিলাফতের শুরু হতেই হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ততায় ভরপুর ছিল। কুফায় রাজধানী স্থাপন করে খলীফা অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার অবসান করতে উদ্যোগী হন। তিনি বসরা, কুফা, মিসর ও সিরিয়ার শাসনকর্তাদের রদবদল করেন। এটি মুয়াবিয়া (রা.)এর মত অপরাপর উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিকদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। তিনি খলীফার এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

মুয়াবিয়া (রা.) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনীহা

মুয়াবিয়া (রা.) ব্যতীত সকল প্রদেশের শাসনকর্তাগণ খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে মেনে নেন। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) খলীফার প্রতি কোন প্রকার আনুগত্য প্রকাশ করলেন না। তিনি খলীফার ঠিকানাযুক্ত একটি পত্রবিহীন খাম প্রেরণ করলেন এবং ঘোষণা করলেন- যতদিন উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হবে ততোদিন তিনি খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বিরত থাকবেন।

মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক উসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ দাবি

খলীফা উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান করা ছিল একটি সময়ের দাবি। কিন্তু এটি ছিল একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। কোন একক ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন না। বরং এতে কুফা, বস্রা ও মিসরের কতিপয় ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। তাই তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রের এমন বিশৃংখল অবস্থায় হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে এই হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার করা সম্ভবপর ছিল না। অপরদিকে মুয়াবিয়া (রা.) খলীফা উসমান (রা.) এর রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তৃত আঙ্গুল সিরিয়ার মসজিদে প্রদর্শন করে জনতাকে উত্তেজিত করে তোলেন। তিনি খলীফার কাছে অচিরেই এই হত্যার বিচার দাবি করেন নতুবা তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন এই মনোভাব ব্যাক্ত করেন।

মুয়াবিয়া (রা.) এর উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমতা লিপ্সা

মূলত উসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ দাবি ছিল মুয়াবিয়ার একটি রাজনৈতিক কৌশল। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী। মুয়াবিয়া হযরত উমর (রা.) কর্তৃক সিরিয়ার গভর্ণর পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক,

সংগঠক, কৃতিত্বপূর্ণ শাসক। তার সময়ে ভূ-মধ্যসাগরে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ও এশিয়া মাইনরে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তার প্রাদেশিক রাজধানী দামেস্কে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন। এতে তার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ বৃদ্ধি পায়। ফলে তিনি কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলের জন্য উৎসাহিত হন।

উমাইয়া ও হাশেমী দ্বন্দ্ব

হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্বে পরোক্ষভাবে প্রাক-ইসলামী যুগের উমাইয়া ও হাশেমী দ্বন্দ্ব প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি বনু উমাইয়া গোত্রভুক্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই বনু হাশিমী গোত্রের লোককে ক্ষমতার কেন্দ্রে দেখতে চাইবেন না।

উমাইয়া স্বার্থহানি

হযরত উসমান (রা.) এর শাসনামলে উমাইয়াগণ খলীফার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বহু সরকারী সম্পত্তি জায়গীর নিজেদের অধিকারভুক্ত করেছিলেন এবং তা ভোগ করে আসছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.) খলীফা হয়ে এই সকল সরকারী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এতে উমাইয়া পরিবারের সকল সদস্য মুয়াবিয়া (রা.) সহ তাদের সম্পত্তির অনেকাংশ হাত ছাড়া হয়ে যায় যা ছিল তাদের জন্য ব্যাপক স্বার্থহানি। এটি ছিল তাদের মধ্যকার অন্যতম দ্বন্দ্বের কারণ।

সিফফিনের যুদ্ধ (৬৫৭ খ্রিঃ)

খলীফা হযরত আলী (রা.) এর প্রতি মুয়াবিয়া (রা.) এর আনুগত্য প্রকাশে অনীহা, উসমান (রা.) হত্যার বিচার দাবি ও সর্বোপরি মুসলিম সম্পদায়ের মধ্যে বিভক্তি ইত্যাদি কার্যকারণে মুয়াবিয়া (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুয়াবিয়া (রা.) এর ধৃষ্টতা ও অবাধ্য আচরণের ফলে ৬৫৭ খ্রিঃ খলীফা একটি বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা শুরু করে। ইতিমধ্যে মুয়াবিয়া (রা.) ৬০,০০০ সৈন্য নিয়ে ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে সিফফিন নামে স্থানে এসে শিবির স্থাপন করলেন। প্রথমে হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) কে দূত পাঠানোর মাধ্যমে ইসলামের স্বার্থে খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে আহবান জানান। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) তার সিদ্ধান্তে অটল রইল। তারপর খলীফা হযরত আলী (রা.) অযথা রক্তপাত এড়ানোর জন্য ব্যক্তিগতভাবে মুয়াবিয়া (রা.) কে মল্লযুদ্ধে আহবান জানালেন। কিন্তু শৌর্য-বীর্যের প্রতীক, আল্লাহর বাঘ হযরত আলী (রা) সাথে মল্লযুদ্ধে মুয়াবিয়া (রা.) নিজের প্রাণক্ষয় করতে চাইলো না তাই এই প্রস্তাবও নাকচ করে দেয়া হলো। অবশেষে যুদ্ধ অনিবার্য হয়েও উঠলো। দুই পক্ষ সম্মুখযুদ্ধে পরস্পরকে মোকাবেলা করতে লাগলো। খলীফার সেনাপতি মালিক আল আসতার এর অপূর্ব রণকৌশলে মুয়াবিয়া (রা.) এর বাহিনী ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিবসে মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর সেনাবাহিনীর নিশ্চিত পরাজয় দেখতে পেলেন।

আমর ইবনুল আসের কৌশল ঃ

যুদ্ধে মুয়াবিয়া (রা.) এর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখা দিলো। তাই মুয়াবিয়া (রা.) তার প্রধান সেনাপতি ও উপদেষ্টা, শ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক আমর ইবন আল-আস (রা.) এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। আমর (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) কে যুদ্ধের পরাজয় হতে ফিরে আসার জন্য এক অভিনব কৌশল অবলম্বনের উপদেশ দিলেন।

কুরআনের মাধ্যমে মীমাংসা

আমরের পরামর্শে মুয়াবিয়ার সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী অংশ তাদের পতাকাশীর্ষে ও বর্শার অগ্রভাগে কুরআন শরীফের পবিত্র পাতা ঝুলিয়ে চিৎকার করে বিরোধীদলীয় সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, " এখানে আল্লাহর কিতাব - এটি আমাদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করবে।" নিঃসন্দেহে এটি ছিল একটি অভিনব কৌশল। হযরত আলী সেনা বাহিনীর প্রায় সম্মুখভাগের প্রায় সকলেই ছিলেন কুরআনে হাফিয। তাঁরা কুরআনকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে যুদ্ধ বন্ধ করেন এবং হযরত আলী (রা.) কে কুরআনের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য সকলকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানান। এই ব্যবস্থা ছিল একটি দূরদর্শী চিন্তার ফসল যা যুদ্ধের মোড়-পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছিল।

হযরত আলীর যুদ্ধ বন্ধে অনীহা

হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) এর এই কূটনৈতিক চালকে বুঝতে সক্ষম হন। তিনি এই যুদ্ধ বন্ধ করতে কোনভাবেই ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ যুদ্ধে তাঁর জয় ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাঁর সেনাপতি মালিক আল-আসতারও যুদ্ধ স্থগিত করতে আগ্রহী হলেন না। এমন অবস্থায় হযরত আলী (রা.) এর সেনাবাহিনীর একাংশ হযরত আলী (রা.) কে যুদ্ধ বন্ধের জন্য বার বার অনুরোধ করতে থাকেন এবং একটি সালিশের মাধ্যমে এই সংকটের নিষ্পত্তি কামনা করেন। অবশেষে সকলের একান্ত ইচ্ছা ও চাপে পড়ে হযরত আলী (রা.) যুদ্ধ স্থগিত করেন।

দুমার মীমাংসা (জানুয়ারী ৬৫৮ খ্রিঃ)

হযরত আলী (রা.) এর সাথে মুয়াবিয়া (রা.) এর যুদ্ধ এড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাঁরা উভয় দল মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করে আপোস করার চেষ্টা করবেন। খলীফা আলী (রা.) কুফার গভর্ণর আবু মুসা আশ্য়ারী (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) আমর ইবনে আল-আসকে সালিশে নিস্পত্তি করার জন্য স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, উভয়পক্ষ সালিশের চারশত লোক সাথে নিয়ে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে মিলিত হবেন এবং কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে বিরোধ মীমাংসা করবেন।

দুমাতুল জন্দলের মীমাংসা ও আমরের কৌশল

নির্দিষ্ট দিনে মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী দুমাতুল জান্দাল (আজরুহ) নামক স্থানে সালিশের মজলিস বসলো। আমর ইবন আল-আস, মুসা আল আশ্য়ারী (রা.) কে বুঝালেন যে ইসলামের স্বার্থে হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) উভয়কেই নিজ নিজ পদ হতে অপসারণ করতে হবে এবং তৃতীয় কোন ব্যক্তি কে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করতে হবে। মূলত সিদ্ধান্ত হয় যে, আবু মুসা হযরত আলী (রা.) কে খিলাফত থেকে অপসারণ ঘোষণা করবেন তারপর আমর ইবন আল-আস তাঁর পূর্ব কথা অনুসারে মুয়াবিয়া (রা.) এর পদ থেকে অপসারণ ঘোষণা করবেন। সরলমনা ও অকপট আবু মুসা বেদীর উপর দাড়িয়ে ঘোষণা করলেন - " আমি হযরত আলী (রা.) কে খিলাফত হতে পদচ্যুত করলাম। এর পর আমর দাড়িয়ে বললেন, "আমি আলীর পদচ্যুতি অনুমোদন করলাম এবং তদস্থলে মুয়াবিয়া (রা.)কে নিযুক্ত করলাম,"। এই রায়ে খলীফার সমর্থকগণ ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। আমরের কূটকৌশল ফলপ্রসূ হলো। উভয় পক্ষের মধ্যে শত্রুতার তীব্রতা বৃদ্ধি পেল।

ফলাফল ঃ

মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা

দুমাতুল জন্দলের মীমাংসা ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি মোড়পরিবর্তনকারী ঘটনা। যার প্রভাব ছিল সদূরপ্রসারী।

খলীফার মর্যাদা লোপ

এই মীমাংসার মাধ্যমে খলীফা হিসেবে হযরত আলী (রা.) এর মর্যাদা লোপ পায়। মুয়াবিয়া, যিনি ছিলেন কেবলমাত্র একজন প্রাদেশিক গভর্ণর ছিলেন। তাঁকে খলীফার সমমর্যাদা দান করা হয়। অথচ মুসলিম জাহানের খলীফার মর্যাদা ছিল সকল কিছুর উর্ধ্বে।

খিলাফত বিভক্তি

এই মীমাংমার পর স্বভাবতই খলীফা হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যে খিলাফতকে আপোষ-বন্টন করেন। সিরিয়া, মিসর মুয়াবিয়া (রা.) এর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অপর দিকে হেজায, বস্রা, কুফা ও আরবের অন্যান্য অঞ্চল হযরত আলী (রা.) এর অধীনস্ত থাকে।

মুয়াবিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও রাজতন্ত্র

মূলত এই মীমাংসার মাধ্যমে মুয়াবিয়া (রা.) এর শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির উচ্চাভিলাষ বাস্তবে পরিণত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় রাজতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। রাজতন্ত্রের বীজ এই সালিশের মীমাংসার মধ্যেই নিহিত ছিল।

খারিজী সম্প্রদায়

দুমাতুল জন্দলের সালিশের মীমাংসায় হযরত আলী (রা.) এর পক্ষের ১২,০০০ সৈন্যের একটি দল তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে 'হারুরা' নামক গ্রামে জমায়েত হয়। খারিজী মানে দলত্যাগী।

উৎপত্তি ঃ দলত্যাগী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও গোলযোগ সৃষ্টিকারী এই দল খলীফার দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বা খারিজ হয়ে অস্ত্র ধারণ করলে তাদেরকে খারিজী বা দলত্যাগী বলা হয়। হারুরায় বসবাস করতো বলে তাদেরকে হারুরী (Harurites) নামেও ডাকা হয়। তারা মানুষের বিচার মানতে অস্বীকার করে এবং প্রচার করতে থাকে যে , "আল্লাহর আইন ছাড়া আর কোন আইন নেই" (লা হুকমাহ্ ইল্লালিল্লাহ)। খারিজী সম্প্রদ্রায়ই ইসলামের সর্বপ্রথম ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল বলে পরিচিত।

খারিজীদের রাজনৈতিক মতবাদ

খারিজীগণ প্রথম দুই খলিফাকে ন্যায় সঙ্গত খলীফা হিসেবে গ্রহণ করেন। ৩য় খলীফা উসমান (রা.) ও আলী (রা.) যেহেতু শত্রুর সাথে মীমাংসা করতে চেষ্টা করেছিলেন তাই তাঁদের বিরোধিতাকে তারা করেন। তারা উমাইয়া ও আব্বাসী খলীফাদের গ্রহণ করেনি। তারা বংশ, গোত্র নির্বিশেষে সর্বজনীনতার ভিত্তিতে ইমাম বা খলীফা নির্বাচনে পক্ষপাতি ছিলেন। তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলো। পার্থিব ভোগ-বিলাস তারা বরদাস্ত করতেন না। তারা ঘোষণা করেন যে- যোগ্যতাসম্পন্ন আদর্শবান ও সৎ যে কোন ব্যক্তি খলীফা হতে পারবেন। এমনকি ভৃত্যও খলীফা হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারবেন। ধর্মের ব্যাপারে তারা ছিল কট্টরপন্থী যারা ইসলামের মূল আদর্শ হতে বিচ্যুত তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করার অভিপ্রায় তারা পোষণ করতেন।

নাহরাওয়ানের যুদ্ধ (৬৫৯ খ্রি)

খারিজীদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব আল-রাবিবী। তার নেতৃত্বে খারিজীগণ যারা তাদের মতবাদের বিরোধিতা করতো তাদের হত্যা করে সর্বস্ব লুটপাট করে নিতো। খলীফা হযরত আলী (রা.) তাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। খলীফা নাহরাওয়ান নামক স্থানে খারিজীদেরকে মোকাবেলা করলেন। ১২০০০ মধ্যে মাত্র ১৮০০ জন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো। যুদ্ধে খলীফা আলী (রা.) খারিজীদের পরাজিত করলেন। কেউ তওবা পড়ে হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে যোগদান করলো অবশিষ্টরা বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলো।

হযরত আলী (রা.) এর শাহাদাত বরণ

খারেজীগণ আমর ইবন আল-আস (রা.), মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) কে সকল সমস্যার সৃষ্টিকারী হিসেবে দায়ী করে এবং তাদের হত্যার পরিকল্পনা করে। নির্দিষ্ট দিনে কুফা, সিরিয়া ও মিসরে তারা এই তিন ব্যক্তিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষায় থাকে। সৌভাগ্যক্রমে নির্দিষ্ট দিনে ফজরের সালাতের সময় আমর অসুস্থতার কারণে মসজিদে হাজির হয়নি। মুয়াবিয়া সামান্য আহত হলেও রক্ষা পেলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.) আব্দুল্লা ইবনে মুলজামের বিষাক্ত ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হন (২৪ জানুয়রি, ৬৬১) এবং ৬৬১ খ্রিঃ ২৭ জানুয়ারী তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরই মাধ্যমে খুলাফায়ে রাশিদীনের ৪র্থ খলীফার জীবনাবসান ঘটলো এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের খিলাফতকালের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

হযরত আলীর ব্যর্থতার কারণ

মূলত উস্ট্রের যুদ্ধের মাধ্যমে আলী (রা.) এর সাথে তালহা (রা.) ও যুবায়ের (রা.) এর মত পার্থক্য ঘটে এবং এই দুই বিশিষ্ট সাহাবীর মৃত্যু হযরত আলী (রা.) এর শক্তি অনেকাংশে হ্রাস পায়। তিনি তাদের নৈতিক ও সামরিক সমর্থন হারান। ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা হতে কুফায় স্থানান্তরের ফলে আলী (রা.) বহুলাংশে মদীনাবাসীর সমর্থন হারান। মদীনা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী যা মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করে যান ও পূর্ববর্তী ৩ জন খলীফা তাঁর অনুসরণ করেন। তাই হযরত আলী (রা.) বিশিষ্ট সাহাবী ও সুন্নী মুসলিমদের সমর্থন হারান। অন্যদিকে কুফাবাসী ছিল অস্থির প্রকৃতির ও চঞ্চলমতি। বিভিন্ন সংকটকালীন সময়ে হযরত আলী (রা.) তাদের পূর্ণসমর্থন পাননি। অপর দিকে সিরিয়ায় মুয়াবিয়া (রা.) এর শক্ত রাজনৈতিক অবস্থান ছিল। তিনি সবসময় সিরিয়াবাসীর অকুণ্ঠ রাজনৈতিক সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হন। যা তার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত উসমান (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) খলীফা নিযুক্ত হন এবং সাথে সাথেই ভ্রাতৃঘাতি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর দ্বন্দ্ব সংঘাতের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল সিফফিনের যুদ্ধ। যার নেপথ্যে ছিল মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের বিচার দাবি, প্রশাসনিক রদবদল ও হযরত আমরের কূটনৈতিকচাল। অবশেষে দুমাতুল জন্দলে হযরত আলী (রা.)কে খিলাফত হতে পদচ্যুত করা হয় এবং মুয়াবিয়া (রা.) কে খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। যা ছিল খিলাফত ও খলীফার জন্য চরম অপমানকর সিদ্ধান্ত। হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্বের ফলাফল স্বরুপ খারিজী ও শিয়া সম্প্রদ্রায়ের আবির্ভাব ঘটে যা ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন খলীফার সময়ে সিফফিনের যুদ্ধ হয়?

ক) হযরত উসমান (রা.)
খ) হযরত আলী (রা.)
গ) হযরত উমর (রা.)
ঘ) হযরত আবু বকর (রা.)

২. হযরত আলী সিফফিনের যুদ্ধে পরাজিত হন। কারণ -

ক) শারীরিক দুর্বলতা
খ) যুদ্ধে অনীহা
গ) রাজনৈতিক অদূরদর্শী ছিলেন
ঘ) যুদ্ধে অদক্ষ ছিলেন।

৩. সিফফিনের যুদ্ধের কারণ ছিল-

i) মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ
ii) প্রশাসনিক রদবদল
iii) হযরত আমরের কূটনৈতিক চাল

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i, ii
খ) i, ii, iii
গ) ii, iii
ঘ) i

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ভৈরব পৌর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নিহত হন। পরবর্তীতে লোকমান এলাকার চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। ইউনিয়নে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য লোকমান সাবেক চেয়ারম্যানের হত্যাকারীদের বিচার করতে বিলম্ব করেন। এতে অন্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী কৌশলে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিচার বিলম্বিত করার অভিযোগ আন্দোলন শুরু করে।

ক) সিফফিনের যুদ্ধ কতসালে ঘটে? ১
খ) 'দুমাতুল জন্দলের মীমাংসার' বর্ণনা দিন ? ২
গ) উদ্দীপকের ঘটনাটি কোন যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) উপরোক্ত ঘটনার পর সমাজের অবস্থা সিফফিনের যুদ্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৬.১৭ হযরত আলী (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আলী (রা.) এর কৃতিত্বের মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- হযরত আলী (রা.) এর শাসন সংস্কারের বিষয়ে বলতে পারবেন ও
- হযরত আলী (রা.) চরিত্রের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**বিশ্বস্ত নেতা, 'দিওয়ানে আলী', তাসাউফ, আসাদুল্লা উপাধি, যুলফিকার।**



হযরত আলী (রা.) খুলাফায়ে রাশিদীনের চতুর্থ খলীফা ছিলেন। বিপুল তারুণ্য নিয়ে তাঁর ইসলামে আগমন আর সারাজীবনব্যাপী ইসলামের জন্য অপরিসীম ত্যাগ-তিতীক্ষা, বীরত্ব, সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

আলী (রা.)-এর চরিত্র

আলী (রা.) রক্তিম বর্ণ বিশিষ্ট, নাতিদীর্ঘ, অতীব শক্তিশালী, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও কোমল কপোতাভ চক্ষুবিশিষ্ট অমায়িক এবং দয়ার দৃষ্টিসম্পন্ন বলে বর্ণিত হয়েছেন। সরল ও একনিষ্ঠ মুসলিম হযরত আলী (রা.) ছিলেন সরলতা ও আত্মত্যাগের মূর্ত-প্রতীক। মুসলিম জগতের খলীফা হয়েও স্বহস্তে কাজ করতে তিনি গর্ববোধ করতেন। তিনি জীর্ণকুটিরে বাস করতেন এবং মোটা কাপড় পরিধান করতেন। দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা.) এর আমলে প্রবর্তিত অধিকাংশ জনহিতকর কার্য তাঁর পরামর্শেই সম্পাদিত হয়েছিল। তিনি শান্ত ও পরোপাকারী ছিলেন। ইসলামের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। হযরত আলী (রা.) প্রত্যহ পাঁচবার মসজিদে সালাত পড়তে যেতেন এবং মুসলিম ও অমুসলিমগণের অভিযোগ শ্রবণ করতেন। তরুণদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

বিশ্বস্ততা ও সততা

তিনি ছিলেন জাতির বিশ্বস্ত নেতা। তিনি সততা ও নিষ্ঠা সহকারে বায়তুল মালের সংরক্ষণ করতেন। নিজের ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত কোন অর্থ বা খাদ্য বায়তুল মাল থেকে নেয়া হারাম বলে মনে করতেন।

জ্ঞানী

হযরত আলী (রা.) শৈশবকাল থেকেই মহানবী (সা.) এর তত্ত্বাবধান সংসর্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি যাবতীয় প্রশিক্ষণ লাভ করেন। যৌবনে হযরত (সা.) এর জামাতা হবার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর মধ্যে জ্ঞান আহরণ এবং বহুমুখী জ্ঞানের পূর্ণতা লাভের সহজাত যোগ্যতা ও আগ্রহ ছিল। এ কারণে নবীর প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কুরআন মাজীদ, তাফসীর, হাদিস, ফিকাহ, অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়াদির জ্ঞানে তিনি ছিলেন দক্ষ। তাঁর জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে সকলেই একমত ছিল। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী "আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী তার ফটক" এরই প্রমাণ দেয়।

হযরত আলী (রা.) এর কৃতিত্ব ঃ

প্রশাসনিক সংস্কার

হযরত উসমান (রা.) (রা.) শাসনের শেষের দিকে প্রশাসনে উমাইয়াদের যে প্রাধান্য সৃষ্টি হয়েছিল হযরত আলী (রা.) পুনরায় তা ঢেলে সাজান এবং প্রশাসনিক সংস্কার করেন। হযরত উসমান (রা.) এর যুগে অসাধু আমলাদের কারণে প্রশাসনে যেসব দূর্নীতি ঢুকে পড়েছিল সেগুলো দূর করে তিনি হযরত উমর (রা.) এর যুগের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা বহাল রেখেছিলেন এবং তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন করেননি। নাযরানের ইহুদিদেরকে উমর (রা.) হিজায থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তারা পুনরায় হিজাযে আগমনের দরখাস্ত করলে তিনি তা অস্বীকার করেন।

বায়তুল মালের সংরক্ষণ ঃ বায়তুল মালের যথাযথ সংরক্ষণে তিনি সতর্ক ছিলেন। নিজের এবং নিজ পরিবারবর্গ ও নিকটাত্মীয়দের কাজে সরকারী কোষাগারের সাধারণ কোন জিনিসও তিনি ব্যয় হতে দিতেন না। মহানবী (সা.) এর ভৃত্য আবু রাফেকে তিনি বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত করেছিলেন।

বাজারদর পরিদর্শন ঃ পণ্যসামগ্রীর বাজার দর তিনি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতেন। যেন তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে না যায়। দোকানদারদেরকে সঠিক মাপ ও ক্রেতার সাথে ভাল ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন।

পাণ্ডিত্য

হযরত আলী (রা.) অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি কবি, সাহিত্যিক, বৈয়াকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁর লিখিত 'দিওয়ানে আলী' আজও আরবি সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর বক্তৃতা ও অভিভাষণ আরবি ভাষার গৌরবের বস্তু।

উত্তরাধিকার আইন

উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন মদীনার অন্যতম বড় পণ্ডিত। বিভিন্ন ধরণের মামলা মুকাদ্দমাতে তাঁর প্রদত্ত রায়সমূহ বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। তাসাউফ তথা আত্মশুদ্ধির বিশেষ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মূল উৎস হিসেবে তাঁর বক্তব্যকেই গণ্য করা হয়।

আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রবর্তক

আরবি ব্যাকরণের ভিত্তি হযরত আলী (রা.)-ই স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজের সাথীদের মধ্য থেকে আবুল আসওয়াদ আদ- দুয়াইলী নামক জনৈক ব্যক্তিকে এ কাজে নিয়োগ করেছিলেন।

বীরত্বের মূর্ত প্রতীক

হযরত আলী (রা.) ছিলেন বীরত্ব ও সাহসিকতার মূর্ত-প্রতীক। তিনি তাঁর অসাধারণ শৌর্য ও সাহসিকতা নিয়ে ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। মহানবী (সা.) জীবদ্দশায় যত যুদ্ধ সংঘটিত হয় তিনি প্রায় সব কটিতেই অংশগ্রহণ করে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। বদর যুদ্ধে তিনি ছিলেন মুসলিমদের পতাকা বহনকারী। উহুদ, খন্দক, মক্কা বিজয়, হুনায়ন, খায়বর প্রভৃতি যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন।

আসাদুল্লা উপাধি লাভ

তাঁর সামরিক কৃতিত্বের মধ্যে খায়বরের বিখ্যাত কামুস দুর্গ দখল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অসাধারণ বীরত্বের নির্দেশন স্বরুপ তাঁকে মহানবী (সা.) 'আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

যুলফিকার লাভ

মহানবী (সা.) যুলফিকার নামক তরবারী তাকে উপহার দান করে বলেন- 'যুলফিকার' সমতুল্য কোন তরবারী নেই এবং আলীর সাথে কোন বীর যোদ্ধার তুলনা করা যায় না।

সারসংক্ষেপঃ

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) এর শাসনকাল ছিল নানা সংকট ও সমস্যায় পূর্ণ। তা সত্ত্বেও তিনি তার মেধা, চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণ রেখে গেছেন। তিনি প্রশাসনিক দিক থেকে যথেষ্ট সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনি তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য অমর হয়ে আছেন। অনুকূল পরিবেশে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করতে পারতেন এতে কোন সন্দেহ নেই। এক কথায় খলীফা হিসেবে কিয়ৎ পরিমাণ ব্যর্থ হলেও মানুষ হিসেবে তিনি পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. "আসাদুল্লাহ" শব্দের অর্থ কী?

ক) আল্লাহর সিংহ খ) আল্লাহর বন্ধু

খ) আল্লাহর তরবারি ঘ) আল্লাহর সিপাহী

২. হযরত আলী (রা.) প্রশাসনে সংস্কার সাধন করেন কেন ?

ক) উমাইয়াদের দমন করতে খ) নিজের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করতে

গ) উমাইয়াগণ কর্তৃক সৃষ্ট দুর্নীতি দূর করতে ঘ) কোনটিই নয়

৩. হযরত আলী (রা.) খলীফা হিসেবে যেসকল কাজ করতেন -

i) বাজারদর পরিদর্শন করতেন ii) স্কুল কলেজ নির্মাণ করতেন

iii) বায়তুল মাল যথাযথ সংরক্ষণ করতেন

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i খ) i, ii

গ) i, iii ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক আবু ইসহাক বললেন 'x' খলীফা ছিলেন ইসলামে শ্রেষ্ঠ বীর। তিনি স্বভাবগত ভাবে অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর শাসনকাল বিভিন্ন যুদ্ধের জন্য বিতর্কিত হলেও ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন সফল সেনানায়ক। তাঁর মৃত্যুর সাথেই ইসলামী সাধারণতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ক) ইসলামের চতুর্থ খলীফার নাম কী? ১

খ) "হযরত আলী (রা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত" কথাটি ব্যাখ্যা করুন। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত খলীফার বীরত্ব তুলে ধরুন। ৩

ঘ) প্রশাসক ও ব্যক্তি হিসেবে হযরত আলী (রা.) এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৬.১৮ খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনব্যবস্থা



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন ও
- খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনব্যবস্থার বিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

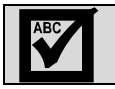	**মুখ্য শব্দ**	**আমিরুল মুমিনীন, মজলিস-উশ-শূরা, সাহিবুল আহ্‌দাস ও সাহিবুল খারাজ।**



মহানবী (সা.) এর ইন্তিকালের পর পর চারজন খলীফা তাঁর প্রতিনিধি হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যকে শাসন করেছেন। এই চার খলীফার শাসন ছিল মহানবী (সা.) আদর্শ নীতির প্রতিকৃতি। মহানবী (সা.) আল্লাহর বাণীকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি মদীনা রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। কিন্তু মদীনা রাষ্ট্রকে একটি শাসনকাঠামো দিয়েছিলেন খুলাফায়ে রাশিদীনের চার খলীফা তাদের ৩০ বছরের (৬৩২-৬৬১) শাসনে মুসলিম সাম্রাজ্য কেবল প্রসারিত হয়নি বরং একটি উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল।

খলীফা

খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনব্যবস্থায় খলিফাই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছিলেন রাসূল (সা.) এর প্রতিনিধি। রাসূল (সা.) এর ন্যায় তিনিও ছিলেন প্রধান ধর্মীয় নেতা, ইমাম, সেনাবাহিনীর প্রধান, আইনদাতা ও রাষ্ট্রের সর্বময়কর্তা। তাঁর উপাধি ছিল 'আমিরুল মুমিনীন বা মুমিনদের নেতা'। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। কুরআন ও হাদীস অনুসারে খলিফাকে শাসন করতে হতো। তিনি তাঁর কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকতেন, জনগণের নিকট জবাবদিহি করতেন। আল খুযারীর ভাষায়-The khilafat was a temporal headship based on religion.

শাসননীতি

খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনকাঠামো খলীফা হযরত উমর (রা.) প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী খলিফাগণ তাঁর অনুসৃত নীতিসমূহ অনুসরণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি শাসনক্ষেত্রে ৩ টি প্রধান নীতি অনুসরণ করেছিলেন যা ছিল তাঁর সমগ্র শাসনকাঠামোর বৈশিষ্ট্য। যথা-

- তিনি আরব জাতিকে একটি বিশুদ্ধ ও স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি -বৈদেশিক উপাদানগুলো আরবদেশ হতে দূরীভূত করে আরব ভূমিকে কেবলমাত্র আরববাসীদের জন্য সংরক্ষিত রাখেন।
- আরববাসীদেরকে আরবের বাইরে ভূমি ক্রয় করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।
- সাধারণতন্ত্রের অতিবিস্তার তিনি পরিহারের চেষ্টা করেন। যতদিন তাঁর এই নীতি প্রচলিত ছিল, ততোদিন পর্যন্ত মুসলিম শাসনকাঠামো অটুট ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরবর্তী খলিফাগণ এই নীতি হতে দূরে সরে পড়েন।

মজলিস-আল-শূরা

মজলিশ-আল-শূরা বা মন্ত্রণা-পরিষদ ছিল খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একে উপদেষ্টা পরিষদও বলা হতো। আনসার ও মুহাজিরদের পক্ষ হতে বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানী-ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দ্বারা শূরা গঠিত হত। মসজিদে নববীতে এটির অধিবেশন পরিচালনা বসতো। খলিফাগণ এই মন্ত্রণা পরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেমন- প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ, কাজী, সেনাপ্রধান নিয়োগ, রাজস্ব নির্ধারণ, যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ও শাসনকার্যের নানাবিধ কর্মকাণ্ড মজলিসের পরামর্শ অনুসারে সম্পন্ন করা হতো। খলীফা উমর (রা.) এর শাসনামলে এটি প্রধান ২ টি অংশে বিভক্ত ছিল।

ক) মজলিস-ই-আম বা সাধারণ সভা।

খ) মজলিস-ই-খাস বা বিশেষ সভা।

শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণ

খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনকার্যে জনগণ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতেন। অনেক ক্ষেত্রে খলীফা জনগণের ইচ্ছানুযায়ী রাজকর্মচারী ও শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। খলীফা তাঁর কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহিতা করতেন। জনগণের মতামত ও অভিযোগ খলিফাগণ গুরুত্বসহকারে শ্রবণ করতেন।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য খলিফাগণ সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। যথা- মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, জাবিয়রাহ, বসরা, কুফা, মিসর, ফিলিস্তিন, ফার্‌স, কির্‌মান, খোরসান, মাক্‌রান, সিজিস্তান, ও আজারবাইজান ।

ওয়ালী

প্রদেশের শাসনকার্য ও প্রাদেশিক গভর্ণর বা ওয়ালীর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি শূরার সম্মতিক্রমে স্বয়ং খলীফা দ্বারা নিযুক্ত হতেন। তিনি ছিলেন প্রদেশের ইমাম, সেনা প্রধান, রাজস্ব আদায়কারী ও শুক্রবারে তিনি জুমুআর খুৎবা পাঠ করতেন। তিনি তাঁর কাজের জন্য খলীফার নিকট দায়ী থাকতেন। তাঁর কাজের জন্য ব্যক্তিগত সেক্রেটারিয়েট (সচিবালয়) ছিল।

আমিল

প্রত্যেকটি প্রদেশকে একাধিক জেলায় বিভক্ত করা হতো। জেলার শাসনভার আমিল নামক কর্মকর্তার হাতে ন্যস্ত ছিল। তিনি ওয়ালীর অধীনে কাজ করতেন। ওয়ালী ও আমিলকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে হত। নিয়োগের পূর্বেই তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসাব রাখা হতো। তাই কর্মরত অবস্থায় তাঁর সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে রাষ্ট্র তা বাজেয়াপ্ত করে নিতো।

অন্যান্য কর্মচারী

খলিফাগণ প্রত্যেক প্রদেশে কাজী নিয়োগ করতেন। কাজীকে উচ্চ শিক্ষিত ও সৎ হতে হতো।
সাহিবুল খারায ছিলেন প্রাদেশিক রাজস্ব কর্মকর্তা।
সাহিবুল আহ্‌দাস ছিলেন প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা।
সাহিবুল বায়তুল মাল ছিলেন বায়তুল মালের প্রধান।

রাজস্ব প্রশাসন

খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে নিম্ন লিখিত উৎস হতে রাজস্ব আদয় করা হত।
১. যাকাত ২. জিযিয়া ৩. খুম্‌স ৪. ওশর ৫. খারায ৬. আল ফাই ৭. উশর।

যাকাত বা দরিদ্র কর

প্রত্যেক সামর্থ্যবান ও বিত্তশালী মুসলিম হতে যাকাত আদায় করা হতো। শরীয়ত মোতাবেক এটির বিধি বিধান স্বয়ং মহানবী (সা.) প্রবর্তন করে গিয়েছেন। সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করার পর পরবর্তীতে খলীফা উমরের সময়ে অশ্বের উপরও যাকাত ধার্য করা হয়।

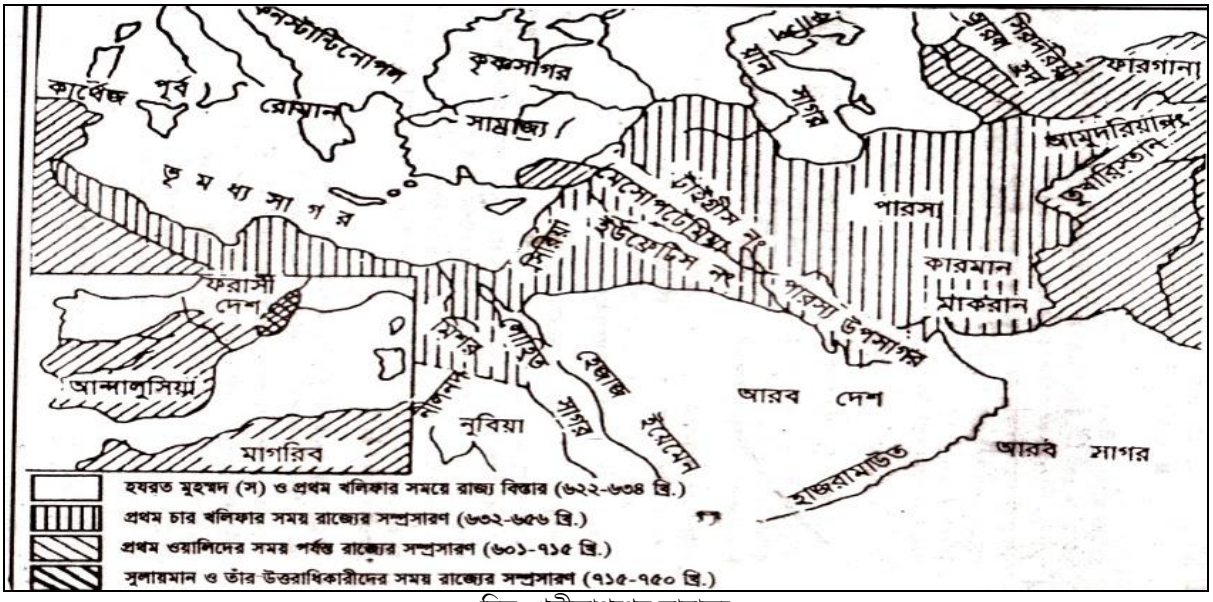

চিত্র: খলীফাগণের সাম্রাজ্য

জিযিয়া বা নিরাপত্তা কর

মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমগণ রাষ্ট্রের তরফ হতে নিরাপত্তার জন্য জিযিয়া কর প্রদান করতো। তাদের কোন প্রতিরক্ষায় বা সামরিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে হতো না। তাই এই কর্তব্য হতে অব্যাহতি ও নিরাপত্তা পাবার জন্য তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করা হয়। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, উন্মাদ, ধর্মপরয়াণগণ এই কর হতে মুক্ত ছিলেন। উচ্চবিত্তের জন্য বাৎসরিক ৪ দিনার মধ্যবিত্তের জন্য ২ দিনার ও নিম্নবিত্তদের জন্য ১ দিনার ধার্য করা হয়েছিল।

গানিমাহ

এটি ছিল যুদ্ধ লব্ধ সম্পত্তি। যার ১/৫ (এক পঞ্চমাংশ) ভাগ রাজকোষে জমা হতো। একে বল হত খুম্‌স। বাকি ৪/৫ (চার পঞ্চমাংশ) অংশ সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হতো।

ওশর

মুসলিমগণ তাদের জমি চাষবাস করলে রাষ্ট্রকে ওশর প্রদান করতে হতো। রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত উৎপন্ন শস্যের ১/১০ (এক দশমাংশ) কে আল-ওশর বলা হত। এটি পানি বা সেচ সুবিধাহীন বৃহৎ ভূ-সম্পত্তি হতে আদায় করা হতো।

খারাজ

খারাজ ছিল অমুসলিম কৃষকদের উপর আরোপিত ভূমিসর। দিওয়ানুল খারাজ নামক বিভাগ রাষ্ট্রের খারাজ আদায় করতো। রাষ্ট্র কর্তৃক এর নির্ধারিত পরিমাণ ছিল উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক অথবা ৫০% নগদ অর্থ বা উৎপন্ন শস্যের মাধ্যমে তা আদায় কার হত।

আল ফাই

খলিফাদের শাসনামলে দাবিদারহীন খাস জমি, অনাবাদী ও অরণ্যভূমি এবং বিদ্রোহীদের বাজেয়াপ্ত জমি আল ফাই নামে পরিচিত। এই সব জমি হতে প্রাপ্ত আয়কে বলা হয় আল ফাই রাজস্ব।

উশুর বা বাণিজ্য কর

বিদেশি বণিকগণ মুসলিম রাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্য করলে তাদেরকে ১০% হারে উশুর বা বাণিজ্যকর দিতে হত। মুসলিম বণিকগণ ২.৫ এবং দেশীয় অমুসলিম বণিকগণ ৫% হরে উশুর দিতো।

বায়তুল মাল ও দিওয়ান

খলীফা উমর (রা.) শাসনামলে আরো দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ছিল বায়তুল মাল ও দিওয়ান। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোতে খলীফা বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন। সকল রাষ্ট্রীয় আয় বায়তুল মাল-এ সংগৃহীত হত এবং তা জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হতো। এটি ছিল রাষ্ট্রীয় কোষাগার। খলীফা বায়তুল মাল হতে মাসিক বৃত্তি পেতেন। এর অর্থের উপর তার কোন অধিকার ছিল না।

অপরদিকে রাষ্ট্রের রাজস্বের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য খলীফা দিওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়ের সঠিক হিসাব নিকাশ করাই ছিল এর প্রধান দায়িত্ব। এছাড়া ব্যয়ের উদ্বৃত্ত অর্থ পেনশন বা ভাতা হিসেবে জনগণের মাঝে বন্টন করা হতো। মহানবী (সা.) এর নিকট আত্মীয়, ইসলামের খিদমত ও সমতার ভিত্তিতে ভাতার পরিমাণ নির্ধারিত হতো।

সামরিক শাসনব্যবস্থা

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময়ে কোন সুনির্দিষ্ট সামরিক বাহিনী ছিল না। যুদ্ধের সময় মহানবীর (সা.) এর আহবানে সকলে অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু খুলাফায়েরাশেদীনের সময়ে একটি স্থায়ী সামরিক বাহিনী তৈরি করা হয়। খলীফা উমর (রা.) এর প্রবর্তন করেন। বর্শা, ঢাল, তলোয়ার ইত্যাদি ছিল সামরিক বাহিনীর অস্ত্র। সামরিক অফিসারগণ যোগ্য পারিশ্রমিস পেতেন, তাদেরকে রাষ্ট্র হতে ভাতাও প্রদান করা হতো।

সামরিক সদস্যগণ মূলত ৫ ভাগে বিভক্ত হয়ে (যথা: অগ্র, পশ্চাৎ, মধ্যভাগ, ডান বাহু ও বাম বাহু যুদ্ধ) পরিচালনা করতেন। খিলাফত ৯ টি জুনদ বা সামরিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। সাধারণত দশমিক পদ্ধতিতে- আরিফ, কায়েদ ও আমীর ইত্যাদি ভাগে দিওয়ান-আল-জুন্‌দ বা সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করা হতো।

বিচার বিভাগ

খলিফাই ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারক। এছাড়াও কেন্দ্রে ছিলেন একজন প্রধান বিচারপতি বা কাজী-উল-কুজ্জাত। তিনি নিরপেক্ষ ও আদর্শ বিচারক হতেন। প্রাদেশিক কাজীদের তিনিই নিয়োগ করতেন। কাজী কুরআন হাদীস অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

নৌ-বিভাগ

আরব উপদ্বীপের ৩ দিকেই ছিল সমুদ্র। প্রথম দুই খলীফার সময় পর্যন্ত আরব- নৌবাহিনী গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়নি। ৩য় খলীফা হযরত উসমান সর্বপ্রথম নৌ-বাহিনী গঠন করেন। আব্দুল্লাহ বিন কায়েস ছিলেন প্রধম আরব নৌ-অধ্যক্ষ। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে ৫০ টি নৌ-অভিযান পরিচালনা করেন। এই সময় হতে লোহিত সাগর, ভূ-মধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগরে আরব নৌবাহিনীর প্রাধান্য সৃষ্টি হতে থাকে।

পুলিশ বাহিনী

খলীফা হযরত উমর (রা.) পুলিশ বিভাগ বা শুরতা প্রবর্তন করেন। সাহিব আল শুরতা ছিলেন এই বিভাগের প্রধান। পুলিশ বাহিনী রাত্রিকালে পাহারা দিতেন ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন।

জনহিতকর কার্যাবলি

খলিফাগণ প্রজাদের জনকল্যাণের জন্য কৃষির উন্নতি সাধন করেন। এই উদ্দেশ্যে বহু খাল খনন করেন, জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। আমর ইবন আল-আস মিসরে সুয়েজ খাল খনন করেন। অনাবাদী জমিকে চাষের উপযোগী করে তোলেন। এছাড়াও খলীফাগণ রাষ্ট্রীয় ভবন, মসজিদ, দফতরখানা, কারাগার, সরাইখানা, পরিবহন, সড়ক ইত্যাদি নির্মাণ করেন।

ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা

খলিফাগণ ছিলেন প্রধান ধর্মীয় নেতা। তাঁরা কুরআন ও হাদীস শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষক নিয়োগ ও বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রেরণ করতেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা

সাধারণত মসজিদই ছিল প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। খলীফাদের শাসনামলে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হতো। এই সময়ে বস্‌রা ও কুফা মুসলিমদের প্রধান শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়।

জিম্মী

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম প্রজাদের নিরাপত্তা দেওয়া হতো। তারা নিজ নিজ ধর্ম পালনে স্বাধীন ছিল। তারা সকল প্রকার মৌলিক অধিকার ভোগ করতো। রাষ্ট্র কেবল সামর্থ্যবান যিম্মীদের কাছ হতে জিযিয়া কর গ্রহণ করতো। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে যিম্মীগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতো।

সামাজিক জীবন

খুলাফায়েরাশেদীনের যুগে সামাজিক জীবন ছিল অত্যন্ত শৃংখল। খলিফাগণ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। সমাজে কোন সামাজিক স্তর বা শ্রেণি ভেদাভেদ ছিল না।সমাজে নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নারীরা সমাজের পুরুষের সম-মর্যাদার অধিকারী হন। তারা স্বামী ও পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়। সমাজে দাসদের প্রতি সুবচিার করা হতো ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা হতো। দাসদের অনেকেই উচ্চ পদে আসীন হতে পারতো।

সারসংক্ষেপঃ

প্রায় দুই যুগের অধিক (৬৩২-৬৬১) খ্রিঃ সময় ধরে খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসন বজায় ছিল। মূলত ২য় খলীফা হযরত উমর (রা.) ছিলেন এই ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রকৃত সংগঠক। তার শাসনকাঠামোই পরবর্তী খলিফাগণ অনুসরণ করে গেছেন। এই শাসনব্যবস্থা ছিল স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক জনগণের ইচ্ছা ও মতামত এই শাসন ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হতো। কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক, সামরিক, বিচার, শিক্ষা, অর্থ-রাজস্ব, সকল দিক থেকে এই শাসন ব্যবস্থা ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনব্যবস্থা। যা ছিল পরবর্তী উমাইয়া ও আব্বাসীয় এবং সমগ্র বিশ্বের শাসকদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খুলাফায়ে রাশিদীনের চার খলীফার শাসনকাল কত বছর ছিল ?

ক) ৪০ বছর খ) ৩০ বছর গ) ২০ বছর ঘ) ৬০ বছর

২. খলিফাগণ সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন কেন ?

ক) অতিরিক্ত কর আদায়ের জন্য খ) জনসংখ্যার হিসাবের জন্য

গ) শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ঘ) কোনটিই নয়

৩. খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে নিম্নলিখিত উৎস হতে রাজস্ব আদায় করা হত-

i) যাকাত ii) জিযিয়া iii) আল ফাই

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i, ii খ) ii, iii গ) i, iii ঘ) i, iii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

মানব সভ্যতার ইতিহাসে 'ক' এর শাসনামল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই শাসনব্যবস্থা ছিল স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক। কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক, সামরিক, বিচার, শিক্ষা, অর্থ-রাজস্ব সকল দিক থেকে এই শাসন ব্যবস্থা ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনব্যবস্থা যা পরবর্তী সকল শাসকের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

ক) খুলাফায়ে রাশিদীনের সদস্য কারা? ১

খ) মজলিশ-আল-শূরা বলতে কী বুঝ? ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসন ব্যবস্থার প্রাদেশিক শাসন পদ্ধতি আলোচনা করুন। ৩

ঘ) খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে রাজস্ব আদায়ের উৎসগুলো আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ :	১. (গ)	২. (গ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ :	১. (ঘ)	২. (গ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ :	১. (ঘ)	২. (গ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ :	১. (গ)	২. (ক)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ :	১. (গ)	২. (ক)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ :	১. (ঘ)	২. (খ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭ :	১. (ঘ)	২. (ক)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৮ :	১. (গ)	২. (ক)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৯ :	১. (খ)	২. (খ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১০ :	১. (গ)	২. (ক)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১১ :	১. (ক)	২. (খ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১২ :	১. (ক)	২. (গ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৩ :	১. (খ)	২. (ঘ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৪ :	১. (খ)	২. (গ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৫ :	১. (খ)	২. (ক)	৩. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৬ :	১. (খ)	২. (গ)	৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৭ :	১. (ক)	২. (গ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৮ :	১. (খ)	২. (গ)	৩. (ঘ)

ইউনিট
৭

উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০ খ্রি.)

ভূমিকা

খুলাফায়ে রাশিদীনের পতনের পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ৬৬১ খ্রিস্টব্দে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন তা 'উমাইয়া খিলাফত' নামে পরিচিত। এই বংশটি ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই বংশে মোট ১৪ জন খলীফা ছিলেন। এই বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)। সিরিয়ার দামেস্কে ছিল তার রাজধানী। উমাইয়া বংশ কুরাইশ গোত্রের একটি শাখা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পঞ্চম উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন আবদে মানাফ। আবদে মানাফের ৬ পুত্রের মধ্যে হাশিম, মুত্তালিব ও আবদে শামস ছিলেন সহোদর ভাই। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন হাশিমের বংশধর। আর আবদে শামসের এক পুত্রের নাম ছিল উমাইয়া। উমাইয়ার সন্তানরাই উমাইয়া বা বনী উমাইয়া বলে পরিচিতি লাভ করে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এই ইউনিটে উমাইয়া আমলের খলিফাদের ক্ষমতায় আরোহণ, তাঁদের চরিত্র, কৃতিত্ব ও আনীত সংস্কারসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা
পাঠ-৭.২ : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ-৭.৩ : ইয়াযিদ : কারবালার ঘটনা ও ফলাফল
পাঠ-৭.৪ : আব্দুল মালিকের রাজ্যবিস্তার ও সংস্কার সমূহ
পাঠ-৭.৫ : আল-ওয়ালিদের রাজ্য বিস্তার ও কৃতিত্ব
পাঠ-৭.৬ : উমর ইবনে আব্দুল আযীযের শাসননীতি, সংস্কার ও কৃতিত্ব
পাঠ-৭.৭ : হিশামের শাসন ব্যবস্থা
পাঠ-৭.৮ : উমাইয়া আমলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা
পাঠ-৭.৯ : উমাইয়া খিলাফতের পতন

পাঠ-৭.১ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুয়াবিয়া (রা.) এর পরিচয় ও বংশ সম্পর্কে জানবেন ।
- হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর প্রথমিক জীবন সম্পর্কে জানবেন।
- উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ওহী লেখক, হিমারীয় ও মুদারীয়, খারিজী, ইফ্রিকিয়া ও আল-মাগরিব**

পরিচয় ও ইসলাম গ্রহণ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন পবিত্র কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের একজন আবু সুফিয়ান। তাঁর মাতা ছিলেন আবু জেহেলের কন্যা হিন্দা। ইসলামের প্রাথমিস যুগে হযরত মুয়াবিয়া ও তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন ইসলামের ঘোরতর শত্রু। কিন্তু ৮ম হজরীতে (৬৩০ খ্রি:) রাসূল (সা.) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের পর মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর পিতা-মাতা ইসলাম কবুল করেন। এই সময়ে তার বয়স ছিল ২৪ বছর। ইসলাম কবুলের পর তিনি নিজেকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেন। রাসূল (সা.) এর একজন বিশিষ্ট সাহাবায় পরিণত হন।

ওয়াহী লেখক : ইসলাম কবুলের পর রাসূল (সা.) মুয়াবিয়া (রা.) কে তাঁর ব্যক্তিগত ওয়াহী লেখক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি এই কাজে রাসূল (সা.) এর প্রশংসা লাভ করেছিলেন। রাসূল (সা.) তার ভগ্নি উম্মে হাবীবাকে বিবাহ করেন। এই সূত্রে তিনি রাসূল (সা.) এর নিকট আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হন। বাল্যকাল হতেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন জ্ঞানী, সুবিবেচক ও ধৈর্যের অধিকারী। মহানবী (সা.) একদা তাকে লক্ষ করে বলেছিলেন যে, "তুমি রাজ্য লাভ করলে জনসাধারণের মঙ্গল সাধন করো"।

সিরিয়ার শাসনকর্তা : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর রাজনৈতিক জীবনের শুভ সূচনা ঘটে ২য় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে রোমান সাম্রাজ্যের অংশ সিরিয়া বিজয় সম্পন্ন হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সিরিয়া অভিযানে তার যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তেমন দূরদর্শী ছিলেন না। কিন্তু শাসনক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি। খলীফা উমর (রা.) তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরুপ তাকে ৬৩৮ খ্রি: সিরিয়ার শাসনকর্তারুপে নিযুক্ত করেন। তাঁর শাসনকেন্দ্রের রাজধানী ছিল দামেস্ক। ধীরে ধীরে সমগ্র সিরিয়া তাঁর অধীনে চলে আসে। খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতকালে তাকে সমগ্র সিরিয়ার গভর্ণররুপে নিয়োগ করা হয় এবং তিনি সিরিয়ার রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেন।

নৌবাহিনী গঠন : খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর শাসনামলে সিরিয়ার গভর্ণর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর নেতৃত্বে প্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গঠিত হয়। এই নৌবাহিনীর সাহায্যে ভূ-মধ্যসাগরীয় কতিপয় দ্বীপ-সাইপ্রাস, ক্রীট, মেজর্কা, মাইনর্কা ইত্যাদি মুসলিমদের অধীনস্ত হয়েছিল। তাই মুসলিম নৌশক্তি গঠনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর কৃতিত্ব ছিল সর্বাগ্রে।

হযরত আলী (রা.) এর সাথে দ্বন্দ্ব :সিরিয়ায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ধীরে ধীরে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি সিরিয়াবাসীর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাদের সমর্থন লাভে সফল হন। তাই চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) তাঁকে পদচ্যুত করতে গিয়ে সমস্যা ও বাঁধার সম্মুখীন হন। এই সময়ে হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং এই হত্যার বিচারকে কেন্দ্র করে হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এই দ্বন্দ্বের ফলাফল স্বরুপ খলীফা আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু কূটনৈতিক

জ্ঞানসম্পন্ন মুয়াবিয়া দুমার সালিশের মাধ্যমে সমগ্র সিরিয়া ও মিসরে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। খলীফা হযরত আলী (রা.) এর শাহাদাতের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ্যপুত্র ইমাম হাসান (রা.) এর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে মুয়াবিয়া (রা.) ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করেন। এই প্রসংগে P.K. Hitti বলেন, æ Muawiyah was proclaimed Caliph at Iliya (Jerusalem) in A.H. 40 (660)."

রাজধানী স্থায়ীকরণ : মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ এবং অভিজ্ঞ প্রশাসক। খিলাফতে আসীন হয়েই তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী কুফা হতে দামেস্কে স্থানান্তরিত করেন। উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী হিসেবে দামেস্ক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল।

খারিজী বিদ্রোহ দমন : রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সাম্রজ্যের ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। হযরত উসমান (রা.) এর সময়কাল থেকেই সাম্রাজ্যে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। হযরত আলী (রা.) এর সমগ্র শাসনামলে তা অব্যাহত থাকে। এই সময় উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে খারিজী বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারিজীগণ হযরত আলী (রা.) এর নিকট পরাজিত হলেও, অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা আবার সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করে। খারিজীগণ কালদীয়া দখল করে ইরাকে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করলে মুয়াবিয়া (রা.) কঠোর হস্তে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন।

হিমারীয় ও মুদারীয় দ্বন্দ্ব : প্রাচীন আরবের অধিবাসিগণ প্রধান দুটি বংশে বিভক্ত ছিল- যথাক্রমে মুদার বংশ এবং হিমার বংশ। হিমারীয়রা ছিল দক্ষিণ আরবের ইয়েমেনের অধিবাসী। অপরদিকে মুদারীয়রা ছিল উত্তর আরবের হেজাযের অধিবাসী। কাহতানগণ তাদের নৃপতি আব্দুস শামসের পুত্র হিমারের নামানুসারে নিজেদের 'হিমারীয়' হিসেবে পরিচিত করে। তারা ইয়েমেনী হিসেবেও পরিচিত লাভ করে। উত্তর আরবের অধিবাসীগণ ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) এর বংশধর। সাদের পৌত্র মুদার হতে তাদের 'মুদারীয়' নামে চিহ্নিত করা হয়। দক্ষিণ আরবের হিমারীয়রা ছিল সুসভ্য এবং মুদারীয়রা ছিল যাযাবর এবং তাদের জীবনযাত্রার মান ছিল নিম্নমানের। এর ফলে রাসূল (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্ব হতেই তাদের মধ্যে ব্যাপক দ্বন্দ্ব সংঘাত বিরাজমান ছিল। পরবর্তীতে ইসলামের আর্বিভাবের ফলে তাদের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। উমাইয়া খলীফা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তার রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যকার এই দ্বন্দ্বকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

যোগ্য প্রশাসকদের নিয়োগ : মুয়াবিয়া (রা.) এর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া ও রাজবংশ প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে ছিল কতিপয় যোগ্য ব্যক্তিদের সমর্থন ও সহযোগিতা। যথা-

আমর ইবন আল-আস : ইসলামের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক আমর ইবনে আল আস ছিলেন মুয়াবিয়া (রা.) এর অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা ও প্রত্যক্ষ সহযোগী। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে মুয়াবিয়া তাকে মিসরের শাসনকর্তারুপে নিয়োগ করেন।

আল মুগিরা : আল মুগিরাকে মুয়াবিয়া (রা.) কুফার শাসনকর্তা রুপে নিয়োজিত করেন। আল মুগিরার পরামর্শেই মুয়াবিয়া (রা.) তদ্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন।

যিয়াদ : যিয়াদ সম্পর্কে ছিল মুয়াবিয়ার সৎ ভাই। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি ব্যাপক বীরত্বের পরিচয় দেন। মুয়াবিয়া (রা.) তাকে বস্রার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। এই প্রসংগে ঐতিহাসিক P.K Hitti বলেন, æThese three with their chief Muawiyah, constituted the four political geniuses (*duhat*) of the Arab Moslems.

সামরিক অভিযান সমূহ : অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার পর মুয়াবিয়া (রা.) সাম্রাজ্য বিস্তারে মনযোগ দেন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তৃত করেন। তাঁর সময়ে অভিজ্ঞ সেনাপতিদের বিজয় অভিযানের ঘটনা ঘটে।

পূর্বাঞ্চল বিজয় : পূর্বাঞ্চলের সেনাপতি ছিলেন মুয়াবিয়া (রা.) এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যিয়াদ। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র উবায়দুল্লা পূর্বাঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হন। এই সময় সীমান্তবর্তী উপজাতিরা বিদ্রোহ সৃষ্টি করলে তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন।

গজনী, কাবুল, কান্দাহার, বুখারা দখল : ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিরাতে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা কঠোর হস্তে দমন করা হয়। এর কিছুদিন পর গজনী, কাবুল, কান্দাহার উমাইয়াদের পদানত হয়। ৬৭৪ খ্রি: বুখারা ও ৬৭৬ খ্রি: সমরখন্দ ও তিরমিজ অধিকারে আসে। সেনাপতি মুহাল্লাব ৬৬৫ খ্রি: সিন্ধু নদ পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন। তবে এটি ব্যর্থ হয়।

পশ্চিমাঞ্চল বিজয় :

উত্তর আফ্রিকা অভিযান : মরক্কো ও আলজেরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে 'আল-মাগরিব (পশ্চিম)' নামে ডাকা হত। হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে সর্বপ্রথম উত্তর আফ্রিকায় অভিযান প্রেরিত হয়। রোমান সম্রাটের আধিপত্য তখন এই অঞ্চলে সর্বত্র বিরাজমান ছিল। হযরত উসমান ও আলী (রা.) এর খিলাফতের বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করে রোমান সম্রাট পুনরায় বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নেয় এবং এই অঞ্চলের বার্বার অধিবাসীদের উপর ব্যাপক অত্যাচার শুরু করে। মিসরের শাসনকর্তা আমর ইবন আল আসের মাধ্যমে অবহিত হয়ে মুয়াবিয়া (রা.) ১০,০০০ সৈন্যসহ ওকবা বিন নাফিকে ৬৭০ খ্রি: উত্তর আফ্রিকার অভিযানে প্রেরণ করেন। ওকবা রোমান বাহিনীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সক্ষম হন। এই অঞ্চল উমাইয়া খিলাফতের অধীনস্থ হয়।

কায়রোয়ান প্রতিষ্ঠা : ৬৭০ খ্রি: ওকবা কায়রোয়ান নামে একটি প্রসিদ্ধ শহর প্রতিষ্ঠা করেন। এটি উত্তর আফ্রিকার রাজধানীতে পরিণত হয়। তিনি এখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ওকবা আরো পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং একের পর এক শহরে বন্দর জয় করেন। তাঁর বিজয়াভিযান সুদূর আটলান্টিক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মুয়াবিয়া (রা.) ওকবাকে তার বিজিত অঞ্চলগুলোর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন কিন্তু তার আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি এই অঞ্চলে মুসলিম শাসন সুসংহত করে যেতে পারেননি। ওকবার বীরত্ব ও কৃতিত্বের কথা স্মরণ করেই ঐতিহাসিকগণ তাকে আরব আলেকজেন্ডার (Alexander of the Arabs) উপাধিতে ভূষিত করেন।

কনস্টান্টিনোপলে নৌ-অভিযান : মুয়াবিয়া (রা.) মুসলিম নৌ-বাহিনী গঠনে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের দাবিদার। সিরিয়ার গভর্ণর থাকা অবস্থায় তিনি নৌ-বাহিনী গঠন করেন এবং ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপ সিসিলি, রোডস, ক্রীট ইত্যাদি দখল করেন। আরব নৌ–অধ্যক্ষ (admiral) আব্দুল্লাহ বিন-কায়েস এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। মুয়াবিয়া (রা.) সিরিয়ার উপকূল রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আর্মেনিয়া দখল : ৬৬২ খ্রি: আর্মেনিয়ার রোমানদেরকে পরাজিত করে আর্মেনিয়া দখল করেন এবং আকব নামক স্থানে একটি পোতাশ্রয় স্থাপন করেন। ৬৬৯ খ্রি: এই পোতাশ্রয় হতে মুয়াবিয়া বাইজানটাইন শক্তির রাজধানী কনস্টানিটনোপলে নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ কিন্তু বেশ কিছুদিন কনস্টান্টিনোপল অবরোধ রাখার পর মহামারী, খাদ্যাভাব, বিশৃঙ্খলা ও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে অভিযানটি ব্যর্থ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, রোমানদের বিরুদ্ধে ভূ-মধ্যসাগরে টিকে থাকার জন্য মুয়াবিয়া ৫০০ রণতরী নিয়ে এক বিশাল নৌ-বহর গঠন করেন। এর ফলেই ভূ-মধ্যসাগরে মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শাসন ব্যবস্থা : মুয়াবিয়া একজন দক্ষ প্রশাসক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন। তিনি তার শাসন প্রণালীতে বাইজানটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের রীতি প্রবর্তন করেন।

ডাক বিভাগ : মুসলিম প্রশাসকদের মধ্যে মুয়াবিয়া সর্বপ্রথম ডাক বিভাগ চালু করেন। সরকারী ও বেসরকারী তথ্য ও সংবাদ ইত্যাদি আদান প্রদানের জন্য তিনি তার সমগ্র রাজ্যে ১২ মাইল অন্তর একটি ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিভাগকে বলা হত 'দিওয়ান আল-বারিদ' (ডাক বিভাগ) এবং এর প্রধান পরিচালককে বলা হত সাহিব-আল-বারিদ। এই বিভাগ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতো।

দিওয়ান আল খাতাম : দিওয়ান আল-খাতাম ছিল সাম্রাজ্যের রেজিস্ট্রি বা নিবন্ধন বিভাগ। খলীফা কর্তৃক ঘোষিত প্রত্যেকটি বিধান এই বিভাগে রেজিস্ট্রি করা হতো এবং পরবর্তীতে তা সিল প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হতো।

রাজস্ব সংস্কার : মুয়াবিয়া অর্থনৈতিক বিভাগকে একটি স্বকীয়রূপ দান করেন। মুয়াবিয়া (রা.) রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সাহিব আল-খারায নামক একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তার হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি স্বয়ং খলীফা কর্তৃক এই বিভাগে নিয়োগ প্রাপ্ত

হতেন। খলীফা উমর (রা.) এর নীতি অনুসারে যে বার্ষিক নির্ধারিত পরিমান ভাতা মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করা হতো তা তিনি দরিদ্র কর (যাকাত) হিসেবে কেটে রাখতেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রশাসনিক সচিবালয় : শাসনকার্যে সুবিধার জন্য মুয়াবিয়া (রা.) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে সচিবালয় স্থাপন করেন। কেন্দ্রে আরবী ভাষার প্রাধান্য ছিল এবং প্রদেশেগুলোতে নিজস্ব ও স্থানীয় ভাষার প্রচলন ছিল। এর ফলে যাবতীয় সরকারী দলিলপত্র, সংরক্ষণ ও সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়।

নৌ-বাহিনী প্রতিষ্ঠা : মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন মুসলিম নৌ-বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সময় হতেই মুসলমানগণ নৌ অভিযানে পারদর্শী হয়ে ওঠে। এছাড়া হযরত উমর (রা.) এর সময়ে প্রবর্তিত প্রশাসনের অন্যান্য শাখা যেমন- দিওয়ান আল-জুনদ (সামরিক বিভাগ), দিওয়ান আল-কাজা (বিচার বিভাগ), দিওয়ান আল-রাসায়িল ইত্যাদি বিভাগ তিনি পুন:প্রবর্তন ও বহাল রাখেন।

ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন : কুফার শাসনকর্তা ও মুয়াবিয়া (রা.) এর অন্যতম উপদেষ্টা আল-মুগীরার পরামর্শে মুয়াবিয়া তার পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। তার এই দৃষ্টান্ত পরবর্তী উমাইয়া খলীফা ও আব্বাসীয় খলীফাগণ অনুসরণ করেন। এইভাবে মুয়াবিয়া (রা.) ইসলামের ইতিহাসে রাজতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটান এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ইতি টানেন।

সারসংক্ষেপ:

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া (রা.) ইসলামের ইতিহাসে একজন দক্ষ ও দূরদর্শী নৃপতি হিসেবে পরিচিত। তিনিই প্রথম ইসলামে রাজতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটান এবং মনোনয়ন ভিত্তিক উত্তরাধিকারী নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করেন। তিনি অপর পক্ষে মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করেন। তাঁর সময়ে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা মুসলিমদের পদানত হয়। তিনি প্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসন বিভাগ দিওয়ান আল বারিদ, দিওয়ান আল খাতাম ইত্যাদি বিভাগ চালু করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম নৌ-বাহিনীর রূপকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী কোথায় স্থাপিত হয় ?

ক) কুফা খ) দামেস্ক গ) বসরা ঘ) ইয়েমেন

২. মুয়াবিয়া (রা.) কে 'প্রথম রাজা' বলা হয় । কারণ -

ক) তিনি এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন খ) তাকে জনগণ এই উপাধি দিয়েছিল

গ) রাজপ্রসাদে বসবাস করতেন বলে ঘ) ইসলামে প্রথম রাজতান্ত্রিক শাসন চালু করেন

৩. মুয়াবিয়া (রা.) এর শাসন সংস্কারগুলো হলো-

i) ডাকঘর প্রতিষ্ঠা ii) সচিবালয় স্থাপন iii) নৌ-বাহিনী প্রতিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, ii খ) i, iii গ) ii, iii ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

মহানবী (সা.) এর সাহাবীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মসজিদের ইমাম সাহেব হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কথা উল্লেখ করলেন। তিনি চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) এর পর নতুন খিলাফত চালু করেন। তিনি রাজ্য বিস্তারে খুব মনোযোগী ছিলেন। তিনি প্রশাসনকি সংস্কার সাধন করেন এবং রাজতান্ত্রিক শাসনের সূচনা করেন।

ক) মুয়াবিয়া (রা.) কত খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত চালু করেন? ১

খ) মুয়াবিয়া (রা.) কে প্রথম রাজা বলা হয় কেন ? ২

গ) উদ্দীপকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখুন। ৩

ঘ) "তিনি রাজ্য বিস্তারে খুব মনোযোগী ছিলেন " কথাটি ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৭.২ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুয়াবিয়ার (রা.)-এর চারিত্রিক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- মুয়াবিয়ার (রা.)-এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- শাসক ও মানুষ হিসেবে মুয়াবিয়া (রা.) কে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র, সভাকবি ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা**

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রায় ৭২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হযরত আলী (রা.) এর সাথে খিলাফতের দ্বন্দ্ব, রাজতন্ত্রের সূচনা, দামেস্কে রাজধানী স্থাপন ইত্যাদি সমালোচানা মূলক কর্মকাণ্ডের পরও তিনি সাম্রাজ্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন যা প্রশংসার দাবিদার। তিনি সামান্য অবস্থা হতে নিজ যোগ্যতা ও কর্মগুণে একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি তার খিলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যকে বর্ধিত করেন এবং বহি:শত্রুর হাত থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনিই রাষ্ট্রকে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামোর উপর দাঁড় করান। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও একজন শ্রেষ্ঠ আরব নৃপতি। P.K Hitti বলেন, æHe was not only the first but also one of the best of Arab kings."

মানুষ হিসেবে মুয়াবিয়া (রা.)

মুয়াবিয়া (রা.) গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও স্থুলকায় ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। তিনি জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। দেহরক্ষী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। মজলিস আল শূরার প্রয়োজন অনুভব করতেন না বরং সকল সমস্যা তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সমাধা করতেন। তিনি জুমুআর জামাআতে ইমামতি করতেন। তিনি মার্জিত রুচি ও সংযত চরিত্রের মানুষ ছিলেন।

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মানুষ। তিনি জনগণের উপর দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। এজন্য তিনি ব্যাপক বুদ্ধিমত্তা ও কূটনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দেন।

উচ্চাভিলাষী

মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন উচ্চাভিলাষী একজন ব্যক্তি। খিলাফত লাভ ও ক্ষমতা গ্রহণের প্রতি তাঁর উচ্চাভিলাষ কাজ করেছিল। এই উচ্চাভিলাষের ফলাফল স্বরুপ খলীফা হযরত আলী (রা.) সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব বাধে এবং হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর তিনি উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

দক্ষ ও কৌশলী

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন একজন দক্ষ ও কৌশলী রাজনীতিবিদ। তিনি শঠতা ও ধূর্ততা এবং নম্র ব্যবহারের দ্বারা শত্রুর সন্দেহ দূর করে স্বপক্ষে আনতে পারতেন। কৌশল ও ধৈর্যের সাহায্যে তিনি পরিস্থিতিকে নিজের আয়ত্বে আনতে পারতেন। শান্তিপূর্ণ উপায় যদি ব্যর্থ হত তাহলে তিনি উক্ত ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করতেন।

অমুসলিমদের প্রতি মনোভাব

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে গুণের কদর করতেন। অমুসলিমদের প্রতি তার মনোভাবে ছিল উদার প্রকৃতির। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে তিনি অমুসলিমদের নিয়োগ করতেন। একজন খ্রিস্টান ছিলেন তার প্রধান উপদেষ্টা। তিনি ইবনে আসল নামক একজন খ্রিস্টান চিকিৎসককে তার দরবারে আমন্ত্রণ জানান। আল-আখতাল নামে তার একজন খ্রিস্টান সভাকবি ছিল।

শাসক হিসেবে মুয়াবিয়া (রা.):

সুশাসক : মুয়াবিয়া (রা.) দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবদি, বিচক্ষণ কূটনীতিবদি এবং সুশাসক হিসেবে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সময়ে

প্রজারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতেন। তিনি অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে কঠোরতা ও দুর্বলের প্রতি সহনীয় আচরণ করতেন। একজন সুশাসকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

কূটনীতিবিদ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন একজন সফল কূটনীতিবিদ। তিনি ক্ষমতারোহণ, রাষ্ট্র পরিচালনা ও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

রাজতন্ত্রের জনক

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইসলামের মৌলিক আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে রাজতন্ত্রের সূচনা করেন। তিনি প্রথম বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। আর উমাইয়া খিলাফতের শাসনকাল ছিল ৯০ বছর।

সমরনেতা

ইসলামে সম্প্রসারণে মুয়াবিয়া (রা.) এর ভূমিসা অগ্রগণ্য। তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা থাকা অবস্থায় বিশাল সেনাবাহিনী ও নৌ-বহর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উত্তর আফ্রিকা ও ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপসমূহে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
তিনি মজলিস আল শূরার অস্তিত্ব বাতিল করেন এবং মনোনয়নভিত্তিক উত্তরাধিকারী ব্যবস্থার প্রচলন ঘটান। এই কারণে তাঁকে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (Founder of a dynasty) বলে অভিহিত করা হয়।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন একজন প্রতিভাবান ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি ও সুশাসক। তাঁর রাজত্বকালে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকে, অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র সম্প্রসারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মুয়াবিয়া (রা.) কত খ্রিস্টাব্দের জন্মগ্রহণ করেন?

ক) ৬৮০ খ্রিঃ খ) ৫৭০ খ্রিঃ গ) ৬৬৪ খ্রিঃ ঘ) ৫৮০ খ্রিঃ

২. মুয়াবিয়া (রা.) এর ক্ষেত্রে কোনটি সত্য ?

ক) রুঢ় স্বভাবের লোক খ) প্রতিভাবান ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন
গ) সাহসী ও ধার্মিক শাসক ঘ) স্বৈরতান্ত্রিক ছিলেন

৩. মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন একজন -

i) সুশাসক ii) সমরনেতা iii) সুদক্ষ রাজনীতিবিদ

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, ii খ) i, iii গ) i, ii, iii ঘ) iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জহির মিয়া বলা চলে জোরপূর্বক ফুলপুর গ্রামে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষকে আকৃষ্ট করার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তার। তিনি গ্রামের উন্নতি সাধন করেন। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশীয় শাসন কায়েম রাখার জন্য মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্র জমিরকে গ্রামের ক্ষমতার ভার দিয়ে যান।

ক) ইসলামে রাজতন্ত্রের সূচনা করেন ? ১

খ) মুয়াবিয়া (রা.) কে রাজতন্ত্রের জনক বলা হয় কেন ? ২

গ) উদ্দীপকে যে খলীফার ঈঙ্গিত রয়েছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ৩

ঘ) মুয়াবিয়া রা. এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৭.৩ ইয়াযিদ : কারবালার ঘটনা ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইয়াযীদের ব্যক্তিগত জীবন ও ক্ষমতায় আরোহন সম্পর্কে জানবেন।
- ইয়াযিদ ও ইমাম হুসাইনের মধ্যকার বিরোধ সম্পর্কে জানবেন।
- কারবালার ঘটনা, এর কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	নিষ্ঠুরতা ও ইন্দ্রীয়পরায়ণ, কালবাইট খ্রিস্টান, সন্ধিচুক্তি, দুরাভিসন্ধি, তামীম গোত্র, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ও শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব

ইয়াযিদ এর প্রাথমিক জীবন :

মুয়াবিয়া (রা.)-এর পুত্র ইয়াযিদ ২৫ বা ২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে। তার মায়ের নাম ছিল মায়সুন, সে একজন কালবাইট খ্রিস্টান ছিলেন। বাল্যকালে মুয়াবিয়া (রা.) ইয়াযীদের শিক্ষার জন্য তাকে গ্রামাঞ্চলে (আল-বাদীয়া) পাঠিয়ে দেন। কারণ গ্রামীণ আরবী ভাষা ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও পরিশীলিত। বাইজানটাইন শক্তির বিরুদ্ধে কনস্টান্টিনোপলের অভিযানে ইয়াযিদ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। কিন্তু নানা কারণে এই অভিযানটি ব্যর্থ হয়।

ইয়াযিদের চরিত্র

ব্যক্তিগত জীবন ইয়াযিদ ছিল অত্যাধিক শারীরিক শক্তিসম্পন্ন । সে বিলাস-ব্যাসনে নিমগ্ন থাকত। তার চরিত্রে দাম্ভিকতা বিদ্যমান ছিল। নিষ্ঠুর ও ইন্দ্রীয়পরায়ণ এই উমাইয়া যুবরাজ শিকারে চরমভাবে আসক্ত ছিলো। ঐতিহাসিক বার্নাড লুইসের মতে, ইয়াযিদ লম্পট ও দুশ্চরিত্রবান হলেও সে কিছু রাজোচিত গুণাবলির অধিকারী ছিলো। সে শিল্প, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করত। ঐতিহাসিক আল-ফাখারী, ভন ক্রেমার ও ইরনুত তিকতার মতে- ইয়াযিদের রাজত্বকাল তিনটি দুষ্কর্মের জন্য কুখ্যাত– ● প্রথম বছর তিনি হুসাইন-বিন-আলীকে হত্যা করেন; ● দ্বিতীয় বছরে মদীনা লুণ্ঠন করেন এবং ● তৃতীয় বছরে কাবা শরীফের উপর হামলা করেন।

কারবালার যুদ্ধের কারণ

১. সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর জেষ্ঠ্য পুত্র ইমাম হাসান (রা.) এর সাথে এই মর্মে চুক্তি হয়েছিল যে, মুয়াবিয়া (রা.)-এর মৃত্যুর পর ইমাম হুসাইন (রা.) খিলাফত গ্রহণ করবেন। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং ৬৮০ খ্রি: ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া দামেস্কের সিংহাসন আরোহণ করে খিলাফত গ্রহণ করেন।

২. ইয়াযিদের ব্যক্তিগত চরিত্র : ইয়াযিদ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন মদ্যপ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, দাম্ভিক এবং শাসক হিসেবে অযোগ্য। অপর দিকে ইমাম হুসাইন (রা.) ছিলেন মহানবী (সা.) এর দৌহিত্র ও শৌর্য-বীর্য ও চারিত্রিক গুণে অনন্য একজন পুরুষ। তাই তাঁর প্রতি মুসলিমদের সমর্থন ছিল ব্যাপক।

৩. রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : ইয়াযীদের মনোনয়ন রাজতন্ত্রের ভিত্তিকে আরো মজবুত করে যা মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক প্রথম স্থাপিত হয়েছিল। এতে করে খুলাফায়ে রাশিদীনের সোনালী যুগের শাসন ব্যবস্থার বিলোপ ঘটে। এর ফলে মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে মক্কা, মদীনা ও কুফার অধিবাসীগণ ইমাম হুসাইনকে সমর্থন জানায় এবং উমাইয়া শাসনের বিরোধিতা করতে শুরু করে।

৪. মদীনার প্রাধান্য হ্রাস : দামেস্কে খিলাফতের রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর থেকে মদীনা তার পূর্বের গৌরব ও গুরুত্ব হারায়। এতে মহানবী (সা.) এর সাহাবা ও তার অনুসারীগণ উমাইয়া খিলাফতের বিরোধিতা শুরু করেন।

৫. ইমাম হুসাইনের ব্যক্তিত্ব ও সরলতা : ইমাম হুসাইন (রা.) ছিলেন ঈমানের শক্তিতে নিষ্ঠাবান। তিনি মদ্যপ, চরিত্রহীন ও দাম্ভিক ইয়াযীদের প্রতি বায়াৎ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। অপরদিকে সরলতার কারণে তিনি ইয়াযিদ ও উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কূট-কৌশলের নিকট পরাস্থ হন।

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এর কর্মকান্ড : আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)ও ইয়াযিদের বিরোধিতা করেন। তিনিও বায়াৎ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি ইমাম হুসাইনকে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে প্ররোচিত করেন। ইমাম হুসাইন (রা.)

ছিলেন ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, সৎ ও খিলাফতের যোগ্য দাবিদার। মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক বলপূর্বক ক্ষমতা দখল এবং ইয়াযিদের মনোনয়ন এবং ক্ষমতায় আরোহণ ইত্যাদিতে ইমাম হুসাইন (রা.) তীব্র প্রতিবাদ করতে শক্তি যোগান। বস্তুত মুয়াবিয়া (রা.) এর পুত্র ইয়াযীদের চেয়ে হযরত হুসাইন (রা.) চরিত্র বলে শতগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই হুসাইন ইবনে আলী (রা.) খিলাফতের ন্যায়-সঙ্গত দাবিদার ছিলেন। তাঁর এই দাবীকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ির (রা.) সমর্থন করেন।

কারবালার ঘটনার প্রেক্ষাপট

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এর দুরাভিসন্ধি : আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ও ইমাম হুসাইন (রা.) মক্কায় চলে আসেন। তাঁরা ইয়াযিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানান। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ির (রা.) নানা ভাবে ইমাম হুসাইন (রা.)কে ইয়াযিদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকেন। মূলত তিনি উভয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজেকে খিলাফতে অধিষ্ঠিত করার উচ্চাভিলাষ পোষণ করতেন বলে মনে করা হয়।। মক্কা ও মদীনার অধিবাসী আলীর সমর্থকগণও ইমাম হুসাইন (রা.) কে তাদের সমর্থন দান করে। তাই একপর্যায়ে ইয়াযিদ ও ইমাম হুসাইন (রা.) এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব তীব্র রূপ লাভ করে।

কুফাবাসীর আমন্ত্রণ : কুফার পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য ইমাম হুসাইন (রা.) তাঁর চাচাত ভাই মুসলিম বিন আকিলকে কুফায় প্রেরণ করেন। মুসলিম কুফাবাসীর সমর্থন দেখে ইমাম হুসাইন (রা.) কে মদীনা ত্যাগ করার পত্র দেন। তার পত্র পেয়ে ইমাম হুসাইন (রা.) সপরিবারে ও অতি অল্প কয়েকজন অনুসারীসহ কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ কর্তৃক মুসলিম নিহত হন এবং কুফাবাসী ইমাম হুসাইন (রা.) এর পক্ষ ত্যাগ করে ইয়াযিদ কে সমর্থন জানায়।

আলহোর ও ওমর কর্তৃক বাধাপ্রাপ্তি : ইমাম হুসাইন(রা.) পথিমধ্যে মুসলিম এর মৃত্যুর সংবাদ পান। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সম্মুখ দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তামীম গোত্রের আল-হোর নামক এক গোত্র প্রধানের কুফার অশ্বারোহী বাহিনী ইমাম হুসাইন (রা.) এর পথ রোধ করে। (১০ সেপ্টেম্বর, ৬৮০) কুফাকে ডানে রেখে ইমাম হুসাইন (রা.) তাঁর ক্ষুদ্র কাফেলাটিকে নিয়ে কুফা হতে ২৫ মাইল উত্তরে ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালার নামক প্রান্তরে এসে উপস্থিত হন। উমর ইবনে সাদ, উবায়দুল্লার সেনাপতি ৪০০০ সৈন্য নিয়ে তাঁর পথে বাধা দেন।

হুসাইন (রা.) এর **সন্ধি প্রস্তাব :** ওমর হুসাইন (রা.)-কে অবিলম্বে ইয়াযিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে আদেশ দিলে ইমাম হুসাইন (রা.) তা প্রত্যাখ্যান করলেন। পরিণামে ইমাম হুসাইন (রা.)-কে সপরিবারে কারবালায় অবরুদ্ধ করে রাখা হল। তাদের পানি সংগ্রহের পথে কড়া পাহাড়া বসানো হল। হুসাইন (রা.) এর শিবিরে পানির জন্য হাহাকার দেখা গেল। এই অবস্থায় হুসাইন (রা.) উবায়দুল্লার কাছে ৩টি শান্তি প্রস্তাব পেশ করার আর্জি জানালেন। সেগুলো হল :

- তাকে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক; ● *অথবা*, তুর্কী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক;
- অথবা, ইয়াযিদের সাথে আলোচনার জন্য দামেস্কে প্রেরণ করা হোক;

কিন্তু তার এই অনুরোধ কোনভাবেই গ্রহণ করা হয়নি।

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা : উবায়দুল্লাহর সৈন্যের হাতে বন্দি হয়ে ইমাম হুসাইন (রা.) তার বন্ধু ও শুভাকাঙ্খীদের পালিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু তারা কেউই তাকে ছেড়ে যেতে রাজি হলো না। অবশেষে ৬৮০ খ্রি: ১০ অক্টোবর মাসে অসহায় তৃষ্ণার্ত নারী শিশুর ক্রন্দনকে তুচ্ছ করে দুটি অসম-দলের মাঝে যুদ্ধ শুরু হলো। ইমাম হুসাইন (রা.) তার ক্ষুদ্র কাফিলা নিয়ে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ ছিলো তাদের চেয়েও সংখ্যায় বহুগুণ বেশি। একে একে সকলেই শাহাদাত বরণ করতে লাগলেন ইমাম হাসান (রা.) এর পুত্র কাসিম, হুসাইন (রা.) এর পুত্র যয়নুল আবিদীন, শিশুপুত্র আসগরসহ পরিবারের সকল পুরুষ সদস্যকে হত্যা করা হলো। অবশেষে শত্রুর মোকাবেলা করতে করতে এক পর্যায়ে ইমাম হুসাইন (রা.) ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে তার তাবুর নিকট বসে পড়লেন। জনৈক মহিলা তার হস্তে এক পেয়ালা পানি তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু পানি পান করার সময় তিনি শিরবিদ্ধ হলেন এবং শেষবারের মতো শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। একসময় অধিক রক্তপাতে জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যুর কোলে শায়িত হলেন। ঘাতক শীমার ইমাম হুসাইনের মস্তক ছিন্ন করলো ও তার দেহ পদদলিত করে বর্বরতা প্রদর্শন করলো। এভাবে ইসলামের ইতিহাসের করুণতম অধ্যায় রচিত হল কারবালার প্রান্তরে। একমাত্র হুসাইনের রুগ্নপুত্র জয়নুল আবেদীন ছাড়া সকলেই শাহাদাত বরণ করলেন।

কারবালা যুদ্ধের ফলাফল

শিয়া সম্প্রদায়ের জন্ম লাভ : কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ড হযরত আলী (রা.) ও ইমাম হুসাইনের সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তারা হযরত আলী ও ফাতেমার বংশধরকে একমাত্র খিলাফতের দাবিদার হিসেবে ঘোষণা করে। তারা ইসলামের মূল ধারা হতে পৃথক মতবাদ সৃষ্টি করে। এভাবে তারা শিয়া সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব : শিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের ফলে পরবর্তীতে শিয়া ও সুন্নী মতবাদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। শিয়ারা সুন্নী মতবাদের বিরুদ্ধে নিজস্ব মত আরোপিত করে।

ইসলামী ঐক্যে ভাঙ্গন : কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ইসলামের ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। গৃহযুদ্ধের পথকে আরো প্রশস্ত করে দেয়।

হাশিমী- উমাইয়া বিরোধ : এই ঘটনা হাশেমী ও উমাইয়া দ্বন্দ্বে ঘৃতাহুতি দান করে। তা পূর্বাপেক্ষা আরো তীব্ররূপ ধারণ করে।

মক্কা-মদীনা ও বসরায় প্রতিক্রিয়া : কারবালার ঘটনা মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে মক্কা ও মদীনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মক্কা ও মদীনাবাসী এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিশোধ দাবি করে। অন্যদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ির (রা.) খিলাফত দাবি করে বসেন।

মক্কা ও মদীনায় আক্রমণ : আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ির (রা.) কে বন্দী করার জন্য ও মদীনাবাসীকে প্রতিরোধ করার জন্য ইয়াযিদ মুসলিম-বিন উকবার নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। মদীনার নিকট হাররা নামক স্থানে ব্যাপক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনার বহু সাহাবী এতে শাহাদাৎ বরণ করেন। দামেস্কের বাহিনী মদীনায় ৩ দিন যাবৎ লুন্ঠন করে অতঃপর মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের কর্তৃক বাঁধার সম্মুখীন হয়। ফলে সিরীয় বাহিনী মক্কা অবরোধ করে। অবরোধকালে তারা পবিত্র কাবাঘরে অগ্নি সংযোগ করে। ইতোমধ্যে ৬৮৩ খ্রি: ২৭ নভেম্বর ইয়াযীদের মৃত্যু হলে সিরীয় বাহিনী দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করে।

সারসংক্ষেপ:

ইমাম হুসাইন ও ইয়াযীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং এর ফলাফলস্বরুপ কারবালার বিষাদময় ঘটনার অবতারণা ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য অশণিসংকেত। এটি ইয়াযিদের রাজত্বকালকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। অপরদিকে মুসলিম বিশ্ব হারিয়েছে ইমাম হুসাইনের (রা.) মতো একজন বীরপুরুষ নেতাকে। এই ঘটনার সুদূপ্রসারী ফলাফলস্বরুপ উমাইয়া বংশের পতন ত্বরান্বিত হয়েছে। শিয়া মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশ এবং সর্বোপরি মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কারবালার যুদ্ধে কে শাহাদাত বরণ করেন?

ক) ইয়াযীদ খ) হুসাইন (রা.) গ) হাসান (রা.) ঘ) যয়নুল আবেদীন

২. ইমাম হুসাইন (রা.) কেন ইয়াজিদরে কাছে শান্তি প্রস্তাব করেন ?

ক) ইয়াযীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য খ) আর্থিক প্রাপ্তির আশায়

গ) খিলাফত লাভের জন্য ঘ) মক্কায় প্রত্যাবর্তনের জন্য

৩. ইয়াযিদ ছিলেন -

i) মদ্যপ ii) সুশাসক রii) দাম্ভিক

নিচের কোনটি সঠিক -

ক) i, ii খ) i, iii গ) i, ii, iii ঘ) ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

প্রতিবছর ১০ই মহররম বিভিন্ন মুসলিম দেশে শোকমিছিল বের হয়। বাংলাদেশের পুরান ঢাকায় হুসনি দালান হতে সবচেয়ে বড় মিছিলটি বের হয়। তারা বিভিন্ন শোকগাঁথা গায় এবং নিজেদের রক্তাক্ত করে। তারা "হায় হোসেন হায় হোসেন" বলে মাতম করে।

ক) কারবালার যুদ্ধ কত সালে হয়? ১

খ) ইয়াজিদ সম্পর্কে লিখুন? ২

গ) উদ্দীপকের মিছিল যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে হয় সে ঘটনার কারণ গুলো লিখুন। ৩

ঘ) কারবালার যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৭.৪ আব্দুল মালিকের রাজ্যবিস্তার ও সংস্কারসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আব্দুল মালিকের পরিচয় জানতে পারবেন।
- আব্দুল মালিকের সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তাঁর শাসননীতি ও সংস্কার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মারওয়ানী শাখা, আরাফাতের যুদ্ধ, 'ময়ূর বাহিনী', রাণী কাহিনা, নোকতা সংযোজন, ফালস (তাম্রমুদ্রা), মাওয়ালী, মুহাফিজখানা ও রাজেন্দ্র**

আব্দুল মালিক ছিলেন উমাইয়া খিলাফতের মারওয়ানী শাখার প্রতিষ্ঠাতা মারওয়ান ইবনে হাকামের পুত্র। তিনি ছিলেন খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর ও **১ম** মুয়াবিয়ার চাচাতো ভাই। আব্দুল মালিক ২৩ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তিনি লালিত পালিত হন।

ক্ষমতায় আরোহণ

ইয়াযিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র ২য় মুয়াবিয়া দামেস্কের খিলাফত গ্রহণ করেন কিন্তু ৩ মাস শাসনের পরই মৃত্যুবরণ করেন। তখন খিলাফতের দায়িত্ব বর্তায় তার ভাই খালিদ এর উপর। কিন্তু খালিদ বয়সে নাবালক ছিলেন। তাই তার স্থলে অভিজ্ঞ ও বয়োজৈষ্ঠ্য মারওয়ান ইবনে হাকাম খিলাফত গ্রহণ করেন। তিনি এই শর্তে সিংহাসন অধিকার করেন যে, খালিদ প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় পৌঁছলে খালিদের পক্ষে সিংহাসন ছেড়ে দিতে হবে। সুচতুর মারওয়ান সিংহাসনে বসেই খালিদের বিধবা মাতাকে বিবাহ করেন এবং তিনি তাঁর চুক্তি ভঙ্গ করে তাঁর নিজ পুত্র আব্দুল মালিককে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনীত করেন। এতে খালিদের মাতা ক্রোধান্বিত হয়ে মারওয়ানকে ঘুমন্ত অবস্থায় বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেন।

অতঃপর ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল মালিক দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর খিলাফতকালকে (৬৮৫-৭০৫) মোটামুটি ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা-

- বিদ্রোহ দমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা
- হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে সামরিক অভিযান ও;
- শাসন ব্যবস্থার সংস্কার ও সুদৃঢ়করণ।

মুখতারের বিদ্রোহ দমন

মুখতার ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী যিনি ইমাম হুসাইনের হত্যার প্রতিশোধকল্পে অনুশোচনাকারীদের দলে (Penitents) যোগ দেন। মুখতার ইরাক, পারস্য ও আরব ভূখণ্ডে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন। ইমাম হুসাইনের হত্যাকারী শীমারসহ ২৮৪ জনকে হত্যা করেন। এই অবস্থায় আব্দুল মালিক উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে মুখতারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। টাইগ্রীস নদীর তীরে জাবের যুদ্ধে উবায়দুল্লাহ নিহত হন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের প্রেরিত সেনাপতি মুহাল্লাব কর্তৃক মুখতার নিহত হন।

আমরের বিদ্রোহ দমন

আমর ইবনে সাঈদ ছিলেন মারওয়ানের চাচাতো ভাই যিনি ২য় মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর দামেস্কের খিলাফত এর দাবিদার ছিলেন। মারওয়ানের মৃত্যুর পর খালিদ বিন-ইয়াযিদ কিংবা আমর ইবনে সাইদের পরিবর্তে যখন মারওয়ানের পুত্র আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন আমর বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কয়েকটি যুদ্ধে আব্দুল মালিক আমরকে পরাজিত করেন কিন্তু ভবিষ্যতে সিংহাসন নিষ্কন্টক রাখার জন্য তিনি আমরকে রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান ও হত্যা করেন।

মুসাবের বিদ্রোহ দমন

মুসাব ছিলেন ইরাকের শাসনকর্তা যিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের অধীনস্থ ছিলেন। মুসহাব মুখতারকে হত্যা করেন। আব্দুল মালিক মুসাবের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। যুদ্ধে স্বীয় দুই পুত্রসহ মুসহাব নিহত হন। এর ফলে ইরাকে আব্দুল মালিকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে হত্যা

আব্দুল মালিকের নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হেজাযের খলীফা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। আরাফাতের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ পরাজিত ও নিহত হন। এর ফলে আব্দুল মালিকের একচ্ছত্র আধিপত্য সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগের পুরোপুরি পরিসমাপ্তি ঘটে।

খারিজী বিদ্রোহ দমন

ইতিমধ্যে কট্টরপন্থী খারিজীগণ শাবীব-ইব্নে-ইয়াযিদের নেতৃত্বে প্রচন্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা কুফা, মসুল ও ইরাকের অন্যান্য অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খারিজীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করেন। অবশেষে সিরিয়া বাহিনীর সাহায্যে তাদের দমন করা সম্ভব হয়।

জানবিলের বিপর্যয়

জানবিল ছিলেন খুজিস্তানের রাজা যিনি কাবুল হতে কান্দাহার পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেন। এটি ছিল উমাইয়া সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার প্রতি হুমকিস্বরুপ। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জানবিলের বিরুদ্ধে 'ময়ূর বাহিনী' নামক একটি সুসজ্জিত সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আল-আসাথ ছিলেন এই বাহিনীর নেতৃত্বে। অভিযানটি সফল হয় এবং হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়।

আসাথের বিদ্রোহ দমন

জানবিলের সাফল্য উদ্বুদ্ধ হয়ে আসাথ উমাইয়া খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইরাক ও ইরানে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তা দমনের জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফ স্বয়ং অভিযানে নেতৃত্ব প্রদান করেন। আব্দুর রহমান-বিন-মুহাম্মদ বিন-আল-আসাথ ৭০৯ খ্রিস্টাব্দে সিজিস্তানে আশ্রয় নেন। তার ময়ূর বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়।

বার্বারদের দমন

উত্তর আফ্রিকা বিজেতা উকবা বিন নাফি ৬৮৩ খ্রি: বার্বার নেতা কুসায়ল কর্তৃক নিহত হলে এই অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং তা স্বাধীন হয়ে যায়। আব্দুল মালিক ৬৯৩ খ্রি: হৃতরাজ্য পুন:দখলের জন্য জুহাইরের নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। জুহাইর গ্রীক ও বার্বার বাহিনীকে পরাজিত ও কুসায়লকে হত্যা করেন। কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র একটা সেনাবাহিনী রেখে, অবশিষ্ট সেনাবাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। বার্বার ও রোমানদের অতর্কিত আক্রমণে সেনাপতি জুহাইর পরাজিত ও নিহত হন। আব্দুল মালিক তাই ক্রুদ্ধ হয়ে ৬৯৮ খ্রি: হাসান বিন নোমানের অধীনে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। নোমান কার্থেজ ও বার্কা দখল করেন। এভাবে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত উমাইয়া আধিপত্য পুনঃস্থাপিত হয়।

কাহিনা বিপর্যয়

কাহিনা নাম্নী এক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন নারীর সংস্পর্শে বার্বারগণ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এক পর্যায়ে বার্বারগণ সেনাপতি নোমানকে পরাজিত করেন। খলীফা আব্দুল মালিক হাসান বিন নোমানের সাহায্যার্থে আরেকটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে বার্বার আফ্রিকান রাণী কাহিনা পরাজিত ও নিহত হয়। প্রায় ১২,০০০ বার্বার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

আব্দুল মালিকের প্রশাসনিক সংস্কার

আব্দুল মালিকের যুগ ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রশাসনিক সংস্কারের একটি সোনালীযুগ। তিনি উমাইয়া শাসনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেন। তার উল্লেখযোগ্য সংস্কারসমূহ হচ্ছে ঃ

সরকারীভাবে অফিসে আরবী ভাষার প্রচলন

ইসলাম তার প্রাথমিক যুগে কেবলমাত্র আরব ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ অপেক্ষা উমাইয়া শাসনামলে ইসলাম তার নিজ ভূখণ্ডে ছাড়িযে আরো বিস্তৃতি লাভ করে। পারস্য, আর্মেনীয়া, খুরাসান, সিরিয়া ও মিসরে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়। এতে করে আরবী ভাষার সাথে আঞ্চলিক ভাষা যেমন- পারসিক, সিরীয়, কপটিক ইত্যাদি ভাষা সরকারি ক্ষেত্রে গোলযোগ ও সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই আব্দুল মালিক এই ভাষা সমস্যার সমাধান ও আরব সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সরকারী ক্ষেত্রে কেবল আরবী ভাষা প্রচলন করেন। সরকারী দলিল চিঠিপত্র ইত্যাদিতে আরবী ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেন।

আরবী বর্ণলিপির উন্নতি সাধন

আরবীকে রাষ্ট্রভাষার ঘোষণার পাশাপাশি তিনি এর উৎকর্ষ বিধানে আত্মনিয়োগ করেন। ইতোপূর্বে আরবী বর্ণমালায় কোন স্বরচিহ্ন অর্থাৎ নুক্তা ছিল না। তাই অনারব মুসলিমগণ কর্তৃক তা পঠনে অসুবিধার সম্মুখীন হতো। ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সহযোগিতায় আব্দুল মালিক আরবি বর্ণমালায় বা লিপিতে নুক্তা সংযোজন করেন। এতে কুরআন সহজে পাঠ করা সম্ভব হয়।

আরবী মুদ্রার প্রচলন

আব্দুল মালিকের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল আরবী মুদ্রার প্রচলন। এ লক্ষে তিনি রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় টাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন। রোমান, পারস্য, হিমারীয় ও বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রার পরিবর্তে তিনি আরবী অক্ষর যুক্ত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), ও ফাল্স্(তাম্রমুদ্রা) প্রচলন করেন। এতে করে অর্থ জাল করার প্রবণতা দূরীভূত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একক মাধ্যমের সৃষ্টি হয়।

ডাক বিভাগের সংস্কার

আব্দুল মালিক কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে প্রাদেশিক সরকারের যোগাযোগ, পত্রাদি ও নির্দেশমালা আদান প্রদানের জন্য ঘোড়ার ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই সকল ঘোড়ার গাড়ি প্রয়োজনে সৈন্যদের যাতায়াতে ব্যবহৃত হয়। ডাক বিভাগের কর্মচারীগণ সম্রাটের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করতেন। প্রদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর তারা ডাকের মাধ্যমে কেন্দ্রে প্রেরণ করতেন।

রাজস্ব সংস্কার

খলীফা আব্দুল মালিকের সময়ে মাওয়ালী বা নও-মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলিম হয়ে তারা খারায বা জিযিয়া কর হতে অব্যাহতি পেতেন এবং যাকাত ব্যতিত আর কোন কর রাষ্ট্রকে প্রদান করতে হত না। অন্যদিকে সেনাবাহিনীতে যোগদানে তারা রাষ্ট্রকর্তৃক ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করতেন। এতে করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাজস্ব ঘাটতি দেখা দেয়। খলীফা আব্দুল মালিকের নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মাওয়ালীদেরকে গ্রামে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন। তাদের উপর পূর্বেকার মতন খারায ও জিযিয়া কর আরোপ করেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও অনুর্বর জমিকে উর্বর করে ফসল ফলানো জন্য তিনি কৃষকদের ৩ বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করেন। এতে করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়।

স্থাপত্য শিল্প

খলীফা আব্দুল মালিক স্থাপত্য শিল্পেও বিশেষ কৃতিত্ব রেখে গেছেন। মহানবী (সা.) যে পাথর খণ্ডের উপর দাড়িয়ে পবিত্র মিরাজে গমন করেন তাকে কেন্দ্র করে এর উপর তিনি আট কোনাবিশিষ্ট "কুব্বাতুস সাখরা" নির্মাণ করেন। এটি Dome of the Rock নামে পরিচিত। যার নির্মাণ ৬৯১ খ্রি: সম্পন্ন হয়। এরই পাশে তিনি 'মসজিদ-উল- আকসা' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি দজলা নদীর তীরে অবস্থিত ওয়াসিত নামক একটি শহর নির্মাণ করেন। দামেস্কে মুহাফিজখানা বা সরকারী দলিল দস্তাবেযখানা (দিওয়ান-আল-রাসায়িল) নির্মাণ করেন।

মৃত্যু ও আল-ওয়ালিদের মনোনয়ণ

২০ বছর গৌরবপূর্ণ রাজত্বের পর ৭০৫ খ্রি: ৬২ বছর বয়সে আব্দুল মালিক মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর জৈষ্ঠ্যপুত্র আল-ওয়ালিদকে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে যান।

চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন

খলীফা আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে নৃশংসতা ও বর্বরতার অভিযোগ থাকলেও তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও নিষ্ঠাবান শাসক। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল ব্যাপক। তিনি উমাইয়া বংশের স্বার্থে নিষ্ঠুর হতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। গৃহযুদ্ধ দমন করে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠাতা ও রাষ্ট্রকে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর কৃতিত্বের জন্য ইতিহাসে তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। তিনি ছিলেন রাজেন্দ্র (Father of the kings) কারণ পরবর্তীতে তাঁর চারপুত্র উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাই তাঁকে Father of the kings বলা যথার্থ।

সারসংক্ষেপঃ

আব্দুল মালিক ছিলেন উমাইয়া বংশের একজন শ্রেষ্ঠতম শাসক। ব্যাপক সামরিক দক্ষতা, কূটনীতি, রাষ্ট্রজ্ঞান ও প্রশাসনিক যোগ্যতা তাকে উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদা দিয়েছে। তার স্থাপত্য রুচিবোধ ছিল প্রশংসার দাবিদার ও উল্লেখযোগ্য। তিনি উমাইয়া সাম্রাজ্যকে অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও গৃহযুদ্ধ হতে নিরাপদ করে রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ঘটান। রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আব্দুল মালিক উমাইয়া খিলাফতের কোন শাখায় অন্তর্ভুক্ত ?

ক) হানাফীয়া খ) মারওয়ানী গ) হাশিমী ঘ) কুরাইশ

২. আব্দুল মালিক 'Dome of the Rock' নির্মাণ করেন কেন ?

ক) মেরাজ গমনের ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্য খ) জেরুজালেমকে পবিত্র স্থানে পরিণত করার জন্য
গ) মক্কা শরীফের মর্যাদা কমানোর জন্য ঘ) মদিনা মসজিদের মর্যাদা কমানোর জন্য

৩. আব্দুল মালিক -

i) আরবি মুদ্রা চালু করেন ii) কুরআন সংকলন করেন
iii) আরবি বর্ণলিপির উন্নতি করেন

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, ii খ) ii, iii গ) iii ঘ) i, iii

৪. 'ক' এর আরবীয়করণ নীতি ইসলামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। 'ক' নিচের কোনটিকে নির্দেশ করেন ?

ক) মুয়াবিয়া খ) আব্দুল মালিক গ) আল-ওয়ালিদ ঘ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রুবি তার ইতিহাস বই পড়ে জানতে পারলো যে 'x' নামক খলীফা ছিল একটি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দৃঢ় হস্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দান করেন। আরবী লিপির উৎকর্ষ সাধন, আরবি মুদ্রার প্রচলন এবং ডাক বিভাগের সংস্কার তাঁর শাসনামলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক।

ক) উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ? ১
খ) খলীফা আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয় কেন ? ২
গ) উদ্দীপকের 'x' নামক খলীফার রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে লিখুন। ৩
ঘ) 'x' নামক খলীফা উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা উক্তিটি মূল্যায়ণ করুন। ৪

পাঠ-৭.৫ আল-ওয়ালিদের রাজ্য বিস্তার ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলীফা ওয়ালিদের ক্ষমতায় আরোহণ ও পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- আল-ওয়ালিদের কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আল-ওয়ালিদের কৃতিত্ব বিচার করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মসজিদে নববী, মুহাম্মদ বিন কাসিম, সাম্রাজ্যবাদীনীতি, নিষ্ফল বিজয়, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্র, সামন্তরাজাগণ, ভূমিদাস ও জিব্রালটার**

পরিচয় ও ক্ষমতায় আরোহণ

আল-ওয়ালিদ ছিলেন খলীফা আব্দুল মালিকের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে আল-ওয়ালিদ দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হিজরী ৫০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। আল-ওয়ালিদ পিতার পদাংক অনুসরণ করেন। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা হিসেবে বহাল রাখেন এবং তার ধর্মপ্রাণ চাচাতো ভাই ওমর বিন আব্দুল আযীজকে হেজাযের গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ করেন। গৃহযুদ্ধের সময় মক্কা ও মদীনায় যে ক্ষতি সাধিত হয়েছিলো তিনি তা পূরণে অগ্রগামী হন। তিনি উভয় শহরে ব্যাপক সংস্কার সাধন ও বহু অট্টালিকা, প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মসজিদে নববী সম্প্রসারণ করেন এবং পবিত্র কাবা ঘর পুণঃনির্মাণ করেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার

খলীফা আল-ওয়ালিদ মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করে ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেন। তিনি ছিলেন ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতা। তার সময়ে মধ্য এশিয়া, সিন্ধু, স্পেন মুসলিম পদানত হয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, তারিফ বিন জিয়াদ, মুসা ইবনে নুসাইর ও কুতায়বা বিন মুসলিম এই বীর যোদ্ধাগণ অপরিসীম রণকৌশল ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

মধ্য এশিয়া বিজয়

কুতায়বা বিন মুসলিম এর পরিচালনায় মুসলিম বাহিনী মধ্য এশিয়া বা অক্সিয়ানায় অভিযান পরিচালনা করে। কুতায়বা বলখ, তুখারিস্তান, বুখারা, খাওয়ারিজম প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে। এই অঞ্চলে ছিল তখন তুর্কিদের আধিপত্য। কুতায়াবা ৭০৬ খ্রি: একে একে বলখ, তুখারিস্তান ও ফারগানা অভিযান পরিচালনা করেন। মুসলিম বাহিনী এই সকল অঞ্চল তাদের পদানত করে। ৭০৯ খ্রি: তুখারিস্তানে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭১০ থেকে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সমরকন্দ ও খাওয়ারিজম পদানত হয়। খাওয়ারিজমের শাহ মুসলিমদের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হন। কুতায়বা ৭১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে খোজান্দা, শাশ্, ফার্গনা ও কাশ্গড় দখল করে চীন সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু ইতিমধ্যে খলীফা আল-ওয়ালিদের মৃত্যু সংবাদ পৌছালে তার অভিযান স্থগিত হয়ে যায়।



চিত্র: আরব সাম্রাজ্য (৬২২-৭৫০ খ্রি.)

অভিযানের কারণসমূহ :

আল-ওয়ালিদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি

মধ্যযুগের সকল শাসকের ন্যায় আল-ওয়ালিদ সিংহাসনে বসেই সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর রাজ্য বিস্তারের অংশ হিসেবে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণের নির্দেশ দেন।

ভারতের ঐশ্বর্য

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ ধন-সম্পদে ঐশ্বর্যশালী। উপকূলীয় বাণিজ্য এই উপমহাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই অর্থনৈতিক কারণেও এই অভিযান প্রেরিত হয়। এছাড়া কাবুল ও কান্দাহারের ভারতীয় রাজাগণ মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন।

দাহির কর্তৃক বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান

আরব বিদ্রোহীগণ, বিশেষ করে হাজ্জজ বিন ইউসুফের অধীনে ইরাকের বিদ্রোহীগণ পালিয়ে সিন্ধু প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরকে তাদের ফিরিয়ে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।

আরব জাহাজ লুণ্ঠন

সিংহলের রাজা কর্তৃক খলীফা আল-ওয়ালিদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জন্য প্রেরিত উপহার, উপঢৌকন সম্বলিত ৮ টি জাহাজ সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে হাজ্জাজ এর ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু রাজা দাহির এই দায় অস্বীকার করেন। এই সমস্ত কারণে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরিত হয়।

অভিযানের বর্ণনা

তুর্কিদের পূর্বেই সিন্ধু বা ভারতীয় উপমহাদেশ আরবদের পদানত হয়েছিল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন খলীফার পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা। তিনি খলীফার প্রতিনিধি হয়ে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে উবায়দুল্লাহ ও বুদায়েলের নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযান ২টি ব্যর্থ হয়। অবশেষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামাতা ও ভ্রাতষ্পুত্র মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক পরিচালিত অভিযানটি সফল হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১০-৭১২ খ্রি: সিন্ধু অভিযানটি পরিচালিত করেন। এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে ৬০০০ উষ্ট্রারোহী, ৬০০০ সিরীয় অশ্বারোহী এবং ২০০০ ভারবাহী পশু। মুহাম্মদ বিন কাসিম পাকিস্তানের মাকরান প্রদেশ দিয়ে দেবলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মাকরানের শাসক হারুন তাকে সৈন্যসামন্ত ও প্রয়োজনীয় সাহায্য করেন। দাহিরের কুশাসনে বহু নিম্ন হিন্দুজাত যেমন জাট ও মেঠ স্বেচ্ছায় মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রথমে দেবলের শাসক রাজা দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে পরাজিত করেন এবং দেবল অধিকার করেন ৭১১ খ্রিস্টাব্দে। এরপর মুহাম্মদ সিরওয়ান নামক শহরটি দখল করেন। আল-নিরুন (আধুনিক হায়দারাবাদ) সিস্তান শহর দুটি দখল করা হয়। রওয়ার নামক স্থানে রাজা দাহিরের সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিম সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। বিশাল হস্তীবাহিনী ও অশ্বারোহী বাহিনী থাকা সত্ত্বেও এই যুদ্ধে রাজা দাহির শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। দাহির পত্নী-রানী বাঈ ১৫,০০০ সৈন্য নিয়ে আরোরা দুর্গ থেকে যুদ্ধ করেন কিন্তু তিনি পরাজিত হয়ে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেন। এরপর মুসলমানগণ বিনা বাধায় ব্রাহ্মণাবাদ দখল করেন এবং ৭১৩ খ্রি: মুলতান অধিকৃত হয়। কিন্তু এই সময় দামেস্ক হতে খলীফার মৃত্যুর সংবাদ গিয়ে পৌছে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর অভিযান স্থগিত ঘোষণা করেন।

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল :

১. রাজনৈতিক ফলাফল

ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, "আরবদের সিন্ধু বিজয় প্রাক-ভারত এবং ইসলামের ইতিহাসে একটি আখ্যায়িকা মাত্র। এটি ফলবিহীন বিজয় উল্লাসের নামান্তর। লেনপুলের এই অভিমত শুধু একদিক দিয়ে সত্য। সিন্ধুতে আরবদের শাসন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি এবং এ বিজয় শুধু সিন্ধু ও মুলতানে ছিল। তাই ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এ বিজয় কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

২. ধর্মীয় ফলাফল

ধর্মীয় দিক হতে এই অভিযানের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী, আরব সেনাবাহিনীর সাথে আরব বণিক ও সুফী দরবেশগণ সিন্ধু অঞ্চলে আসেন। তাঁরা ইসলাম প্রচার করেন এবং অনেকে এই অঞ্চলে বিবাহ করে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। তাদের মাধ্যমেই এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করে।

৩. সাংস্কৃতিক ফলাফল :

সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও এই অভিযানের সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল। আরবরা ভারতীয় গণিত, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্রের সংস্পর্শে আসেন এবং গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাই এই বিজয় সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল ছিল বলা যায় না।

আফ্রিকা বিজয় :

হাসান বিন নুমানের মৃত্যুর পর মুসা ইবনে নুসাইর আফ্রিকা অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োজিত হন। বার্বারগণ তাঁর পূর্ববর্তী শাসনকর্তাদের যুগে ব্যাপক বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল। তিনি তাদেরকে পরাজিত করে আটলান্টিক সাগরে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত মুসলিম আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। তিনি ভূ-মধ্যসাগরে বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং নৌবহরের সাহায্যে মেজর্কা, মাইনরকা, ইভিকা প্রভৃতি ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করেন।

স্পেন বিজয়

বিজয় প্রাক্কালে স্পেনের অবস্থা :

১) রাজনৈতিক অবস্থা : স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল গৃহবিবাদে পূর্ণ। উচ্চভিলাষী ও অত্যাচারী সামন্তরাজা ডিউক রডারিক স্পেনীয় সিংহাসনের রাজা উইটিজাকে পদচ্যুত ও হত্যা করে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করেন। স্পেনে তখন ছিল গথিক রাজাদের শাসন। অভিজাত শ্রেণি ছিল আপন স্বার্থসচেতন ও পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল খুবই দুর্বল। তাদের মাঝে কোন ঐক্য ছিল না।

২) সামাজিক অবস্থা : সমাজব্যবস্থা ছিল ৩টি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত।

i) আভিজাত্য সম্প্রদায় : রাজা, গীর্জার পাদ্রি ও সামন্তরাজাগণ। এদের কোন প্রকার কর দিতে হতো না।

ii) মধ্যবিত্ত শ্রেণি : যারা সমাজের মধ্যভাগে অবস্থান করতো। তাদেরকে সকল প্রকার করা প্রদানে বাধ্য করা হতো।

iii) তৃতীয় শ্রেণি ছিল দাস : তারা ছিল ভূমিদাস (Serf) এবং ব্যক্তিগত ক্রীতদাস। যাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। তাদের-কে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হত না।

৩) ধর্মীয় অবস্থা : সমাজে কোন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ছিল না। ইহুদীরা ছিল নির্যাতিত। তাদের ধর্মীয় কোন স্বাধীনতা ছিল না। চার্চের প্রাধান্য ছিল সবকিছুর উর্ধ্বে।

স্পেন বিজয়ের কারণসমূহ :

১. স্পেনের গথিক রাজার দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে অনেকেই উত্তর আফ্রিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সকল ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও অত্যাচারিত মানুষ মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেনে অভিযান প্রেরণে অনুপ্রাণিত করেন।

২. অপর দিকে স্পেন বিজয় ছিল খলীফা আল-ওয়ালিদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির একটি অংশ।

৩. সিউটার শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ান ছিল মৃত ও সিংহাসনচ্যুত রাজা উইটজার জামাতা। কাউন্ট জুলিয়ান তাই স্পেনের সিংহাসনকে শত্রুমুক্ত করতে চেয়েছিলো এবং মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেনে আহবান করেন।

৪. এই অভিযানে কাউন্ট জুলিয়ান মুসলিম সেনাবাহনীকে সর্বাত্মক সাহায্য করেন। যুদ্ধ জাহাজ, প্রয়োজনীয় রসদ ও সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে তিনি মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করেন।

৫. কাউন্ট জুলিয়ানের সর্বাত্মক সহযোগিতার পেছনে রয়েছে তার কন্যা ফ্লোরিন্ডাকে রডারিক কর্তৃক অবমাননা। তাই এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কাউন্ট জুলিয়ান মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেন বিজয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

ঘটনা প্রবাহ :

মুসা ইবনে নুসাইর প্রথমে তার অনুচর তারিফকে স্পেনে প্রেরণ করেন। তারিফ ফিরে এসে তাঁকে আক্রমণের অনুকূল পরিবেশের কথা ব্যক্ত করেন। এরপর মুসা আর একজন বিশ্বস্ত অনুচর ও সেনাপতি বার্বার যোদ্ধা তারিক বিন যিয়াদকে ৭১১ খি: স্পেন অভিযানে প্রেরণ করেন। এই সময় ৭০০০ সৈন্য নিয়ে তারিক যে পাহাড়ে অবতরণ করেন তা 'জাবাল আল তারিক' (তারিকের পাহাড়) নামে পরিচিত হয়। ইউরোপীয়দের নিকট এটি জিব্রালটার নামে পরিচিত। ৭১২ খ্রি: মেডিনা-সিডোনিয়া নামক স্থানে গোয়াদালকুইভার নামক নদীর তীরে তারিক রডারিকের বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই সময় মুসা ইবনে নুসাইর ৫০০০ সৈন্য সাহায্য পাঠালে তারিকের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১২,০০০ এবং রডারিকের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১,২০,০০০ যুদ্ধে রডারিক পরাজিত হন এবং পলায়নকালে গোয়া ডিলেট নদীতে নিমজ্জিত হয়ে মারা যান। মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করলো। তারিক তাঁর সেনাবাহিনীকে চারভাগে বিভক্ত করে যথাক্রমে মালাগা, গ্রানাডা,

কর্ডোভায় পাঠালেন এবং নিজে রাজধানী টলেডো দখল করলেন। তারিকের সাফল্যে মুসা ঈর্ষান্বিত হয়ে ৭১২ খ্রি: তিনি স্পেন আগমন করেন এবং সেভিল, মেরিডা, কারমোনা প্রভৃতি শহর জয় করে টলেডোর নিকট তারিকের সাথে মিলিত হন। তাদের মিলিত বাহিনী সারাগোসা, টেরাগোনা, আরাগোনা, বার্সালোনা, লিও প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে। এই সময়ে খলীফা আল-ওয়ালিদের মৃত্যুসংবাদ তাদের নিকট পৌছালে তারা দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করেন।

স্পেন বিজয়ের ফলাফল :

সমাজে সমতা ও ন্যায়নীতির প্রবর্তন

আরবদের কর্তৃক স্পেন বিজয় ইউরোপীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। অত্যাচার-অবিচারের পরিবর্তে সমাজে সাম্য ও ন্যায়বচিার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

আরবদের কর্তৃক স্পেন বিজয়ের ফলে সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনে স্বীকৃত হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে সকল অনাচার -অবিচার সমাজ হতে তিরোহিত করা হয়।

দাসদের মর্যাদা

সমাজে দাস ও ভূমিদাসগণ স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ পায়। সামাজিকভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ পায়।

যাজক শ্রেণির ক্ষমতা হ্রাস

সমাজের উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণির বিশেষ করে যাজক শ্রেণির ক্ষমতার রাশ টেনে ধরা সম্ভব হয়। মুসলিম বিজয়ের পর যাজক শ্রেণির শোষণের হাত থেকে স্পেনীয়রা মুক্তি পায়।

কৃষি ও ব্যবসায় বাণিজ্য

মুসলমানগণ স্পেন বিজয়ের পর সেখানকার কৃষি ও ব্যবসায় বাণিজ্যে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন এবং এই ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়।

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

স্পেন বিজয়ের পর সেখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসা ইবনে নুসাইর তাঁর পুত্র আব্দুল আযিযকে স্পেনের, আব্দুল্লাহকে ইফ্রিকিয়ার ও আব্দুল মালিককে মরক্কোর শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন।

শিল্প সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞান

মুসলমান কর্তৃক স্পেন বিজয়ের ফলে এখানে শিল্প, সাহিত্যের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচর্চা ও বিকাশ ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে গোটা ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

আল ওয়ালিদের মৃত্যু

খলীফা আল ওয়ালিদ ১০ বছর গৌরবের সাথে রাজত্ব করার পর ৭১৫ খ্রি: মৃত্যুবরণ করে। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন কিন্ত তাঁর পুত্র তার জীবদ্দশায় মারা যান। তাই তাঁর ভ্রাতা সুলায়মান তার মৃত্যুর পর দামেস্কের সিংহাসন আরোহণ করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব :

দয়ালু ও সুযোগ্য শাসক

সৈয়দ আমীর আলী বলেন- তিনি যে তার পিতা আব্দুল মালিক ও পিতামহ মারওয়ান অপেক্ষা দয়ালু ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এটা নিশ্চিত যে, তার বংশধরগণের অনেকের চেয়ে তিনি হৃদয়বান ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকগণ তাঁকে স্বেচ্ছাচারি বললেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন দয়ালু ও একজন সুযোগ্য শাসক।

উমাইয়া ইতিহাসের স্বর্ণযুগ

আল-ওয়ালিদ ছিলেন উমাইয়া বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা যার রাজত্বকাল ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাত। তিনি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা

আল-ওয়ালিদ কেবল উমাইয়া বংশেরই নন সমগ্র মুসলিমদের ইতিহাসে অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতা। তিনি অক্সাস নদী হতে সিন্ধু নদ, উত্তর আফ্রিকা হতে স্পেন পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি বিশাল সাম্রাজ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে সমসাময়কি রাজণ্যবর্গের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

জনহিতকর কার্যাবলি

তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন এবং কূপ খনন করেন। সীমান্ত রক্ষার জন্য দূর্গ নির্মাণ করেন । বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ করেন। দুস্থদের জন্য আশ্রয়স্থল তৈরি করেন। তিনি অসহায় ও দুস্থদের রাষ্ট্র হতে ভাতা প্রদান করতেন। অসহায়, পঙ্গু, অন্ধ, পাগল, ও অক্ষম লোকদের জন্য তিনি আহার, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এতিম বালক বালিকার জন্য এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

স্থাপত্যবিদ্যা

আল-ওয়ালিদ ছিলেন যুগের একজন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যবিদ। দামেস্কের জামে মসজিদ তার স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম নির্দশন। এছাড়াও তিনি মক্কা ও মদীনায় মসজিদ সংস্কার করেন যে শহরে মসজিদ ছিল না সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন।

শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

আল-ওয়ালিদ শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর দরবারে কবি ও সাহিত্যিকদের বিশেষ সমাদার করা হতো। কবি ফারায্দাক তার দরবার অলংকৃত করেন। খলীফা নিজে ছিলেন কবি ও সঙ্গীতানুরাগী। তাঁর সময়ে কুফায় ও বসরায় জ্ঞান বিজ্ঞান ও হাদীস চর্চা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর সময়ে মক্কায় কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

নৌ-বহরের উন্নতি

আল-ওয়ালিদ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সামরিক সংগঠক। তিনি নৌ-বহরের উন্নতি সাধন করেন যা ভূ-মধ্যসাগরে রোমানদের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করেছিলেন।

সারসংক্ষেপঃ

আল-ওয়ালিদ আব্দুল মালিকের একজন যোগ্যতম উত্তরসূরি এবং উমাইয়া বংশের একজন শ্রেষ্ঠতম শাসক। তাঁর সময়েই ইসলামী রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়। তিনি উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, সিন্ধু ও মধ্য এশিয়ায় ইসলামী পতাকা উত্তোলন করেন। শ্রেষ্ঠতম সেনাপতিগণ ছিলেন তার সাফল্যের কারিগর। স্থাপত্য ও প্রশাসনে তিনি ছিলেন একজন প্রথম সারির নৃপতি। তাই তিনি শুধু উমাইয়া বংশের নয় তিনি ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি ও বিজেতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আরবরা স্পেন বিজয় করে কত সালে ?

ক) ৭১৫ খ) ৭০৫ গ) ৭১২ ঘ) ৭১৩

২. খলীফা আল ওয়ালিদ স্পেনে অভিযান প্রেরণ করেন -

ক) অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য খ) সাম্রাজ্যবাদীনীতির অংশ হিসেবে

গ) স্পেনীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ছিল ঘ) সামরিক শক্তি প্রদর্শন করতে

৩. খলীফা আল ওয়ালিদের সময় মুসলিমরা জয় করে -

i) সিন্ধু ii) চীন iii) স্পেন

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, ii, iii খ) i, iii গ) i, ii ঘ) ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

'ইসলামের সম্প্রাসারণে খলীফাদের অবদান' শীর্ষক সেমিনারে একজন বক্তা বলেন- খলীফা উমর (রা.) এর পরে উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য অধিক বিস্তৃত হয়। তিনি তার সুযোগ্য গভর্ণরদের দ্বারা মধ্য এশিয়া, সিন্ধু, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন জয় করতে সক্ষম হন। জনহিতকর কাজের জন্যও ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক চিরস্মরণীয়।

ক) ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের পূর্বাঞ্চলের গভর্ণর কে ছিলেন? ১

খ) "জনহিতকর কাজের জন্য ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক চিরস্মরণীয়"-ব্যাখ্যা করুন ? ২

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত খলীফার সময়ে সিন্ধু বিজয়ের ঘটনাটি তুলে ধরুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত খলীফার চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৭.৬ উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) এর শাসননীতি, সংস্কার ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) এর পরিচয় ও ক্ষমতায় আরোহণ সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)- এর শাসন প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) এর সংস্কার, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বসম্পর্কে জানতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	**প্রজাবৎসল, হাশেমী নীতি, লানত ও অভিসম্পাত, মজলিস-ই-শুরা, পীরেনীজ পর্বত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, পঞ্চম খলীফা ও 'উমাইয়া সাধু খলীফা'**

পরিচয় :

উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) ছিলেন মারওয়ানের দৌহিত্র। তাঁর মাতা ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর দৌহিত্রী উম্মে হামিম। তিনি ছিলেন খলীফা আব্দুল মালিকের ভাই ও মিসরের শাসনকর্তা আব্দুল আযীযের পুত্র। তিনি আব্দুল মালিকের কন্যা ফাতিমাকে বিয়ে করেন। ইতিহাসে তিনি ২য় উমর হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত।

ক্ষমতায় আরোহণ

খলীফা আল-ওয়ালিদের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই সুলাইমান খলীফা হন। তিনি প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করতে ব্যর্থ হন। তাঁর রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য কোন সামরিক বিজয় সম্ভব হয়নি। তিনি মাত্র ২ বছর ৮ মাস রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সৎ ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী তাঁর চাচাতো ভাই উমর ইবনে আব্দুল আযীযকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে নির্বাচিত করেন। ৭১৭ খি. উমর ইবনে আব্দুল আযীয দামেস্কের সিংহাসণ আরোহণ করেন।

শাসননীতি :

নিরপেক্ষ ও প্রজাবৎসল

খলীফা ২য় উমর (রা.) একজন প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। রাজ্য জয়ের পরিবর্তে তাঁর সাম্রাজ্যে বসবাসকারী প্রজাদের কল্যাণসাধনকেই তিনি তার পরম দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি শাসনকার্যে ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও বিশ্বস্ত লোককে নিয়োগ করেছিলেন। তাদের কর্মকাণ্ডের উপর কড়া নজর রাখতেন। ইয়াযীদ ইবনে মুহাল্লাব ও আল-হুরকে অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য পদচ্যুত করেন।

অনাড়ম্বর জীবন

তিনি খিলাফত লাভের পর তার সকল সম্পত্তি রাজকোষে জমা করেন। তিনি খোলাফায়ে রাশিদীনের নীতি অনুসরণ করে দৈনন্দিন জীবন যাপন করতেন। তার নির্দেশে তদ্বীয় স্ত্রী তার পিতা ও ভ্রাতা কর্তৃক প্রাপ্ত মূল্যবান অলংকার রাজ কোষে জমা করেন। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করে দেন এবং রাজ অশ্বশালার অশ্ব বিক্রি করে জনকল্যাণে ব্যয় করেন। তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।

বায়তুল মাল পুনঃপ্রতিষ্ঠা

তিনি বায়তুল মালকে জনগণের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

হাশিমী নীতি

খলীফা ২য় উমর হাশেমীয় বংশের প্রতি উদার ছিলেন। তিনি শুক্রবারের খুৎবায় হযরত আলীর নামে পঠিত লানত ও অভিসম্পাত বন্ধ করে দেন। তিনি মারওয়ান কর্তৃক দখলকৃত ফিদাক নামক খেজুরবাগানটি মুহাম্মদ (সা.) এর পরিবারের লোকদের কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি তালহার সম্পত্তি যা আব্দুল মালিক কর্তৃক দখলকৃত হয়েছিল, তা তালহার বংশধরকে ফিরিয়ে দেন।

মজলিস-আল-শুরা

শাসন ক্ষেত্রে তিনি মজলিস-আল-শুরা অনুসরণ করতেন যা তার পূর্বসূরীরা স্থগিত করেছিল।

খারিজী নীতি

খলীফা ২য় উমর (রা.) খারিজীদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করেন। তাঁর এই নীতির ফলে তাঁর সময়ে খারিজীগণ কোন বিদ্রোহ করেনি। খারিজীগণ একমাত্র ২য় উমর (রা.)কেই উমাইয়া বংশের খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

অমুসলিম নীতি

খলীফা ২য় উমর (রা.) অমুসলিমদের প্রতিও উদার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। অমুসলিমগণ তাঁর সময়ে রাজকার্যে নিয়োগ পেতেন। তিনি খ্রিস্টান ও ইহুদীদের গীর্জা ও উপাসনালয় তাদের নিকট হস্তান্তর করেন। তিনি নায্‌রান, আইলা ও সাইপ্রাসের খ্রিস্টানদের বার্ষিক করের বোঝা হ্রাস করেন।

মাওয়ালী নীতি

খলীফা ২য় উমর মাওয়ালীদের (অনারব মুসলিম) প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি থেকে দূরে সরে আসেন। তাদের প্রতি বৈষম্য দূর করেন। তিনি তাদের উপর আরোপিত খারায ও জিযিয়া কর লাঘব করে দেন। তিনি মাওয়ালীদের ভাতা প্রদান করেন।

সংস্কারসমূহ :

ধর্মীয় সংস্কার

রাষ্ট্র সম্প্রসারণ অপেক্ষা ইসলাম সম্প্রসারণে খলীফা ২য় উমর বেশি মনোযোগী হন। তিনি মাওয়ালীদের উপর বাড়তি জিযিয়া ও খারায ন্যায়ানুগভাবে আরোপ করেন। মুসলিমদের ন্যায় তাদেরকে সকল রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। এই নীতির ফলে খোরসান, বোখারা, সমরকন্দ, খাওয়ারিজম, নিশাপুর প্রভৃতি জায়গায় ইসলাম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। আফ্রিকার বার্বার জনগোষ্ঠীর মাঝেও ইসলাম ব্যাপকহারে বিস্তার লাভ করে। তিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন প্রকার গোঁড়ামির আশ্রয় নেননি বরং তিনি ছিলেন সকল ধর্মের প্রতি উদার। তিনি তাঁর রাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষ শাসননীতি প্রবর্তন করেছিলেন।

রাজস্বনীতি

অমুসলিমদেরকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তিনি মাওয়ালীদের উপর হতে জিযিয়া ও খারায মওকুফ করেন। এর ফলে রাজকোষে অর্থসংকট দেখা দেয়। তাই রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্ব করেন। নও মুসলমানগণ ১/১০ অংশ উশর রাজস্ব প্রদান করতো যা পূর্বে তাদের উপর ১/৫ খারায হিসেবে ধার্য ছিল। তাই তিনি ঘোষণা করেন যে, ১০০ হিজরীর পরে অমুসলমানগণ মুসলিমদের নিকট খারায ভূমি বিক্রয় করতে পারবে না। মুসলমানগণ সকল প্রকার কর হতে মুক্ত ছিল এবং অমুসলমানগণ কর প্রদানে অনিচ্ছার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাই তিনি ভূমিদখলকারী প্রত্যেক মুসলিম ও অমুসলিমের উপর খারায আরোপ করেন। তিনি সকল অমুসলিমকে রাষ্ট্র কর্তৃক নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য জিযিয়া কর বাধ্যতামূলক করেন।

বৈদেশিক নীতি :

স্পেনের শাসন

স্পেনে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য খলীফা উমর আস-সামকে গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি সেখানে বহু জনহিতকর কার্যাবলি যেমন- ভূমি জরিপ, আদমশুমারি, সেতু, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি সম্পন্ন করেন। তিনি সারাগোসায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি বিদ্রোহী খ্রিস্টানদের হুমকি প্রতিহত করার জন্য এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পীরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ দখল করেন। আস-সামের মৃত্যুর পর আব্দুর রহমান মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

উমর ইবনে আব্দুল আযীয ছিলেন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠ উমাইয়া খলীফা। তিনি ছিলেন সরল, আদর্শবান ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি তার ব্যক্তিগত জীবন ও শাসনপ্রণালীতে খোলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শ অনুসরণ করতেন। তিনি ইসলামের মৌলিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ধর্মভীরু ও নিষ্ঠাবান জীবন যাপন করতেন। প্রজাদের কল্যাণ সাধনই ছিল তার শাসননীতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। এজন্যই ইসলামের ইতিহাসে তাকে পঞ্চম খলীফা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের এক ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত। তিনি 'উমাইয়া সাধু খলীফা' (Pious Caliph of the Umayyah) নামে পরিচিত। তার সময়ে ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হয়। মাওয়ালী ও অমুসলিমগণ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হন। প্রজাগণ সুখে

শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। Syed Ameer Ali বলেন, æThe reign of Omar forms the most attarctive period of the Ommeyade dominion."

সারসংক্ষেপঃ

খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রা.) উমাইয়া বংশের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল নাম। তাঁর রাজত্বকালে ছিল উমাইয়া বংশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের চেয়ে শাসনক্ষেত্রে ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেন এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসননীতি ও ইসলামের আদর্শকে মূলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাই তিনি খুলাফায়ে রাশিদীনের 'পঞ্চম খলীফা' হিসেবে পরিচিত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সদাসয় অনাড়ম্বর, উদার ও আদর্শবান একজন শাসক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দাও

১. 'উমাইয়া সাধু' কার উপাধি ?

ক) আল-ওয়ালিদ খ) উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) গ) মুয়াবিয়া (রা.) ঘ) আব্দুল মালিক

২. খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয (রা.) আলীপন্থীদের প্রতি সদাচরণ করেন কিভাবে ?

ক) কর রহিত করে খ) অভিসম্পাত বন্ধ করে গ) অর্থ প্রদান করে ঘ) খারায রহিত করে

৩. খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয (রা)-

i) বায়তুল মাল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন
ii) ইসলামী রাষ্ট্রকে সম্প্রসারিত করেন
iii) নৌ-বাহিনী গঠন করেন

নিচের কোনটি সঠিক -

ক) i, iii খ) i গ) ii, iii ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

আসিফ ও নাফিস উমাইয়া খলীফাদের সম্পর্কে আলোচনা করছিল। আসিফ বলল, উমাইয়া খলীফাদের মধ্যে উমর বিন আব্দুল আযীয (রা.) ছিলেন সবচেয়ে ধার্মিক। তিনি ইসলামের পঞ্চম খলীফা হিসেবে পরিচিত। নাফিস বলল, তিনি তাঁর ব্যাতিক্রমী শাসননীতি ও শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন সংস্কারের জন্য ও সুপরিচিত।

ক) উমর বিন আব্দুল আযীয (রা.) কত সালে সিংহাসন আরোহণ করেন ? ১

খ) উমর বিন আব্দুল আযীয (রা.) কে 'পঞ্চম ধার্মিক খলীফা' বলা হয় কেন ? ২

গ) উদ্দীপকে নাফিসের মতানুসারে উমর বিন আব্দুল আযীয (রা.) এর শাসন নীতি আলোচনা করুন। ৩

ঘ) খলীফা হিসেবে ২য় উমরের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৭.৭ হিশামের শাসন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিশামের রাজত্বকালের বিবরণ দিতে পারবেন।
- হিশামকে কেন উমাইয়া বংশের শেষ রাজনীতিবিদ বলা হয় তা নিরুপণ করতে পারবেন।
- হিশামের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**হৃত-গৌরব, 'মূর্তির যুদ্ধ', 'সম্ভ্রান্তদের যুদ্ধ', টুরস যুদ্ধ, ভাগ্যনিয়ন্ত্রক যুদ্ধ।**

পরিচয়

খলীফা আব্দুল মালিকের চতুর্থ পুত্র ছিলেন হিশাম। ৭২৪ খ্রি: দুর্বল শাসক দ্বিতীয় ইয়াযিদের মৃত্যুর পর হিশাম দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের সর্বশেষ কর্মদক্ষ খলীফা।

সমস্যা ও সংকট

হিশাম সিংহাসনের আরোহণ করে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সময় উমাইয়া ও হাশিমী দ্বন্দ্ব, খারিজী বিদ্রোহ, বার্বার ও রোমানদের হুমকি এবং সর্বোপরি আব্বাসীয় আন্দোলন উমাইয়া খিলাফতকে সংকটের দিকে ঠেলে দেয়। এ সকল সংকট নিরসন করে উমাইয়া হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার করতে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

হিশামের নীতি

একমাত্র ২য় উমর ছাড়া উমাইয়া বংশের সকল খলীফা কোন না কোন দলীয় শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। হিমারীয় ও মুদারীয় দ্বন্দ্ব এভাবে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতো। খলীফা ২য় ইয়াযিদ মুদারীয়দের অনুগ্রহ লাভ করেন। তাই তাদের প্রাধান্য খর্ব করার জন্য হিশাম হিমারীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

প্রশাসনিক রদবদল

পূর্ববর্তী খলীফার অযোগ্য শাসনের ফলে অযোগ্য রাজকর্মচারী ও মন্ত্রীর কুশাসনে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা যায়। হিশাম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে প্রশাসনিক রদবদল করেন। ইরাকে উমর বিন হোবায়রাকে অপসারণ করে তার স্থলে খালিদ বিন আব্দুল্লাহ আল কাসরীকে নিয়োগ করেন। খালিদ এর ভ্রাতা আসাদ আল কাসরীকে খোরাসানে নিয়োগ করেন।

ইরাকে বিদ্রোহ দমন

ইরাকের শাসক খালিদ কৌশলে হিমারীয় ও মুদারীয় দ্বন্দ্ব প্রশমিত করেন। তিনি খারিজী বিদ্রোহ প্রশমিত করেন। অমুসলমানগণ ও তার শাসনে আস্থাভাজন হন। কিন্তু খলীফা তার সুশাসন সত্ত্বেও অর্থ আত্মসাৎ অথবা আলী (রা.) এর বংশধরদের প্রতি উদারতার জন্য তাকে পদচ্যুত করেন এবং তার স্থলে ৭৩৯ খ্রি: ইউসুফ বিন উমরকে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তার শাসনকালে যায়িদ নামক হযরত আলী (রা.) এর বংশধর কুফায় খিলাফত দাবি করলে ইউসুফ তাকে পরাজিত ও নিহত করেন।

খোরাসানে বিদ্রোহ দমন

জিযিয়া থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আমু-দরিয়ার পূর্বদিকের অবস্থিত সাগোদের অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাদের উপর জিযিয়া ধার্য হলে তারা ইসলাম ত্যাগ করেন এবং বিদ্রোহ ঘোষাণা করেন। এই সময় ৭৩৫ খ্রি: আসাদ আল কাসরী তার জৈষ্ঠ্য ভ্রাতা খালিদ আল-কাসরী কর্তৃক নিয়োজিত হন। ৭৩৬ খ্রি: আসাদ সাগোদের বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করেন। তিনি তুর্কি উপাজতি নেতা খানকেও পরাজিত ও নিহত করেন। আসাদ বলখে

খোরাসানের রাজধানী স্থাপন করেন। আসাদ অচিরেই মৃত্যুবরণ করেন এবং তার স্থলে নসর বিন সাইয়্যারকে গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। নসর ছিলেন সর্বশেষ উমাইয়া গভর্ণর। তিনি মার্ভে খোরাসানের রাজধানী স্থাপন করেন।

উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহ দমন

হিশামের খিলাফতের প্রাথমিককালে উত্তর আফ্রিকায় শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু একদল খারিজী উত্তর আফ্রিকায় গমন করে বার্বারদের সহায়তায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা ৭৩৮ খ্রিঃ তাঞ্জিয়ারের শাসনকর্তাকে নিহত করে এবং কায়রোয়ান দখল করে। আরব সেনাপতি হাবীব পরাজিত ও নিহত হন আরো বহু বীরযোদ্ধা এই যুদ্ধে নিহত হন। তাই এইযুদ্ধে 'সম্ভ্রান্তদের যুদ্ধ' (Battle of the Nobles) বলা হয়। খলীফা সেনাপতি কুলসুম কে প্রেরণ করলে তিনিও পরাজিত ও নিহত হন। এই অবস্থায় ৭২৪ খ্রিঃ হিশাম সেনাপতি হানজালাকে উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 'মূর্তির যুদ্ধে' (Battle of Idols) এ হানজালা বিদ্রোহীদের পরাজিত করে উত্তর আফ্রিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

মধ্য-এশিয়ায় অভিযান

ককেশাস পর্বতের উত্তরে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান প্রদেশে খাজার তুর্কিগণ বসবাস করত। ৭৩১ খ্রিঃ তারা মসুল আক্রমণ করে এর গভর্ণর জার্‌রাকে পরাজিত ও নিহত করে। হিশাম সাঈদ আল-হাবশীকে বিপুল সৈন্যসহ খাজারদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। খাজারগণ তার নিকট পরাজিত হয়। ৭৩২ খ্রিঃ খলীফা তাঁর ভ্রাতা মাসলামাকে পরের বছর ও মারওয়ানকে যথাক্রমে আর্মেনিয়া ও মেসোপটেমিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মাসলামা খাজারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। মারওয়ান খাজারদের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করেন। পরবর্তী উমাইয়া ইতিহাসে তিনি দ্বিতীয় মারওয়ান নামে খ্যাত।

স্পেন ও ফ্রান্সের ঘটনাবলী

দামেস্ক হতে স্পেনের দূরত্ব অধিক হওয়ায় উত্তর আফ্রিকা হতে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হতো। ৭২০ সালে তুলুসের যুদ্ধের পর আরব সেনাপতি আনবাসাহ স্পেনের শাসকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি প্রশাসনিক কাজে দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু পীরেনীজ গিরি সংকটে তিনি ফ্রান্সের বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। এর ফলে স্পেনে ৬ বছর যাবৎ বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। অবশেষে হিশাম ৭৩১ খ্রিস্টাব্দে আব্দুর রহমান আল-গাফিকীকে স্পেনে পাঠান। এই সময় পীরেনীজ পর্বতের অপর প্রান্তে সাগোদে আরব শাসনকর্তা মনুজা একুইটেনের ডিউক ইউডিজের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করে শ্বশুরের সাথে আরব শাসনের বিরোধিতা শুরু করেন। মনুজা আব্দুর রহমানে নিকট পরাজিত ও নিহত হন। ইউডিজ ফ্রানকিস রাজা চার্লস মারটেলের সহায়তায় আব্দুর রহমানকে বাঁধা দেন। ৭৩২ খ্রিঃ টুরস নামক স্থানে উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। দলীয় কোন্দল, বিশৃঙ্খলা, সেনাপতির আদেশ অমান্য ও ভুল সংবাদ পরিবেশন ইত্যাদি কারণে মুসলমানগণ এই যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হয়। সেনাপতি আব্দুর রহমান যুদ্ধে পরাজিত হন। এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ভাগ্যনিয়ন্ত্রক যুদ্ধ।

আব্বাসীয় বিদ্রোহ

এই সময়ে আব্বাসীয়গণ উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আবু মুসলিম খোরাসানী নামক এক ইস্পাহানবাসী হযরত আব্বাস (রা.) এর বংশধর মুহাম্মদ ও তার পুত্র ইব্রাহীম এর পক্ষে খোরাসান অঞ্চলে প্রচারণা শুরু করেন। খলীফা হিশাম এই আন্দোলনকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন।

হিশামের চরিত্র ও কৃতিত্ব :

শাসনদক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

খলীফা হিশাম ২০ বছর রাজত্ব করেন। তিনি যে সময়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেন তখন সর্বত্র ছিল গোত্রীয় কলহ, খারিজী ও বার্বার বিদ্রোহ, খাজার বিদ্রোহ ও স্পেনে সংকট। এই সময় আব্বাসী আন্দোলন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। এই সংকটজনক অবস্থায় তিনি কঠোর অবস্থানে থেকে একে একে সকল বিদ্রোহ দমন করেন। তার পূর্বসূরী ২য় ইয়াযীদের সমর্থকদের প্রভাব তিনি বহুলাংশে কমিয়ে আনতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের সর্বশেষ রাজনীতিবিদ। তার মাধ্যমে উমাইয়া গৌরব যুগের অবসান ঘটে। এই প্রসংগে P.K Hitti বলেন, æWith Hisham (724-43), the fourth son of 'Abd-al-Malik, the Umayyad golden age came to a close."

সন্দেহপরায়ণ ও ধনলিপ্সা

শাসক হিসেবে তিনি সন্দেহপরায়ণ ছিলেন। কাউকেই তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর সময়ে অনেক প্রশাসনিক রদবদল দেখা যায়। তাঁর অতিরিক্ত অর্থলিপ্সা পূরণের জন্য তিনি প্রজাদের উপর বাড়তি কর আরোপ করেন। এর ফলে জনগণ অসন্তুষ্ট হয় এবং আব্বাসীয় আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে।

ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ

ব্যক্তি জীবনে তিনি ধর্মপরায়ণ ছিলেন তাঁর দরবার পাপাচার ও অন্যায় হতে মুক্ত ছিল। হিশাম রক্ষণশীল মুসলিম হিসেবে পরিচিত এবং ধর্মের ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মতবাদ সহ্য করতেন না।

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

তিনি শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি একজন সুপণ্ডিত হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী সেলিম একজন বিখ্যাত ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি এরিস্টটলের কয়েকটি গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন। তাঁর পুত্র জাবালাও ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাস আরবিতে অনুবাদ করেন।

তিনি তাঁর প্রজাদের মঙ্গলের জন্য জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করেন। তিনি সুরম্য অট্টালিকা, বাগান ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। খ্রিস্টান ধর্ম যাজক স্টিফেন ছিলেন তাঁর একজন সহচর। এছাড়াও সঙ্গীতজ্ঞ হুনায়ন আল-হিরি তার অনুগ্রহ লাভ করেন।

সারসংক্ষেপঃ

হিশাম প্রায় ২০ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের সর্বশেষ রাজনীতিবিদ। তার বিশ বছরের শাসনকাল ছিল মূলত বিদ্রোহ ও বিশৃংখলায় ভরপুর। তিনি কঠোর হস্তে সকল বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু বিদ্রোহের স্থায়িত্ব ও প্রকৃতি এত কঠোর ছিল যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে উমাইয়াদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন ধার্মিক ও প্রজারক্ষক। তিনি শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি উমাইয়া বংশের আসন্ন পতনকে কিছুটা হলেও রোধ করেছিলেন। তাই তিনি ছিলেন সর্বশেষ উমাইয়া রাজনীতিবিদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খলীফা হিশাম কাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন ?

ক) মুদারীয় খ) নাসারা গ) হিমারীয় ঘ) ইহুদী

২. হিশাম গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে প্রশাসনিক রদবদল করেন -

ক) দুর্নীতি দূর করতে খ) বিদ্রোহ দমন করতে গ) ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে ঘ) কর বৃদ্ধি করতে

৩. খলীফা হিশামের সময় উল্লেখযোগ্য ঘটনা

i) আব্বাসীয় আন্দোলন ii) শিয়া বিদ্রোহ iii) উত্তর আফ্রিকায় খারিজী বিদ্রোহ

নিচের কোনটি সঠিক-

ক) i, ii, iii খ) i, iii গ) ii, iii ঘ) iii

৪. খলীফা 'x' উমাইয়া বংশের সর্বশেষ রাজনীতিবিদ। 'x' নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে।

ক) ২য় ইয়াযিদ খ) সুলায়মান গ) মারওয়ান ঘ) হিশাম

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ফাহিমা তার পিতার কাছ থেকে জানতে পারলো যে, উমাইয়া বংশের একজন শাসক উমাইয়া বংশের পতনের পূর্ব মুহূর্তে পতনকে দীর্ঘায়িত করেন। তিনি পূর্ববর্তী দুর্বল শাসকের সময়ে সৃষ্ট নানা বিশৃংখলা ও বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করেন। তিনি উমাইয়া বংশের সর্বশেষ রাজনীতিবিদ।

ক) খলীফা হিশামের কত সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন ? ১

খ) খলীফা হিশামের সময় আব্বাসীয় আন্দোলনের উল্লেখ করুন। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত খলীফার সময়ে শিল্প-সাহিত্যের উৎকর্ষতার বর্ণনা দিন । ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত খলীফার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৭.৮ উমাইয়া আমলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উমাইয়া যুগের সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- উমাইয়া যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তুলে ধরতে পারবেন।
- উমাইয়া আমলের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ সমন্ধে বলতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**অভিজাত শ্রেণিবর্গ, বেদুইন, মুরজিয়া সম্প্রদায় ও দামেস্কের জামে মসজিদ**

খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনকাল অবসানের পর মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক ৬৬১ খ্রি: দামেস্কে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় শাসন ব্যবস্থা, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

উমাইয়া সমাজের সামাজিক বৈশিষ্ট্য :

অভিজাত সম্প্রদায় :

খলীফা, খলীফার পরিবারবর্গ, বিজেতাগণ, আমলাবর্গ, সম্ভ্রান্ত আরবগণ এই শ্রেণিভূক্ত ছিলেন। খলীফাগণ দামেস্কে বিলাস ব্যাসনের জীবন যাপন করতেন। প্রাসাদ ছিল মূল্যবান পাথর ও মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি। কৃত্রিম ফোয়ারা ও জলপ্রপাত ছিল। খলীফা ও তার অভিজাত শ্রেণিবর্গ বিলাসী ও প্রমোদ-পূর্ণ জীবন-যাপন করতেন।

মাওয়ালী :

নবদীক্ষিত অনারব মুসলিমদেরকে মাওয়ালী বলা হত। মাওয়ালীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য কোন আরব গোত্রভূক্ত হত। তারা উমাইয়াদের রাজ্য বিস্তার ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে অবদান রাখে।

যিম্মি :

মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রিত অমুসলিম প্রজাদের যিম্মি বলা হত। বাধ্যতামূলক সামরিক ও অন্যান্য দায়িত্ব থেকে জিযিয়া কর প্রদান করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ভোগ করতো। তবে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের জিযিয়া কর প্রদান করতে হতো না।

দাস :

উমাইয়া যুগে দাসদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধবন্দী হিসেবে সাধারণত দাসদের আগমন ঘটে। তারা খলীফা ও বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হতো। তবে তাদের অবস্থা রোমান ও সাসানীয় সময় অপেক্ষা ভালো ছিল।

আমোদ-প্রমোদ :

উমাইয়া যুগে ভোগ বিলাস প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয় ওয়ালিদের সময়ে হেরেম প্রথা অত্যন্ত প্রসার লাভ করে। রাজধানী দামেস্ক পরিণত হয় সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র। খলীফা ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে ঘোড়দৌড়, পাশাখেলা, মোরগের লড়াই, দাবা ইত্যাদি খেলা প্রচলিত ছিল। উমাইয়া যুগের শেষভাগে পারস্য পোলো খেলার প্রচলন হয়।

নারীর অবস্থান :

উমাইয়া যুগে সমাজে নারীর বিশেষ মর্যাদা ছিল। রাজ পরিবারের নারীরা প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এ যুগে কয়েকজন বিদূষী নারীর কথা জনা যায়। মুয়াবিয়ার দুহিতা আতিকা ও আব্দুল মালিকের স্ত্রী আতিফা খলীফাদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। মদীনায় ইমাম হুসাইন (রা.) এর কন্যা সুকায়না (সখিনা) তায়েফের আয়শা বিনতে তালহা, মক্কার খার্ফা ও ওয়ালিদের স্ত্রী উম্মে বানিন ও তাপসী রাবেয়া ছিলেন এই যুগের গুণবতী ও প্রতিভাসম্পন্ন নারী।

বেশ-ভূষা :
উমাইয়া যুগে মুসলামনগণ জাঁকজমক ও সুদৃশ্য পোশাক পরিধান করতেন। সাধারণত ঢিলা পাজামা, লম্বা কোর্তা, সূক্ষ্ম মাথাওয়ালা জুতা ও পাগড়ী পরিধান করা হতো। বেদুইনরা কটিবদ্ধ ও কাঁধের উপর ছোট-ছোট চাদর ও মাথার উপর আবরণ ব্যবহার করতো। মহিলারা ঢিলা পাজামা কামিজ ও বড় রুমাল বা ওড়না ব্যবহার করতেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা :
উমাইয়াযুগ ছিল রাজ্য বিস্তারের যুগ। এই যুগে মুসলমানগণ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে বিজয় প্রতিষ্ঠা করে। উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল দিওয়ান আল-খারায নামক প্রতিষ্ঠানের উপর। বায়তুল মাল ছিল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কোষাগার। বিজিত অঞ্চল হতে উমাইয়াগণ ব্যাপক রাজস্ব আদায় করতেন। তাদের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎসগুলো ছিল: যাকাত, জিযিয়া বা নিরাপত্তা কর, গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি, খারায বা অমুসলিমদের ভূমিকর, উশর বা মুসলিমদের ভূমিকর, উশুর বা বাণিজ্য কর, আল-ফে বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত কর ইত্যাদি।

কৃষি উৎপদান :
উমাইয়াগণ রাজ্য বিজয়ের ফলে প্রচুর অনাবাদি জমির মালিক হন। এ সকল জমিতে পানি সেচের মাধ্যমে ফসল ফলানোর কাজে অসংখ্য দাস শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। সিরিয়া, মিসর ও প্যালেস্টাইন অঞ্চলে উর্বর ভূমিতে প্রচুর কৃষি উৎপাদন ঘটে।

হস্তশিল্প :
উমাইয়া আমলে হস্তশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে এতে স্থানীয় কারিগর শ্রেণি যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। হস্তশিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গৃহস্থালী আসবাব, তৈজসপত্র, সোফা, ফুলদানি, ধাতব পাত্র, মুসাল্লা (জায়নামাজ) ও কার্পেট ইত্যাদি। পোশাক শিল্পও এই সময় ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

মুদ্রা ব্যবস্থা :
খলীফা আব্দুল মালিক সর্বপ্রথম রাজকীয় টাকশাল নির্মাণ করেন এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক মুদ্রা তুলে নিয়ে আরবীতে নিজ নামে অঙ্কিত স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। মুদ্রা জাল রোধ করার জন্য কঠোরতা অবলম্বন করেন।

শিল্প-সাহিত্য : স্থাপত্য ও সংস্কৃতি

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা :
সাম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি উমাইয়াগণ জ্ঞান বিজ্ঞানে ও শিল্প সাহিত্য চর্চায় বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। এই সময় গ্রীক, আর্মেনিয়া, রোমান, পারসিক ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়। এটি ছিল মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচনাকাল।

কুরআন-হাদীস চর্চা :
এই যুগে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কুরআন ও হাদীস চর্চা শুরু হয়। এই কুরআন ও হাদীস চর্চা শুরু থেকেই পরবর্তীতে ফিকাহ শাস্ত্র বা মুসলিম আইনের জন্ম হয়। এই যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশরাদ ছিলেন ইমাম হাসান আল বসরী, শিহাব আল জুহুরী। কুফায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ বহু হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনে শারাহবিন ইমাম আবু হানিফার শিক্ষক ছিলেন।

আরবী ব্যাকরণ ও ইতিহাস চর্চা :
এই সময় বসরা ও কুফায় আরবী ব্যাকরণ চর্চা শুরু হয়। মূলত অনারব মুসলিমদের কুরআন পাঠে ও অর্থ উদ্ধারে সহায়তার জন্য ব্যাকরণ চর্চা শুরু হয়। বসরার আবুল আসওয়াদ ছিলেন আরবী ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক। ব্যাকরণবিদ খলিল আরবী ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন করেন। তার শিষ্য সিবাওয়াই ছিলেন প্রথম আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনাকারী। উমাইয়া যুগের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ হচ্ছে আবিদ কর্তৃক রচিত কিতাবুল মুলক ওয়া আখবারুল মদীনা। কবি কায়িস ছিলেন একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক।

কবিতা ও কাব্য সংস্কৃতি :
খলীফারা ছিলেন কবিতা ও কবির পৃষ্ঠপোষক। এযুগে রাজনৈতিক কবিতার জন্ম হয়। কবি মিসকিন আল দারিমী ইয়াযিদের খলীফা নির্বাচন সম্পর্কিত কবিতা রচনা করেন। হাম্মাদ জাহিলিয়া যুগের কবিতা সংকলনের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন।

এছাড়া ছিলেন ফারাজদাক জারীর ও আল-আখতাল। তাঁরা চারণকবিতা, ব্যাঙ্গ কবিতা, প্রহসন রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবির উমর ইবনে রাবিয়া ও কবি জামীল প্রেমের কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

আইনশাস্ত্র বা ফিক্‌হ ও বিভিন্ন মতবাদ :

ইমাম আবু হানিফা, হাসান আল বসরী, এই যুগের শ্রেষ্ঠ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। এই সময় মুসলিম মনোজগতে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত হয়। এই সময় জাবরিয়া ও কাদারিয়া নামে ২ টি ভিন্নধর্মী মতবাদের সৃষ্টি হয়। এই সময় ইসলামের প্রথম যুক্তিবাদী সম্প্রদায় মুতাজিলাদের আবির্ভাব ঘটে। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো এই সময় আত্মপ্রকাশ করে। যেমন- শিয়া ও খারিজী সম্প্রদায়। মুরজিয়া নামক অপর একটি সম্প্রদায়েরও আবির্ভাব ঘটে এই সময়ে। উমাইয়াগণ এদেরকে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা :

উমাইয়া যুগে শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। খলীফা আব্দুল মালিক ও আল-ওয়ালিদ শিক্ষার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারা শিক্ষানুরাগী হিসেবেও পরিচিত। তাদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্য জুড়ে বহু স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তখন মসজিদ ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দেওয়া হতো। রাজপরিবারে ও অভিজাত শ্রেণির পরিবারে গৃহশিক্ষক রাখার রীতি প্রচলিত ছিল।

বিজ্ঞান চর্চা :

উমাইয়াযুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। খালিদ বিন ইয়াযিদ গ্রীক বিজ্ঞান চর্চা করে জ্ঞান অর্জন করেন। হারিস নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর রচিত গ্রীক ও সিরীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ এ সময় আরবীতে অনূদিত হয়।

সঙ্গীত চর্চা :

উমাইয়া খলীফাদের রাজদরবারে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে নিয়মিত সঙ্গীত চর্চা হত। মদীনার তুবায়িস ছিলেন ইসলামী সঙ্গীতের গুরু। সাইদ ইবনে মিস্‌জাহ ছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। নারীদের মধ্যে মদীনার জামিলা, সাল্লামা, হাবাবা, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

স্থাপত্য শিল্প :

শিল্পে উমাইয়া খলীফাগণ বিশেষ কীর্তি রেখে গেছেন। আব্দুল মালিক ও আল ওয়ালিদ ছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যবিদ। জেরুজালেমে আব্দুল মালিক বিখ্যাত কুব্বাতুস সাখ্‌রা ও আল- আকসা মসজিদ নির্মাণ করেন। আল-ওয়ালিদ দামেস্কের বিখ্যাত উমাইয়া জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিকে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মসজিদও বলা হয়। এছাড়াও মিসরের ফুসতাত মসজিদ ছিল উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন।

সারসংক্ষেপ:

মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক ৬৬১ খ্রি: উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় যা ৭৫০ খ্রি: পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই খিলাফতের প্রকৃতি ছিল পূর্ববর্তী খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসন হতে ভিন্নতর। এটি ছিল ইসলাম সম্প্রসারণের যুগ, রাজ্য বিজয়ের যুগ, তথাপি এটি মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও কুরআন হাদীস চর্চা এই যুগকে মহিমান্বিত করেছে। উমাইয়া যুগে যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বীজ উন্মোচিত হয়, তা পরবর্তীকালে অব্বাসীয় আমলে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সর্বপ্রথম রাজকীয় টাকশাল নির্মাণ করেন কে ?

ক) মুয়াবিয়া
খ) আল-ওয়ালিদ
গ) আব্দুল মালিক
ঘ) হিশাম

২. উমাইয়া আমলে আরবী ব্যাকরণ চর্চা শুরু হয় কেন ?

ক) সর্বত্র আরবী ভাষা শিক্ষা দানের জন্য

খ) অনারব মুসলিমদের কুরআন পাঠে সহায়তার জন্য

গ) হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য

ঘ) কুরআন শিক্ষার প্রসারের জন্য

৩. উমাইয়া আমলে আবির্ভাব ঘটে -

i) শিয়া সম্প্রদায় ii) খারিজী সম্প্রদ্রায় iii) মুরযিয়া

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, ii খ) ii, iii

গ) i, iii ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

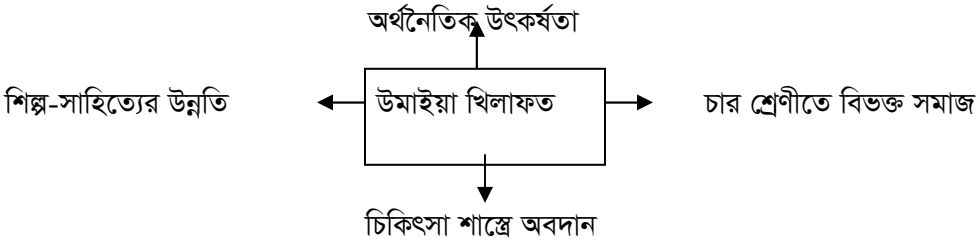

ক) মাওয়ালী কারা ? ১

খ) চিকিৎসাশাস্ত্রে উমাইয়াদের ব্যাপক অবদান রয়েছে- কথাটি ব্যাখা করুন । ২

গ) উমাইয়া যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিন। ৩

ঘ) ছকে উল্লেখিত সামাজিক শ্রেণির জীবনাচার বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-৭.৯ উমাইয়া খিলাফতের পতন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উমাইয়া খিলাফত কী কী কারণে পতন ঘটেছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- উমাইয়াদের পতনের কারণ নির্ণয় করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ইবনে খালদুনেরতত্ত্ব, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মাওয়ালী, বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন**

৬৬১ খ্রি. হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর মাধ্যমে ইসলামিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করে রাজতন্ত্রের। তথাপিও তারা তৎকালীন ইসলামি রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণ করতে অনেকাংশেই সক্ষম হন। তারা রাজ্য বিজয়ে যেমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন তেমনি তারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নানাবিদ কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছিলেন। তবুও তাদের শাসনকাল কুসুমাস্তীর্ণ ছিলো না।

উমাইয়া বংশের পতনের কারণসমূহ :

ইবনে খালদুনের তত্ত্ব :

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালেদুনের মতে যে কোন রাজবংশের স্থিতিকাল একশত বছর। যে কোন রাজবংশই প্রতিষ্ঠা, উৎকর্ষ ও গৌরবের শিখরে আরোহণ, তার ক্রমাগত অবক্ষয় এবং অবশেষে পতন এই ৩ টি অধ্যায়কাল অতিক্রম করে। এই নীতি অনুসারেই মুয়াবিয়া কর্তৃক ৬৬২ খ্রি: প্রতিষ্ঠিত বংশ আব্দুল মালিক ও আল-ওয়ালিদ কর্তৃক চরম শিখরে অবস্থান করে এবং অবশেষে ৭৫০ খ্রি: তার পতন ঘটে।

সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব :

উমাইয়া খলীফাগণ পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করতেন না। তাই পরবর্তী খিলাফতের দাবি নিয়ে পিতা-পুত্র ও পিতৃব্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি হতো। এর ফলে এই বংশের স্থায়িত্ব ও ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

খলীফাদের অযোগ্যতা ও বিলাসিতা :

কতিপয় খলীফা ব্যতীত যেমন- মুয়াবিয়া, আব্দুল মালিক, আল-ওয়ালিদ, ২য় উমর ব্যতীত প্রায় সকল খলীফাই ছিলেন রাজকার্যে অযোগ্য ও অদূরদর্শী। অপরদিকে অত্যাধিক বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন উমাইয়া বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

চারিত্রিক দুর্বলতা :

খলীফা মুয়াবিয়া (রা.) ও ২য় উমর ব্যতীত প্রায় সকল উমাইয়া খলীফাগণ চারিত্রিক দুর্বলতা প্রদর্শন করেন। মদ্যপান ও হেরেমের প্রতি অত্যাধিক অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাদের ব্যক্তিগত জীবন কলুষিত হয় এবং জনগণ তাদের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নেন।

আরব-অনারব বৈষম্য :

উমাইয়া শাসনে অনারব মুসলিম বা মাওয়ালী মুসলিমদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ এর পতনে বহুলাংশে দায়ী ছিল। তাদের উপর অতিরিক্ত করারোপ তাদেরকে উমাইয়া শাসনের বিরোধিতায় উৎসাহ প্রদান করে।

হাশিমীয়দের সাথে দুর্ব্যবহার :

একমাত্র খলীফা দ্বিতীয় উমর ব্যতীত অন্যান্য উমাইয়া খলীফাগণ হযরত আলী (রা.) এর বংশধরদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। জুমুআর জামাআতের খুতবায় হযরত আলী (রা.) এর নামে অপ্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করা হতো। এতে করে অন্যান্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে বিরুপ মনোভাব পোষণ করে।

খলীফাগণের অধার্মিক কার্যকলাপ :

সাম্রাজ্য-বিস্তার ও সেই সাথে বিপুল ধন সম্পদ প্রাপ্তির ফলে পরবর্তী দুর্বল খলীফাগণ অন্ত:পুর নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ক্রীতদাসীর সাথে অনাচার ও ব্যভিচার তাদের জীবনী শক্তিকে হ্রাস করে দিয়েছিল। আরবীয় রক্তের দূষণ ঘটে। তৃতীয় ইয়াযিদ ও তার পরবর্তী দুজন উত্তরাধিকারী দাসীর পুত্র ছিলেন। শেষের দিকে অনেক খলীফা জুমুআর জামাতে অংশগ্রহণ করতেন না ও পবিত্র রমজানে রোযা পালন করতেন না। এরুপ অনৈতিক ও ধর্মহীন জীবনাচরণে মুসলিম সম্প্রদ্রায় তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে।

নিষ্ঠুরতা :

খলীফা ইয়াযিদের সময়ে সংঘটিত কারবালার হত্যাকাণ্ড, মক্কা ও মদীনায় তাদের ধ্বংসযজ্ঞ, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোরতা ও সুলায়মান কর্তৃক প্রখ্যাত সেনাপতিদের সাথে নির্মম আচরণ উমাইয়া বংশের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

হিমারীয়-মুদারীয় দ্বন্দ্ব :

উমাইয়া খলীফাগণ নিজ নিজ স্বার্থ রাক্ষার জন্য কখনো হিমারীয়দের উপর আবার কখনো মুদারীয়দের উপর নির্ভর করতেন। তারা এক সম্প্রদায়কে অপর সম্পদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতেন। এতে আরবগণ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে যা উমাইয়া খিলাফতের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

সেনাপতি ও মন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতা :

দুর্বল উমাইয়া খলীফাগণ নিজেদের বিলাসিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এতে অনেক মন্ত্রী ও সেনাপতি নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজ দায়িত্ব অবহেলা করতেন ও নিজ স্বার্থনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এতে করে উমাইয়া শাসনের অভ্যন্তরে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে এর পতনকে ত্বরান্বিত করে।

খারিজী বিদ্রোহ :

উমাইয়াদের ঘোরতর শত্রু ছিল ও তাদেরকে অবৈধ দখলদার হিসেবে চিহ্নিত করে। খারিজীদের ক্রমাগত বিদ্রোহ উমাইয়া শাসনের ভিতকে দুর্বল করে দেয়।

শিয়া সম্প্রদায়ের উত্থান :

কারবালার করুণ ঘটনা শিয়া সম্পদায়ের জন্ম দিয়েছিল। হাশিমীদের প্রতি দুর্ব্যবহার, খলীফাদের বিলাসী জীবন এবং চরিত্রহীনতা ও কুরআন হাদীস হতে বিচ্যুতি শিয়া সম্প্রদায়কে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সদা তৎপর হতে বাধ্য করেছিল।

আব্বাসীয় আন্দোলন :

বিলাসী জীবন, আমোদ-প্রমোদে অর্থব্যয়ে উমাইয়াদের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। এর সাথে বার্বার, খারিজী বিদ্রোহ, আরব-অনারব দ্বন্দ্ব ও মাওয়ালীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ আব্বাসীয় আন্দোলনকে বেগবান করে। শিয়া, খারিজী ও মাওয়ালীরা আব্বাসীয় আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিসা পালন করে। অবশেষে এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা ৭৫০ খ্রি: ২য় যাবের যুদ্ধে সর্বশেষ খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করে। এর মাধ্যমে উমাইয়া বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

সারসংক্ষেপ:

ধাপে ধাপে উমাইয়া বংশের পতনের ভিত রচিত হয়। কোন সুনির্দিষ্ট কারণে এই বংশের পতন ঘটেনি, অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ এর পতনের পিছনে দায়ী ছিল। উমাইয়াগণ যে তরবারির জোরে একদিন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, দীর্ঘ ৯০ বছর শাসনের পর তা অন্য নতুন তরবারির জোরেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উমাইয়া বংশের পতন কত সালে হয় ?

ক) ৬৬১ সালে খ) ৭৫০ সালে

গ) ৭১২ সালে ঘ) ৭১৫ সালে

২. উমাইয়া খিলাফতের পরিসমপ্তি ঘটে কী কারণে ?

ক) খারিজী বিদ্রোহের জন্য
খ) আব্বাসীয় আন্দোলনের জন্য
গ) মাওয়ালী বিদ্রোহের জন্য
ঘ) শিয়া বিদ্রোহের জন্য

৩. উমাইয়া খিলাফতের পতনের অন্যতম কারণ কী ?

i) ইসলামকে পার্থিবকরণ
ii) অধর্মীয় কার্যকলাপ
iii) স্বৈরাচারী নীতি

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i
খ) ii
গ) i, ii
ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

'ক' নামক রাজবংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রাজতন্ত্র। অধিকন্তু এ যুগে উত্তরাধিকার নির্বাচনেরও কোন সুনির্দিষ্ট আইন কানুন না থাকায় সাম্রাজ্যে বহু গোলযোগ দেখা দেয়। এ যুগের শেষ দিকের সম্রাটগণ সুন্দরী দাসী ও রমণী নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে তাঁরা জুমুআর জামাআতেও যোগদান করত না। এসব কারণ ছাড়াও আরো বিভিন্ন কারণে তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত 'ক' রাজবংশ ৯০ বছর পর আরেক নতুন তরবারির জোরেই তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

ক) কোন যুদ্ধের মাধ্যমে উমাইয়া বংশের পতন হয় ? ১
খ) উমাইয়া বংশের পতনে ইবন খালদুনের তত্ত্বটি লিখুন ? ২
গ) উদ্দীপকের 'ক' বংশের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে আব্বাসীয় আন্দোলন ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) উদ্দীপকের 'ক' বংশের পতনের উল্লেখযোগ্য নিয়ামক গুলো কি ছিল। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১. (খ) ২. (ঘ) ৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ : ১. (ক) ২. (খ) ৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ : ১. (খ) ২. (ঘ) ৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ : ১. (খ) ২. (খ) ৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ : ১. (গ) ২. (খ) ৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬ : ১. (খ) ২. (খ) ৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৭ : ১. (গ) ২. (খ) ৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৮ : ১. (গ) ২. (খ) ৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৯ : ১. (খ) ২. (খ) ৩. (ঘ)

আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮খ্রি.)

ইউনিট ৮

ভূমিকা

আব্বাসীয় শাসনের সূত্রপাত হয় উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর। যারা ৭৫০ থেকে **১২৫৮** পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল শাসন ক্ষমতায় ছিল। এই সময়টি ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবদীপ্ত অধ্যায়। মুসলিম সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিকাশে এই বংশ এক মাইলফলক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এটি ছিল মূলত ইসলামী কৃষ্টি, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক যুগ। এই বংশে সর্বমোট ৩৭ জন খলীফার আবির্ভাব ঘটেছে। উমাইয়া খিলাফতকাল ছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে একক আধিপত্যের যুগ, কিন্তু আব্বাসীয় শাসনকালের একটি নির্দিষ্ট সময়ে মুসলিম খিলাফত ৩টি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। বাগদাদ কেন্দ্রিক আব্বাসীয় খিলাফত, মিসরের কায়রোয়ান কেন্দ্রিক ফাতিমীয় খিলাফত ও স্পেনের কর্ডোভা কেন্দ্রিক উমাইয়া খিলাফত। এছাড়া এই বংশের শেষ দিকে দুর্বল সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির কারণে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব ঘটে যা এই শাসনামলের একটি গুণগত বৈশিষ্ট্য। এতে আরব অনারব দ্বন্দ্ব ছিল না। একক আরবীয় জাতীয়তাবাদের স্থলে বিশ্বজনীন মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। আরবীয়দের স্থলে পারসিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় শাসনে খলীফার পর উযির পদ্ধতির প্রথম সূচনা। বাগদাদ পরিণত হয় মুসলিম রাজনীতি, শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে।

সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগকে পেছনে ফেলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে মুসলিমগণ এই খিলাফতের মাধ্যমে প্রবেশ করে। ৫০৮ বছর শাসন করে আব্বাসীয় খিলাফত পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী শাসনকালের ইতিহাস গড়ে। আবুল আব্বাস আস-সাফফার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বংশ আবু জাফর আল মনসুর, হারুন অর-রশীদ ও আল-মামুনের মত শ্রেষ্ঠ খলীফাদের মাধ্যমে ইতিহাসে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম। অবশেষে **১২৫৮** খ্রিঃ হালাকু খান কর্তৃক বর্বরোচিত আক্রমণে সর্বশেষ খলীফা আল মুসতাসিম বিল্লাহর হত্যার মধ্য দিয়ে এই খিলাফতের অবসান ঘটে। এই ইউনিটে আব্বাসীয় আমলে খলিফাদের ক্ষমতায় আরোহণ, তাঁদের চরিত্র, কৃতিত্ব ও আনীত সংস্কারসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৮ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ : আব্বাসীয় আন্দোলন ও বংশ প্রতিষ্ঠা
পাঠ-৮.২ : আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ
পাঠ-৮.৩ : আবু জাফর আল মনসুর এর শাসনব্যবস্থা
পাঠ-৮.৪ : আবু জাফর আল মনসুর এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ-৮.৫ : আল-মাহদী ও আল-হাদী
পাঠ-৮.৬ : হারুন-অর-রশিদের খিলাফত লাভ এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি
পাঠ-৮.৭ : হারুন-অর-রশীদের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ-৮.৮ : খলীফা আল-আমীন ও আল-মামুনের মধ্যকার গৃহযুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
পাঠ-৮.৯ : আল-মামুনের শাসন ব্যবস্থা
পাঠ-৮.১০ : আল-মামুনের শাসন আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি
পাঠ-৮.১১ : আল-মুতাসিম বিল্লাহ, আল-ওয়াসিক ও আল-মুতাওয়াক্কিল
পাঠ-৮.১২ : বুয়াইয়া বংশের উত্থান ও পতন
পাঠ-৮.১৩ : সেলজুক বংশের উত্থান ও পতন
পাঠ-৮.১৪ : আব্বাসীয় বংশের পতন
পাঠ-৮.১৩ : আব্বাসীয় সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

পাঠ-৮.১ আব্বাসীয় আন্দোলন ও বংশ প্রতিষ্ঠা



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আব্বাসীয়দের পরিচয় জানতে পারবেন।
- আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।
- আব্বাসীয় বংশ ও খিলাফতের প্রতিষ্ঠা বর্ণনা করতে পারবেন।

	**মুখ্য শব্দ**	**হাদীসবেত্তা, স্বপ্নদ্রষ্টা, মাওয়ালী মুসলিম, আবু মুসলিম খোরাসানী, আস-সাফফা, জাবের যুদ্ধ, কুসাফ গ্রাম ও বাগদাদ**

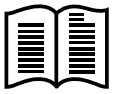

নামকরণ ও পরিচয়

আব্বাসীয় খিলাফতের নামকরণ হয়েছে মহানবী (সাঃ) এর চাচা আল-আব্বাসের নাম হতে। তাঁর নামানুসারে এই বংশের নামকরণ হয়েছে আব্বাসীয় বংশ। তিনি আল-আব্বাস আব্দুল্লাহ, ফজল, উবায়দুল্লাহ ও কায়সার নামে ৪ পুত্র রেখে ৩২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তারা প্রত্যেকেই হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ অবলম্বন করেন। আব্দুল্লাহ ইতিহাসে 'ইবনে আব্বাস' নামে পরিচিত। তিনি একজন প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ছিলেন। ইমাম হুসাইন (রা.) কারবালার যুদ্ধে নিহত হলে তিনি ভগ্নহৃদয়ে ৬৮৭ খ্রি. ৭০ বছর বয়সে তায়িফে ইন্তিকাল করেন। এরপর তাঁর পুত্র আলী পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আব্বাসীয় আন্দোলনের উৎপত্তি

৭৩৫ খ্রিঃ আলী (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ পরিবারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ অতিশয় উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন আব্বাসীয় আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি সর্বপ্রথম রাজক্ষমতা দখলের ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি নিজেকে খিলাফতের ন্যায্য দাবিদার ভাবতেন।

হযরত ফাতিমা (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) হানাফিয়া গোত্রের জনৈকা রমণীকে বিবাহ করেন এবং মুহাম্মদ আল-হানাফীয়া তাঁর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন। কারবালার ঘটনায় ইমাম হুসাইন (রা.) এর মৃত্যুর পর ইসলামের ধর্মীয় নেতৃত্ব ইবনুল হানাফিয়ার হাতে অর্পিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হাশিম নেতৃত্ব লাভ করেন। হাশিম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ইবনে আব্বাসের প্রপৌত্র মুহাম্মদকে ধর্মীয় নেতৃত্ব অর্পন করেন। মুহাম্মদ তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের পূর্বেই ৭৪৪ খ্রিঃ মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তদ্বীয় ৩ পুত্র ইব্রাহিম, আবুল আব্বাস ও আবু জাফরকে পরপর তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে যান।

সমর্থন ও অনুকূল পরিবেশ

আবুল আব্বাসের বংশধরগণ ছিলেন হাশিমী গোত্রভুক্ত ও মহানবী (সাঃ) এর নিকটাত্মীয়। তাই Ahl-al-Bayt এর পাশে তাদের এই আন্দোলনকে জনগণ স্বাগত জানায়। বিশেষ করে শিয়া মুসলিম ব্যাপকভাবে তাদের সমর্থন জানায়। উমাইয়া শাসনের কুপ্রভাব, কারবালার ঘটনা, আরব-অনারব বৈষম্য, গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ইত্যাদি উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে জনমনে বীতশ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। তারা এই শাসনের সমাপ্তি কামনা করে। পারস্য অঞ্চলের মাওয়ালী মুসলিম ও সুন্নী মুসলিমগণের মনে উমাইয়াদের নৈতিক অধঃপতন ও ইসলাম হতে বিচ্যুতি ও বৈষম্যমূলক আচরণ হতে পরিত্রাণ পাবার আশায় আহলে বায়াতের নামে এই আব্বাসীয় আন্দোলনকে স্বাগত জানায়। এভাবে আব্বাসী আন্দোলন সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে একটি সর্বজনীন রূপ লাভ করে।

আবু মুসলিমের আবির্ভাব

মূলত উমাইয়া খলীফা দ্বিতীয় ইয়াজিদের সময় হতেই এই আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। এর ব্যাপক প্রচারণা শুরু হয়। হিশামের মৃত্যুর পর এই আন্দোলন আরো জোরদার হয় এবং দ্বিতীয় মারওয়ানের শাসনামলে তা তীব্র আকার ধারণ করে।

ইব্রাহীম এই সময় আব্বাসীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় আবু মুসলিম খোরাসানী নামক আরব বংশোদ্ভূত ইস্পাহানবাসীর আবির্ভাব ঘটে যিনি নিজেকে আব্বাসীয় প্রচার কাজে সম্পৃক্ত করেন। তিনি একজন দক্ষ সামরিক সংগঠক ও কৌশলী সেনানায়ক ছিলেন। তিনি খোরাসান অঞ্চলে আব্বাসীয় প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন।

খোরাসান দখল

খোরাসান অঞ্চলে ব্যাপক প্রচার অভিযানের ফলে আবু মুসলিম খোরাসানী ব্যাপক সমর্থন লাভ করেন। এর মধ্যে খারিজী, শিয়া ও মাওয়ালীদের সমর্থন ছিল উল্লেখযোগ্য। খোরাসান আব্বাসী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়। খলীফা মারওয়ান তখন সিরিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। খোরাসানের সর্বশেষ উমাইয়া গভর্ণর নসর বিন সাইয়্যার কিরমানের খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে আবু মুসলিম খোরাসানের রাজধানী মার্ভ দখল করেন (৪৭৭ খ্রি:)। নসর আবু মুসলিমের সেনাপতি কাহতাবা কর্তৃক পরাজিত হন ও মারওয়ান কর্তৃক প্রেরিত সাহায্য পৌছাবার পূর্বে নসর পলায়নরত অবস্থায় নিহত হন। এভাবে খোরাসান আব্বাসীদের হস্তগত হয়।

ইব্রাহিমের কারাবরণ

খলীফা মারওয়ান আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসেবে ইব্রাহিমকে বন্দী করেও কারাগারে পাঠান। তবুও সমানগতিতে এই আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে। আবু মুসলিমের সেনাপতি কাহতাবা ও খালিদ ইউফ্রেটিস নদীর তীরে কারবালার প্রান্তরে উমাইয়া সেনাপতি ইয়াজিদকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে ইয়াজিদ পরাজিত হন, কাহতাবা নিহত হলে তাঁর পুত্র হাসান আব্বাসী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। আবু মুসলিমদের অপর সেনাপতি আবু আয়ান মারওয়ানের পুত্র আব্দুল্লাহকে পরাজিত করে নিহাওয়ান্দ ও মেসোপটেমিয়া অধিকার করেন। এই সংবাদ পেয়ে মারওয়ান ইব্রাহীমকে হত্যার নির্দেশ দেন। ইব্রাহীমের মৃত্যুর পর আবুল আব্বাস আস-সাফফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

আবুল আব্বাসের খিলাফত ঘোষণা

ইব্রাহীমের বন্দী অবস্থায় তাঁর ভ্রাতাগণ কুফায় আত্মগোপন করেন এবং ইবনে কাহতাবা কর্তৃক কুফা অধিকৃত হওয়া পর্যন্ত তারা আত্মগোপনে থাকেন। ৭৪৯ খ্রি: কুফা বিজিত হয় এবং আবুল আব্বাস কুফার মসজিতে খলীফা হিসেবে ঘোষিত হন। ইরাকবাসী এতে পূর্ণ সমর্থন জানায় ও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

যাবের যুদ্ধ

খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ান তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন আব্বাসীয়দের প্রতিহত করতে। ১,২০,০০০ সৈন্য সমেত তিনি টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করে জাব নদীর তীরে অগ্রসর হন। আব্বাসীয় বাহিনী আবুল আব্বাসের পিতৃব্য আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে সমবেত হয়। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী জাব নদীর তীরে কুসাফ নামক গ্রামে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মারওয়ান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং মসুল, হাররান হয়ে দামেস্কে পলায়ন করেন। সেখান হতে প্যালেস্টাইন হয়ে মিসরের দিকে পলায়ন করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি ধৃত এবং নিহত হন। তাঁর মস্তক কুফায় আব্দুল আব্বাসের নিকট প্রেরণ করা হয়। খলীফা মারওয়ানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উমাইয়া বংশ বিলুপ্ত হয় এবং আব্বাসীয়গণ খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।

সারসংক্ষেপ:

ইবনে আব্বাসের বংশধরগণ মহানবী (সাঃ) ও বিবি ফাতিমার বংশধরগণের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার সুযোগ গ্রহণ করে উমাইয়া বিরোধী প্রচারণা করেন এবং উমাইয়া খিলাফত অবসানে সর্বাত্মক আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই আন্দোলন সফলতার পেছনে আবু মুসলিম খোরাসানীর অবদান অপরিমেয়। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাধর, মেধাবী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা। অবশেষে ৭৫০ খ্রি: ২য় জাবের যুদ্ধের মাধ্যমে দামেস্ক কেন্দ্রিক উমাইয়া বংশের পতন ঘটে এবং তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসীয় বংশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আবুল আব্বাসের কয়জন পুত্র ছিল?

ক) দুজন খ) চারজন গ) তিনজন ঘ) পাঁচজন

২. আব্বাসীয় আন্দোলন সফল হয়েছিল কেন?

ক) বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রের সহায়তায় খ) অসির জোরে

গ) আর্থিক সমৃদ্ধি ছিল বলে ঘ) কোনটিই নয়

৩. আব্বাসীয় আন্দোলনে সহায়তা করেন-

i) আবু মুসলিম ii) খারিজী সম্প্রদায়

iii) উমাইয়া বংশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) i,ii ঘ) ii,iii

৪. আবু মুসলিমের জন্মস্থান 'x' ছিল আব্বাসী আন্দোলনের মূলকেন্দ্র। 'x' নিচের কোনটি?

ক) সিরিয়া খ) খোরাসান গ) মার্ভ ঘ) বাগদাদ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

কয়েক শতাব্দীব্যাপী 'খ' বংশের শাসন চলছিল। 'ক' বংশের অনাচার, অত্যাচার, গোত্রপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের ফলে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। সুবিধাবঞ্চিত জনগণও আন্দোলনে যোগ দেয়। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রের সমর্থন লাভ করে 'খ' বংশ আন্দোলন চালায় এবং 'ক' বংশের পতন ঘটায়।

ক) আব্বাসি খিলাফত কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? ১

খ) আবু মুসলিম কেন ইতিহাসে বিখ্যাত? ২

গ) উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের যে আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর বর্ণনা দিন। ৩

ঘ) 'ক' বংশের পতনই উমাইয়া বংশের পতন।- মতামত প্রদান করুন। ৪

পাঠ-৮.২ আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আবুল আব্বাস এর পরিচয় বলতে পারবেন।
- আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবুল আব্বাসের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আবুল আব্বাসের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**উত্তরসূরী, রক্তপিপাসু, নিধনযজ্ঞ, 'আল হাশিমীয়া' ও উযীর, জল্লাদ**

পরিচয় ও সিংহাসনে আরোহণ

আবুল আব্বাস ছিলেন আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলীফা। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর অন্যতম চাচা আল আব্বাস এর উত্তরসূরী। জাব নদীর তীরে ৭৫০ খ্রিঃ আব্দুল্লাহর নিকট উমাইয়া বংশের শেষ খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের মাধ্যমে আব্বাসীয়গণ ক্ষমতা লাভ করে। কুফার জামে মসজিদে আবুল আব্বাস খলীফা হিসেবে ঘোষিত হন এবং জনগণ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। তিনি আস-সাফফাহ বা রক্তপিপাসু উপাধি গ্রহণ করেন।

উমাইয়া নিধনযজ্ঞ

এরপর আব্বাসীয়গণ উমাইয়া বংশকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। আস-সাফফাহর পিতৃব্য আব্দুল্লাহ প্যালেস্টাইনের আবু ফ্রুটস নামক স্থানে ৮০ জন উমাইয়া বংশের লোককে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। সেখানে যত উমাইয়া বংশীয় লোক ছিল সকলকেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এমনকি মৃত উমাইয়াদের দেহ কবর হতে তুলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কেবলমাত্র মুয়াবিয়া ও দ্বিতীয় উমরের কবর এই নিষ্ঠুরতার হাত হতে রক্ষা পায়। এই নিষ্ঠুর আচরণের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানের উমাইয়া সমর্থকগণ বিশেষ করে দামেস্ক, হিমস, কিন্নিসিরিন, ফিলিস্তিন এর লোকজন নিজেদের দাড়িগোঁফ কামিয়ে আব্বাসী বংশের বিরোধিতা করে। আস-সাফফাহ অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে এই সকল বিদ্রোহ দমন করেন।

ইয়াজিদ বিন হুবায়রার পতন

২য় মারওয়ানের মৃত্যুর পরও ইরাকের শাসনকর্তা ইয়াজিদ বিন হুবায়রা ওয়াসিতে নিজ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান নামক জনৈক ব্যক্তিকে হযরত আলীর বংশধর হিসেব খলীফা ঘোষণা করেন। এই সময় আবুল আব্বাস ইয়াজিদকে দমন করার জন্য তাঁর ভ্রাতা আবু জাফর ও সেনাপতি কাহতাবা কে প্রেরণ করেন। ইয়াজিদ দীর্ঘ **১১** মাস অবরুদ্ধ থাকার পর প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতিতে আত্মসমর্পন করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর পুত্র ও বহু অনুচরসহ নিহত হন।

রাজধানী স্থানান্তর

আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ তাঁর রাজধানী ইরাকের কুফা হতে আল-আনবারে স্থানান্তরিত করেন। সেখানে তিনি 'আল হাশিমীয়া' নামক একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন।

প্রশাসনিক কর্তা নিয়োগ

আবুল আব্বাস খলীফা হওয়ার পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর নিকটাত্মীয় ও সমর্থকদের নিয়োগ করেন। এতে তাঁর প্রশাসনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। খলীফা তাঁর ভ্রাতা আবু জাফরকে মেসোপটেমিয়ায়, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের শাসনকর্তা; পিতৃব্য দাউদ ইবনে আলীকে হিজায, ইয়ামেন ও ইয়ামামায় , আব্দুল্লাহ ইবনে আলীকে সিরিয়ায়, সুলাইমান ইবনে আলীকে বসরায়; আবু মুসলিমকে খোরাসানের এবং আয়ুনকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। খালিদ ইবনে বার্মাককে অর্থমন্ত্রী ও আবু সালমা খাল্লালকে উযীর হিসেবে নিযুক্ত করেন।

মৃত্যু ও উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

চার বছর তিন মাস রাজত্ব করার পর ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ ৩০ বছর বয়সে বসন্ত রোগে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ভ্রাতা আবু জাফরকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশাকে তৎপরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। আস-সাফফাহ এক পুত্র মুহাম্মদ ও রাইতা নামক এক কন্যা রেখে যান। পরবর্তীতে আল-মাহদীর সাথে রাইতার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

নিজ বংশের স্বার্থে আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। উমাইয়াদের প্রতি নৃশংস ও নির্মম আচরণ তাকে ইতিহাসে রক্ত পিপাসু স্বীকৃতি দেয়। এসকল নিষ্ঠুরতার উর্ধ্বে তিনি ছিলেন একজন দারুণ সামরিক সংগঠক, দক্ষ সৈনিক ও কর্তব্যপরায়ণ শাসক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল নিষ্কলুষ। তিনি মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন (উম্মে সালমা)। খলীফা তাঁর স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্য ও আত্মীস্বজনকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। এতে তিনি পরিবারের সদস্যদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে সমর্থ হন। তিনি কুফা হতে আনবারে রাজধানী স্থাপন করেন। আব্বাসীদের জন্য একটি নিরাপদ আবাসস্থল তৈরি করেন। তিনি অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ, কুফা হতে মদিনা পর্যন্ত দীর্ঘ জনপথ তৈরি করেন এবং হজ্বযাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি এর স্থানে স্থানে সরাইখানা নির্মাণ করেন। আব্বাসীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় উযির ও জল্লাদের পদ তিনি প্রথম সূচনা করেন। তিনি একজন দূরদর্শী রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

সারসংক্ষেপঃ

মূলত তাঁর বংশের প্রতি উমাইয়াদের নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিশোধ হিসেবেই আবুল আব্বাস উমাইয়াদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলীফা। অতি স্বল্প রাজত্বকালের মধ্যে তিনি রাজধানী স্থাপন, প্রশাসনিক নিয়োগ ও উমাইয়া বিদ্রোহ দমন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আস-সাফফাহ শব্দের অর্থ কী ?

ক) রক্তপাত খ) রক্তপ্রবাহ গ) রক্তপিপাসু ঘ) রক্তের প্রয়োজন

২.আবুল আব্বাস প্রশাসনে আত্মীয়স্বজন নিয়োগ দেন কেন?

ক) প্রশাসনকে অনুকূলে রাখতে খ) ভালোবাসার প্রতিদান দিতে

গ) প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ঘ) আত্মীয়দের অধিকার আদায়ে

৩.আবুল আব্বাসের কৃতিত্ব-

i) রাজধানী প্রতিষ্ঠায় ii) উযির ও জল্লাদের পদ সৃষ্টি iii) দূরদর্শী রাজনীতি বিশেষজ্ঞ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) i,ii ঘ) ii,ii, iii

৪.তিনি ইতিহাসে আস্-সাফ্ফাহ বা রক্তপিপাসু হিসেবে পরিচিত। তিনি নিচের কোন শাসক?

ক) আবু জাফর খ) আবুল আব্বাস গ) আল মনসুর ঘ) মুয়াবিয়া

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জোবায়দা আব্বাসীয় খিলাফতের কাহিনী পড়ছিল। 'x' ছিল এই বংশের প্রথম খলীফা। তাকে আস্-সাফফাহও বলা হয়। তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার সংমিস্রণ ঘটে। স্বল্প রাজত্বকালের মধ্যে তিনি রাজধানী স্থাপন, প্রশাসনিক নিয়োগ ও উমাইয়া বিদ্রোহ দমন করেন।

ক) আব্বাসী বংশের ১ম খলীফা কে? ১

খ) আবুল আব্বাসকে আস-সাফফাহ বলা হয় কেন? ২

গ) উদ্দীপকের 'x' খলীফার প্রশাসনিক সংস্কার উল্লেখ করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকের 'x' খলীফার চরিত্র ও কৃতিত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৮.৩ আবু জাফর আল মনসুর এর শাসনব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আল-মনসুরের পরিচয় ও খিলাফত লাভ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আব্বাসীয় শাসন সুদৃঢ়করণে তাঁর ভূমিকা বিবরণ দিতে পারবেন।
- আল মনসুরের শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল তাঁর বিবরণ দিতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**আল মনসুর (বিজয়), প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, 'দারুস-সালম',স্বাধীন আল-আমিরাত, দলপতি সানবাদ, রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়, খালিদ বিন বার্মাক ও 'নফস উস-জাকিয়া'**

পরিচয়

আবু জাফর আল মনসুর ছিলেন আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলীফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহর জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা। তাঁর নাম ছিল আবু জাফর। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি আল মনসুর (বিজয়) উপাধি গ্রহণ করেন। ইতিহাসে তিনি এই নামেই অধিক পরিচিত।

খিলাফত লাভ

আবুল আব্বাস ৭৫৪ খ্রিঃ মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ভ্রাতা আবু জাফরকে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করে যান। এই সময় আবু জাফর মক্কায় হজ্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দ্রুত কুফায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অভ্যন্তরীণ নীতি

আবুল আব্বাস যদি আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা হন তাহলে আবু জাফর আল মনসুর ছিলেন এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছিলেন, বিদ্রোহ দমন করেন এবং সুন্নী ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শাসনপ্রণালীতে ধর্মীয় ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটান। তিনি তাঁর বংশের স্বার্থ রক্ষার্থে তাঁর শত্রু মিত্র উভয়কেই সমান নজরে দেখতেন।

আব্দুল্লাহর বিদ্রোহ দমন

আল মনসুরের খিলাফত লাভের পর তাঁর চাচা সিরিয়ার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কারণ আবুল আব্বাসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাবের যুদ্ধে যিনি বিজয়ী হবেন তিনি পরবর্তীতে খিলাফতের অধিকারী। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলে আব্দুল্লাহ বিদ্রোহী হন। আল-মনসুর আবু মুসলিমকে আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ৭৫৪ খ্রিঃ নাসিবিনের যুদ্ধে আবু মুসলিম আব্দুল্লাহকে এক তুমূল যুদ্ধে পরাজিত করেন। আব্দুল্লাহ বসরায় তাঁর ভ্রাতা সুলায়মানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে আব্দুল্লাহ তাঁর পুত্রসহ হাশিমীয়ার অনতিদূরে একটি দুর্গে কারারুদ্ধ হন। সাত বছর বন্দী থাকার পর তাকে লবণের ভিত্তির উপরে নির্মিত একটি প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু একদিন প্রবল বর্ষণে বাড়িটি ধ্বসে পড়ে ও আব্দুল্লাহ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে নিহত হন।

আবু মুসলিমের পতন

আবু মুসলিম খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। তাই তিনি ভবিষ্যতে খিলাফতের প্রতি হুমকি স্বরূপ হওয়ার পূর্বেই তাকে দমনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আবু মুসলিমকে আল মনসুর রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর সাথে উচ্চবাক্যের পর কৌশলে তাকে গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যা করেন। আবু মুসলিম ছিলেন আব্বাসী বংশের 'Kingmaker', একজন অসাধারণ সামরিক সংগঠক। তিনি প্রায় ৬ লক্ষ উমাইয়াকে প্রাণে হত্যা করেছিলেন। তাই ভবিষ্যতের হুমকি মনে করে আল মনসুর তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।

সানবাদের বিদ্রোহ দমন

আবু মুসলিমের পতনের পরে পারস্য ও খোরাসান অঞ্চলে তাঁর অনুচর ও সমর্থকগণ ব্যাপক বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন মাজুনি দলপতি সানবাদ। খলীফা আল মনসুর খোরাসানের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে সানবাদ নিহত হন। এরপর খোরসান অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় আবু মুসলিমের অপর একজন সেনাপতি আবু নাসের খলীফার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং খলীফা তাকে ক্ষমা করে দেন।

রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়কে দমন

পারস্যের রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় আল মনসুরকে 'আল্লাহর অবতার' বলে গণ্য করত। তারা উগ্রপন্থী ছিল এবং ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের জন্য খলীফা ৭৫৮ খ্রি: ২০০ জন রাওয়ান্দিয়াকে বন্দী করেন। এর কিছুদিন পর এই সম্প্রদায়ের প্রায় ৬০০ লোক খলীফার সাথে রাজদরবারে দেখা করতে এসে খলীফাকে আক্রমণ করে। এই সময় মায়ান বিন যায়দার হস্তক্ষেপের ফলে খলীফা রক্ষা পান। পরবর্তীতে খলীফা রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়কে কঠোর হস্তে দমন করেন।

তাবারিস্তান ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমন

রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়কে দমনের পর ৭৫৯ খ্রি: খোরাসানের শাসনকর্তা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য খলীফা তাঁর পুত্র আল-মাহদী ও সেনাপতি খুযাইমাকে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীদের নেতা পলায়ন করেন এবং এতে বিদোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে খোরাসানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর তাবারিস্তানের শাসনকর্তা ইস্পাহান্দা বিদ্রোহী হলে আল-মাহদী তাকেও পরাজিত করেন। পরবর্তীতে ৭৭৫ খ্রি: খালিদ বিন বার্মাককে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

ইফ্রিকিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা

এই সময় ইফ্রিকিয়াতে বার্বার ও খারিজীগণ আব্বাসীয় খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে খলীফা আল-মনসুর ৭৭২ খ্রি: তাদের দমন করেন এবং ইফ্রিকিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ইয়াজিদ ইবনে মুহাল্লাব এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফল হন ও ১৫ বছর শাসন করেন।

আলী বংশীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান

যদিও আলী বংশীয়গণ আব্বাসীয় আন্দোলনে ব্যাপক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন কিন্তু তাদের প্রতি আব্বাসী খলীফাগণ সুবিচার করেননি। তারা ভবিষ্যতে খিলাফত দাবি করবে এই আশংকায় আল-মনসুর তাদেরকে নির্মূল করার নীতি গ্রহণ করেন। উমাইয়া খিলাফত পতনেরকালে মদীনায় সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয় যে, উমাইয়াদের পতনের পর ইমাম হাসানের প্রপৌত্র মুহাম্মদ খিলাফত গ্রহণ করবেন, সকলে তাকে তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতার জন্য 'নফস উস-যাকিয়া' (পবিত্র আত্মা) উপাধিতে ভূষিত করেন। মদিনায় ইমাম হাসান ও হুসাইনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক কারারুদ্ধ হন। এভাবে আল মনসুর তাঁর রাজত্বকালের কলঙ্কময় অধ্যায় রচিত করেন।

রাজ্যবিস্তার

৭৭৩ খ্রি: আল মনসুর রোমানদের বিরুদ্ধে সালিহ ও আব্বাসের নেতৃত্বে ৭০ হাজারের একটি মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে রোমান সম্রাট ৪র্থ কনস্টানটাইন পরাজিত হন ও বার্ষিক কর প্রদান করতে সম্মত হন। মালাতিয়া দুর্গ পুনরায় আব্বাসীয়দের দখলভুক্ত হয়। সাম্রাজ্যের সুরক্ষার জন্য তিনি গ্রীক সীমান্তে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তাবারিস্তানের অধিবাসীগণ ৭৫৯-৬০ খ্রি: তাদের যুবরাজ ইস্পাহান্দের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করলে, আল মনসুর অভিযান প্রেরণ করে তাদের দমন করেন। তাবারিস্তান ও গীলান তাঁর দখলে আসে। দায়লম অঞ্চলটিও আব্বাসীয়দের অধীনস্থ হয়। খালিদ বিন বার্মাককের নেতৃত্বে এশিয়া মাইনরের উপজাতীয়দের বিদ্রোহ দমন করেন। জর্জিয়া, মসুল, আর্মেনিয়া ও কুর্দিস্তান তাঁর সাম্রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত হয়। তিনি স্পেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। যেখানে ৭৫৬ খ্রি: অপর একটি উমাইয়া স্বাধীন আল-আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁর এই অভিযানটি সফল হয়নি।

খলীফা মনসুর ২২ বছর রাজত্ব করার পর ৬৫ বছর বয়সে ৭৭৫ খ্রি: মৃত্যুবরণ করেন। মক্কায় হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে পথিমধ্যে বীরে মায়মুনা নামক স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

আবুল আব্বাস তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ভাই আবু জাফর ও তাঁর পরে তাঁর ভাতিজা ঈসাকে পর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে যান। কিন্তু খিলাফত লাভের পর আল মনসুর ঈসাকে খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তদ্বীয়পুত্র মুহাম্মদকে 'আল-মাহদী' উপাধি দিয়ে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা

বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা (৭৬২-৬৬) করে খলীফা আল-মনসুর চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি তাঁর বংশের জন্য একটি নিরাপদ আবাসস্থল খুঁজতে থাকেন এবং পারস্য সম্রাট কিসরার গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল বাগদাদকে মনোনীত করেন। এটি দজলা নদীর পশ্চিম তীরে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ অবস্থিত। সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চল হতে আনীত ১,০০,০০০ শ্রমিক ও শিল্পী সুদীর্ঘ ৪ বছর (৭৬২-৬৬) অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রায় ৪৮,৮৩,০০০ দিরহাম ব্যয়ে এ নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। এ নগরীর নামকরণ হয় 'দারুস-সালম' (শান্তি নিবাস)। এটিকে খলীফার নামানুসারে 'মনসুরীয়া'ও বলা হয়ে থাকে। এটি ছিল বৃত্তাকার ও ২ প্রাচীর বিশিষ্ট নগরী এর কেন্দ্র ছিল। রাজপ্রাসাদ, জামে মসজিদ, প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের অট্টালিকা, উদ্যান ও কৃত্রিম ফোয়ারা। আরব্য রজনীর বাগদাদ ছিল তৎকালীন বিশ্বের বিস্ময় ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্র।

নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠন

আল-মনসুর বহিঃশক্তির আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকা ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের জন্য একটি সুদক্ষ নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠন করেন। তিনি সৈনিকদের উচ্চ পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করেন।

গুপ্তচর বাহিনী নিয়োগ

তিনি অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য গুপ্তচর বাহিনী গঠন করেন। যা সাম্রাজ্যের সর্বত্র হতে খলীফাকে সংবাদ প্রেরণ করতো।

প্রদেশের সীমানা পুনঃনির্ধারন

বিশাল সাম্রাজ্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য তিনি প্রদেশের সীমানা নির্ধারণ করেন। সৎ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি প্রদেশপাল নিয়োগ করতেন। সুষ্ঠুভাবে শাসন কার্য পরিচালনার জন্য তিনি প্রশাসনিক কর্মচারীদের রদবদল করতেন।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য খলীফা আল-মনসুর সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহরে কাজী নিয়োগ করেছিলেন। বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কাজীগণ নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ছিলেন। মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমানকে বাগদাদের প্রধান কাজী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তিনি উক্ত পদে প্রায় ২০ বছর বহাল ছিলেন। খলীফা বিচারকার্যের প্রতি আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখে গেছেন। একদা তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় উস্ট্রের মালিকের অভিযোগ আরোপিত হলে তিনি কাজীর রায় মেনে নেন এবং কাজীকে তাঁর সততা ও নিরপেক্ষতার জন্য পুরস্কৃত করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক

খলীফা আল-মনসুর শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আব্বাসীয় খিলাফতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ভিত্তি তিনিই প্রথম রচনা করেন। তিনি তাঁর রাজ্য জুড়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি নিজেও একজন শিক্ষানুরাগী ও পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি

খলীফা আল-মনসুর তাঁর জনগণের কল্যাণ ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্য বহু রাজপথ, সরাইখানা, নগর ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি অর্থনীতির প্রতি মনোযোগী হন। তিনি শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার স্থাপন করেন।

সারসংক্ষেপঃ

আবুল আব্বাস যদিও ৭৫০ খ্রিঃ আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন তথাপি খিলাফতকে একটি সার্বিক কাঠামোতে রূপদান করেন খলীফা আবু জাফর আল-মনসুর। তিনি আব্বাসীয় বংশের সম্ভাব্য সকল বাধাকে অপসারণ করেন, নিজ চাচা আব্দুল্লাহ ও শ্রেষ্ঠ সংগঠক আবু মুসলিমকেও তিনি ক্ষমা করেননি। আব্বাসীয় বংশধরদের জন্য তিনি বিখ্যাত সুরক্ষিত বাগদাদ নগরী নির্মাণ করেন এবং রাষ্ট্রকে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামোতে বিন্যস্ত করেন। তাই তিনিই ছিলেন আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আল-মনসুর শব্দের অর্থ কী?

ক) রক্তপিপাসু খ) শ্রেষ্ঠ
গ) বিজয়ী ঘ) বিশ্বাসী

২. আবু-মুসলিমকে আল-মনসুর হত্যা করেন কেন?

ক) খিলাফতের উত্তরসূরী ভেবে খ) খিলাফতের দাবিদার ভেবে
গ) খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে ঘ) খিলাফতের যোগ্য ভেবে

৩. বাগদাদ শহরের নাম করা হয়-

i) দারুস সালাম ii) মানসুরিয়া iii) শান্তিনিবাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) i,ii ঘ) i, ii, iii

৪. মতিন রসুলপুরে আব্বাসী বংশের রাজধানী স্থাপন করেন। রসুলপুর নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে?

ক) কুফা খ) বাগদাদ
গ) বসরা ঘ) ইফ্রিকিয়া

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

বায়জীদ তাঁর ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ শুনে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর ভ্রাতা মৃত্যুর পূর্বে তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। তাই তিনি দেশে ফিরে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁর শাসনের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল- বিদ্রোহ দমন, রাজ্যবিস্তার, প্রশাসনিক কাঠামোর বিন্যাস।

ক) আল-মনসুর কত খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহন করেন? ১
খ) খলীফা আল-মনসুরই আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ব্যাখ্যা করুন। ২
গ) উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন খলীফার সাথে মিল রয়েছে তাঁর রাজ্যবিস্তার আলোচনা করুন। ৩
ঘ) আপনি কী মনে করেন, বায়জীদ একজন দক্ষ শাসক? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৮.৪ আবু জাফর আল-মানসুর এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আল মনসুরের চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- খলীফা আল-মনসুরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**প্রাক-ইসলামী যুগ, ভারতীয় 'সিদ্ধান্ত', বাবুল জাহাব, কাসরুল খুলদ, রুসাফা রাজপ্রাসাদ, রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন, হানাফী ও মালেকী মাজহাব**

চারিত্রিক সংমিশ্রণ

খলীফা আবু জাফর আল-মনসুর দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ ও ক্ষীণদেহের অধিকারী ছিলেন। তার চরিত্রে দোষ-গুণের বিচিত্র সমাবেশ লক্ষ করা যায়। একদিকে তিনি ছিলেন কোমল, প্রজারঞ্জক, ন্যায়পরায়ণ, আদর্শবাদী ও দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব। অপরদিকে তিনি ছিলেন শত্রুর প্রতি অত্যাচারী, কপট, বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ও স্বৈরাচারি শাসক। তিনি সানবাদের বিদ্রোহ, হিরাতের বিদ্রোহ ও বার্বার খারিজীদের বিদ্রোহ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে দমন করেছিলেন। অপরদিকে ইমাম হাসানের বংশধর মুহাম্মদ ও ইব্রাহিমের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ। তিনি তাঁর পিতৃব্য আব্দুল্লাহ, ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসাকে তাদের দাবি হতে অপসৃত করেন। আবু মুসলিম খোরাসানীর মত যোগ্য ও মেধাবী ব্যক্তিত্বকে তিনি নিজ বংশের স্বার্থরক্ষার জন্য হত্যা করেছিলেন। আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় করার জন্য তিনি এই কঠোরতা অবলম্বন করেন।

আদর্শবান

ব্যক্তিগত জীবনে আবু জাফর আল-মনসুর ছিলেন আদর্শবান ব্যক্তি। কোন প্রকার চারিত্রিক দুর্বলতা তাঁর ছিল না। অপবিত্রতা ও অশালীনতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। ন্যায়-নিষ্ঠ, মিতব্যয়ী, ধৈর্যশীল ও কঠোর পরিশ্রমী হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্র মুহাম্মদ আল-মাহদীকে যে অছিয়ত দান করেন তা তাঁর অভিজ্ঞতা দৃঢ় চরিত্র ও উন্নত শাসনদক্ষতার পরিচয় বহন করে।

আল-মনসুরের কৃতিত্ব :

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি

খলীফা আল-মনসুর একজন রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টির মাধ্যমে বুঝতে সক্ষম হন যে, আব্বাসীয় খিলাফত একসময় বিলুপ্ত হবে, তাই জনগণের সমর্থন ও আস্থা অর্জনের মধ্যে দিয়ে এর স্থায়িত্বকে ধরে রাখা সম্ভবপর হবে। তাই তিনি পার্থিব ক্ষমতার সাথে আধ্যাত্মিকতার এক সংমিশ্রণ ঘটান। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সুন্নী মতবাদের ভিত্তি গড়ে ওঠে। হানাফী ও মালেকী মাযহাব গড়ে ওঠেছিল। এর ফলে শিয়াদের আধিপত্য অনেকটা হ্রাস পায় ও খলীফা ধর্মীয়ভাবে অনেকটা স্বীকৃতি পান।

প্রশাসনিক সংস্কার

আব্বাসীয় খিলাফতের উযীর ও জল্লাদের পদটি আবু জাফর আল-মনসুরের সময় অব্যাহত থাকে। উযীর খলীফাকে শাসনকার্যে নানাভাবে সাহায্য করেন। খালিদ বিন বার্মাকী তাঁর প্রধান উযীর ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে খলীফা আল মানসুর আব্বাসীয় প্রশাসনকে একটি মজবুত কাঠামো দান করেছিলেন।

আব্বাসী বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা

আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ মাত্র ৩ বছর রাজত্ব করেন, তাই তিনি আব্বাসীয়দের শাসন কাঠামো তৈরী করে যেতে পারেননি। তিনি কেবল আব্বাসীয়দের চিরশত্রু উমাইয়াদের প্রতি ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ কার্যকরণ করেছিলেন। কিন্তু খলীফা আল-মানসুর সিংহাসনে আরোহন করে অভ্যন্তরীন বিদ্রোহসমূহ দমন করেন, আব্বাসীয় খিলাফতের সম্ভাব্য হুমকি ও

সমস্যাগুলোকে প্রতিহত করেন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য সিংহাসন নিষ্কন্টক করেন। বাগদাদ নগরীর মত সুরক্ষিত একটি রাজধানী স্থাপন করেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও তিনি সমান সফলতা অর্জন করেন। তাই তিনিই ছিলেন আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। Syed Ameer Ali এই প্রসংগে বলেন-Although Saffah is the first sovereign of the Banu Abbas, Abu Jafor must be regarded as the real founder of the dynasty.

বিজেতা হিসেবে

বিজেতা হিসেবেও খলীফা আল-মনসুর অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি ৭৭৩ খ্রিঃ রোমান সম্রাট ৪র্থ কনস্টানটাইনকে পরাজিত করে মালাসিয়া দুর্গটি দখল করেন। গ্রীক সীমান্তে নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণ করেন। তারাকিস্তান, আর্মেনিয়া, কুর্দিস্তান তাঁর সময়ে আব্বাসীয়দের হস্তগত হয়।

অভ্যন্তরীন বিদ্রোহ দমন

ক্ষমতায় আরোহণ করেই খলীফা আল-মনসুর অভ্যন্তরীন বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সানবাদের বিদ্রোহ, আফ্রিকার বার্বার ও খারিজী বিদ্রোহ, খুরাসান ও তাবারিস্তানের বিদ্রোহ এবং রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহকে দমন করে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদ্যানুরাগী নরপতি

খলীফা আল-মনসুর একজন বিদ্যানুরাগী নরপতি ছিলেন। আব্বাসীয়দের দ্বারা শিক্ষা-সংস্কৃতির যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো তাঁর বীজ আবু জাফর আল-মনসুর কর্তৃক রোপিত হয়েছিল। আব্বাসীয়দের যুগ ছিল তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ যার সূত্রপাত হয় আল-মনসুরের সময়কাল হতে। খলীফা বহু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা নির্মাণ ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি নিজেও বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সময়ে কুরআনের তাফসীর (ব্যাখ্যা) এবং হাদীস সংকলিত ও সংগৃহীত হয়। তিনি প্রাক-ইসলামী যুগের আরবী কবিতা সমূহও লিপিবদ্ধ করেন।

অনুবাদ বিভাগ স্থাপন

খলীফার রাজদরবারে অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণী সমাদর পেতেন। খলীফা তাদের সমন্বয়ে একটি অনুবাদ বিভাগ স্থাপন করেন। এই বিভাগ গ্রীক, পারসিক, সংস্কৃত প্রভৃতি নানান ভাষায় লিখিত বহু মূল্যবান পুস্তকাদি আরবী ভাষায় অনুবাদ করে। তাঁর তত্ত্বাবধানে এরিস্টটল, ইউক্লিড ও টলেমীর গ্রন্থসমূহ, ভারতীয় 'সিদ্ধান্ত' খণ্ডকা-খাদ্যকা, হিতোপদেশ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ

স্থাপত্য শিল্পে আবু জাফর আল-মনসুরের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত টাইগ্রীস নদীর তীরে অবস্থিত বৃত্তাকার বাগদাদ নগরী জগৎ বিখ্যাত। তিনি রাফিকা নামক অপর একটি শহরও নির্মাণ করেন। কুফা ও বসরা নগরীর প্রাচীর, বাব আল-যাহাব (স্বর্ণদ্বার), কাসরুল খুলদ (অনন্তধারা) ও রুসাফা রাজপ্রাসাদ তাঁর স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

সারসংক্ষেপঃ

আবু জাফর আল-মানসুর ছিলেন বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে গঠিত একজন মানুষ। তাঁর চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিস্রণ ঘটেছিল। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনার ফলেই আব্বাসীয় খিলাফত গৌরবের যুগে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি ন্যায়বিচারক, প্রজাহিতৈষী, শ্রেষ্ঠ বিজেতা, বিদ্যানুরাগী ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই নৃপতির মাধ্যমেই আব্বাসীয়রা গৌরবের সাথে ৫০৮ বছর শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ তিনিই ছিলেন এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. খালিদ বিন বার্মাক কে ছিলেন?

ক) সেনাপ্রধান খ) জল্লাদ

গ) মানসুরের প্রথম উযির ঘ) সভাপতি

২. আল-মনসুর জনগণের সমর্থন ও আস্থা অর্জনে জোর দেন কেন?

ক) বংশের স্থায়িত্ব ধরে রাখতে খ) আর্থিক উন্নতির জন্য

গ)জনবল বৃদ্ধি করতে ঘ) কোনটিই নয়

৩. আবু জাফর আল-মনসুরকে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলার কারণ হলো-

i)রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করেন ii)বিদ্রোহ দমন করেন

iii)সম্ভাব্য হুমকি ও সমস্যা প্রতিহত করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) ii,iii ঘ) ii,iii

৪. আব্বাসীয় খলীফা 'x' অনুবাদ বিভাগ স্থাপন করেন। 'x' নিচের কোনটি?

ক) হারুন অর-রশিদ খ) আল-মনসুর

গ) আল-মামুন ঘ) আবুল আব্বাস

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ইসহাক সাহেব ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক। তিনি চৌধুরী বংশের শাসক জহির সম্পর্কে আলোচনা করলেন যিনি চৌধুরী বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁর শাসনকালে বিদ্রোহ দমন, প্রশাসনিক উন্নয়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটান। তিনি ছিলেন রাজনীতিক, কূটনীতিক এবং শাসন ক্ষমতায় এক প্রকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ক) আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ) আল-মানসুরের চরিত্রে দোষ গুণের বিচিত্র সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। ব্যাখ্যা করুন। ২

গ) উদ্দীপকের জহির যে শাসকের প্রতিনিধিত্ব করে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁর অবদান লিখুন। ৩

ঘ) আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আল-মানসুরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৮.৫ আল-মাহদী ও আল-হাদী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আল-মাহদীর পরিচয় ও রাজত্বকাল সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আল-হাদীর পরিচয় ও তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন

	মুখ্য শব্দ	**প্রজাবৎসল, জিন্দিক সম্প্রদায়, মুবাইয়া (শ্বেতবসন পরিহিত), আল-হাদী, মুকান্না, মুহাম্মির ও ইদ্রিসীয় বংশ**

আল-মাহদী-(৭৭৫-৭৮৫) খ্রিঃ

খলীফা আবু জাফর আল-মানসুরের পুত্র ছিলেন মুহাম্মদ। তিনি ৭৭৫ খ্রিঃ আল-মাহদী উপাধি নিয়ে বাগদাদের আব্বাসীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শাসননীতি

শাসনপ্রণালীর ক্ষেত্রে আল-মাহদী ছিলেন তাঁর পিতার বিপরীত। তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। অযথা রক্তপাত ও কঠোরতা পরিহার করে তিনি উদার ও সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি প্রজাবৎসল ও দয়ালু ছিলেন। তিনি অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের মুক্তি দেন এবং হজ্ব পালনের জন্য ৭৭৬-৭৭ খ্রিঃ মক্কা ও মদীনাবাসীর মাঝে ৩ কোটি দিরহাম দান করেন।

বিদ্রোহ দমন :

ক) খোরসানে বিদ্রোহ : আল-মাহদীর সময়ে খোরাসানে এ বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়। এর নেতৃত্ব দেন ইউসুফ ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী ইয়াকুব ইবনে দাউদ। আল-মাহদী তাদের বন্দী করে কারাগারে পাঠান। ফলে খোরাসানের বিদ্রোহ দমন সম্ভবপর হয়েছিল।

খ) মুকান্নার আবির্ভাব : তাঁর রাজত্বকালে মুকান্না নামে এক ভণ্ডনবীর আবির্ভাব ঘটে। সে সর্বদা মুখোশ পরিধান করতো। তাই তাকে বলা হতো মুকান্না। সে নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করেন। তার অনুচরবর্গ সাদা পোষাক পরিধান করতো। তাই তাদেরকে মুবাইয়া (শ্বেতবসন পরিহিত) বলা হতো। খলীফা মুকান্নার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

গ) যিন্দিক সম্প্রদায় : এই সময় কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বদিকে জুরজান নামক স্থানে মুহাম্মির বা লাল পোশাক পরিহিত ধর্মদ্রোহী জিন্দিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। খলীফা এ সম্প্রদায়কে কঠোর হস্তে প্রতিহত করেন।

গ্রীকদের বিরুদ্ধে অভিযান

৭৭৮ খ্রিঃ গ্রীক সৈন্যরা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে এবং সেখানে ব্যাপক লুটতরাজ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। খলীফা তাঁর পুত্র হারুনকে সৈন্যসহ সেখানে এক অভিযান প্রেরণ করেন। গ্রীক সৈন্যরা পরাজিত হয় এবং সম্রাজ্ঞী আইরিন বার্ষিক কর দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ও মৃত্যু

আল-মাহদী ১০ বছর শাসন করেন। এই সময় আব্বাসীয় সাম্রাজ্য সুসংহত ও সমৃদ্ধি অর্জন করে। আল-মাহদী ৭৮৫ খ্রিঃ মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর দুই পুত্র মুসা ও হারুনকে পর পর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

আল-হাদী- (৭৮৫-৮০৯) খ্রিঃ

ক্ষমতায় আরোহণ : পিতা আল-মাহদীর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ্য পুত্র মুসা 'আল-হাদী' (পথ প্রদর্শক) উপাধি নিয়ে ৭৮৫ খ্রিঃ বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি তাঁর পিতার মনোনয়নকে অস্বীকার করেন এবং পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর ভ্রাতা হারুনের পরিবর্তে নিজ পুত্র জাফরকে মনোনীত করেন। এই সময় হারুনের কতিপয় সমর্থক ও প্রধান উপদেষ্টা খালিদ বিন বার্মাককে তাঁর অনুচরসহ বন্দী করেন। রাজপ্রাসাদ অনিরাপদ হয়ে পড়লে হারুন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন ও অন্যত্র আশ্রয় নেন। আল-হাদীর স্বল্পকালীন রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ইরাক ও খোরাসানে খারিজী বিদ্রোহ ও যিন্দিকীয় বিদ্রোহ। তিনি এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। তাঁর শাসনামলের অপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে মরক্কোতে ইদ্রিসীয় বংশ প্রতিষ্ঠা।

চরিত্র : ৭৮৬ খ্রিঃ বাগদাদের নিকটবর্তী ঈসাবাদ নামক জায়গায় নৌবিহারকালে আল-হাদী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর মাতার কাছে তাঁর অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং পিতার ইচ্ছানুসারে তাঁর ভ্রাতা হারুনকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনীত করেন।

সারসংক্ষেপঃ

খলীফা আল-মাহদী ও আল হাদী অতি অল্প সময় আব্বাসীয় খিলাফত পরিচালনা করেন। তাঁরা মূলত আবু জাফর আল-মানসুরের শাসনকাঠামো অনুসরণ করেছেন। তাঁদের রাজত্বকাল আব্বাসীয় খিলাফতের একটি অনুজ্জল অধ্যায় হলেও তাদের পরবর্তী খলীফা হারুন এর রাজত্বকাল ছিল গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায়। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে মরক্কোতে ইদ্রিসীয় বংশ প্রতিষ্ঠা, ভণ্ডনবী মুকান্নার আবির্ভাব, যিন্দিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও গ্রীক-আব্বাসীয় পারস্পরিক সম্পর্ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোন শাসকের সময়ে মরক্কোর ইদ্রিসীয় বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) আল-মাহদী খ) আল-হাদী গ) আল-মনসুর ঘ) হারুন-অর-রশিদ

২. আল-মাহদী কেমন প্রকৃতির ছিলেন?
ক) কঠোর প্রকৃতির খ) ভীরু প্রকৃতির গ) দয়ালু ও প্রজাবৎসল ঘ) উগ্র প্রকৃতির

৩. মাহদী ও হাদীর সময়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা-
i)মুকান্নার আবির্ভাব ii) ইদ্রিসীয় বংশ প্রতিষ্ঠা iii)যিন্দিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i,ii ঘ) i, ii, iii

৪. 'ক' শাসকের সময়ে সম্রাজ্ঞী আইরিন কর প্রদানে বাধ্য হন। 'ক' নিচের কোনটি নির্দেশ করে।
ক) আল-মাহদী খ) আল-হাদী গ) আল-মনসুর ঘ) কোনটিই নয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রফিক তাঁর ইসলামের ইতিহাস বইতে আব্বাসীয় খিলাফতের ইতিহাস পড়ছিল। আব্বাসীয় ৩৭ জন শাসকের মধ্যে আল-মানসুরের মৃত্যুর পর দুজন শাসক পর পর শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করে এবং স্বল্প সময় শাসন করে।

ক) আল-মাহদী কার উপাধি? ১
খ) আল-মাহদীর সময়ে মুকান্নার কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিন। ২
গ) উদ্দীপকে যে দুজন শাসকের কথা বলা হয়েছে তাদের পরিচয় লিখুন। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকদ্বয়ের কৃতিত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৮.৬ হারুন-অর-রশিদের খিলাফত লাভ এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলীফা হারুন-অর-রশিদ এর পরিচয় ও খিলাফত লাভের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- খলীফা হারুন-অর-রশিদের অভ্যন্তরীণ নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- খলীফা হারুন-অর-রশিদের বৈদেশিক নীতি আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**নরপতি, বাগদাদ নগরীর স্রষ্টা ও 'আরব জোয়ান-অব-আর্ক'**

পরিচয়

বিশ্বের ইতিহাসে যে সকল নরপতি গৌরবের ইতিহাস রচনা করেছেন, যারা ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-রশিদ তাদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন রূপকথার বাগদাদ নগরীর স্রষ্টা। তাঁর খিলাফত আব্বাসীয় বংশকে এমনই এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল যা আর কোন শাসকের পক্ষে তেমনটি সম্ভব হয়নি। ৩৭ জন আব্বাসীয় খলীফার মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা সফল রাজনীতিবিদ, সমরনায়ক, শ্রেষ্ঠ শাসক, প্রজারঞ্জক, বিদ্যানুরাগী ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। তিনি ছিলেন খলীফা আল-মাহদীর কনিষ্ঠ পুত্র এবং আল-হাদীর ভ্রাতা।

খিলাফত লাভ ও প্রাথমিক কার্যাবলি

ভ্রাতা আল-হাদীর মৃত্যুর পর ৭৮৬ খ্রি: ২৫ বছর বয়সে হারুন-অর-রশীদ বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে বসেই তিনি তাঁর মাতা খায়জুরানকে সকল প্রকার সুবিধা প্রদান করেন। খলীফা তাঁর বাল্য শিক্ষক বিখ্যাত ইয়াহিয়া বিন-খালিদ বার্মাকীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তাঁর পুত্রদ্বয় ফজল ও জাফরকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করেন।

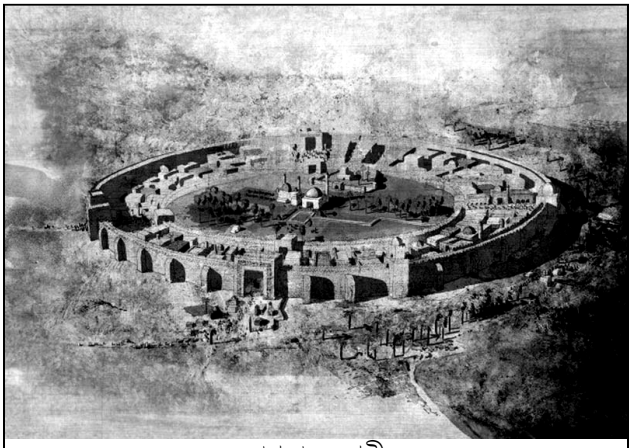

বাগদাদ নগরী

অভ্যন্তরীণ নীতি

খারিজী বিদ্রোহ দমন : তার খিলাফতের শুরুতেই খারিজীরা বিদ্রোহ শুরু করে। ৭৮৭-৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মসুলে প্রথম খারিজী উপদ্রব দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা মেসোপটেমিয়ার রাজধানী দখল করলে খলীফা তাঁর সেনাবাহিনীর সহায়তায় বিদ্রোহ দমন করেন। ওয়ালিদ বিন তারিকের নেতৃত্বে অপর একটি বিদ্রোহ নাসিবিনে শুরু হয়। খারিজীগণ আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান আক্রমণ করেন এবং হলওয়ান পর্যন্ত তাদের প্রভাব বিস্তার করে। এক যুদ্ধে তাদের নেতা ওয়ালিদ নিহত হলে তাঁর ভগ্নী লায়লা খারিজীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। খলীফার বাহিনী তাঁর নিকট পরাজিত হয়। অবশেষে জনৈক সেনাপতি তাকে অস্ত্র ত্যাগ করে পারিবারিক জীবনে ফিরে যেতে অনুরোধ করলে তিনি বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটান। তিনি আরবীয় ইতিহাসে 'আরব জোয়ান-অব-আর্ক' (Arab Joan-of-Arc) নামে পরিচিত। তিনি রূপসী ও সুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।

মধ্য-এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা : খলীফা হারুন-অর-রশিদের সময় মধ্য এশিয়ায় সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছিল। ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে কাবুল ও কান্দাহার আব্বাসীদের অধীনস্ত হয় এবং সাম্রাজ্যের সীমানা হিন্দুকুস পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। খলীফা দক্ষ সামরিক কর্মকর্তা এই অঞ্চলে নিয়োগ করেন।

আর্মেনিয়ার খাজার বিদ্রোহ দমন : ৭৯৯ খ্রিঃ খাজার উপজাতি আর্মেনিয়ায় বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। খলীফা তাদেরকে দমন করার জন্য দুজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। তারা এই অভিযানে সফলতা অর্জন করেন।

মুদারীয় ও হিমারীয়দের দমন : এই সময় সিরিয়া অঞ্চলে হিমারীয় ও মুদারীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ানক গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। একই সাথে সিন্ধু প্রদেশেও অনুরূপ গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। খলীফা এই গৃহযুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনাপতি মুসাকে সিরিয়ায় ও সেনাপতি দাউদ মুহাল্লাবীকে সিন্ধু প্রদেশে প্রেরণ করেন।

আলী (রা.) এর বংশধরদের প্রতি আচরণ : আব্বাসীয় খলীফাগণ সর্বদাই আলী (রা.) এর বংশধরদের তাদের নিজ বংশের জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করতেন। খলীফা আল-মানসুর ইমাম হাসান (রা.) এর বংশধর মুহাম্মদ ও ইব্রাহিমকে হত্যা করার পর তাদের ছোট ভাই ইয়াহিয়া দাইলামে আত্মগোপন করেন। খলীফা হারুনের খিলাফতকালে ইয়াহিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফজল বার্মাকী সুকৌশলে এই বিদ্রোহ দমন করেন। খলীফা আলী বংশীয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সাধক মুসা আল-কাযিমকেও কারাগারে বন্দী করেন। ৭৯৯ খ্রিঃ বন্দী অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলী আল-রিজা পরবর্তী ইমাম নিযুক্ত হন।

আফ্রিকায় আঘলাবী শাসন প্রতিষ্ঠা : খলীফা আল-হাদীর সময়ে উত্তর আফ্রিকার মরক্কোতে ইদ্রিসীয় বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই উত্তর আফ্রিকা আব্বাসীয় শাসন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আব্বাসীয় খলীফাগণ বহুচেষ্টা করেও তা পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। খলীফা হারুন-অর-রশিদ ৭৮৭ খ্রিঃ তাঁর সেনাপতি হারসামাকে উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হারসামা প্রায় ৩ বছর যোগ্যতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।
এই প্রদেশের ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থার কথা চিন্তা করে খলীফা হারসামার পরামর্শে বাৎসরিক ৪০,০০০ দিনার কর প্রদানের শর্তে ইব্রাহিম ইবনে আগলাবের উপর ইফ্রিকিয়া অঞ্চলের শাসনভার ছেড়ে দেন। তখন থেকে বংশানুক্রমিকভাবে বাগদাদের খলীফার অনুমোদনক্রমে আফ্রিকায় আঘলাবীয় বংশের শাসন শুরু হয় যা ১০৯ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন : খলীফা হারুন সম্রাজ্ঞী জুবাইদা ও তাঁর ভ্রাতা ঈসার চাপে তাঁর পুত্র মুহাম্মদকে (আল-আল-আমিন) প্রথম উত্তরাধিকারী, আব্দুল্লাহ (আল-মামুন) কে দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী ও কনিষ্ঠ পুত্র কাসিম (মুতাসিন) কে পরপর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

বৈদেশিক নীতি

বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ : হারুন-অর-রশীদ ও বাইজান্টাইন শক্তির মধ্যকার বিরোধ ছিল তাঁর সময়ে সর্বাপেক্ষা আলোচিত ঘটনা। খলীফা আল-মাহদীর সময় সম্রাজ্ঞী আইরিন যে চুক্তি করেছিলো তা ভঙ্গ হয়। ৭৯১ খিস্টাব্দে আব্বাসীয় অধীনস্ত রাজ্য আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে। মুসলিম সেনাবাহিনী বাইজানটাইনদের কাছ হতে মাতাবা ও আনসিরা শহর দুটি এবং ভূমধ্যসাগরীয় সাইপ্রাস ও ক্রীট দ্বীপ দুটিও দখল করে নেয়। ৮০২ খ্রিঃ সম্রাজ্ঞী আইরিন সিংহাসনচ্যুত হন এবং কোষাধ্যক্ষ নাইসিফোরাস ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। নাইসিফোরাস খলীফার নিকট অপমানসূচক পত্র প্রেরণ করেন এবং সম্রাজ্ঞী আইরিন প্রদত্ত করের দ্বিগুণ অর্থ দাবি করেন।
ক্ষুব্ধ খলীফা তাঁর সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং নাইসিফোরাসকে পরাজিত ও কর প্রদানে বাধ্য করেন। চুক্তি ভঙ্গকারী নাইসিফোরাস পরপর ৩ বার খলীফার সাথে চুক্তিভঙ্গ করেন এবং প্রতিবারই খলীফা তাঁর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে তাকে পরাজিত ও কর প্রদানে বাধ্য করেন। এতে একদিকে খলীফা হারুন-অর-রশীদের উদারতা ও অপরদিকে তাঁর অদূরদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে।

কূটনৈতিক সম্পর্ক : হারুন-অর-রশীদের সুনাম সুখ্যাতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি চীনা সম্রাট ফাগফুরকে দূত প্রেরণ করে তাঁর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। ভারতবর্ষেও তিনি উপহার ও দূত প্রেরণ করেন। ফ্রান্সের রাজা শার্লিমেনের সাথে তাঁর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। খলীফা শার্লিমেনকে অত্যন্ত দামী কারুকার্যময় একটি জলঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন।

সারসংক্ষেপঃ

হারুন-অর-রশীদের রাজত্বকাল ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায় সূচনা করে। তিনি কঠোর হস্তে খারিজী বিদ্রোহ, খাজারে বিদ্রোহ, হিমারীয় মুদারীয় দ্বন্দ্ব ও মসুলের বিদ্রোহ দমন করেন। আলী পন্থীদের প্রতিও তিনি তাঁর কঠোর অবস্থান নেন। তাঁর সময়ে মধ্য এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইফ্রিকিয়ায় আগলাবী বংশীয় শাসনের সূত্রপাত হয়। তাঁর বৈদেশিক নীতি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কিংবদন্তী এই খলীফা ছিলেন বাগদাদ নগরীর ঐশ্বর্যের স্রষ্টা। তাঁর সময়ে বাগদাদ নগরী বিশ্বে মর্যাদার আসন লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১.হারুন-অর-রশীদের মায়ের নাম কী?

ক. যুবাইদা　　খ. খাইজুরান

গ. গুলবদন　　ঘ. রাজীয়া

২. খলীফা হারুন-অর-রশীদ আলী বংশীয়দের দমন করেন কেন?

ক.খিলাফতের জন্য হুমকি স্বরূপ বলে　　খ.পূর্বশত্রুতা ছিল বলে

গ.যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল বলে　　ঘ. কোনটিই নয়

৩. খলীফা হারুন-অর-রশীদ

i) খারিজী বিদ্রোহ দমন করেন　　ii) রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেন

iii) হিমারীয় ও মুদারীয়দের দমন করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i　　খ) ii, ii　　গ) i,iii　　ঘ) i,ii, iii

৪. মিরাজের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ, মিরাজ নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে?

ক) মুয়াবিয়া　　খ) হারুন-অর-রশীদ

গ) আল-মাহদী　　ঘ) আল-আব্বাস

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

চৌধুরী বংশের ইতিহাসে হাশিমের নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর শাসন আমলে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ কূটনীতিক। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। তাঁর বৈদেশিক নীতি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ক) হারুন-অর-রশিদ কত সালে সিংহাসনে আরোহন করেন? ১

খ) কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের হারুন-অর-রশিদের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। ব্যাখ্যা করুন। ২

গ) উদ্দীপকে যে শাসকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর বৈদেশিক নীতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) বিদ্রোহ দমনে খলীফা হারুন-অর-রশিদের কৃতিত্ব লিখুন। ৪

পাঠ-৮.৭ হারুন-অর-রশীদের চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হারুন-অর-রশীদের চারিত্রিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- হারুন-অর-রশীদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**বার্মাকী পরিবার, স্বর্ণযুগের দ্রষ্টা, পাশ্চাত্যের শার্লিমেন, নহর-ই-জুবায়দা, 'প্রাচ্যের রাণী', হানাফী মাজহাব ও 'আরব্য রজনীর উপন্যাস'**

হারুন-অর-রশীদের রাজত্বকাল ছিল ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

কঠোর ও কোমলতার সহাবস্থান

আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-রশীদের চরিত্র ছিল কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণে তৈরি। অন্যায় ও বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি ছিলেন কঠোর, অপরদিকে অসহায় ও সম্বলহীনদের জন্য তাঁর হৃদয় ছিল কোমল। তিনি ছিলেন তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ, উদার, মহানুভব, দানবীর ও বিচক্ষণ নরপতি।

ধর্মপরায়ণ

খলীফা হারুন-অর-রশীদ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরও তিনি প্রত্যহ রাত্রিকালে একশত রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন। তিনি তাঁর ২৩ বছর শাসনকালে নয় বার হজ্ব পালন করেন এবং প্রতিবার একশত জন আলিমকে তাঁর সাথে হজ্ব করার জন্য নিয়ে যেতেন। তিনি প্রতিদিন ১০০০ দিরহাম দান করতেন।

সন্দেহপরায়ণতা ও ধৈর্যহীনতা

তার পূর্ববর্তী শাসকদের মত তিনিও সন্দেহপরায়ণ ছিলেন। তাঁর ফলে তিনি আলী (রা.) এর বংশধরদের ও বার্মেকী পরিবারের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেন যা তাঁর ব্যক্তিত্বে স্বৈরাচারী শাসকের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করেছে।

কৃতিত্বসমূহ

স্বর্ণযুগের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা

খলীফা হারুন-অর-রশীদ ছিলেন আব্বাসী খলীফাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের মধ্যে অন্যতম। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন যে, "নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে জাগতিক কার্যকলাপ নিয়ামক দুটি বিশাল ব্যক্তিত্বশালী নৃপতির নাম দেখা যায়- পাশ্চাত্যে শার্লিমেন, আর প্রাচ্যে হারুন-অর-রশীদ, এর দুজনের মধ্যে নিঃসন্দেহে হারুন অধিকতর শক্তিশালী এবং উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন।"

ন্যায় বিচারক ও প্রজারঞ্জক

খলীফা হারুন-অর-রশীদ ন্যায়বিচারক ও প্রজারঞ্জক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্য প্রত্যেক রাত্রিতে ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণ করতেন। তিনি সীমান্ত অঞ্চল ও দুর্গ পরিদর্শন করতেন। তিনি তাঁর কর্মে যত্নশীল ছিলেন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি প্রজাদের মঙ্গল সাধন করতেন।

জনকল্যাণমূলক কাজ

খলীফা হারুন-অর-রশীদ হজ্বযাত্রী ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য বহু স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাকেন্দ্র ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটান।

তাঁর স্ত্রী সম্রাজ্ঞী যুবায়দা মক্কায় হাজীদের পানির কষ্ট দূর করার জন্য নহর-ই-জুবায়দা নামে একটি খাল খনন করেন। খলীফা গরীব ও অসহায় ব্যক্তির জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

সমর কুশলী

খলীফা হারুন-অর-রশীদ ছিলেন আব্বাসীয় বংশের একজন শ্রেষ্ঠ সমরবিদ। তাঁর একটি বিশাল ও সুশিক্ষিত সামরিক বাহিনী ছিল, যার তত্ত্বাবধান খলীফা নিজেই করতেন। বিদ্রোহ দমন ও বৈদেশিক শত্রুকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাঁর সামরিক দক্ষতা তিনি প্রমাণ করেন।

শাসন কাঠামো

দীর্ঘ তেইশ বৎসর রাজত্বকালে খলীফা আব্বাসীয় খিলাফতের জন্য একটি পরিপূরক শাসন কাঠামো সৃষ্টি করেন। বিখ্যাত বার্মাকী উযির পরিবার ছিল খলীফার শাসন কাঠামোর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

বাগদাদের ঐশ্বর্য

খলীফা হারুন-অর-রশীদের রাজত্বকালে বাগদাদ নগরী তৎকালীন বিশ্বে শ্রেষ্ঠ নগরীর মর্যাদা লাভ করে। বাগদাদকে এই সময় অভিহিত করা হত 'প্রাচ্যের রাণী' বলে। ধন-প্রাচুর্যে, শিল্প-সাহিত্যে, অর্থনীতি-বাণিজ্যে, স্থাপত্যশৈলী ও নির্মাণ সকল দিক থেকে বাগদাদ নগরী ছিল অদ্বিতীয়। বাগদাদের বাজার ছিল দেশ-বিদেশের পণ্যে পরিপূর্ণ। বাগদাদের পণ্য ছিল জগৎবিখ্যাত। নৌবন্দর হিসেবে বাগদাদের সুদীর্ঘ পোতাশ্রয় জুড়ে শত শত বাণিজ্য জাহাজ শোভা পেত। বাগদাদের সৌন্দর্য ও আভিজাত্য প্রসংগে P. K. Hitti বলেন, It was then that Baghdad became a city with no peer throughout the whole world'.

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক

খলীফা হারুন-অর-রশীদের রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা প্রকৃত অর্থে বিস্তর লাভ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ এই সময়ে আব্বাসীয়রা অর্জন করতে সক্ষম হয়। বাগদাদ নগরী ছিল পৃথিবীর নানা প্রান্তের জ্ঞানী-গুণীর কর্মস্থল। খলীফা তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। রাজদরবার ছিল তাদের পদচারনায় মুখরিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংগীত, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এই সময়ে শুরু হয়।

খলীফার প্রচেষ্টায় তাঁর পূর্বসূরী খলীফা আল-মনসুরের অনুবাদ বিভাগ সম্প্রসারিত ও বিকশিত হয়। এই সময় হানাফী মাজহাব আত্মপ্রকাশ করে খলীফার প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফের তত্ত্বাবধানে। ইমাম আল বুখারী (রহ.) হাদীসশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। আবু নুয়াস খলীফার রাজদরবারের একজন স্বনামধন্য কবি ছিলেন। আতিয়া ও আসমায়ী যথাক্রমে কবি ও ব্যাকরণবিদ ছিলেন। খলীফার তত্ত্বাবধানে গ্রীক দর্শনের আরবী অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন হয়। খলীফা ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী 'মানকাকে' বাগদাদে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। এছাড়াও সংগীত ও নৃত্যকলাও খলীফার প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তাঁর সময়ের অন্যতম আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আলিফলায়লা ওয়ালা 'আরব্য রজনীর উপন্যাস' রচনা।

হানাফী মাযহাবের পৃষ্ঠপোষকতা

খলীফা হারুন-অর-রশীদ হানাফী মাযহাবকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। খলীফার প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় আইন লিপিবদ্ধ করে সুনামের অধিকারী হন।

কূটনৈতিক সম্পর্ক

খলীফা হারুন-অর-রশীদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিখ্যাত একজন নৃপতি ছিলেন। পাশ্চাত্যের অনেক বরেণ্য নরপতির সাথে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। চীন সম্রাট ফাগফুর ও ফরাসি সম্রাট শার্লিমেনের সাথে খলীফা দূত বিনিময় ও উপহার প্রেরণ করেন।

সারসংক্ষেপঃ

মূলত হারুন-অর-রশীদ ছিলেন আরব্য রজনীর ইতিহাসের নায়ক। তাঁর ঐশ্বর্যশালী বাগদাদ নগরী বিশ্বের কাছে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শিক্ষা, চিকিৎসা, সংগীত, নাট্যকলা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য হারুন-অর-রশীদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, প্রজারঞ্জক ও ন্যায়বিচারক নৃপতি। তাঁর সকল সমালোচনার উর্ধ্বে তাঁর কৃতিত্ব ছাপিয়ে যায়। তিনি ছিলেন আব্বাসীয়দের স্বর্ণযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খলীফা হারুন কোন মাযহাবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন?

ক) শইফয়ী খ) হানাফী
গ) মালিকী ঘ) হাম্বলী

২. 'নহরে জুবায়দা' কেন খনন করা হয়?

ক) বাগদাদে শিক্ষা বিস্তারের জন্য
খ) মক্কার হজ্বযাত্রী ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য
গ) মক্কায় হাজীদের পানিকষ্ট দূর করার জন্য
ঘ) কোনটিই নয়

৩. হারুন-অর-রশীদের অবদান রয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে?

i) শিল্পসাহিত্যে, অর্থনীতি বাণিজ্যের প্রসারে
ii) জ্ঞানীগুণীর পৃষ্ঠপোষকতায়
iii) চিকিৎসা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i, iii খ) i,ii,iii
গ)ii, iii ঘ) কোনটিই নয়

৪. একজন আব্বাসীয় খলীফা প্রতি রাত্রে ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে বের হতেন প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবার জন্য। উদ্দীপকের সাথে কোন আব্বাসীয় খলীফার সাদৃশ্য আছে?

ক) হারুন-অর-রশীদ খ) আল-মনসুর
গ) আল-আল-আমিন ঘ) আল-মামুন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রিমা আব্বাসীয় খিলাফতের একজন শাসক সম্পর্কে পড়ছিল। যাকে বলা হয় আরব্য রজনীর ইতিহাসের নায়ক। তাঁর সময়কালকে বলা হয় আব্বাসীয় খিলাফতের স্বর্ণযুগ। এ সময়ে বাগদাদ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর মর্যাদা লাভ করে। বাগদাদকে বলা হতো প্রাচ্যের রাণী।

ক) হারুন-অর-রশীদের স্ত্রীর নাম কী? ১
খ) খলীফা হারুন-অর-রশীদের জনসেবামূলক কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন। ২
গ) উদ্দীপকে বর্ণিত খলীফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন। ৩
ঘ) "খলীফা হারুনের শাসনকাল আব্বাসীয় খিলাফতের স্বর্ণযুগ"- বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৮.৮ খলীফা আল-আমীন ও খলীফা আল-মামুনের মধ্যকার গৃহযুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলীফা আল-আমিন ও আল-মামুনের মধ্যকার গৃহযুদ্ধের কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গৃহযুদ্ধের ঘটনাবলি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- গৃহযুদ্ধের ফলাফলসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**চঞ্চল-বিলাসী, ভগিনীর পুত্র, আমোদপ্রিয়, উচ্চাভিলাষী ও মনোনয়নপত্র**

৮০৯ খ্রি: খলীফা হারুন-অর-রশিদের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আল-আল-আমিন খলীফার প্রাসাদে গমন করেন। পরের দিন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সকল আমীর, উমরাহ, সেনাপতি ও জনসাধারণের কাছ হতে আনুগত্যের শপথ লাভ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা আল-মামুন ও আরেক ভাই কাসিম তাদের কর্মস্থল মার্ভ ও কিন্নীসিরিন হতে তাদের আনুগত্য ও উপহার প্রেরণ করেন।

আল-আমিন ও আল-মামুনের চরিত্রগত পার্থক্য

আল-আমিন ছিলেন খাঁটি আরব বংশদ্ভূত মাতা যুবাইদার পুত্র। অপরদিকে আল-মামুন ছিলেন একজন পারসিক ক্রীতদাসীর সন্তান। আল-আমিন তাঁর মাতা যুবাইদার ও মাতুল ঈসার তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং অপরদিকে আল-মামুন ছিলেন মাতৃহীন। তিনি উযির জাফর বার্মাকীর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে উভয়েই ছিলেন ভিন্নধর্মী চরিত্রের অধিকারী। আল-আমিন ছিলেন অস্থিরমতি, চঞ্চল-বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত ও আমোদপ্রিয়। কিন্তু আল মামুন ছিলেন প্রজ্ঞাবান-বিচক্ষণ, দার্শনিক ও আইনজ্ঞ। তিনি পবিত্র কুরআন কণ্ঠস্থ করেন। এই চরিত্রগত পার্থক্য খলীফা হারুন-অর-রশীদ ও প্রজাদের নিকট তাঁকে অধিক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির আসনে বসিয়েছিলেন।

আল-আমিন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধের কারণ

পিতার ইচ্ছানুযায়ী আল-আমিন বাগদাদের সিংহাসনে বসেন এবং আল-মামুন তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের মধ্যকার সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায় এবং গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়।

উত্তরাধিকার নীতির অনুপস্থিতি

খলীফা হারুন-অর-রশীদের একাধিক পুত্র ছিল। তারা সকলেই ছিলেন সিংহাসনের দাবিদার। কিন্তু খলীফা তাঁর প্রিয়তমা পত্নী জুবাইদা ও তাঁর ভ্রাতার চাপে পড়ে তাঁর জৈষ্ঠ্য পুত্র আল-আমিনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু খলীফা হিসেবে আল-আমিন ছিলেন অযোগ্য যা এই গৃহযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

আল-আমিন কর্তৃক মামুনের সেনাবাহিনী ও ধনাগার আত্মসাৎ

মৃত্যুশয্যায় খলীফা হারুন-অর-রশীদ যাকে যে অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ও যার অধীনে যে সম্পদ রয়েছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে অছিয়ত করে যান। ৮০৯ খ্রি: হারুন-অর-রশীদ খোরসান অভিযানে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর সঙ্গের ধনাগার ও সেনাবাহিনী মামুনের নামে উইল করে যান। কিন্তু খলীফা হয়ে আল-আমিন গুপ্তচর ও তাঁর উযির ফজল বিন রাবীর মাধ্যমে উক্ত সেনাবাহিনী ও ধনাগার বাগদাদে ফিরিয়ে আনেন। এতে মামুন তাঁর এই অন্যায় আচরণের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

আল-আমিনের ঈর্ষা

ব্যক্তিগত চরিত্র, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতার জন্য আল-মামুন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ও প্রজাদের নিকট জনপ্রিয় ছিলেন। মামুন প্রাচ্যের প্রদেশসমূহে রাজ কর মওকুফ করে দেন। এতে জনগণের ওপর তিনি প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তাকে প্রাচ্যের

প্রজাগণ "তাদের ভগিনীর পুত্র" হিসেবে গ্রহণ করে। এর ফলে মামুনের প্রতি আল-আমিনের ঈর্ষার উদ্রেক হয়। তিনি মামুনের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার উপর ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠেন।

আরব-পারসিক দ্বন্দ্ব

আব্বাসীয় খিলাফতে এর প্রতিষ্ঠকাল হতে আরব-পারস্য দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। শাসনকার্যে উভয় জাতির লোকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের সূচনা হয়। আল-আমিনের পরিবার, সমর্থকগণ ও তাঁর অমাত্যবর্গ সকলেই ছিলেন খাঁটি আরবীয়, অপরদিকে আল-মামুনের মাতা ও সমর্থকগণ ছিলেন পারসিক। তাই নিজ নিজ স্বার্থোদ্ধারে আরব ও পারসিক আমিরগণ এই গৃহযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে তোলে।

আল-আমিনের আমোদপ্রিয়তা ও রাজকর্মে অবহেলা

আল-মামুন তাঁর দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর নিজ প্রদেশের শাসনপ্রণালীতে আত্মনিয়োগ করেন। অপরদিকে আল-আমিন ছিলেন অদূরদর্শী, আমোদপ্রিয়। তিনি তাঁর উযির ফজল বিন রাবীর হাতে সকল রাজকার্য অর্পন করে আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস ব্যসনে ডুবে রইলেন। তিনি রাজদরবারকে নর্তকী ও গায়িকার আবাসস্থলে পরিণত করেন।

আল-আমিনের কুশাসন

আল-আমিন তাঁর আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসবহুল জীবনে ব্যাপক অর্থ অপচয় করতে লাগলেন। রাজশাসনের পরিবর্তে আমোদ-প্রমোদে অর্থব্যয়, তাঁর উযীর ফজল বিন রাবীর কুশাসনে সাম্রাজ্য ধ্বংসের মুখে আবর্তিত হচ্ছিল। প্রজাসাধারণ এই কুশাসনকে ঘৃণা করতে শুরু করলো।

ফজল বিন রাবীর স্বার্থপরতা

খলীফা আল-আমিনের উযীর ফজল বিন রাবী একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন। আল-আমিন ছিলেন দুর্বল চরিত্রের অধিকারী ও রাজশাসনে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। তাই সকল ক্ষমতা উযীর ফজল বিন রাবীর হাতেই ন্যস্ত ছিল। তাই মামুনকে অপসারণ করে আল-আমিনকে নেপথ্যে থেকে রাজক্ষমতা হস্তগত করার গোপন ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত হয়ে ওঠেন।

মামুন ও কাসিমকে অপসারণ

খলীফা হারুন-অর-রশিদের ইচ্ছা অনুযায়ী আল-মামুন ছিলেন খোরসানের ও কাসিম ছিলেন কিন্নীসিরিনের শাসনকর্তা। কিন্তু আল-আমিন তাঁর সমর্থকদের কুমন্ত্রণায় তাঁর উভয় ভ্রাতাকে তাদের পদমর্যাদা হতে বরখাস্ত করেন। মসজিদের খুতবায় তাদের নাম উচ্চারণে নিষেধ করেন। এতে আল-মামুন আল-আমিনের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

আল-আমিন কর্তৃক চুক্তিপত্রের শর্তভঙ্গ

আল-আমিন তাঁর পিতা কর্তৃক লিখিত চুক্তিপত্রের শর্ত লংঘন করেন। তিনি তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর ভ্রাতা মামুনের পরিবর্তে নিজ পুত্র মুসাকে 'নাতিক বিল হক' উপাধি দিয়ে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিছুদিন পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকেও তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। কাবাগৃহে রক্ষিত তাঁর পিতার মনোনয়নপত্র তিনি এনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন।

মামুনের পুত্রদ্বয়কে হত্যার পরামর্শ

উযীর ফজল বিন রাবী, আল-আমিনকে বাগদাদে বসবাসকারী আল-মামুনের দুই পুত্রকে হত্যার পরামর্শ দেন। তবে আল-আমিন এই কথা কানে নেননি।

আল-মামুনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ :

খলীফা আল-আমিন তাঁর উজীরের পরামর্শে আল-মামুনকে প্রদত্ত ১,০০,০০০ দিরহাম ও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এতে করে আল মামুন আল-আমিনের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন।

গৃহযুদ্ধের ঘটনা ও ফলাফল :

সীমান্ত বন্ধ : যুদ্ধ অনিবার্য বুঝতে পেরে আল-মামুন তাঁর রাজ্যের সীমান্ত বন্ধ করে দিলেন। সেখানে প্রহরী নিযুক্ত করলেন। আল-আমিনের কোন গুপ্তচর যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে কড়া নযর রাখলেন।

আল-আমিনের সেনাবাহিনীর পরাজয় : আল-আমিন তাঁর সেনাপতি আলী ইবনে ঈসার নেতৃত্বে ৫০,০০০ সৈন্যের সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ৮১১ খ্রি: রাবী নামক স্থানে মামুনের বিখ্যাত সেনাপতি তাহির ইবনে হুসাইনের নিকট আলী ইবনে ঈসা ও তাঁর সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আলী ইবনে ঈসা নিহত হন। এই দু:সংবাদ শুনে খলীফা

আল-আমিন তাঁর অপর সেনাপতি আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে আরেকটি সেনাদল প্রেরণ করেন। কিন্তু এই দলটিও তাহিরের নিকট পরাজয় বরণ করে।

মামুনের খলীফা উপাধি গ্রহণ : আল-মামুন খলীফা উপাধি গ্রহণ করলেন। আল-আমিনের প্রেরিত বেশ কয়েকটি বাহিনী মামুনের সেনাপতি তাহির ও হারসামার নিকট পরাজয় বরণ করলো। সমগ্র ইরাক ও আরব মামুনের অধীনে চলে আসলো।

বাগদাদ অবরোধ : মামুনের সেনাপতি তাহির, হারসামা ও জুহাইর একত্রে বাগদাদ অবরোধ করেন। বাগদাদে অবস্থান করা নিরাপদ নয় দেখে খলীফা আল-আমিন তাঁর মাতা ও পরিবারবর্গসহ দজলার পশ্চিম তীরে অবস্থিত মদীনাতুল মনসুর দুর্গে আশ্রয় নেন।

আল-আমিনের আত্মসমর্পন : অবশেষে আল-আমিন বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ সেনাপতি হারসামার নিকট আত্মসমর্পন করেন। কিন্তু রাত্রিকালে কয়েকজন উগ্র পারসিক কর্তৃক হতভাগ্য খলীফা আল-আমিন নিহত হন (৮১৩ খ্রি:)। এই মর্মান্তিক সংবাদে মামুন শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি হত্যাকরীদেরকে তৎক্ষনাৎ শাস্তিবিধান করেন। আল-আমিনের পুত্রদ্বয়কে আল-মামুন আপন পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা বড় হলে নিজ নিজ কন্যাগণের সাথে তাদের বিবাহ দেন। মামুন আল-আমিনের পরিবারবর্গকে তাদের নিজ নিজ সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার দেন।

আল-মামুনের সফলতার কারণ

আল-আমিনের ব্যক্তিগত চরিত্র ও কুশাসন : আল-আমিনের ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল তাঁর পতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী। রাজকার্যে অবহেলা, আমোদ-প্রমোদ ও হেরেমে আত্মনিয়োগ করে তিনি তাঁর চারিত্রিক ত্রুটিগুলোকে সকলের সামনে স্পষ্ট করে তোলেন। তাঁর এই শৃঙ্খলহীন জীবনের সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর উযীর ফজল বিন রাবী সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন এবং প্রশাসন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে আল-মামুন ছিলেন প্রজাহৈতষী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নৃপতি। তাঁর শাসনের অধীনে প্রজাগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করছিল। তাই এই চরিত্রগত পার্থক্যের দরুণ আল-আমিনের চেয়ে প্রজাদের নিকট আল-মামুনের গ্রহনযোগ্যতা বেশি ছিল।

পারসিকদের শ্রেষ্ঠত্ব : আল-আমিন ও আল-মামুনের দ্বন্দ্ব ছিল মূলত আরব-পারিসক দ্বন্দ্ব। ধর্মীয় দিক থেকে এটি ছিল শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব। চারিত্রিক দুর্বলতা ও অনৈতিক ইসলামিক কর্মকাণ্ডের জন্য আল-আমিন খাঁটি সুন্নী-আরবদের সমর্থন হারান। অপরদিকে শিয়া সম্প্রদায় আল-মামুনকে তাদের ব্যাপক সমর্থন দান করে। তাই আল-আমিনের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী।

আল-আমিনের সমর্থকগণের অযোগ্যতা ও স্বার্থপরতা : আল-আমিনের উযীর ও সমর্থকগণ অপেক্ষা আল-মামুনের উযীর ও সমর্থকগণ ছিলেন অধিক বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ। মামুনের খোরাসানের সেনাবাহিনী আল-মামুনকে তাদের 'ভগ্নীরপুত্র' মনে করতো, অপরদিকে আল- আমিন তাঁর সেনাবাহিনীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করেন এবং তারা ছিল স্বার্থপর ও অবিশ্বস্ত। তাই এই গৃহযুদ্ধে আল-আমিনের পরাজয় ছিল আবশ্যক।

অস্তিত্বের লড়াই : আল-আমিন আল-মামুনকে সকল দিকে থেকে বঞ্চিত করেন। তাঁর সাথে সকল প্রকার দুর্ব্যবহার করেন। তাঁর সম্পত্তি ও অধিকার হরণ করেন। এমনকি মামুনের পরিবারকেও হুমকির মুখে ফেলে দেন। তাই এই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতও ছিল আল-মামুনের নিকট অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। শেষ পর্যন্ত এই মনোবল আল-মামুনকে সফলতা দান করেছিল।

জনসমর্থনের অভাব : পারস্যবাসী আল-মামুনকে ব্যাপক সমর্থন দান করে। এতে তাঁর মনোবল ও সমর্থন বেড়ে যায়। অপরদিকে আল-আমিনের পেছনে কোন প্রকৃত জনসমর্থন ছিল না। যা তাঁর ব্যর্থতাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

অন্যায়ের উপর ন্যায়ের জয় : এই গৃহযুদ্ধ ছিল মামুনের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ। অপরদিকে আল-আমিনের জন্য তা ছিল কেবলই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে টিকে থাকার লড়াই। মূলত এটি ছিল অন্যায়ের উপর ন্যায়ের জয়লাভ।

সারসংক্ষেপ :

জীবদ্দশায় খলীফা হারুন-অর-রশীদ ভ্রাতৃকলহের আশংকায় তাঁর পুত্রদেরকে ক্রমানুসারে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। কিন্তু আল-আমিন ও আল-মামুনের ব্যক্তিগত চরিত্র, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সমর্থক ও রাজকর্মচারীদের স্বার্থ ও সর্বোপরি আরব-পারসিক দ্বন্দ্ব তাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। যার পরিণতি হিসেবে আল- আমিনের জীবন ও খিলাফতের অবসান ঘটে এবং আল-মামুনের শাসনের সূচনা ঘটে। এর ফলে আব্বাসীয় খিলাফতে আরবদের প্রাধান্য লোপ পায় এবং বাগদাদে পারসিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খলীফা আল- আমিন ও আল-মামুনের মধ্যকার যুদ্ধ কতসালে সংঘঠিত হয়?
   ক) ৭১১ খ্রিঃ খ) ৭৭৫ খ্রিঃ
   গ) ৮১১ খ্রিঃ ঘ) ৮১৪ খ্রিঃ

২. আল-মামুনের ব্যক্তিগত চরিত্র কেমন ছিল?
   ক) উগ্র প্রকৃতির খ) বিচক্ষণ
   গ) আমোদপ্রিয় ঘ) বিলাসী প্রকৃতির

৩. আল-আল-আমিন ও আল-মামুনের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ সংঘঠিত হওয়ার যথার্থ কারণ হল-
   i) সাম্রাজ্যের বিভাজন ii) শিক্ষাগত পার্থক্য
   iii) চারিত্রক পার্থক্য
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i,ii খ) i, iii গ) i,ii, iii ঘ) ii, iii

৪. তন্ময় ও মৃন্ময় দুই ভাই। তন্ময় সৎ, জ্ঞানী ও চরিত্রবান। অন্যদিকে মৃন্ময় অসৎ, অকর্মণ্য ও লালসাগ্রস্থ। আব্বাসীয় কোন খলীফাদের সাথে তাদের সাদৃশ্য আছে?
   ক) আল-মামুন ও সাদিক খ) আল- মামুন ও মনসুর
   গ) আল-আমিন ও ফজল ঘ) আল-মামুন ও আল-আমিন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

অশোক ও লক্ষণ দুই ভাই। তাদের পিতা অর্জুন মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠপুত্র অশোককে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। কিন্তু অশোক ছিল আমোদপ্রিয়, বিলাসী ও অস্থিরমতি। অপরদিকে লক্ষণ আল-আর্মিক, বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী ছিলেন। চারিত্রিক গুণাবলির জন্য লক্ষণ প্রজা সকলের নিকট প্রিয় ছিলেন। ফলে দুই ভাইয়ের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠলো।

ক. খলীফা হারুন-অর-রশীদ কতজনকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান? ১
খ. আল-মামুনের জনপ্রিয়তার কারণ কী? ২
গ. উদ্দীপকের অশোকের চরিত্রের সাথে খলীফা আল-আল-আমিনের সাদৃশ্য তুলে ধরুন। ৩
ঘ. আল-আল-আমিন ও আল-মামুনের মধ্যকার গৃহযুদ্ধের কারণ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৮.৯ আল-মামুনের শাসন ব্যবস্থা



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আল-মামুনের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানবেন।
- আল-মামুনের সময়ে বিদ্রোহ সম্পর্কে অবগত হবেন।
- আল-মামুনের সময়ে রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে জানবেন।

	**মুখ্য শব্দ**	**জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, উচ্চাভিলাষী, শিয়া ইমাম, খারিজিগণ ও মাজেন্দ্রান**

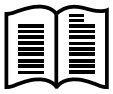

মার্ভে মামুনের অবস্থান

আল-মামুন ৭৫৮ খ্রি: পারস্যরমণী মারজিলের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ৮১৩ খ্রি: খলীফা আল-আমিন পরাজিত হলে মামুন খিলাফত লাভ করেন ও বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। খলীফা আল-মামুনের শাসনকালকে ২টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম ছয় বছর (৮১৩-১৯ খ্রি:) আল-মামুন খোরাসানের রাজধানী মার্ভে অবস্থান করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেন। এই সময় তাঁর বিশ্বস্ত উযীর ফজল বিন সাহল রাজকার্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। পরবর্তী ১৪ বছর মামুন (৮১৯-৩৩ খ্রি:) স্বহস্তে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

খলীফা আল-মামুনের বাগদাদে আগমন

ফজল বিন সাহল গৃহযুদ্ধে আল-মামুনকে সমর্থন ও ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করলেও, আল-মামুনের খিলাফত লাভের পর ফজল উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠেন। আল-মামুন নিজেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় ব্যস্ত রাখলে তিনি রাজক্ষমতার অপব্যবহার করেন। প্রধান সেনাপতি হারসামা খলীফাকে এই বিষয়ে অবগত করতে চাইলে ফজল গোপনে হারসামাকে হত্যা করেন। এর ফলে বাগদাদে হারসামার সমর্থকগণ বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। অবশেষে শিয়া ইমাম আলী আল রিজা কর্তৃক প্রকৃত ঘটনা অবগত হয়ে খলীফা আল-মামুন বাগদাদের উদ্দেশ্যে মার্ভ ত্যাগ করেন। ফজল আততায়ীর হাতে নিহত হন।

খলীফা আল-মামুনের শাসনব্যবস্থা

৮১৯ খ্রি: খলীফা স্বহস্তে রাজক্ষমতা দখল করেন। তিনি প্রশাসনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই ব্যাপারে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী। তিনি হাসান বিন-সাহলকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকদের তিনি প্রশাসনে নিযুক্ত করেন। তিনি আলী পন্থীদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করেন। আলীর বংশধরদের তিনি খিলাফতের অংশীদার করার উদ্দেশ্যে আব্বাসী বিরোধিতা সত্ত্বেও শিয়া অষ্টম ইমাম আলী আল-রিজাকে তাঁর পরবর্তী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু ৮১৮ খ্রি: আলী আল রিযা মৃত্যুবরণ করলে তা বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়নি।

বিদ্রোহ দমন

খলীফা আল-মামুন তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি তাহির ইবনে হুসাইনের পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে তাহিরকে সিরিয়া মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি সুশাসক ও উদার ছিলেন। আব্দুল্লাহ মেসোপটেমিয়া নসর উকায়লীর বিদ্রোহ দমন করেন ও তাকে বন্দি করে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে তাহির পরবর্তীতে মিসরের বিদ্রোহীদের দমন করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় ইয়েমেন ও খোরসানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইবরাহীম ইয়েমেনে ও আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে খারিজিগণ খোরাসানে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। ইয়েমেনের বিদ্রোহ দমন করে আব্দুল্লাহ ইবনে তাহির খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করেন।

রাজ্য বিস্তার

খলীফা আল-মামুনের সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য রাজ্যবিজয় সংঘটিত হয়নি। তাঁর সেনাবাহিনী ভূমধ্যসাগরীয় ক্রীট ও সিসিলি অধিকার করে। এ সময় পারস্যের মাজেন্দ্রান নামক স্থানে বাবেক নামক জনৈক দস্যুর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযান ব্যর্থ হলেও খলীফা স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করে এই অভিযানে সফলতা অর্জন করেন। খলীফার সেনাবাহিনী কতিপয় আফগান উপজাতিকে দমন করে তাদের অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হয়।

বুরানের সাথে বিবাহ

৮২৫ খ্রিঃ খলীফা আল-মামুন তাঁর প্রধানমন্ত্রী হাসান বিন-সাহলের কন্যা বুরানকে বিবাহ করেন। বুরান ছিলেন সর্বগুণে শ্রেষ্ঠা একজন রমণী। এই বিবাহের জাঁকজমকতা ও মহাসমারোহের কাহিনী আরব ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ব্যয়বহুল ঘটনা।

উত্তরাধীকারী মনোনয়ন

খলীফা আল-মামুন তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর যোগ্যতম ভ্রাতা আবু ইসহাক মুহাম্মদকে 'মুতাসিমবিল্লাহ' উপাধি দিয়ে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। খলীফা আল-মামুন ৮৩৩ খ্রিঃ তারসাসের অনতিদূরে বাদানদুন নামক স্থানে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

সারসংক্ষেপঃ

খলীফা আল-মামুনের শাসনকাল ২টি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। মার্ভে ও বাগদাদের শাসনকার্য তাঁর শাসনতান্ত্রিক দক্ষতা প্রমাণ করে। প্রধানমন্ত্রী হাসান বিন সাহল তাঁর প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর সময়ে সংঘটিত বিদ্রোহসমূহ আব্দুল্লাহ ইবনে তাহির অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দমন করেন। তাঁর সময়ে খুব বেশি রাজ্যবিস্তার না ঘটলেও ক্রীট ও সিসিলি দ্বীপ তাঁর অধীনস্ত হয়েছিল। খলীফা আল- মামুন মৃত্যুর পূর্বে তাঁর যোগ্যতম ভ্রাতা আবু ইসহাক মুহাম্মদ মুতাসিম বিল্লাহকে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে যান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খলীফা আল-মামুনের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ছিল?

ক) ফজল বিন সাহল খ) হাসান বিন সাহল গ) আলী আল রিযা ঘ) হারসামা

২. খলীফা আল-মামুন বাগদাদে গমন করেন কেন?

ক) যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য খ) রাজক্ষমতা স্বহস্তে পরিচালনার জন্য
গ) বিদ্রোহ দমন করার জন্য ঘ) রাজক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য

৩. খলীফা আল-মামুন রাজ্যবিস্তার করেন-

i) সিসিলিতে ii) স্পেনে iii) ক্রীটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii, iii গ) i,ii, iii ঘ) i, iii

৪.আব্বাসীয় খলীফা আল মামুন 'x' নামী একজন গুণী মহিলাকে বিয়ে করেন। 'x' নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে?

ক) বুরান খ) রাবেয়া বস্‌রী গ) রাযিয়া ঘ) জুবাইদা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

আব্বাসীয় বংশের একজন শাসক স্বীয় ভ্রাতার সাথে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি শাসকালের প্রথম পর্যায়ে উজিরের সাহায্যে শাসনকার্য চালান। পরবর্তীতে তিনি স্বহস্তে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি আলীপন্থীদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করেন। আব্বাসীর খিলাফতের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

ক) খলীফা মামুন মার্ভে কয় বছর যাপন করেন? ১
খ) খলীফা মামুনের বাগদাদ আগমনের ঘটনাটি লিখুন। ২
গ) উদ্দীপকে যে শাসকের কৃতিত্ব উল্লেখ করা হয়েছে বিদ্রোহ দমনে তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখ করুন। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের বাগদাদে শাসনকার্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। ৪

পাঠ-৮.১০ আল-মামুনের শাসন আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জ্ঞান-বিজ্ঞানে খলীফা আল-মামুনের অবদানকে মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- জ্ঞান-বিজ্ঞানে আল-মামুনের গৃহীত পদক্ষেপ ও কার্যাবলির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- আল-মামুনের সময়ে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ইউরোপীয় নবজাগরণ, বায়তুল হিকমা, মাইলফলক, বিষুবরেখা, ধুমকেতু, চিকিৎসা, দূরবীক্ষণযন্ত্র, নৌ-কম্পাস আবিষ্কার ও 'রায়হানী লিপি'**

খলীফা আল মামুনের শাসনকাল ইতিহাসের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক অধ্যায়। এই সময়ে আব্বাসীয় ইতিহাসের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য চরম শিখরে উপনীত হয়। আল-মামুনের রাজদরবার হয়ে ওঠে জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, হাদিসবেত্তা ও মনীষীদের মিলনমেলা। খলীফা উদার হস্তে এই সকল গুণী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন।

ইসলামের গৌরবময় যুগ

খলীফা আল-মামুনের শাসনকাল ছিল ইসলামের ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ তাঁর পূর্ববর্তী সকল সময়কে ছাড়িয়ে যায়। তাঁর সময়ে ইসলাম ও বিশ্বের কৃষ্টি সভ্যতার ইতিহাসের সর্বাধিক মানসিক জাগরণের সূত্রপাত হয়। ইউরোপীয় নবজাগরণ ও আধুনিক সভ্যতা তারই সুচিন্তিত ভাবধারা ও দূরদর্শিতার ফল। এই প্রসংগে সৈয়দ আমীর আলী বলেছেন, Mamun's reign was unquestionably the most brilliant and glorious of all in the history of Islam.

শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা

আল-মামুন মনে করতেন জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির উপর। তাই তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র বহু স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য প্রচুর অর্থদান ও লাখেরায় সম্পত্তি দান করেন। তিনি মসজিদ ও মাদ্রাসাকে ব্যাপকভাবে স্থায়ী আয়ের মধ্যে নিয়ে আসেন। চীন দেশের অনুকরণে কাগজ কল স্থাপন করেন।

অনুবাদ কার্যবলি

খলীফা আল-মনসুরের সময় প্রথম অনুবাদ কার্যের সূচনা হয়। খলীফা আল-মামুনের সময় তাঁর পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তিনি সিরিয়া, এথেন্স, এশিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশ হতে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা বিখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা অনুবাদ করেন। প্লেটো, এরিস্টটল, গ্যালেন, হিপোক্রিটাস প্রভৃতি দার্শনিকের গ্রন্থসমূহ আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। খলীফা লিউকের পুত্র কোস্টার উপর গ্রিক, সিরিয়া ও ক্যালদীয় ভাষায় গ্রন্থাবলি, মানকাহ এবং দুবান নামক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থসমূহ, ঈসা ও মুসার (আ.) উপর পারসিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করান। তিনি স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা অনুবাদকদের পারিশ্রমিক দিতেন।

বাইতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা

৮৩০ খ্রি: প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা ছিল খলীফা আল-মামুনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি। বাইতুল হিকমা (House of Wisdom) ছিল অনুবাদ কর্ম পরিচালনার জন্য একটি গ্রন্থাগার। এর মোট ৩টি শাখা ছিল। এগুলো হল- গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ বিভাগ। হুনায়ন ইবনে ইসহাকের উপর এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। সকল পণ্ডিতগণ এই প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনভাবে গবেষণা করার সুযোগ পান। এই সকল মনীষীদের গবেষণার ফসল আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিনির্মাণ করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এ যুগে অনুবাদের পাশাপাশি বিজ্ঞানচর্চায় ও বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।

বিজ্ঞান চর্চা

বিজ্ঞান গবেষণা ও চর্চায় এই যুগ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করে। যে সময় ইউরোপ অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল ঠিক সেই সময় ইয়াহিয়া-বিন-আল-মনসুর, সিন্ধ-বিন-আলী, খালিদ-বিন-আব্দুল মালিক প্রমুখ খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ পৃথিবীর আকৃতি, গ্রহ, নক্ষত্র, বিষুবরেখা, ধুমকেতু ইত্যাদি বিষয়ের উপর মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন।

দূরবীক্ষণযন্ত্র ও নৌ-কম্পাস আবিষ্কার

খলীফা আল-মামুনের সময়ে আবুল হাসান নামক একজন বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও নৌ-কম্পাস আবিষ্কার করেন। এছাড়া মুসা-আল-খাওয়ারিজমী নামক বিখ্যাত গণিত ও ভূগোলশাস্ত্রবিদ এই যুগে আবির্ভূত হন। তাঁর রচিত "হিসাবুল জবর ওয়াল মুকাবালাহ" গণিত শাস্ত্রের একটি প্রাচীনতম গ্রন্থ।

চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্র

চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রে এই যুগে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। উহান্না-বিল-মোসাওয়াহ চিকিৎসাশাস্ত্রে ও জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়ন শাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

ফারসি সাহিত্যে ধর্ম ও দর্শন

খলীফা আল-মামুনের সময়ে ফারসি সাহিত্য নবজীবন লাভ করে। ফারসি কবিতার জনক আবুল আব্বাস তাঁর সভাকবি ছিলেন। প্রসিদ্ধ হাদীস সংগ্রাহক ইমাম বুখারী, ঐতিহাসিক ওয়াকিদী ও ইবনে সাদ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও দার্শনিক আল-কিন্দি তাঁর শাসনকালকে গৌরবান্বিত করেন।

হস্তলিপির বিকাশ

খলীফা আল-মামুনের সময়ে হস্তশিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই সময়ে বিখ্যাত হস্তলিপিকার ছিলেন আবু রায়হান। তাঁর নামানুসারে তাঁর লিখন পদ্ধতিকে বলা হত 'রায়হানী লিপি'।

মুতাযিলা মতবাদের প্রচলন

খলীফা আল-মামুনের সময়ে মুতাযিলা মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। খলীফা একজন উদার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মাঝে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামী ছিল না। তিনি যুক্তিবাদী মুতাযিলা মতবাদকে গ্রহণ করেন ও রাজধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ

খলীফা আল-মামুনের সময় মুক্তবুদ্ধির চর্চা ছিল স্বীকৃত। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস সকল ক্ষেত্রেই এই যুগ ইসলামের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে। এই যুগ কেবল ইসলামের ইতিহাসেই নয়, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অভূতপূর্ব জাগরণ ও উন্নতি বহন করেছিল। এটি ছিল মুসলিম ও ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ (The Golden Age of Islamic Civilization)। এই যুগ ইতিহাসে 'Augustan Age of Islam নামেও পরিচিত। সকল সীমাবদ্ধতাকে পেরিয়ে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এই যুগের অবদান ছিল অত্যন্ত ব্যাপক।

সারসংক্ষেপঃ

খলীফা আল-মামুনের রাজত্বকাল ছিল আব্বাসীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য চর্চায় এই যুগ তাঁর পূর্ববর্তী সকল যুগকে ছাড়িয়ে যায়। এই যুগের অবদান কেবলমাত্র মুসলিমরাই গ্রহণ করেনি বরং সমগ্র ইউরোপের আধুনিক সভ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নবজাগরণ এই যুগের অবদানের ফসল। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, রসায়ন, গণিত, ভূগোল এত উৎকর্ষ লাভ করেছিল যে, একে বলা হয় The Golden Age of Islamic Civilization।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১০

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কত খ্রিস্টাব্দে আল-মামুন বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠ করেন?

ক. ৮১৩ খ. ৮১৯

গ. ৮২৪ ঘ. ৮৩০

২. মৃতপ্রায় ফারসি সাহিত্য আব্বাসীয় আমলে নবজীবন লাভ করে। এর যথার্থ করণ হল-

ক. হারুনের পৃষ্ঠপোষকতা খ. আল-মামুনের পৃষ্ঠপোষকতা

গ. আল-মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতা ঘ. আল-মুনতাসিরের পৃষ্ঠপোষকতা

৩. খলীফা আল-মামুনের সাহিত্য দর্শনের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

i. ফারসি সাহিত্যের নবজীবন লাভ

ii. হস্তশিল্পের বিকাশ

iii. গণিত ও ভূগোলের চর্চা

নিম্নের কোনটি সঠিক?

ক.i, ii খ.i, iii

গ.ii, iii ঘ.i,ii, iii

৪. খলীফা আল-মামুনের একটি কার্যধারা আজও বিশ্বের বুকে দেশ ও জাতির কল্যাণে একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত। কার্যধারাটি কী?

ক. শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা খ. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চা

খ. স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তির চর্চা ঘ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ইতিহাসের শিক্ষক আব্দুর রহমান একজন আব্বাসীয় খলীফা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, তাঁর সময়কাল ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। কারণ এ যুগেই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও চিন্তাধারার বিকাশ লাভ করে। জনাব আবদুর রহমান আরও বলেন, তাঁর রাজত্বকালকে ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগও বলা হয়।

ক. বায়তুল হিকমা কী? ১

খ. আল-মামুন ইতিহাসে কেন বিখ্যাত? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খলীফার আমলে অনুবাদ কার্যের উৎকর্ষের প্রমাণ দিন। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খলীফার আমলে সাহিত্য ইতিহাস ও ধর্ম-দর্শন চর্চার অগ্রগতির ব্যাখ্যা দিন। ৪

পাঠ-৮.১১ আল-মুতাসিম বিল্লাহ, আল-ওয়াসিক ও আল-মুতাওয়াক্কিল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আল-মুতাসিম বিল্লাহর রাজত্বকাল সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আল-ওয়াসিক স্বল্প স্থায়ী শাসনকাল সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কঠোর শাসক আল-মুতারয়াক্কিল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**তুর্কি দেহরক্ষী বাহিনী, বুলকাওয়ারা, সামারাহ, বাবেক যুদ্ধ, পৃষ্ঠপোষক, আরবদের নীরো ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের**

আল-মুতাসিম (৮৩৩-৮৪২) খ্রি

খলীফা আল-মামুনের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা আবু ইসহাক মুহাম্মদ আল-মুতাসিম বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তুর্কি দেহরক্ষী বাহিনী গঠন

এই সেনাবাহিনীতে আরব ও পারস্য সৈন্যদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, গোত্রতন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাই তিনি পারস্য সৈন্যদের প্রভাব হ্রাস করার জন্য তুর্কিদের নিয়ে নতুন সেনাবাহিনী গঠন করেন। এই তুর্কি সেনাবাহিনী ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী।

রাজধানী স্থানান্তর

একপর্যায়ে তুর্কি বাহিনীর ক্ষমতা ও আধিপত্য এতো বৃদ্ধি পায় যে, খলীফা রাজধানী বাগদাদ হতে ৬০ মাইল উত্তর পশ্চিমে সামাররাতে (৮৩৬ খ্রি:) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এখানে তিনি বুলকাওয়ারা নামক রাজপ্রাসাদ, সেনানিবাস ও অশ্বের আস্তাবল নির্মাণ করেন।

বিদ্রোহ দমন

এই সময়ে ভারতীয় জাঠ উপজাতীয় লোকেরা ইরাকে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। খলীফা তাদের বিতাড়িত করেন। মাজেন্দ্রাণের বিদ্রোহী বাবেক পুনরায় বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে খলীফা তাঁর তুর্কি সেনাপতি আফসীনকে প্রেরণ করে বাবেক এর বিদ্রোহ দমন করেন। বাবেক যুদ্ধে নিহত হয় এবং মাজেন্দ্রানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাইজানটাইনদের সাথে যুদ্ধ

আল-মুতাসিমের শাসনকালে বাইজানটাইন শাসক থিওফিলাস জিবত্রা আক্রমণ করে। ৮৩৮ খ্রি: খলীফা তাঁর সেনাবাহিনীর মাধ্যমে আনকারা নামক স্থানে বাইজানটাইনদের পরাজিত করেন, সম্রাটের জন্মভূমি এমোরিয়াম শহর ধ্বংস করে দেন। অবশেষে সম্রাটের সাথে খলীফা এক সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন।

মাজিয়ান বিদ্রোহ

মাজিয়ান নেতা মাজিয়ার ৮৩৯ খ্রি: বিদ্রোহ সৃষ্টি করলে খলীফা আব্দুল্লাহ ইবনে তাহিরকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে মাজিয়ার পরাজিত ও নিহত হন। খলীফা তাঁর তুর্কি সেনাপতি আফসীনকে মাজিয়ারের সাথে গোপন সম্পর্ক থাকার অভিযোগে বন্দী করেন। পরে কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়।

চরিত্র ও মৃত্যু

ব্যক্তি জীবনে খলীফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ নির্দয় ও কঠোর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনিও খলীফা আল-মামুনের ন্যায় মুতাযিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ৮৪২ খ্রি: দীর্ঘদিন রোগে

আক্রান্ত থাকার পর খলীফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-ওয়াসিককে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

আল-ওয়াসিক (৮৪২-৪৭) খ্রিঃ

আল-মুতাসিম বিল্লার মৃত্যুর পর মনোনয়ন অনুসারে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবু জাফর হারুন আল-ওয়াসিক বিল্লাহ উপাধি ধারণ করে বাগদাদের সিংহাসনে বসেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন উদার, শিক্ষিত, রুচিশীল এবং শিল্প, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তিনি প্রায় ছয় বছর নির্বিঘ্নে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজ্যে সমৃদ্ধি ব্যয় ছিল। বলা হয়ে থাকে এই সময় রাজ্যে কোন ভিক্ষুক ছিলো না। তিনি সঙ্গীতের ব্যাপক অনুরাগী ছিলেন। তিনি একশত রাগ ও সুর রচনা করেন। ৮৪৭ খ্রিঃ খলীফা আল-ওয়াসিক মৃত্যুবরণ করেন।

আল-মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬১) খ্রিঃ

সিংহাসনে আরোহণ :

আল-ওয়াসিকের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা আল-মুতাওয়াক্কিল ৮৪৭ খ্রিঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর নিষ্ঠুরতার জন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁকে আরবদের নীরো (Nero of the Arabs) বলে অভিহিত করেন।

গোঁড়া ধর্মান্ধ শাসক

খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ছিল গোঁড়া সুন্নীপন্থী। তাই শিয়া ও মুতাযিলা মতবাদ অবলম্বনকারীদের প্রতি তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। মুতাযিলাদের সরকারি কার্য হতে বহিষ্কার ও অমুসলিমদেরকে রাজকার্যে নিযুক্ত হতে বিরত রাখে। বিখ্যাত তুর্কি সেনাপতি ঈতাখকে হত্যা করেন। কারবালায় ইমাম হুসাইনের মাযার ধ্বংস করেন।

সাম্রাজ্য বিভক্তিকরণ

রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আল-মুতাওয়াক্কিল তাঁর সাম্রাজ্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। পশ্চিমাঞ্চল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আল-মুনতাসিরকে এবং পূর্বাঞ্চল অপর পুত্র আল-মুতাজকে প্রদান করেন। খলীফা তাঁর পুত্র মুতাযকে অধিক স্নেহ করতেন এবং তাঁর নামে মুদ্রাঙ্কন করেন।

মৃত্যু

খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের পুত্রদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নীতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-মুনতাসিরকে অসন্তুষ্ট করে তোলে। এর ফলাফল হিসেবে ৮৬১ খ্রিঃ তিনি কয়েকজন তুর্কি সেনাপতির সাহায্যে এক রাত্রিতে তাঁর পিতাকে হত্যা করেন এবং সিংহাসনে বসেন। এরপর থেকে পরবর্তী খলীফাগণ তুর্কি সেনাবাহিনীর হাতের পুতুলে পরিণত হয়।

সারসংক্ষেপঃ

খলীফা আল-মামুনের পর আল-মুতাসিম, আল-ওয়াসিম, আল-ওয়াসিক ও আল-মুতাওয়াক্কিল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাদের শাসনকাল ছিল আব্বাসীয় শাসনের অনুজ্জ্বল দিক। তন্মধ্যে আল-মুতাসিমের রাজত্বকাল ছিল অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী। আল-ওয়াসিক ছিলেন শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং আরবদের নীরো বলে খ্যাত আল-মুতাওয়াক্কিল ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামীতে আচ্ছন্ন এক শাসক। তাদের পরবর্তী শাসকগণ ছিলেন দুর্বল, রাজকার্যে অযোগ্য ও ক্ষমতাহীন। তারা ছিলেন তুর্কি সেনাবাহিনীর হাতের পুতুল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. নিচের কোন শাসক সঙ্গীতের ব্যাপক অনুরাগী ছিলেন?

ক. আল-ওয়াসিক
খ. মুতাসিম বিল্লাহ
গ. আল মুতারয়াক্কিল
ঘ. আবুল আব্বাস

২. আল মুতারয়াক্কিলকে 'আরবদের নীরো' বলা হয় কেন?

ক. তিনি স্বজনপ্রিয় ছিলেন খ. তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন

গ. তিনি বিলাসী ছিলেন ঘ. তিনি উদার ছিলেন

৩. খলীফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ নিম্নোক্ত মতবাদের পৃষ্ঠপোষক-

i. কাদারিয়া মতবাদ ii. মুতাযিলা মতবাদ

iii. আশারিয়া মতবাদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক.i খ.i, iii

গ.i,ii, iii ঘ.ii, iii

৪. আব্বাসীয় একজন শাসক গোঁড়া ধর্মান্ধ ছিলেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নীপন্থী। উদ্দীপকে কোন শাসকের কথা বলা হয়েছে?

ক. আল-মুতাসিম বিল্লাহ খ. আল-ওয়াসিক

গ. আল-মুতাওয়াক্কিল ঘ. আল মনসুর

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

আবু নিসার 'ক' রাষ্ট্রের প্রধান। বংশের শেষের দিকের শাসক হলেও তাঁর শাসনকাল মোটামুটি সমৃদ্ধশালী। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন। রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং বহু বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি নির্দয় ও কঠোর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন।

ক. আল-মুতাসিম বিল্লাহ কত সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন? ১

খ. আল-মুতাসিম বিল্লাহ রাজধানী স্থানান্তর করেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসক যে শাসকের প্রতিনিধিত্ব করে বিদ্রোহ দমনে তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখ করুন। ৩

ঘ. খলীফা মুতাসিম বিল্লাহ'র রাজত্বকাল আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৮.১২ বুয়াইয়া বংশের উত্থান ও পতন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বুয়াইয়া বংশের পরিচয় ও তাদের উত্থান বর্ণনা করতে পারবেন।
- বুয়াইয়া বংশের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শাসক সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বুয়াইয়া বংশের পতন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**বুয়াইয়া বংশ, ১০ই মুহাররম, আল-আমির-উল-উমারাহ, তাজ-উল-মিল্লাত, শাহানশাহ', 'আল-বিমারিস্তান আল-আয়ুদি' ও 'ইখওয়ানুস সাফা'**

আব্বাসী শাসনামলে যে সকল আঞ্চলিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের শাসন সূচনা হয়, সে গুলোর মধ্যে বুয়াইয়া বংশ অন্যতম। এই বংশটি ছিল শিয়া মতাবলম্বী এবং আব্বাসীয় খিলাফতে এই বংশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বুয়াইয়াদের উত্থান

উৎপত্তি : আবু সুযা বুয়াইয়া ছিলেন এই বংশের একজন শক্তিশালী নেতা, যার নেতৃত্বে বুয়াইয়ারা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তারা কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলে তাবারিস্তান ও গীলানের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ দাইলাম নামক স্থানে বসবাস করতেন। এই অঞ্চলে তখন সামানী বংশের শাসন কার্যকরী ছিল, এবং আবু সুযা বুখারার সামানীয় বংশের অধীনে চাকরি করতেন। আলী হাসান ও আহমদ নামক আবু সুযার ৩ পুত্র ছিল। এই বংশটি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা : সিরায হতে দাইলামী শাসকগণ ইরাক, ওয়াসিত দখল করে রাজদানী বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বাগদাদে এই সময় আব্বাসীয় খলীফা ছিলেন মুস্তাকফী (৯৪৪-৪৬খ্রি:)। বাগদাদে এই সময় তুর্কি দেহরক্ষী বাহিনীর আধিপত্য বেড়ে যায়। খলীফা তুর্কি বাহিনীর হাতের পুতুলে পরিণত হন। সকল ক্ষমতা তুর্কিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এই সময় বুয়াইয়ারা আহমদ এর নেতৃত্বে বাগদাদ উপকণ্ঠে হাজির হন এবং খলীফা আহমদ এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। আহমদ খলীফার আহবানে সাড়া দিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করেন। তুর্কি আল-আমির-উল-উমারা ও তুর্কি বাহিনী রাজধানী হতে পলায়ন করেন। আহমদ বাগদাদে খলীফাকে তাঁর সিংহাসনে পুন:প্রতিষ্ঠিত করেন। খলীফা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আমীর-উল-উমারা হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং মুইয-উদ-দৌলাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। এইভাবে মুইয-উদ-দৌলা বাগদাদে যে বংশ প্রতিষ্ঠা করেন তা তাঁর পিতার নামানুসারে নাম রাখেন বুয়াইয়া বংশ।

মুইয-উদ-দৌলা : (৯৪৫-৯৬৭) খ্রি: মুইয-উদ-দৌলা ছিলেন বাগদাদে বুয়াইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ধীরে ধীরে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন এবং দুর্বল খলীফার উপর তিনি তাঁর প্রভাব ও কর্তৃত্ব খাটান। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি সকল ক্ষমতা হস্তগত করেন, মুদ্রায় নিজের নাম অঙ্কিত করেন। খুতবায় খলীফার নামের সাথে তাঁর নামও উচ্চারিত হতো। খলীফা তাঁর অধীনে আশ্রিত ব্যক্তির ন্যায় ছিলেন। খলীফা রাজকোষ হতে দৈনিক ৫০০০ দিনার ভাতা হিসেবে পেতেন। খলীফার উপর তাঁর প্রভাব এবং প্রতিপত্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে মুইয-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। এই সংবাদে অবগত হয়ে মুইয-উদ-দৌলা খলীফাকে অন্ধ করে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং আল-মুস্তাকফীর পুত্র আল-মুতীকে সিংহাসনে (৯৪৬ খ্রি:) বসান। খলীফা আল-মুতীর সাথে বুয়াইয়াদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। মুইয-উদ-দৌলা নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। ৯৫২ খ্রি: গ্রিকগণ মুসলিম সাম্রাজ্যে যুদ্ধ বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি শিয়া মতবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। ১০ই মুহাররমকে (কারবালার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা) শোক দিবস হিসেবে পালন করার নিয়ম প্রচলন করেন। ৯৬৭ খ্রি: মুইয-উদ-দৌলা মৃত্যুবরণ করেন।

ইজজুদ্দৌলাহ (৯৬৭খ্রিঃ) : মুইজ-উদ-দৌলার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বখতিয়ার ইজজুদ্দৌলাহ উপাধি নিয়ে আল-আমির-উল-উমারাহ পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বলচিত্তের অধিকারী। শাসক হিসেবে তাঁর কোন যোগ্যতা ছিল না। তিনি তুর্কি বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলে তাঁর পিতৃব্য পুত্র আজদুদ্দৌলাহ তাকে উদ্ধার করেন এবং তাকে বন্দী করেন। পরবর্তীতে পিতা রুকনুদ্দীনের অনুরোধকে উপেক্ষা করে আজদুদ্দৌলাহ ইজজুদ্দৌলাহকে হত্যা করেন।

আজদুদ্দৌলাহ (৯৬৭-৯৮৩) খ্রিঃ আজদুদ্দৌলাহ ছিলেন রুকনুদ্দৌলার পুত্র। ৯৩৬ খ্রিঃ আজদুদ্দৌলাহ ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯৬৭ খ্রিঃ ইজজুদ্দৌলাহকে নিহত করে আমীর-উল-উমারাহ পদ গ্রহণ করেন। পরবর্তী খলীফা তাকে তাজ-উল-মিল্লাত (জাতির মুকুট) উপাধিতে ভূষিত করেন। আজদুদ্দৌলাহ ছিলেন শ্রেষ্ঠ বুয়াইয়া শাসক। তিনি বুয়াইয়াদের ক্ষমতার চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন। তিনি বুয়াইয়া শাসকদের অধীনে এবং প্রতিষ্ঠিত ইরাক ও পারস্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে একত্রে করে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খলীফা তাকে 'সুলতান' উপাধি প্রদান করেন। জুমুআর খুতবায় তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। মুদ্রায় তাঁর নাম অংকন করা হয়। তাঁর প্রাসাদের দরজায় খলীফা দৈনিক তিনবার ঢোল পিটাবার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি উচ্চাভিলাষী শাসক ছিলেন এবং বুয়াইয়াদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'শাহানশাহ্' উপাধি গ্রহণ করেন। আজদুদ্দৌলাহ নিজ কন্যার সাথে খলীফা আল-মুতীর পুত্র ও পরবর্তী খলীফা আত্তায়ী বিল্লাহর সাথে বিবাহ দেন। তিনি নিজেও খলীফার এক কন্যাকে বিবাহ করেন। আজদুদ্দৌলাহর সময়ে বুয়াইয়া সাম্রাজ্য কাস্পিয়ান সাগর হতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তিনি প্রজাদরদী ও জনকল্যাণকামী শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজে সুশিক্ষিত ছিলেন। বিশ্বখ্যাত কবি আবু আলী, শরীফ ইবনে আলম ও আল-ফারসির মত জ্ঞানী-গুণী তাঁর রাজদরবার অলংকৃত করেন। তিনি বহু মসজিদ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল নির্মাণ করেন। খাল-খনন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করেন। তাইগ্রীস ও ফূর নদীতে বাধ নির্মাণ করেন। বাগদাদে তিনি 'আল-বিমারিস্তান আল-আজুদি' নামক একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন।

পরবর্তী বুয়াইয়াগণ : আজ্দুদ্দৌলাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দৌলাহ 'শামস-উল-মিল্লাত' উপাধি নিয়ে আমীর-উল-উমারার পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁর ভাই শরাফউদ্দৌলাহ কর্তৃক পদচ্যুত হন। শরাফউদ্দৌলাহ ৯৮৩-৯৮৯ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ৯৮৯ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নসর বাহাউদ্দৌলাহ উপাধি নিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। ৯৯১ খ্রিঃ আব্বাসীয় খলীফা আল-কাদিরকে বাহাউদ্দৌলাহ আত্তায়ীর স্থলে সিংহাসনে বসান। খলীফা আল-কাদিরের সময়কাল হতে বুয়াইয়াদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। সুলতানুদ্দৌলাহ(১০১২-১০২৪ খ্রিঃ) এবং ইমাদুদ্দীন (১০২৪-১০৪৮ খ্রিঃ) খ্রিস্টাব্দে আমীর-উল-উমারার পদে আসীন হন। বুয়াইয়া বংশের শেষ সুলতান ছিলেন আমীর-উল-উমারাহ মালিক আর রহিম (১০৪৮-১০৫৫) সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুগ্রিল বেগ কর্তৃক বুয়াইয়াদের বিতাড়িত হওয়ার সাথে সাথে এই বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

বুয়াইয়া বংশের পতনের কারণসমূহ :

শিয়া সুন্নী বিদ্বেষ : আব্বাসীয় খলীফা ছিলেন সুন্নী অপরদিকে বুয়াইয়া শাসকগণ ছিলেন শিয়া। তাই এই শিয়া সুন্নী দ্বন্দ্ব এই বংশের পতন ঘটায়।

নিষ্ঠুরতা : বুয়াইয়া বংশের অনেক শাসক নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। তাদের নিষ্ঠুরতার জন্য ক্ষমতাহীন আব্বাসীয় খলীফা ও প্রজাগণ তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

বুয়াইয়াদের দুর্বলতা : আজদুদ্দৌলাহর পরবর্তী বুয়াইয়া শাসকগণ ছিলেন দুর্বলচেতা ও অযোগ্য। তারা বুয়াইয়া সাম্রাজ্যকে সুসংহত রাখতে সক্ষম হননি। তাই বুয়াইয়া বংশের পতন ঘটে।

সেলজুক তুর্কিদের আক্রমণ : বুয়াইয়াদের দুর্বলতা, আত্মকলহ, গৃহযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে সুন্নী সেলজুক তুর্কিরা তুগ্রিল বেগের নেতৃত্বে শেষ বুয়াইয়া শাসক মালিক রহীমকে পরাজিত করে বুয়াইয়াদের নিকট হতে ক্ষমতা কেড়ে নেয়।

বুয়াইয়াদের অবদান : বুয়াইয়া আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুইযদুদ্দৌলাহ বিদ্যানুরাগী ও শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক আজ্দুদ্দৌলাহ এর সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি সর্বাধিক বিকশিত হয়। তিনি নিজেও একজন জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং গণিতশাস্ত্রে তাঁর দখল ছিলো। ঐতিহাসিক আল-মাসুদী, দার্শনিক আল-ফারাবী, আবু-নসর, কবি মুতানববী, ভাষাবিদ আলী-আল-ফারসী ও আবুল ফারায প্রমুখ মনীষীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখেন। এই সময় 'ইখওয়ানুস সাফা' সম্প্রদায়

জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ইবনুস আলম জ্যোতির্বিদ্যায় ও আবু-ওয়াফা গণিতশাস্ত্রে অবদান রাখেন। এ বংশের শাসক শরাফউদ্দৌলাহ খলীফা আল-মামুনের ন্যায় একটি মান মন্দির ও বাহাউদদ্দৌলাহ বাগদাদে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

সারসংক্ষেপঃ

বুয়াইয়া শাসকগণ ছিলেন সামরিক ক্ষেত্রে যোগ্যতম একটি বংশ যারা আব্বাসীয় খলীফাগণকে তুর্কিদের অধীন হতে মুক্ত করেছিলেন। তারা একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু শাসকদের নিষ্ঠুরতা, অযোগ্যতা, আত্মকলহ ও শিয়া মতবাদ তাদেরকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়। অবশেষে সুন্নী সেলজুক তুর্কিদের হাতে তাদের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বুয়াইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক. মুইয-উদ-দৌলা　　খ. আজ্‌দদ্দৌলাহ

গ. ইজজুদ্দৌলাহ　　ঘ. শাম্‌সউদ্দৌলাহ

২. বুয়াইয়া আল-আমির বখতিয়ার ইজজুদ্দৌলাহ সিংহাসনচ্যুত হন কেন?

ক. ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে　　খ. যুদ্ধে পরাজিত হয়ে

গ. দুর্বল মনের ছিলেন বলে　　ঘ. দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে

৩. বুয়াইয়া বংশের পতনের কারণ ছিল-

i. সেলজুক তুর্কীদের আক্রমণ　ii) শিয়া সুন্নীদের বিদ্বেষ　iii) নিষ্ঠুরতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. ii, iii　　ঘ. i,ii, iii

৪. আকিব সাহেব বুয়াইয়া বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। আকিব সাহেব চরিত্রটি নিচের কোনটি নির্দেশ করে।

ক. মুইয-উদ-দৌলা　　খ. ইজ্‌জুদ্দৌলাহ

গ. আজ্‌দদ্দৌলাহ্‌　　ঘ. রুকন্‌উদ্দৌলাহ্‌

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রাকিব বুয়াইয়া বংশের ইতিহাস সম্পর্কে পড়ছিল। আব্বাসীয় বংশের দুর্বল শাসকদের সময়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশের উত্থান ঘটে বুয়াইয়া বংশ তাঁর মধ্যে অন্যতম। বুয়াইয়া বংশের বিভিন্ন শাসকগণ এই বংশের ইতিহাস তৈরীতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। নিষ্ঠুরতা, অযোগ্যতা, আত্মকলহ ও শিয়া মতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন কারনে বুয়াইয়া বংশের পতন ঘটে।

ক. বুয়াইয়াদের রাজধানী কোথায় ছিল? ১

খ. বুয়াইয়াদের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখুন। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বংশটির ইতিহাসে অবদান উল্লেখ করুন। ৩

ঘ. বুয়াইয়া বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে আজদুদ্দৌলাহর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৮.১৩ সেলজুক বংশের উত্থান ও পতন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সেলজুক বংশের উত্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সেলজুকদের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করতে পারবেন।
- সেলজুকদের পতন মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ঘুজ গোত্র, মধ্য এশিয়া, গজনীর বংশ, 'সুলতান' উপাধি, 'আতাবেগ' উপাধি, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ, 'জালালী পঞ্জিকা', গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়, এশিয়া মাইনর**

সেলজুকগণ মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত ঘুজ গোত্রীয় লোক ছিলেন। সেলজুক বিন বাকায়িকের নাম অনুসারে এ বংশের নামকরণ হয় সেলজুক বংশ। তারা প্রাথমিককালে ছিল নিরক্ষর, অসভ্য ও অজ্ঞ। ৯৫৬ খ্রিঃ তারা সেলজুক বিন বাকায়িকের নেতৃত্বে দক্ষিণ ট্রান্স অক্সিয়ানার বোখারায় বসতি স্থাপন করে এবং সুন্নী ইসলাম মতাদর্শ ছিল। সেলজুকের পর তাঁর পুত্র পিগু আরসলান ও তাঁর পৌত্র তুগ্রিল বেগের নেতৃত্বে সেলজুকগণ মধ্য এশিয়ায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। গজনীর সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মাসুদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সেলজুকের পৌত্র তুগ্রিল বেগ সেলজুকদের নেতৃত্ব দেন এবং মাসুদকে পরাজিত করে মার্ভ ও নিশাপুর দখল করেন। গযনীর বংশের ধ্বংসস্তুপের উপর সেলজুক বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০৪৩ খ্রিঃ মধ্যে তুগ্রীলের নেতৃত্বে সেলজুকগণ বলখ, জুরজান, তাবারিস্তান, হামাদান, রাই, ইস্পাহান ও পারস্য দখল করে নেয়।

তুগ্রীল বেগ (১০৩৭-১০৬৩) খ্রিঃ

১০৫৫ খ্রিঃ আব্বাসীয় খলীফা কায়িম-বিল্লাহ বুয়াইয়া শাসকদের প্রতাপে অতিষ্ঠ হয়ে তুগ্রিল বেগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তুগ্রিল বেগ খলীফার আহবানে সাড়া দিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং ১০৫৫ খ্রিঃ শেষ বুয়াইয়া শাসক মালিক রহিমকে পরাজিত করে বাগদাদ দখল করেন। তুগ্রিল বেগ বাসাসিরি নামক তুর্কি নেতাকে পরাজিত ও নিহত করেন যিনি খলীফা আল-কায়িম বিল্লাহ কে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। ১০৬০ খ্রি: খলীফা পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। খলীফা তুগ্রিল বেগকে 'সুলতান' উপাধি দেন। তুগ্রিল বেগ বাগদাদে স্বয়ং উপস্থিত না থেকে তাঁর রাজধানী মার্ভ হতে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তুগ্রিল বেগ অত্যন্ত উদার, সরল, সাহসী ও যোগ্য সামরিক সংগঠক ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর তুগ্রিল বেগকে জ্ঞানী, ধৈর্যশীল, দানবীর, অনাড়ম্বর ও বিদ্যানুরাগী বলে উল্লেখ করেন। মার্ভে ছিল তাঁর রাজধানী। তিনি যে নগর বিজয় করতেন সেখানে তাঁর বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ একটি মসজিদ ও একটি মাদ্রাসা স্থাপন করতেন। দীর্ঘ ২৫ বছর গৌরবে সাথে রাজত্ব করে ১০৬৩ খ্রি: তুগ্রিলবেগ মৃত্যুবরণ করেন।

আলপ্ আরসলান (১০৬৩-১০৭২) খ্রিঃ

তুগ্রিল বেগের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলপ্ আরসলান সেলজুক সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সুলতান তুগ্রিলের সময় বাইজানটাইন সম্রাটের সঙ্গে যে সংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল তা আলপ্ আরসলানের সময় চরমরূপ ধারণ করে। ১০৬০ খ্রি: আলপ্ আরসলান বাইজানটাইনদের কাপাডোসিয়া ও ফ্রিজিয়া হতে বিতাড়িত করেন। এরপর তিনি বাইজানটাইন অধিকার করে জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া দখল করেন। এতে ১০৭১ খ্রি: বাইজানটাইন সম্রাট ডায়োজিনিসিম রোমানাস ২,০০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। আলপ্ আরসলান মাত্র ৪০,০০০ সৈন্যের সাহায্যে মালাজকার্দ নামক যুদ্ধক্ষেত্রে রোমানদের পরাজিত করেন। রোমান সম্রাট তাঁর কন্যার সাথে আলপ্ আরসলানের পুত্রের বিবাহ, সকল মুসলিমকে বন্দীদশা হতে মুক্তি প্রদান ও নিজের মুক্তিপণ হিসেবে ১০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে সুলতানের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। আলপ্ আরসলান ১০৭৩ খ্রি: ইন্তিকাল করেন। তিনি মার্ভ হতে ইস্পাহানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করেন। আব্বাসীয় খলীফার সাথে তাঁর সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

মালিক শাহ (১০৭২-১০৯২) খ্রিঃ

আলপ্ আরসলানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মালিক শাহ 'জালালউদ্দিন' উপাধি নিয়ে ১০৭৩ খ্রিঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মালিক শাহের রাজত্বকাল ছিল সেলজুক ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। তাঁর রাজত্বের শুরুর দিকে তাকে বেশ কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করতে হয়। নিজের ভ্রাতার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই সময়ে আব্বাসীয় খলীফা ছিলেন মুকতাদির। তিনি একজন ব্যক্তি ছিলেন। মালিক শাহ তাঁর রাজধানী ইস্পাহান হতে বাগদাদে স্থানান্তর করে। একজন জ্ঞানী ও সুশাসক হিসেবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মালিক শাহ্ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সময়ে সেলজুক সাম্রাজ্য চীনের সীমান্ত হতে ভূ-মধ্যসাগরীয় তীর পর্যন্ত এবং উত্তরে জর্জিয়া হতে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি শাসন সংস্কারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যে সুখ-শান্তি বিরাজমান ছিল।

খাজা হাসান নিযামুল মুলক

মালিক শাহ খাজা হাসান নিযামুল মুলককে পদে নিযুক্ত করে 'আতাবেগ' উপাধি দেন। নিযামুল মুলক ছিলেন একজন পণ্ডিত ও মেধাবী এবং তাঁর কর্মদক্ষতা বিচক্ষণতার ফলেই সেলজুক শাসকদের মধ্যে মালিক শাহের রাজত্বকাল স্মরণীয় হয়ে আছে। এই প্রসংগে ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন, 'Nizamul-Mulk was probably, after Yahya Bermek, the ablest ministar and administrator, Asia has ever produced.'

নিজামুল মুলক ছিলেন ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের অলংকারস্বরূপ। তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমাণস্বরূপ রাজ্যশাসন কাঠামোর উপর 'সিয়াসাত নামা' নামক ফার্সি ভাষায় একটি মহামূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। সুপণ্ডিত নিযামুল মুলক ১০৬৫-৬৭ খ্রিঃ বাগদাদে নিযামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন যা পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিচিত। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এর মত দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন এই মাদ্রাসার একজন অধ্যাপক। শেখ সাদী এই মাদ্রাসার অন্যতম কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং উমর আল-খৈয়াম নিযামুল মুলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। নিযামুল মুলকের পরামর্শে ১০৭৪ খ্রিঃ নিশাপুরে ৭০ জন জ্যোতির্বিদদের একটি সম্মেলন আহবান করেন এবং তাদের মাধ্যমে একটি পারসিক পঞ্জিকা সংস্কার করেন। এটি সুলতানের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় 'জালালী পঞ্জিকা'। মালিক শাহ নিশাপুরে একটি মান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়

মালিক শাহের রাজত্বের শেষ দিকে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নিযামুল মুলকের সহপাঠি হাসান সাবাহ, যিনি পর্বতের বৃদ্ধ লোক (The Old Man of the Mountain) নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায় ফাতেমীয় খলীফার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র নৈরাজ্য ও ত্রাসের সৃষ্টি করে। তারা তরবারি ও বিষের সাহায্যে বহু রাজবংশীয় লোককে হত্যা করে। নিযামুল মুলকের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে ১০৯১ খ্রিঃ গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় নিযামুল মুলককে হত্যা করে। তিনিই ছিলেন এই গুপ্তঘাাতক সম্প্রদায়ের প্রথম হত্যার শিকার। মালিক শাহ তাদের বিরুদ্ধে ২টি অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হন। অবশেষে ১২৫৬ খ্রিঃ মোঙ্গল নেতা হালাকু খান কর্তৃক গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের বিনাশ ঘটে ও তাদের প্রধান ঘাটি আলামুত দুর্গ বিধ্বস্ত হয়। মালিক শাহ প্রায় একুশ বছর রাজত্ব করে ১০৯২ খ্রিঃ মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

পরবর্তী সেলজুকগণ

মালিক শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী তুরখানের অনুরোধে খলীফা তাঁর শিশুপুত্র মাহমুদকে (১০৯২-৯৪) নাসিরুদুনইয়া ওয়াদ্দীন উপাধি দিয়ে সুলতানের পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু অচিরেই তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বরকিয়ারুক তাকে পদচ্যুত করেন ও রুকুনুদ্দীন উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। কিছুদিন পর তাঁর ভ্রাতা মুহাম্মদের সাথে তাঁর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। বরকিয়ারুক পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন ও মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হতেই সেলজুক সুলতানদের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। সেলজুক সাম্রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ১১৯৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সেলজুকগণ আব্বাসী খলীফাদের উপর প্রভাব বজায় রাখেন।

সেলজুকদের পতনের কারণসমূহ

যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব : মালিক শাহ ছিলেন শ্রেষ্ঠ সেলজুক শাসক। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে সেলজুক বংশের পতন ঘটে।

নিজামুল মুলকের মৃত্যু : নিজামুল মুলকের ন্যায় মেধাবী ও যোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

আদর্শচ্যুতি : যে আদর্শের ভিত্তিতে সেলজুক বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পরবর্তী দুর্বল শাসকগণ সেই আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। এতে এ বংশের পতন ত্বরান্বিত হয়। ১১৯৪ খ্রিঃ খাওয়ারিজমের শাসক তাকাশ শেষ সেলজুক সুলতান তুগ্রিলকে (১১৭৭-৯৪) পরাজিত করে সেলজুক বংশের পতন ঘটান।

সেলজুকদের অবদান : ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেলজুক সুলতানদের অবদান চিরস্মরণীয়। মালিক শাহের ও নিজামুল মুলকের সময়কাল ছিল সেলজুকদের স্বর্ণযুগ। দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (রহ.), কবি ফরিদ আল দীন আত্তার, সাহিত্যিক নিযামী, কবি নাসির-ই-খসরু, গণিত ও জ্যোতির্বিদ উমর খৈয়াম সেলজুক রাজদরবার অলংকৃত করেন। সেলজুক সুলতানদের আমলে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও স্থাপত্য শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁরা বাগদাদে সুন্নী খিলাফতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তারা ইসলাম বিস্তার ও এশিয়া মাইনরে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

সারসংক্ষেপ :

সুন্নী মতাদর্শী সেলজুক শাসকগণ ১০৫৫ হতে ১১৯৪ খ্রিঃ পর্যন্ত বাগদাদে শাসন পরিচালনা করেন। তুগ্রিল বেগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও মালিক শাহের দ্বারা গৌরবান্বিত সেলজুক বংশ মধ্য এশিয়ায় এক বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বংশের সকল শাসক ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। এশিয়া মাইনরে তারা স্থায়ীভাবে ইসলামকে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কার নামানুসারে সেলজুক বংশের নামকরণ করা হয়?
ক. মালিক শাহ খ. নিযাম-উল-মুলক গ. সেলজুক বিন বাকায়িক ঘ. আলপ-আর-সালান

২. নিযাম-উল-মুলককে আতাবেগ উপাধিতে ভূষিত করা হয় কেন?
ক. কুরআনের তরজমা করার জন্য খ. জ্যোতিষশাস্ত্রে অবদানের জন্য
গ. ফিকাহশাস্ত্রে অবদানের জন্য ঘ. রসায়নশাস্ত্রে অবদানের জন্য

৩. নিযাম-উল-মুলকের অবদান রয়েছে-
i. সিয়াসতনামা রচনায় ii. বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠায়
iii. জালালী পঞ্জিকা তৈরীতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক.i খ.i,iii গ. i,ii ঘ.ii,iii

৪. সেলজুক শাসনের সময়ে 'ক' এর নেতৃত্বে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। 'ক' নিচের কোনটি নির্দেশ করে?
ক. মালিক শাহ খ. হাসান বিন সাবাহ
খ. আলপ আর-সালান ঘ. নিজাম-উল-মুলক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

প্রফেসর ইসহাক বললেন- মধ্য এশিয়া সেলজুকগণ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করেন। তিনি সেলজুকদের উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করেন, বিভিন্ন সেলজুক শাসকের শাসনকাল সম্পর্কে বর্ণনা করেন। ছাত্রছাত্রীরা সেলজুকদের অবদান সম্পর্কে জানতে পায়।

ক. কার শাসনামলে সেলজুকদের ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে ওঠে? ১
খ. মালিক শাহকে 'সেলজুকদের শ্রেষ্ঠ শাসক' বলা হয় কেন? ২
গ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সেলজুকদের অবদান উল্লেখ করুন। ৩
ঘ. প্রফেসর ইসহাক সেলজুকদের উত্থান সম্পর্কে কী ধারণা দেন ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৮.১৪ আব্বাসীয় বংশের পতন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আব্বাসীয় বংশের পতনের কারণসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।
- আব্বাসীয় বংশের পতনের ঘটনার বিবরণ দিতে পারবেন।
- আব্বাসীয় বংশের পতনের ফলাফল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ, তুর্কি সেনাবাহিনী, গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়, হালাগু খান, খলিফা মুস্তাসিম, বাগদাদ ধ্বংস**

৭৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় বংশ প্রায় ৫০০ বছর শাসন করে এবং ১২৫৮ সালে এর চূড়ান্ত পতন ঘটে। অষ্টম ও নবম শতকে এই বংশটি তার গৌরব বলয় বিস্তার করে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই গৌরব রবি মোঙ্গল সেনাপতি হালাগু খানের হাতে অস্তমিত হয়।

আব্বাসীয় বংশের পতনের কারণসমূহ :

পরোক্ষ কারণ

কেন্দ্রিয় শাসনের দুর্বলতা : আব্বাসীয়দের প্রথম একশত বছরের শাসনকালকে গৌরবের যুগ বলা হয়। এ সময় আল-মনসুর, আল-মাহ্দী, হারুন-অর-রশিদ, আল-মামুন প্রমূখ খলিফারা যোগ্যতার সাথে কেন্দ্রিয় প্রশাসন যন্ত্রটি পরিচালনা করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে আল-ওয়াসিকের (৮৪২-৪৭) পরবর্তী খলিফাদের অযোগ্যতা, নৈতিক অবক্ষয়, জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি নানা কারণে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে রাষ্ট্রের স্থায়ীত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। P. K. Hitti (গ্রন্থ: *History of the Arabs*) এর মতে, ৮২০ সালের দিকে যেখানে বাগদাদের খলিফার হাতে পৃথিবীর অধিকাংশ ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত ছিল, সেখানে একশ বৎসর পর উত্তরসূরীদের ক্ষমতা এতটাই কমে গেল যে, রাজধানীতেও এর বিন্দুমাত্র প্রভাব অনুভব করা যেতনা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব : খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যে বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক প্রধানগণ স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে এবং আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে শুরু করেছিল। P. K. Hitti বলেন, "খিলাফত নামক দুর্বল ব্যক্তিটি যখন প্রায় মৃত্যুশয্যায়, তখন সিদেল চোরেরা দরজা খুলে সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।" এ সময় আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমে তাহিরী, সাফ্ফারী, সামানি, বুয়াইদ, সেলজুক, গযনভী, ইদ্রিসী, আঘলাবী, তুলুনী, ইখ্শিদ, জঙ্গি, হামানিদ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। এই আঞ্চলিক রাজবংশসমূহ কালক্রমে খিলাফত থেকে অলাদা হবার কারণে কেন্দ্রিয় শক্তি দুর্বল হতে থাকে।

তুর্কী সেনাদের দৌরাত্ম্য : খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৪২) কর্তৃক গঠিত তুর্কী সেনাবাহিনী পরবর্তীতে আব্বাসীয় বংশের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই বাহিনী ক্রমে এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠে যে, আব্বাসীয় খলিফাগণ তাঁদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। খলিফাদের নিয়োগ ও পদচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষমতা তাদের হাতেই থেকে যায়। তুর্কী সেনাদের দৌরাত্ম্যে খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ বাগদাদ হতে রাজধানী সামাররাতে স্থানান্তর করতে বাধ্য হন। কিন্তু সেখানে গিয়েও খলিফাদের বন্দী জীবন-যাপন করতে হত। তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ৫৬ বছর (৮৩৬-৯২) পর বাগদাদে আবার রাজধানী ফিরিয়ে আনা হয়। খলিফা মুস্তাকফী (৯৪৪-৪৬) তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বুয়াইয়াদের আমন্ত্রণ জানান। ফলে তুর্কীদের পরিবর্তে বুয়াইয়াদের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর আবার সেলজুক ও খারিজম শাহের আধিপত্য খলিফাদের স্বাধীনভাবে শাসন করার ক্ষমতা হরণ করে।

জাতিগত দ্বন্দ্ব : জাতিগত দ্বন্দ্ব আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে বড় কারণ ছিল। আরবীয়, অনারবীয়, মুসলিম, নও-মুসলিম ও অমুসলিম যিম্মিদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিরাজ করছিল। আরবদের মধ্যে উত্তর আরবীয় ও

দক্ষিণ আরবীয়দের মধ্যে পুরানো বিভেদকামী মানসিকতা তখনও বজায় ছিল। পারসিক ও তুর্কী জাতি কখনও আরবীয় বা সেমেটিক জাতির সাথে মিলেমিশে একটি অখণ্ড সত্তায় পরিণত হতে পারেনি। সংস্কৃতিবান পারসিকরা অপেক্ষাকৃত কম সংস্কৃতিবান আরব শাসনের সাথে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। ফলে জাতিগত কোন্দল আব্বাসীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলে।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা : জাতিগত দ্বন্দ্বের পাশাপাশি যোগ হয়েছিল ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব। শিয়া, সুন্নী, খারিজি, আশারিয়া, মুতাযিলা, গুপ্তঘাতক, কারামাতীয়, ঈসমাইলীয় ইত্যাদি ধর্মীয় মতবাদগুলি পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করত। বিশেষ করে শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব আব্বাসীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয়। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর দ্বন্দ্ব কখনও কখনও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নিত।

ত্রুটিযুক্ত উত্তরাধিকার নীতি : উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব আব্বাসীয় খিলাফতের ঐক্যের প্রতি ছিল হুমকি স্বরূপ। উত্তরাধিকারীদের অধিকার নিয়ে অন্তহীন দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা হয়নি; বরং এই দ্বন্দ্ব দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আরও দুর্বল করে দিয়েছিল। যখনই অসংখ্য ভাই-বোনদের মধ্যে একজন খলিফা হন, তখন খিলাফতের অন্যান্য দাবীদাররাও নির্বাচিত খলিফার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে খলিফাকে কার্যত অকার্যকর করে ফেলত।

অর্থনৈতিক সংকট : অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও এই বংশের পতনের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল। নতুন নতুন কর আদায় এবং কৃষি ও শিল্পের প্রতি ক্রমাগত অবহেলার কারণে মানুষের আর্থিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। বারবার রক্তাক্ত সংঘর্ষে বহু মানুষের প্রাণহানী হয়। এছাড়া প্লেগ, গুটি বসন্ত, ম্যালেরিয়া, জ্বর ইত্যাদি মহামারিতে বহু মানুষের প্রাণহানী ঘটে। আরবীয় বর্ষপঞ্জিতে প্রথম চার হিজরি শতকে ৪০টি বড় ধরনের মহামারীর কথা লেখা আছে। জনসংখ্যা কমে যাওয়ায় বহু আবাদী জমি পতিত জমিতে পরিণত হয়। ফলে অর্থের অভাবে সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতা প্রদান, সেনাবাহিনী সম্প্রসারণ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান বিঘ্নিত হয়।

প্রত্যক্ষ কারণ :

হালাগু খানের আক্রমণ : ১২৫৬ সালে মোঙ্গল সেনাপতি হালাগু খান গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে সাহায্য চাইলে খলিফা মুস্তাসিম (১২৪২-৫৮) তাতে কোন সাড়া দেননি। ১২৫৬ সালে হালাগু খান এককভাবে আক্রমণ চালিয়ে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করেন। গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে সাহায্য না করার অযুহাতে এবং খলিফা মুস্তাসিমের শিয়া উযির মুয়াহিদউদ্দীন আল-কামীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মঙ্গু খানের সেনাপতি হিসেবে হালাগু খান বাগদাদ আক্রমণ করেন।

বাগদাদ ধ্বংসের ঘটনা ও ফলাফল :

হালাগু খানের বাহিনী ১২৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে বাগদাদে প্রবেশ করে। বাগদাদ অবরোধ করা হয়। তিনি নির্বিচারে বাগদাদের ২০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ১৬ লক্ষকে হত্যা করেন। বাগদাদ নগরীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস্তুপে পরিণত করা হয়। এখানে এতটাই হত্যাকাণ্ড চালানো হয় যে ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীর পানি রক্তে লাল হয়ে যায়। খলিফাকে পরিবার পরিজনসহ হত্যা করা হয়। এর ফলে মুসলিম বিশ্ব কয়েক বছরের জন্য খিলাফত শূণ্য হয়ে যায়। বাগদাদের পতনের ফলে শুধু একটি সাম্রাজ্যেরই পতন হয়নি; বরং একটি সভ্যতারও পতন ঘটে। কারণ সমসাময়িক বিশ্বে বাগদাদ শুধু মুসলিম সভ্যতারই নয়, বিশ্ব সভ্যতারও প্রাণকেন্দ্র ছিল। আব্বাসীয় বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আরবদের প্রাধান্য চিরতরে নি:শেষ হয়ে যায় এবং মূল খিলাফত ইতিহাসের অবসান ঘটে।

সারসংক্ষেপ:

১২৫৮ সালে আব্বাসীয় বংশের পতন ঘটে। শেষ যুগের খলিফাদের অযোগ্যতা, সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব, তুর্কী সেনাবাহিনীর উত্থান, স্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক রাজবংশের উদ্ভব, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি নানা কারণে এই বংশের অধ:পতন নেমে আসে। অবশেষে মোঙ্গল সেনাপতি হালাগু খান ১২৫৮ সালে বাগদাদ নগরী ধ্বংস সাধন করেন এবং এর ফলে আব্বাসীয় বংশের পতন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাগদাদের সর্বশেষ আব্বাসীয় খলিফার নাম কী?
   (ক) হারুন-অর-রশিদ (খ) আল-মুতাসিম বিল্লাহ
   (গ) আল-মুস্তাসিম (ঘ) আল-মুতাওয়াক্কিল

২. বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের পতন ঘটে কত সালে?
   (ক) ৭৫০ সালে (খ) ৮২০ সালে
   (গ) ১২৫৬ সালে (ঘ) ১২৫৮ সালে

৩. বাগদাদ ধ্বংস করেন কে?
   (ক) খলিফা মুস্তাসিম (খ) হালাগু খান
   (গ) চেঙ্গিস খান (ঘ) মঙ্গু খান

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

সুলতান মাহমুদ গজনী থেকে এসে ১৭ বার ভারত অভিযান করে প্রচুর পরিমাণে ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। ইতিহাসের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে সায়হান তার পিতার নিকট থেকে এ বিজয় অভিযান সম্পর্কে আরও জানার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করে বিস্তারিত জানতে পারল।

ক. বাগদাদ নগরী কত সালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়? ১

খ. বাগদাদ কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়- ব্যাখা করুন। ২

গ. উল্লিখিত উদ্দীপকের সাথে আবাসীয় বংশের পতন বিশ্লেষণ করুন। ৩

ঘ. আব্বাসীয় বংশের পতনের ফলাফল বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-৮.১৫ আব্বাসীয় সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আব্বাসীয় সমাজের একটি রূপরেখা অঙ্কণ করতে পারবেন।
- শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে আব্বাসীয় অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**আব্বাসীয় সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি**

আব্বাসীয় সমাজ ব্যবস্থা

আব্বাসীয় সমাজের স্তর বিন্যাস : আব্বাসীয় সমাজ ব্যবস্থা প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত ছিল : অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণী। খলিফা, তাঁর পরিবার পরিজন ও হাশেমী গোত্রের সদস্যবৃন্দ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত হয় অভিজাত শ্রেণী। তারা সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ছিল বণিক, শিল্পী ও অন্যান্য পেশাজীবী মানুষ। কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মেহনতি জনতা নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নারী সমাজ : সমাজে নারীর উচ্চ স্থান ছিল। খলিফা আল-মাহ্দীর স্ত্রী খায়জুরান, কন্যা উলাইয়া, হারুন-অর-রশিদের স্ত্রী যুবাইদা প্রমূখ মহিয়সীরা আব্বাসীয় সমাজে তাদের কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেন। নারীরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ, বিচার কার্য সম্পাদন, সাহিত্য সভা বা আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ, কাব্য রচনা, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদিতে অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারত।

দাস প্রথা : আব্বাসীয় সমাজে দাস-দাসীদের মানবীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করা হতনা। আব্বাসীয় দরবারে ১০/১২ হাজার দাস-দাসী থাকত। হেরেমে যেসব দাস থাকত তারা হত নপুংশক বা খোজা। অল্পবয়স্ক দাসদের নিয়ে গড়ে তোলা হত গিলমান। দাসীরা নাচ-গান করত। দাসীদের মধ্য হতে অনেকে খলিফা ও অভিজাতদের উপপত্নী হত।

যিম্মি সমাজ : অমুসলিম বা যিম্মিদের সাথে আব্বাসীয়রা উদার ও মানবিক আচরণ করতেন। খ্রিস্টান, ইহুদি, সাবী, মাজুসী, জরথুস্ত্র সম্প্রদায় যিম্মিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজদরবারে অমুসলিম জ্ঞান-গুণীরা সমাদৃত হতেন। বায়তুল হিকমাহ, রাজস্ব বিভাগ ও অন্যান্য দপ্তরে উচ্চপদে এমনকি উযির হিসেবে তারা গুরু দায়িত্ব পালন করত।

বিনোদন : আব্বাসীয় আমলে দাবা ও পাশা খেলার প্রচলন ছিল। খলিফা হারুন-অর-রশিদ প্রথম খলিফা যিনি দাবা খেলতেন এবং খেলাকে প্রশ্রয় দিতেন। তিনি ফ্রান্সের রাজা শার্লিমেনকে একটি দাবার বোর্ড উপহার দিয়েছিলেন। আউটডোর খেলার মধ্যে তীরন্দাজ প্রতিযোগিতা, পোলো খেলা, বল ও বল্লম ছোড়ার খেলা, ঘোড়দৌড় এবং শিকার উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা ব্যবস্থা : উচ্চ শিক্ষায় মুসলিম দুনিয়ার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল বাইতুল হিক্মাহ্। ৮৩০ সালে খলিফা আল-মামুন বাগদাদে এটা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অনুবাদ কেন্দ্র, পাঠাগার ও গবেষণা-এই তিনটি বিভাগ ছিল। এ সময়ই বাগদাদে নির্মিত প্রথম হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। তবে উচ্চ শিক্ষায় প্রথম প্রকৃত প্রতিষ্ঠান ছিল নিযামুল মুলকের প্রতিষ্ঠিত নিজামিয়া শিক্ষায়তন। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি এটির অনুকরণেই গড়ে ওঠে। খলিফা আল মুস্তানসির (১২২৬-৪২) ১২৩৪ সালে চার মাযহাব শিক্ষাদানের জন্য মুস্তানসিরিয়াহ্ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন।

সংস্কৃতি

সাহিত্য ও কাব্য চর্চা : আব্বাসীয় আমলে আরবী ও ফারসি সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইউসুফ জোলেখা, লাইলী মজনু, আলিফ লায়লা ওয়া-লায়লা এ সময়ের বিখ্যাত সাহিত্য গ্রন্থ। কবিদের মধ্যে বাশ্শার ইবনে বারদ, আবু-নওয়াস, আবু-তাম্মাম, আল-বুহতরি, আবু আল-আতাহিয়া ও আব্বাস বিখ্যাত ছিলেন।

ধর্মতত্ত্ব : আব্বাসীয় আমলে হাদীস চর্চা ব্যাপকতা লাভ করে। সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা ৬টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ রচিত হয় এ সময়। এছাড়া ফিকাহ শাস্ত্রেরও বিকাশ ঘটে এ সময়। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যার বাস্তবমূখী সমাধানের জন্য ৪ জন আইন প্রণেতা কুরআন, হাদীস ও ইজমার ভিত্তিতে ৪টি মাযহাব গড়ে তোলেন।

ইতিহাস : আব্বাসীয় যুগে বহুমাত্রিক ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চা আরও ব্যাপক রূপ লাভ করে। আল-ওয়াকিদী, হিশাম আল-কালবী, মুহম্মদ ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, ইবনে সাদ, ইবনে আব্দুল হাকাম, আল-বালাযুরী, ইবনে কুতাইবা, দিনওয়ারী, আল-ইস্পাহানী, আল-তাবারী, ইবনে খাল্লিকান এ যুগের ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ভূগোল : ভূগোলের ক্ষেত্রে আল-তাবারী, আল-মাসুদী, আল-ইয়াকুত, আল-বালাযুরি, ইবনে হাওকাল, আল-বল্‌খি, আল-দিনাওয়ারি, ইবনে মিসকাওয়াই, আল-খাওয়ারিয্‌মি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। আল-খাওয়ারিয্‌মির 'সুরাত আল-আরদ' এ বিষয়ে একটি মৌলিক গ্রন্থ। খলিফা আল-মামুনের সময় ৬৯ জন পণ্ডিতের মাধ্যমে একটি মানচিত্র তৈরি হয় যা সৌরজগৎ ও পৃথিবী সম্পর্কে মুসলিমদের অঙ্কিত প্রথম মানচিত্র।

দর্শন শাস্ত্র : দর্শন শাস্ত্রে আব্বাসীয়রা মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে। এ সময় আরবীয় দর্শন শাস্ত্রে গ্রিক ও পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ যুগের দার্শনিকদের মধ্যে আল-কিন্দি, আল-ফারাবী, ইবনে সীনা ও ইমাম আল-গায্‌যালী উল্লেখযোগ্য।

চিকিৎসা বিজ্ঞান : চিকিৎসা বিদ্যায় আব্বাসীয়দের অবদান অনন্য। এ যুগের চিকিৎসকদের মধ্যে জিব্রিল ইবনে বখতিয়াসু, জাবির ইবনে হাইয়ান, ইবনে মাসাওয়াহ, সিনান ইবনে সাবিত বিন কুররাহ, আল-তাবারী, আল-রাযী, আল-মাযুসী, ইবনে সিনা বিখ্যাত ছিলেন। আল-রাযী ছিলেন বাগদাদের হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক। তাকে শল্য চিকিৎসার জনক বলা হয়। ইবনে সিনার 'আল কানুন ফি আল-ত্বিব'কে বলা হয় চিকিৎসা বিদ্যার বাইবেল। নবম শতকে খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময় বাগদাদে প্রথম হাসপাতাল নির্মিত হয় যার নাম হয় বিমারিস্তান।

জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতি :শাস্ত্র ও গণিত: জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতি:শাস্ত্র ও গণিতে সাধারণভাবে আরব এবং বিশেষ করে আব্বাসীয়দের অবদান বিস্ময়কর । এ যুগের জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদদের মধ্যে আল-বাত্তানি, আল-বিরুনি, উমর আল-খৈয়াম ও আল-খাওরিয্‌মি বিখ্যাত ছিলেন।

রসায়ন শাস্ত্র : জাবির ইবনে হাইয়ান ছিলেন রসায়ন শাস্ত্রের জনক। তার রচিত গ্রন্থগুলো এশিয়া ও ইউরোপে রসায়ন শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হত। এছাড়া আল-রাযী রসায়ন শাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

স্থাপত্য ও কারুকার্য, চিত্র শিল্প ও লিপিকলা : আব্বাসীয় আমলে সমাধিসৌধ, রাজ প্রাসাদ, অট্টালিকা, মসজিদ, হাসপাতাল, ঝর্ণা, বাগান, সরকারী হাম্মামখানা ও দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামে অনুমোদন না থাকলেও এ যুগে চিত্রশিল্পের ব্যাপক চর্চা হয়েছে। আব্বাসীয় আমলে লিপিকলা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মাধ্যমে পরিণত হয়। এ সময় লিপিকলায় রায়হানী, মুহাককারা ও ইয়াকুতী পদ্ধতি যুক্ত হয়। সমাজে চিত্র শিল্পিদের চেয়ে লিপিকার বা হস্তাক্ষরবিদদের বেশি মর্যাদা ছিল। কারণ লিপিকাররা মূলত কুরআনের প্রতিলিপি লিখত। অন্যদিকে ইসলামে চিত্রশিল্প নিষিদ্ধ।

সঙ্গীত চর্চা : আব্বাসীয় আমলে সঙ্গীত চর্চা বিকাশ লাভ করে। সিয়াত, ইব্রাহিম মওসিলি ও ইসহাক মওসিলি সে সময়ের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ইসহাক মওসিলি ছিলেন ঐ যুগের শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীতজ্ঞ। তাকে সঙ্গীতের ডিন বলা হয়।

সারসংক্ষেপ:

আব্বাসীয় সমাজ ব্যবস্থা প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত ছিল: অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণী। সমাজে নারীর উচ্চস্থান ছিল। দাসদের ও জিম্মিদের মানবীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করা হত না। আব্বাসীয়রা শিক্ষা, সাহিত্য ও কাব্য চর্চা, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত, স্থাপত্য, চিত্র ও লিপিকলায় তাদের মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও ইসলামের ৪টি মাযহাব গড়ে ওঠে কোন্ আমলে?

(ক) খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে

(খ) উমাইয়া আমলে

(গ) আব্বাসীয় আমলে

(ঘ) ফাতিমি আমলে

২. সঙ্গীতের ডিন বলা হয় কাকে?

(ক) ইসহাক মওসিলি-কে

(খ) খলিফা আল-ওয়াসিক-কে

(গ) সিয়াত- কে

(ঘ) ইব্রাহিম মওসিলি-কে

৩. বাগদাদে প্রথম হাসপাতাল বা বিমারিস্তান নির্মিত হয় কার সময়?

(ক) খলিফা আল-মনসুরের সময়

(খ) খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়

(গ) খলিফা আল-মাহ্দীর সময়

(ঘ) খলিফা আল-মামুনের সময়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

দিনা তার শিক্ষকের নিকট সুলতানী আমলের সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি সুলতানী আমলে সমাজের একটি রূপরেখা তুলে ধরেন। এরপর তিনি সেই আমলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন। এতে দিনা সেই সমাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করল।

ক. আব্বাসীয় বংশ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? ১

খ. আব্বাসীয় সমাজে সামাজিক শ্রেণীগুলো ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়ের সাথে আব্বাসীয়দের সমাজের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন। ৩

ঘ. আব্বাসীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি রূপরেখা তুলে ধরুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ : ১. (খ) ২. (ক) ৩. (গ) ৪. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ : ১. (গ) ২. (ক) ৩. (ঘ) ৪. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ : ১. (গ) ২. (খ) ৩. (ঘ) ৪. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ : ১. (গ) ২. (ক) ৩. (গ) ৪. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ : ১. (খ) ২. (গ) ৩. (ঘ) ৪. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ : ১. (খ) ২. (ক) ৩. (গ) ৪. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ : ১. (খ) ২. (খ) ৩. (খ) ৪. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ : ১. (গ) ২. (খ) ৩. (ক) ৪. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৯ : ১. (খ) ২. (খ) ৩. (ঘ) ৪. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১০ : ১. (ক) ২. (খ) ৩. (খ) ৪. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১১ : ১. (ক) ২. (খ) ৩. (ঘ) ৪. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১২ : ১. (ক) ২. (গ) ৩. (ঘ) ৪. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৩ : ১. (গ) ২. (খ) ৩. (খ) ৪. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৪ : ১. (গ) ২. (ঘ) ৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১৫ : ১. (গ) ২. (ক) ৩. (খ)

স্পেনে মুসলিম শাসন (৭১১-১৪৯২)

ইউনিট ৯

ভূমিকা

মধ্যযুগে যেসকল স্থানে আরব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এর মধ্যে স্পেন অন্যতম। ৭১১ সালে এ অঞ্চলটি মুসলিম শাসনাধীনে আসে। মুসলিমরা এর নাম দিয়েছিল আন্দালুসিয়া বা আল-আন্দালুস। শুরুতে স্পেন দামেস্কের উমাইয়া খিলাফতের অধীনে একটি প্রদেশ হিসেবে পরিণত হয়। ৭৫৬ সালে আব্দুর রহমান আদ্-দাখিল এখানে একটি স্বাধীন উমাইয়া আমীরাত প্রতিষ্ঠা করেন। ৯২৯ সালে তৃতীয় আব্দুর রহমান এই আমীরাতকে খিলাফতে উন্নীত করেন। ১০৩১ সালে উমাইয়া খিলাফতের অবসানের পর স্পেনে আরব, বার্বার ও স্লাভরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের সৃষ্টি করে শাসন করতে থাকে। উত্তরের খ্রিস্টানরা ক্রমাগত আক্রমণ করে যখন ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একে একে গ্রাস করছিল সেসময় উত্তর আফ্রিকার মরক্কো হতে মুরাবিতুন (১০৯১-১১৪৬) রাজবংশ স্পেনের রাজক্ষমতা গ্রহণ করে এবং মরক্কো হতেই স্পেন শাসন করতে থাকে। এরপর মুরাবিতুনদের হটিয়ে মুয়াহিদুন (১১৪৬-১২৪৮) রাজবংশ মরক্কো হতে স্পেন শাসন করে। স্পেনে মুসলিমদের শেষ রাজবংশ ছিল গ্রানাডার নসর বংশ (১২৩২-১৪৯২)। ১৪৯২ সালে এই বংশের পতনের মধ্য দিয়ে স্পেনে মুসলিম শাসনের চির অবসান হয়। পরবর্তী প্রায় ১০০ বছর খ্রিস্টানদের ধর্মান্তকরণ, অত্যাচার, নিপীড়ন, নিষ্পেষণ, বহিস্কার ও হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মুসলিমদের চূড়ান্ত উচ্ছেদ সম্পন্ন করে। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবার পর সেখানে প্রকাশ্যে কোন মুসলিমের অস্তিত্ব ছিলনা। তবে দীর্ঘ প্রায় ৮০০ বছর শাসন করে মুসলিমরা স্পেনে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল যা ইউরোপীয় রেনেঁসা সৃষ্টিতেও বিরাট ভূমিকা রেখেছিল।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ : স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থা
পাঠ-৯.২ : মুসলিম বিজয়ের পূর্বে স্পেনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা
পাঠ-৯.৩ : মুসলিমদের স্পেন বিজয় ও উমাইয়া আমীরাত প্রতিষ্ঠা
পাঠ-৯.৪ : টুরসের যুদ্ধ
পাঠ-৯.৫ : প্রথম আব্দুর রহমান
পাঠ-৯.৬ : প্রথম হিশাম
পাঠ-৯.৭ : দ্বিতীয় আব্দুর রহমান
পাঠ-৯.৮ : উমর বিন বিন হাফ্সুন
পাঠ-৯.৯ : তৃতীয় আব্দুর রহমান
পাঠ-৯.১০ : দ্বিতীয় হিশাম ও হাজিব আল মনসুর
পাঠ-৯.১১ : স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান
পাঠ-৯.১২ : শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে স্পেনের মুসলিমদের ভূমিকা

পাঠ-৯.১ স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্পেনের প্রাকৃতিক সীমারেখা, বন্দর, মালভূমি, পর্বতমালা, নদী, হ্রদ ইত্যাদির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- স্পেনের যাতায়াত ব্যবস্থা, জলবায়ু, উৎপাদন ব্যবস্থা ও জনসংখ্যার বিবরণ দিতে পারবেন।
- স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**আইবেরীয় উপদ্বীপ, আন্দালুসিয়া, জিব্রাল্টার প্রণালী, পিরেনীজ পর্বতমালা, মেসেতা, তাগুস, গোয়াদালকুইভার, আইবেরি ও মুর**

ভূমিকা

বর্তমানকালের স্পেন ও পর্তুগাল রাষ্ট্রের ভূখণ্ড নিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগে স্পেন গড়ে উঠেছিল। রোমান শাসনামলে স্পেনকে বলা হত আইবেরীয় উপদ্বীপ। স্পেনের সর্বপ্রাচীন আইবেরি জাতির নামানুসারে এই নামকরণ করা হয়। এই উপদ্বীপের তের ভাগের এগার ভাগ এলাকা জুড়ে স্পেন বিস্তৃত। মুসলিম আমলে এর নাম হয় আন্দালুসিয়া। স্পেনের দক্ষিণভাগের বিরাট অংশের নাম ছিল আন্দালুসিয়া। এ কারণে মুসলিমরা স্পেনকে এই নামে জানত।

প্রাকৃতিক সীমানা : স্পেন চার দিক থেকেই প্রাকৃতিক সীমানা বেষ্টিত। এর তিন দিক জল ও এক দিক স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত বলে স্পেন একটি উপদ্বীপের বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করে। এর দক্ষিণ দিকে রয়েছে জিব্রাল্টার প্রণালী, যা স্পেনকে উত্তর আফ্রিকা হতে পৃথক করেছে। উত্তর দিকে রয়েছে পিরেনীজ পর্বতমালা, যা স্পেনকে ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য অংশ হতে পৃথক করেছে। এছাড়া স্পেনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বিসকে উপসাগর রয়েছে। পূর্ব দিক থেকে ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিম দিক থেকে আটলান্টিক মহাসাগর স্পেনকে পরিবেষ্টণ করে রেখেছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে স্পেন আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে।



মানচিত্র: স্পেন (আন্দালুসিয়া)

উপকূল ও পোতাশ্রয় : স্পেনের প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ সমুদ্রের দিকে উন্মুক্ত। এত বিশাল উপকূল থাকা সত্ত্বেও স্পেনে খুব কম সংখ্যক পোতাশ্রয় রয়েছে। এর কারণ হল সেখানকার বেশিরভাগ উপকূলীয় এলাকা সমুদ্র উপকূল হতে সুউচ্চ এবং খাঁজবিহীন। উপকূলের পোতাশ্রয়গুলোর মধ্যে তারাগোনা, ক্যাস্টেলন, ভ্যালেন্সিয়া, আলমেরিয়া, মালাগা, আলজেসিরাস, তারিফা, কেডিজ, লিসবন, অপোর্তো ও করুন্না উল্লেখযোগ্য।

মেসেতা মালভূমি : স্পেনের অর্ধেকেরও বেশি জায়গা জুড়ে আছে মেসেতা মালভূমি। এই মালভূমি উত্তর হতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হতে পশ্চিমে ক্রমশ ঢালু। এর গড় উচ্চতা দুই হাজার ফুট। এটি সমুদ্র উপকূল হতে বিচ্ছিন্ন এবং উপকূলের মধ্যভাগে অবস্থিত। মেসেতা মালভূমির মধ্যভাগস্থ মন্টেস দে-টলেডো নামক একটি পর্বতমালা এই মালভূমিকে আবার উত্তর ও দক্ষিণ উপ-মেসেতায় বিভক্ত করেছে।

পর্বতমালা ও গিরিপথ : উত্তর দিকের পিরেনীজ পর্বতমালা স্পেনকে ফ্রান্স হতে পৃথক করেছে। পিরেনীজ পর্বতমালার মধ্যে কিছু সংখ্যক গিরিপথ রয়েছে, যেমন- রইসেস ভ্যালী, পেরতুস, ভ্যালী দে-আরান ও সমপোর্ট। এই গিরিপথগুলি স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে

সংযোগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই গিরিপথগুলো বছরের প্রায় ছয় মাস তুষার আবৃত থাকে। অন্যান্য পর্বতমালার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম দিকের ক্যান্টাব্রিয়ান পর্বতমালা, দক্ষিণের সিয়েরা মরেনো পর্বতমালা, পূর্বদিকের আইবেরিয়ান পর্বতমালা এবং গোয়াদালকুইভির নদী ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যভাগে অবস্থিত সিয়েরা নাভাদা পর্বতমালা উল্লেখযোগ্য। সিয়েরা নাভাদা পর্বতমালার মধ্যে অনেক হ্রদ ও হিমবাহের পলি দ্বারা সৃষ্ট গ্রাবরেখা রয়েছে।

যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা : মেসেতা মালভূমির সীমানায় অবস্থিত গিরিপথসমূহ, বিভিন্ন উপত্যাকা, নদী ও নদীর অববাহিকা অনুসরণ করে স্পেনের যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পার্বত্য অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও রোমান এবং আরব শাসনাধীনে স্পেনে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রোমানদের তৈরী ৩৪টি রাস্তা ৩৭২টি শহরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। আরব শাসনামলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন হয়েছিল।

নদ-নদী : স্পেনে অনেক নদ-নদী রয়েছে। এগুলোর মধ্যে তাগুস, গোয়াদিয়ানা, গোয়াদালকুইভার ও ডুরো- এ চারটি বৃহত্তর নদী। এছাড়া রয়েছে ইবরো ও মিনহো নদীসহ আরও অনেক ছোট ছোট নদ-নদী। তাগুস স্পেনের সবচেয়ে বড় নদী।

হ্রদ : স্পেনে অনেক হ্রদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ভ্যালেন্সিয়ার আল-বুফেরা, মুরসিয়ার মার মেনর, কেডিজের ল্যাগুনা দে-জান্দা অন্যতম। এছাড়া মেসেতা মালভূমিতে কিছু লবন হ্রদ রয়েছে।

জলবায়ু : স্পেনের জলবায়ু বৈচিত্রময়। দেশের এক স্থানের আবহাওয়া অন্য স্থান থেকে পৃথক। শীতকালে আবহাওয়া কোমল, আর্দ্র ও বৃষ্টিবহুল এবং গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আবহাওয়া গরম এবং উত্তরাঞ্চলের আবহাওয়া অত্যাধিক ঠাণ্ডা। গ্যালেসিয়া ও ক্যান্টাব্রিয়া অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। শীতকালে মেসেতা ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থা : আইবেরীয় উপদ্বীপের প্রায় অর্ধাংশ অনুর্বর পর্বতমালা ও গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। দুই-পঞ্চমাংশেরও কম ভূমি কৃষি কাজের উপযোগী। ভূমির বৈচিত্র্যতা, উচ্চতা ও আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। দেশের পূর্ব ও দক্ষিণ উপকূলের সমতল ভূমি খুবই উর্বর। এখানে প্রচুর পরিমাণে গম, জলপাই, আঙ্গুর, ধান, কমলালেবু, বাদাম, ডুমুর ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। পার্বত্য এলাকাসমূহ বনজ ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। সোনা, রূপা, তামা, লোহা ইত্যাদি প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদ। এশিয়া ও ইউরোপের জীব-জন্তু এখানে পাওয়া যায়।

জনসংখ্যা : স্পেনের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী জাতির নাম 'আইবেরি'। কালক্রমে এখানে বাস্ক, ফিনিশীয়, গ্রিক, সেল্ট, কার্থেজেনিয়ান ও রোমানরা আগমন করে। রোমানদের হটিয়ে কয়েকটি বর্বর জাতি যথা-এ্যালান, ভ্যান্ডাল, সুয়েভী ও ভিজিগথ্‌রা এখানে আগমন করে। সবশেষে ভিজিগথ্‌দের প্রায় ৩শত বছরের (৪০৯-৭১১) শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিমরা উপদ্বীপের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে। স্পেনের মুসলিমদেরকে বলা হত মুর। রোমানদের শাসনামলে এখানকার জনসংখ্যা বেশ ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু বর্বরদের অধীনে বিশেষ করে ভিজিগথ্‌দের আমলে জনসংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। এর কারণ হল ভিজিগথ্‌রা ইহুদি ও বুদ্ধিজীবিসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণী ও পেশার মানুষদের নানা কারণে হত্যা ও বহিষ্কার করে। মুসলিম আমলে স্পেনের জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। দেশের দক্ষিণ ও ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলীয় অঞ্চল সবচেয়ে বেশি জনবহুল ছিল। দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম এবং উত্তারাঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল খ্রিস্টান। খ্রিস্টানরা পুনরায় স্পেন অধিকার করে মুসলিম ও ইহুদিদের বিতাড়ন করে। মুসলিম আমলে কর্ডোভা, গ্রানাডা ও অন্যান্য প্রধান শহরগুলোর জনসংখ্যা বর্তমান সময়ের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি ছিল।

ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব : আইবেরীয় উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থা সেখানকার জনজীবন ও ইতিহাসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে স্পেন আফ্রিকার সাথে ইউরোপের, প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের এবং আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে ভূমধ্যসাগরের যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পেরেছে। বৈচিত্র্যময় আবহাওয়া ও বিভিন্ন অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতার কারণে এখানকার অধিবাসীরা তাদের আলাদা নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ ও প্রথা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। মেসেতা মালভূমির উচ্চতা, ভূমির অসমতা এবং উচু-নিচু পর্বতমালা সহজ গমনাগমনের জন্য বাধা সৃষ্টি করে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে জটিল করে তোলে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার দরুন অধিবাসীদের মধ্যে কেন্দ্রবিমূখ ও আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং শক্তিশালী শাসক ও সামরিক বাহিনী ছাড়া সমগ্র অঞ্চলের উপর আধিপত্য বজায় রাখা কঠিন ছিল। এ কারণে যখনই কেন্দ্রিয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই কেন্দ্র

হতে দূরবর্তী অঞ্চলের উচ্চাভিলাষী ও স্বার্থপর শাসনকর্তা বা গোত্রপ্রধানগণ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার সুযোগ গ্রহণ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং স্বাধীন শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালায়। স্পেনের সম্পদের প্রাচুর্য আক্রমণকারীদের আকৃষ্ট করেছে এবং সেখানকার স্থানীয় মানুষদের কেন্দ্রবিমূখতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা আক্রমণকারীদের সাফল্য দিয়েছে।

সারসংক্ষেপঃ

স্পেন বা আন্দালুসিয়ার দক্ষিণ দিকে রয়েছে জিব্রাল্টার প্রণালী, উত্তর দিকে পিরেনীজ পর্বতমালা, পূর্ব দিকে ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিম দিকে আটলান্টিক মহাসাগর। স্পেনের প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ সমুদ্রের দিকে উন্মুক্ত। পিরেনীজ পর্বতমালা স্পেনকে ফ্রান্স হতে পৃথক করেছে। এর অর্ধেকেরও বেশি জায়গা জুড়ে আছে মেসেতা মালভূমি। তাগুস, গোয়াদিয়ানা ও গোয়াদালকুইভির স্পেনের উল্লেখযোগ্য নদ-নদী। এর জলবায়ু, ভূমি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থা এর জনজীবন ও ইতিহাসের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. স্পেনের মুসলিমদেরকে বলা হত-
(ক) আরব (খ) বার্বার (গ) মুর (ঘ) ভিজিগথ্

২. কোন্ পর্বতমালা স্পেনকে ফ্রান্স হতে পৃথক করেছে?
(ক) পিরেনীজ পর্বতমালা (খ) ক্যান্টাব্রিয়ান পর্বতমালা
(গ) আইবেরিয়ান পর্বতমালা (ঘ) সিয়েরা নাভাদা পর্বতমালা

৩. স্পেনের সবচেয়ে বড় নদী-
(ক) গোয়াদিয়ানা (খ) ডুরো
(গ) গোয়াদালকুইভির (ঘ) তাগুস

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

শিক্ষক বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের একটি দেশ। এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বৈচিত্রময় যা এখানকার জনজীবন ও ইতিহাসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

ক. স্পেন কোন মহাদেশে অবস্থিত? ১
খ. স্পেনের ভৌগোলিক সীমানা ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে পাঠ্যপুস্তকে আলোচিত বিষয়ের বিশ্লেষণ করুন। ৩
ঘ. জনজীবনের উপর এর ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-৯.২ মুসলিম বিজয়ের পূর্বে স্পেনের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাক্-মুসলিম স্পেনের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও তাদের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্পেনের ইহুদীদের উপর ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের অত্যাচারের প্রকৃতি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মুসলিম বিজয়ের পূর্বে স্পেনের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার বিবরণ দিতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**এ্যালান, ভ্যান্ডাল, সুয়েভী, ভিজিগথ্, রাজা রিকার্ড, ক্যাথলিক ধর্ম, রডারিক, উইতিজা, আচিলা, কাউন্ট জুলিয়ান, মুসা বিন নুসাইর ও ফ্লোরিন্ডা**

ভূমিকা : স্পেন ইউরোপ মহাদেশের একটি দেশ। মুসলিমদের আগমনের আগে ভিজিগথ্রা প্রায় তিনশত বৎসর (৪০৯-৭১১) স্পেন শাসন করে। এসময় স্পেনের অবস্থা পূর্ববর্তী রোমানদের থেকে আরও খারাপ হয়ে যায়। ভিজিগথ্ শাসনামলে স্পেনের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে চরম বিভাজন তৈরী হয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্পেন দৈন্যদশায় পতিত হয়, ধর্মীয় ক্ষেত্রে চরম অসহিষ্ণুতা বিরাজ করে এবং রাজনৈতিক অঙ্গণে অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়।

সামাজিক অবস্থা: স্পেনে মুসলিমদের আগমনের পূর্বে সেখানকার সামাজিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। প্রাক-মুসলিম স্পেনীয় সমাজকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগে করা যায়। শাসক শ্রেণী বা উচ্চবিত্ত শ্রেণী ও শাসিত শ্রেণী বা প্রজা শ্রেণী। রাজা, ধর্মযাজক এবং অভিজাতদের নিয়ে উচ্চবিত্ত শাসক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। শাসিত শ্রেণী আবার দু'ভাগে বিভক্ত: মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণী। বর্গাদারগণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ছিল ভূমিদাস ও ক্রীতদাস। এছাড়া শিক্ষিত ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা শাসিত বা প্রজা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উচ্চবিত্ত বা শাসক শ্রেণী : স্পেনের উচ্চবিত্ত বা শাসক শ্রেণী সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসেবে পরিচিত ছিল। রাজা, ধর্মযাজক এবং অভিজাতদের নিয়ে গঠিত এই শ্রেণী সব ধরনের করের ভার হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তারা প্রজা সাধারণের উপর নানারকম অত্যাচার ও নির্যাতন চালাত। রাজা ও ধর্মযাজকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল। তবে ধর্মযাজকদের জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এবং তাদের উপর ব্যাপক প্রভাব থাকায় রাজার উপর ধর্মযাজকদের প্রাধান্য ছিল। যুবরাজ ও সামন্তপ্রভূদের সমন্বয়ে স্পেনের অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠে। তারা বিলাসী জীবন-যাপন করত। তারা মদ, জুয়া, ঘোড়দৌড় ও ভোজনের মধ্য দিয়ে জীবন পরিচালনা করত। তারা বসবাস করত সুরম্য রাজপ্রাসাদে। প্রজাদের কল্যাণে তাদের কোন মনোযোগ ছিলনা। এক কথায় তারা অসীম ক্ষমতা ও সম্পদ উপভোগ করত।

নিম্নবিত্ত শ্রেণী : স্পেনের নিম্নবিত্ত শ্রেণীটি ছিল ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের নিয়ে। ভূমিদাসরা ছিল চাষী। তাদের দায়িত্ব ছিল কৃষিকাজের জন্য শ্রমিক ও সেনাবাহিনীর জন্য সৈন্য সরবরাহ করা। তারা ছিল ভূমির অবিচ্ছেদ্য অংশ। জমি বিক্রয় করা মানে হল জমির সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমিদাসদেরও বিক্রয় করা। সামান্য ভুল-ত্রুটির জন্য তাদের উপর দৈহিক নির্যাতন চালানো হত। ক্রীতদাসদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। স্পেনীয় সমাজে ক্রীতদাস প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বাজারে ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় হত। তারা কৃষক, মেষপালক, জেলে অথবা সাধারণ কর্মচারি হিসেবে কাজ করত। ভিজিগথ্ শাসনামলে ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের মানবীয় অধিকার সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়। প্রতিবেশি দুই জমিদারের দাসদের মধ্যে বিবাহ হলে তাদের সন্তান-সন্ততি উভয় জমিদার ভাগ-ভাটোয়ারা করে নিত। সমাজের উচ্চবিত্তদের অত্যাচার হতে বাঁচার জন্য তারাও মধ্যবিত্তের ন্যায় বনে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে দস্যুতা ও লুটতরাজ শুরু করে।

অর্থনৈতিক অবস্থা : মুসলিম বিজয়ের পূর্বে স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তখন স্পেনে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল। কিন্তু এই সম্পদের অসম বন্টন এবং ইচ্ছামত অর্থের অপচয়ের কারণে স্পেনের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল। উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে কোন প্রকার কর প্রদান করতে হতনা। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জাঁকজমক জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর অতিরিক্ত কর আরোপের ফলে তাদের

ভূমির সাথে সংযুক্ত প্রজা সাধারণকেও করের বোঝা বহন করতে হয়। বৈষম্যমূলক ও অতিরিক্ত কর আরোপের কারণে শিল্পকারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে সাধারণ মানুষের উপর নেমে আসে আর্থিক বির্পযয়। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রাজপথে দস্যুতা-রাহাজানির কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যেও অচলাবস্থা বিরাজ করছিল।

ধর্মীয় অবস্থা : স্পেনে সে সময় খ্রিস্টান ও ইহুদী -এই দুইটি ধর্ম চালু ছিল। খ্রিস্টানরা রাষ্টীয় ক্ষমতায় থাকার কারণে ইহুদীরা ছিল নির্যাতিত। বিশেষ করে ৫৮৭ খ্রিষ্টব্দে রাজা রিকার্ড ক্ষমতায় এসে ক্যাথলিক ধর্মকে রাষ্টীয় ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহুদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালান। তাদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত না হলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাদেরকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ, ধর্মীয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি নিষিদ্ধ হয়। এমনকি তাদেরকে তাদের পুত্র-কন্যাসহ ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হয়। ফলে ইহুদীরা বাঁচার জন্য আশপাশের মুসলিম দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে।

রাজনৈতিক অবস্থা : সে সময়ে স্পেনে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। সর্বশেষ ভিজিগথ্ শাসক রডারিক পূর্ববর্তী শাসক উইতিজাকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসেন এবং স্বৈরাচারী শাসন শুরু করেন। ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তুষ্টি দেখা দেয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সিংহাসন অধিকার নিয়ে শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। কেন্দ্রিয় শাসনের দুর্বলতার কারণে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও বিদ্রোহী নেতাগণ তাদের স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীনতা লাভের সুযোগ খুঁজতে থাকে। এ অবস্থায় মুসলিমগণ স্পেনে অভিযান প্রেরণ করে সহজেই বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়।

সারসংক্ষেপ:

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভিজিগথ্রা প্রায় তিনশত বৎসর (৪০৯-৭১১) স্পেন শাসন করে। এ সময় স্পেনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অঙ্গণে অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়। প্রাক-মুসলিম স্পেনীয় সমাজে শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ভিজিগথ্রা ক্যাথলিক ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহুদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। ভিজিগথ্ শাসক রডারিক পূর্ববর্তী শাসক উইতিজাকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসেন এবং স্বৈরাচারী শাসন শুরু করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মুসলিম বিজয়ের সময় স্পেনের শাসন ক্ষমতায় কারা ছিল?
(ক) এ্যালান (খ) ভ্যান্ডাল (গ) সুয়েভী (ঘ) ভিজিগথ্

২. উইতিজার জামাতা কাউন্ট জুলিয়ান কোন্ এলাকার গভর্নর ছিলেন?
(ক) সেভিল (খ) কর্ডোভা (গ) টলেডো (ঘ) সিউটা

৩. সর্বশেষ ভিজিগথ্ শাসক কে?
(ক) উইতিজা (খ) আচিলা (গ) কাউন্ট জুলিয়ান (ঘ) রডারিক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

শরিফা তার পিতার নিকট মগদ নামক একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা জানতে চাইলে তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি সেই রাষ্ট্রের এসব দিক সম্পর্কে নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেন।

ক. কোন মুসলিম সেনাপতি স্পেন বিজয় করেন? ১
খ. মুসলিম বিজয়ের পূর্বে স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মগদ রাষ্ট্রের সামাজিক অবস্থার সাথে স্পেনের তুলনা করুন। ৩
ঘ. রাজা রডারিকের শাসনামলে স্পেনের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা তুলে ধরুন। ৪

পাঠ-৯.৩ মুসলিমদের স্পেন বিজয় ও উমাইয়া আমীরাত প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুসলিমদের স্পেন বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মুসলিমদের স্পেন বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মুসলিমদের স্পেন বিজয়ের ফলাফল উল্লেখ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**উইতিজা, রডারিক, কাউন্ট জুলিয়ান, ফ্লোরিন্ডা, মুসা বিন নুসাইর, তারিফ বিন মালিক, তারিক বিন-যিয়াদ, জাবালুত তারিক ও ওয়াদী লাক্কোর যুদ্ধ**

মুসলিমদের স্পেন বিজয় ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের সময়ে আফ্রিকার শাসনকর্তা মূসা বিন নুসাইর তাঁর সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদের মাধ্যমে ৭১১ সালে স্পেন জয় করেন। প্রায় তিনশত বৎসর বর্বর ভিজিগথ্দের দুঃশাসনের (৪০৯-৭১১) পর স্পেন মুসলিম শাসনাধীনে আসে এবং সেখানে উমাইয়া আমীরাত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মুসলিমদের স্পেন বিজয়ের কারণ :

সামাজিক কারণ : স্পেনে মুসলিমদের আগমনের আগে সেখানকার সামাজিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। প্রাক-মুসলিম স্পেনীয় সমাজ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। শাসক ও প্রজা শ্রেণী। রাজা, ধর্মযাজক এবং অভিজাতদের নিয়ে শাসক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। স্পেনের শাসক শ্রেণী প্রজা-সাধারণের উপর নানারকম অত্যাচার ও নির্যাতন চালাত। তাদের উপর সীমাহীন কর আরোপ করা হত। সাধারণ মানুষ এ অবস্থায় মুসলিমদের ত্রাণকর্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

রাজনৈতিক কারণ : সে সময়ে স্পেনে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ভিজিগথ্ শাসক রডারিক পূর্ববর্তী শাসক উইতিজাকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসেন এবং স্বৈরাচারী শাসন শুরু করেন। ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তুষ্টি ও কেন্দ্রিয় শাসনের দুর্বলতার কারণে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও বিদ্রোহী নেতাগণ তাদের স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীনতা লাভের সুযোগ খুঁজতে থাকে। ফলে স্পেনে কার্যকরী শাসন ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিলনা। মুসলিমরা এই সুযোগটি গ্রহণ করে।

অর্থনৈতিক কারণ : মুসলিম বিজয়ের পূর্বে স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শাসক শ্রেণীর ইচ্ছামত অর্থের অপচয়ের কারণে স্পেনের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল। প্রজা সাধারণের উপর অতিরিক্ত কর আরোপের ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে আর্থিক বির্পযয়। এ সময় মুসলিমগণ স্পেন অভিযানে অগ্রসর হলে সাধারণ মানুষ তাদের স্বাগত জানায়।

ধর্মীয় কারণ : স্পেনে সে সময় কোন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বা উদারতা ছিলনা। ক্ষমতাসীন ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা জ্ঞানদীপ্ত ইহুদিদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং নির্বাসনে পাঠানো হয়। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি তাদেরকে তাদের পুত্র-কন্যাসহ ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হয়। ফলে ইহুদীরা বাঁচার জন্য আশপাশের মুসলিম দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। এ সময় মুসলিমরা স্পেনে অভিযান চালালে জনগণ ধর্মীয় আশীর্বাদ হিসাবে তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে।

সামরিক কারণ : সে সময় স্পেনের সামরিক অবস্থা সুসংগঠিত ছিল না। প্রয়োজনের সময় সৈন্য সংগ্রহ করা হতো। তাছাড়া ক্রীতদাসদেরকে জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হত। ফলে সেনাবাহিনীর সামরিক মান সন্তোষজনক ছিল না। শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম এবং ঐক্য তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। তাই সংখ্যায় বেশি হলেও রডারিকের লক্ষাধিক সৈন্য মাত্র ১২ হাজার মুসলিম সৈন্যের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

মুসা ও তারিক ও বার্বারদের দক্ষতা : মুসা বিন নুসাইর ছিলেন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মুসলিম বীর। তিনি উত্তর আফ্রিকার সাহসী বার্বারদের নিয়ে তাঁর সেনাবাহিনী গঠন করেন। তিনি মুসলিম বীর তারিক বিন যিয়াদকে সেনাপতি করে স্পেনে পাঠান। এই তারিক বিন যিয়াদ অসাধারণ নৈপূণ্যে স্পেন বিজয়ের দ্বার উম্মুক্ত করেন।

প্রত্যক্ষ কারণ :

কাউন্ট জুলিয়ানের আমন্ত্রণ : মুসলিমদের স্পেন বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল কাউন্ট জুলিয়ান কর্তৃক উত্তর আফ্রিকার মুসলিম গভর্নর মুসা বিন নুসাইরকে আমন্ত্রণ। কাউন্ট জুলিয়ান ছিলেন উইতিজার জামাতা এবং উত্তর আফ্রিকার সিউটার গভর্নর। তাঁর মেয়ে ফ্লোরিন্ডাকে প্রথা অনুসারে রাজকীয় চাল-চলন ও রীতি-নীতি শিক্ষা করার জন্য রাজা রডারিকের রাজ দরবারে পাঠানো হয়। পরমা সুন্দরী ফ্লোরিন্ডা রাজা রডারিক কর্তৃক রাজ প্রাসাদে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন। এ ঘটনায় কাউন্ট জুলিয়ান ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিশোধের পথ খুঁজতে থাকেন এবং উত্তর আফ্রিকার মুসলিম গভর্নর মুসা বিন নুসাইরকে স্পেন বিজয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানান । কাউন্ট জুলিয়ান স্পেনের যাবতীয় তথ্য ও সহযোগিতা দিয়ে মুসলিমদের স্পেন বিজয়ের পথ সুগম করে দেন ।

স্পেন বিজয়ের ঘটনা

শ্বশুর হত্যা ও কন্যার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কাউন্ট জুলিয়ান স্পেন আক্রমণের জন্য মুসা বিন নুসাইরকে আমন্ত্রণ জানান। কাউন্ট জুলিয়ানের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মুসা ৭১০ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের বাস্তব অবস্থা অনুধাবনের জন্য তাঁর একজন ক্রীতদাস তারিফ বিন মালিককে স্পেনে প্রেরণ করেন। তিনি স্পেনের দক্ষিণ উপকূল জরিপ এবং প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সেখানে বিজয়াভিযান প্রেরণের অনুকূল অবস্থা জানালে মুসা তার অপর একজন সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদকে ৭১১ সালে ৭ হাজার সৈন্যসহ স্পেন বিজয়ে প্রেরণ করেন। তারিক বিন যিয়াদ জুলিয়ানের সাহায্যে মোট ১২ হাজার সৈন্যসহ জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনের দক্ষিণ-পূর্বের এক উচ্চ ভূমিতে অবতরণ করেন। তারিকের নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম হয় জাবালুত তারিক। 'জাবাল' আরবী শব্দ যার অর্থ পাহাড়। 'জাবালুত তারিক' মানে তারিকের পাহাড় (ইংরেজিতে The rock of Tariq)। বর্তমানে এই স্থানটির পরিবর্তিত নাম জিব্রাল্টার। তারিকের আগমনের সংবাদে রডারিক ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। গুয়াডেল্ট নদীর তীরে মেডিনা সিডোনিয়া শহরের নিকটবর্তী ওয়াদী লাক্কো নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। রডারিকের সৈন্যবাহিনী পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। রডারিক পলায়নকালে নদী গর্ভে নিমজ্জত হয়ে প্রাণ হারান। তারিক রাজধানী টলেডোসহ কর্ডোভা, মুর্সিয়া, ভ্যালেন্সিয়া, আলমেরিয়া, মালাগা ইত্যাদি অঞ্চল দখল করেন। মুসা এ সংবাদ শুনে আরও ১৮ হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেনে আসেন এবং বাকী বিজয় কার্য সম্পাদন করেন।

মুসলিমদের স্পেন বিজয়ের ফলাফল

মুসলিমদের স্পেন বিজয়ের ফলে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনী-দরিদ্র সমমর্যাদা লাভ করে। উচ্চ শ্রেণী ও ধর্মযাজকদের বিশেষ সুবিধা লোপ পায়। মধ্যবিত্তের করের বোঝা লাঘব করা হয়। দাসদের মুক্ত করা হয়। কৃষক, শ্রমিক, মজুর ও ইহুদী সম্প্রদায় পূর্ববর্তী শাসনের অত্যাচার হতে মুক্ত হয় এবং তারা স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন শুরু করে। ফলে সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম শাসনামলে বিজয়ী এবং বিজীতদের মধ্যে আন্ত:বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর ফলে সেখানে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠে। মুসলিমদের উদার ও প্রগতিশীল শাসনের কারণে সুষ্ঠু পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং এই সুষ্ঠু পরিবেশ কৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশের পক্ষে সহজ হয়। অল্প দিনের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্পেন বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। মুসলিম স্পেনের আলোকোজ্জ্বল সভ্যতার ছোঁয়ায় ইউরোপ আলোকিত হয়। আধুনিক সভ্যতার পেছনেও স্পেনের অবদান অনস্বীকার্য। মুসলিমদের স্পেন বিজয়ের ফলে সেখানে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। জনগণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালনের অধিকার লাভ করে। মুসলিমগণ অন্য ধর্মমতের প্রতি ছিল অত্যন্ত উদার ও সহনশীল। তাদের ধর্মীয় উদারতা ও সহনশীলতায় মুগ্ধ হয়ে স্পেনবাসী দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আর যারা মুসলিম হয়নি তারাও মুসলিমদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ে।

সারসংক্ষেপঃ

মুসলিমদের স্পেন বিজয় ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের সময়ে সিউটার গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ানের আমন্ত্রণে আফ্রিকার শাসনকর্তা মুসা বিন নুসাইর তাঁর সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদের মাধ্যমে ৭১১ সালে স্পেন জয় করেন। মুসলিমদের স্পেন বিজয়ের ফলে প্রায় তিন শত বছরের বর্বর ভিজিগথ্দের দুঃশাসনের (৪০৯-৭১১) পর স্পেন মুসলিম শাসনাধীনে আসে এবং সেখানে উমাইয়া আমীরাত প্রতিষ্ঠা করা হয়। অল্প দিনের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্পেন বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন্ মুসলিম সেনাপতি স্পেন বিজয় করেন?
(ক) তারিক বিন যিয়াদ (খ) মুসা বিন নুসাইর
(গ) আল-ওয়ালিদ (ঘ) তারিফ বিন মালিক

২. কোন্ খলিফার সময় মুসলিমরা স্পেন বিজয় করে?
(ক) খলিফা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)- এর সময় (খ) খলিফা আব্দুল মালিক-এর সময়
(গ) খলিফা আল-ওয়ালিদ- এর সময় (ঘ) খলিফা হারুন-অর-রশিদ-এর সময়

৩. কোন্ যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমরা স্পেন বিজয় করে?
(ক) টুরসের যুদ্ধ (খ) মাসারার যুদ্ধ
(গ) টলেডোর যুদ্ধ (ঘ) ওয়াদী লাক্কোর যুদ্ধ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

সোনিয়া তার বান্ধবির সাথে সিন্ধু বিজয় নিয়ে আলোচনা করার সময় উল্লেখ করে যে, মুহম্মদ বিন কাশিম রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু বিজয় করেন। মুসলিমরা নানা কারণে সিন্ধু অভিযান করে। এই বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

ক. মুসলিমরা কাকে পরাজিত করে স্পেন বিজয় করে? ১
খ. স্পেন বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সিন্ধু বিজয়ের সাথে পাঠ্য পুস্তকে বর্ণিত বিজয়ের ঘটনাপ্রবাহ লিখুন। ৩
ঘ. মুসলিমদের স্পেন বিজয়ের ফলাফল বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৯.৪ টুর্‌সের যুদ্ধ



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- টুর্‌সের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বা কারণ আলোচনা করতে পারবেন।
- টুর্‌সের যুদ্ধের ঘটনা ও মুসলিমদের পরাজয়ের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- টুর্‌সের যুদ্ধের ফলাফল বা তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	**মুখ্য শব্দ**	**আব্দুর রহমান আল-গাফিকি, চার্লস মার্টেল, একুইটেন, ডিউক ইউডেস, মেরোভিনজিয়ান রাজবংশ, পইটিয়ার্স ও শহীদদের স্মৃতিক্ষেত্র**



৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিমরা স্পেন বিজয় করে। এরপর থেকে স্পেন দামেস্কের উমাইয়া খিলাফতের অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ৭১১ থেকে ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনের উমাইয়া শাসনকে বলা হয় পরাধীন উমাইয়া আমীরাত। এ সময়কালের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল টুর্‌সের যুদ্ধ। ইসলাম ও ইউরোপের ইতিহাসে এই যুদ্ধের ফলাফল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

টুর্‌সের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট :

আব্দুর রহমান আল গাফিকির শাসনভার লাভ: আব্দুর রহমান আল-গাফিকি ৭৩২ সালে স্পেনের শাসনভার লাভ করেন। ৭২৫ সাল থেকে ৭৩০ সাল পর্যন্ত স্পেনের শাসনব্যবস্থায় সংকটের সৃষ্টি হয়। এ সময় ৬ জন শাসনকর্তা সেনাবাহিনী কর্তৃক নিযুক্ত হন। এ অবস্থায় দামেস্কের উমাইয়া খলিফা হিশাম তাঁকে স্পেনের আমীর হিসেবে নিয়োগ দেন।

অভ্যন্তরীণ বিবাদ দূরীকরণ : আব্দুর রহমান আল-গাফিকি একজন যোগ্য শাসনকর্তা ও সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। শাসনক্ষমতা লাভ করে তিনি অভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদ দূরীকরণ এবং শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের উপর নযর দেন। সে সময় স্পেনের মুসলিমদের মধ্যে গোত্র-কলহে এবং বিশেষ করে দক্ষিণ আরবের হিমারীয় ও উত্তর আরবের মুদারীয়দের এবং আরবদের সাথে বার্বারদের দ্বন্দ্বে স্পেন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন। হিমারীয় ও মুদারীয় উভয় গোত্রের মধ্যে তিনি সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ছিলেন এবং তারা তাঁকে তাদের নেতারূপে মেনে নেয়।

শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন : দেশের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য তিনি সমগ্র দেশ সফর করেন। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন জনপ্রিয় শাসকে পরিণত হন এবং সমগ্র জাতি তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ইউরোপ জয়ের চেষ্টা : আব্দুর রহমান আল-গাফিকির মূল লক্ষ্য ছিল তারিক বিন যিয়াদ ও মুসা বিন নুসাইরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা। তারিক ও মুসার স্বপ্ন ছিল ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যসহ ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে মুসলিম স্পেনের সাথে একত্রিত করে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। ৭২১ সালে স্পেনের গভর্নর আল-সামাহ (৭১৯-২১) পিরেনীজ অতিক্রম করে ফ্রান্সে অভিযান চালান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুলুস-এর যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মুসলিমরা এ পরাজয় ভুলে যায়নি। কিন্তু অভ্যন্তরীণ অবস্থা স্থিতিশীল না থাকার কারণে তারা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেনি। ১১ বছর পর আব্দুর রহমান আল-গাফিকির নেতৃত্বে তারা এর সুযোগ পায়।

উসমানকে পরাজিত ও হত্যা : দক্ষিণ ফ্রান্সের শাসনকর্তা ও বার্বার নেতা উসমান বিন আবু নিসা এ সময় একুইটেনের স্বাধীন শাসক ডিউক ইউডেসের কন্যাকে বিবাহ করে তার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আব্দুর রহমান আল-গাফিকির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আব্দুর রহমান আল-গাফিকি সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন।

ডিউক ইউডেসের বিরুদ্ধে অভিযান : ৭৩২ সালে আব্দুর রহমান আল-গাফিকি **১** লক্ষ সৈন্য নিয়ে পিরেনীজ অতিক্রম করে ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। তিনি আর্লেস নগর দখল করেন। এরপর তিনি একুইটেনের শাসক ডিউক ইউডেসকে পরাজিত করে একে একে বার্তিমাস্ক, বুরন্ডি, লিওন, বেসাসকোন এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের আরও কয়েকটি শহর দখল করেন।

টুর্সের যুদ্ধের ঘটনা

সে সময় ফ্রান্সে মেরোভিনজিয়ান রাজবংশের (৪৯৬-৭৫১) শাসন চলছিল। এ বংশের শেষ দিকে শাসকরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় প্রাসাদের মেয়র বা প্রধানমন্ত্রীর হাতে। তখন রাজা ছিলেন লোথায়ের। তিনি শাসক হিসেবে দুর্বল ছিলেন এবং তার মেয়র ছিলেন চার্লস যিনি প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করতেন। পরে অবশ্য চার্লস রাজা হয়েছিলেন। এদিকে ডিউক ইউডেস তার **শত্রু** চার্লসের সাথে বিবাদ দূর করে তার সাহায্য কামনা করেন। ৭৩২ সালের অক্টোবর মাসে উত্তর ফ্রান্সের টুর্স ও পইটিয়ার্সের মধ্যবর্তী সমতল ভূমিতে আব্দুর রহমান আল-গাফিকির বাহিনী এবং চার্লস ও ডিউক ইউডেসের সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। কয়েকদিন ধরে যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে মুসলিমদের জয়লাভ যখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় তখন মুসলিম সেনাদের মধ্যে বিশৃংখলা শুরু হয়ে যায়। আব্দুর রহমান আল-গাফিকি তাঁর বাহিনীতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। যুদ্ধের দশম দিবসে আব্দুর রহমান আল-গাফিকি তীরবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এরপর মুসলিমরা একজন নতুন সেনাপতি নির্বাচনে ব্যর্থ হয় এবং যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে।

টুর্সের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের কারণ :

টুর্সের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের পেছনে কতগুলো কারণ রয়েছে-

মুসলিম গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা : চার্লস ও ইউডেসের মধ্যে সন্ধি সম্পর্কে মুসলিম গোয়েন্দারা কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। ফলে আব্দুর রহমান আল-গাফিকি খ্রিস্টান সৈন্যদের প্রকৃত শক্তি পরিমাপ করতে পরেননি। তাই এই সন্ধি এবং খ্রিস্টানদের শক্তি সম্পর্কে মুসলিম গোয়েন্দাদের অজ্ঞতা যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

গোত্রীয় কলহ : যুদ্ধ চলাকালে মুদারীয়, হিমারীয় ও বার্বারদের মধ্যে পুরাতন গোত্রীয় কোন্দল আবার নতুনভাবে শুরু হয়। আব্দুর রহমান আল-গাফিকি সাময়িকভাবে বিবাদমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করলেও তা স্থায়ী হয়নি।

সেনাপতি নির্বাচনে ব্যর্থতা : যুদ্ধের দশম দিবসে আব্দুর রহমান আল-গাফিকির মৃত্যু অবস্থা পাল্টে দেয়। তাঁর মৃত্যুতে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যায়। এছাড়া তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিনিধি বা সেনাপতি নির্বাচন নিয়ে মুসলিম সেনাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ফলে সেনাপতি নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে রাতের অন্ধকারে তারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে।

গনিমতের মাল সংগ্রহে প্রতিযোগিতা : যুদ্ধে জয়লাভ যখন অত্যাসন্ন তখন মুসলিম সৈন্যরা শৃংখলা ভঙ্গ করে গনীমতের মাল সংগ্রহ করে এবং এই মালের হিফাজতের দিকে দৃষ্টি দেয়। ফলে তারা খ্রিস্টানদের পাল্টা আক্রমণ সম্পর্কে ভাবা ও এর জন্য নিজেদেরকে সামরিক ও মানসিক দিক দিয়ে যথেষ্ঠ প্রস্তুত করতে পারেনি।

গুজব : যুদ্ধ চলাকালে গুজব ওঠে যে খ্রিস্টানরা মুসলিম সেনা ছাউনিতে আক্রমণ করেছে। মুসলিম সেনারা গুজবের যথার্থতা পরীক্ষা না করেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে নিজেদের স্ত্রী-সন্তান ও সম্পদ রক্ষায় তাঁবুতে ফিরে আসে। ফলে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং খ্রিস্টানদের আক্রমণ ও জয়লাভ সহজ হয়।

টুর্সের যুদ্ধের ফলাফল :

টুর্সের যুদ্ধ ইতিহাসের চূড়ান্ত যুদ্ধগুলির মধ্যে অন্যতম। টুর্সের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের পর চার্লস আহত মুসলিমদের হত্যা করে মার্টেল (Martel) উপাধি লাভ করেন।'মার্টেল' অর্থ হাতুড়ি (hammer)। হাতুড়ি দিয়ে যেভাবে লোহা বা কঠিন পদার্থকে অবদমিত করা হয় তেমনি ভাবে চার্লস মুসলিমদের পরাজিত করে তাদের বিজয়ের ধারা থামিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের মর্যাদাকেও অবনমন করেছেন। আরবের বাইরে এই প্রথম কোন যুদ্ধে মুসলিমরা সৈন্য সংখ্যায় বেশি থাকা সত্ত্বেও পরাজিত হল। মুসলিমদের নিকট টুর্সের যুদ্ধক্ষেত্র শহীদদের স্মৃতিক্ষেত্র রূপে পরিগণিত। এ যুদ্ধের ফলে খ্রিস্টান ইউরোপে মুসলিমদের প্রবেশ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এই যুদ্ধে চার্লস পরাজয় বরণ করলে সমগ্র ইউরোপের বিপর্যয় ঘটতে পারত। অন্যদিকে P. K. Hitti (গ্রন্থ: *History of the Arabs*) এর মতে, এ যুদ্ধে আরবরা জয়লাভ করলে গীবন এবং তাঁর পরবর্তী ঐতিহাসিকরা প্যারিসে এবং লন্ডনের যেখানে এখন গির্জা রয়েছে এর পরিবর্তে সেখানে মসজিদ দেখতে

পেতেন এবং অক্সফোর্ড এবং অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বাইবেলের পরিবর্তে কুরআন পাঠ শুনতে পেতেন। Lane Poole (গ্রন্থ: *The Moors in Spain*) এর মতে, এ যুদ্ধ মুসলিমদের অব্যাহত বিজয়ের ধারা রুদ্ধ করে দেয়। তাঁর মতে, এই যুদ্ধের ফলাফলের উপরই নির্ভর করছিল ইউরোপ খ্রিস্টানদের অধিকারে থাকবে না মুসলিম অধিকারে যাবে।

সারসংক্ষেপ:

স্পেনের পরাধীন উমাইয়া আমীরাত আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা টুর্সের যুদ্ধ। ৭৩২ সালে আব্দুর রহমান আল-গাফিকি ও ফ্রান্সের চার্লসের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। টুরসের যুদ্ধ ছিল একটি চূড়ান্তকারী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে খ্রিস্টান ইউরোপে মুসলিমদের প্রবেশ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. টুর্সের যুদ্ধের সময় স্পেনের মুসলিম আমীর কে ছিলেন?
   (ক) আব্দুর রহমান আদ্-দাখিল (খ) আব্দুর রহমান আল-ফিহরি
   (গ) আব্দুর রহমান আল-নাসির (ঘ) আব্দুর রহমান আল-গাফিকি

২. কত সালে টুর্সের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
   (ক) ৭১১ সালে (খ) ৭২১ সালে
   (গ) ৭৩২ সালে (ঘ) ৭৫৬ সালে

৩. কার সাথে মুসলিমদের টুর্সের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
   (ক) চার্লস-এর সাথে (খ) পিপিন-এর সাথে
   (গ) ইউডেস-এর সাথে (ঘ) উসমান-এর সাথে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

মুসা তার পাঠ্য পুস্তকে 'ক' 'খ'-এর বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার নানা প্রস্তুতির কথা জানতে পারে। 'ক'-এর বাহিনীতে সৈন্য বেশি হলেও শেষ পর্যন্ত নানা কারণে পরাজিত হয়। এটি ছিল একটি চূড়ান্তকারী যুদ্ধ।

ক. কত সালে টুর্সের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১
খ. টুরসের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে 'ক'-এর বাহিনীর পরাজয়ের সাথে টুরসের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় আলোচনা করুন। ৩
ঘ. টুর্সের যুদ্ধের ফলাফল উল্লেখ করুন। ৪

পাঠ-৯.৫ প্রথম আব্দুর রহমান



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রথম আব্দুর রহমানের পরিচয় ও তাঁর স্পেনে আগমনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে পারবেন।
- স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমীরাত প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা জানতে পারবেন।
- স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমীরাত সুদৃঢ়করণে তাঁর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

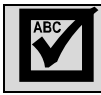	**মুখ্য শব্দ**	**আদ্-দাখিল, ইউসুফ আল-ফিহরি, মাসারার যুদ্ধ, লোকসার যুদ্ধ, কুরায়েশদের বাজপাখি, কর্ডোভা মসজিদ, কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ও 'মুন্যাত আল-রুসাফা'**

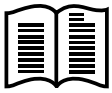

৭১১ সাল থকে ৭৫৬ সাল পর্যন্ত স্পেনের উমাইয়া শাসনকে দামেস্কের উমাইয়া খিলাফতের অধীনস্ত বা পরাধীন উমাইয়া আমীরাত বলা হয়। ৭৫৬ সালে প্রথম আব্দুর রহমান (৭৫৬-৮৮) এই পরাধীন উমাইয়া আমীরাতকে স্বাধীন উমাইয়া আমীরাতে পরিণত করেন।

প্রথম আব্দুর রহমানের পরিচয় : প্রথম আব্দুর রহমান ছিলেন একজন উমাইয়া রাজপুত্র। তিনি উমাইয়া বংশের দশম খলিফা হিশামের দৌহিত্র ছিলেন। স্পেনের ইতিহাসে তিনি 'আদ্-দাখিল' নামে পরিচিত। 'আদ্-দাখিল' শব্দের অর্থ প্রবেশকারী বা সূচনাকারী। তিনি স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমীরাতের সূচনা করায় অথবা পরাধীন উমাইয়া আমীরাত থেকে তিনি স্বাধীন উমাইয়া আমীরাতের সূচনা করায় তাঁকে এই উপাধি দেয়া হয়। স্পেনের উমাইয়াদের মধ্যে আব্দুর রহমান নামে আরও দুই জন বিখ্যাত শাসক থাকায় ইতিহাসে তিনি প্রথম আব্দুর রহমান নামে পরিচিতি লাভ করেন।

উত্তর আফ্রিকায় আগমন : ৭৫০ সালে জাব নদীর তীরে আব্বাসীয়দের হাতে উমাইয়াদের পতনের পর হিশামের পৌত্র আব্দুর রহমান তাঁর ক্রীতদাস বদরকে নিয়ে প্যালেস্টাইন ও মিসর অতিক্রম করে উত্তর আফ্রিকায় গমন করেন। উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন তখনও আব্বাসীয়দের অধীনতা স্বীকার করেনি। তখন উত্তর আফ্রিকার শাসক ছিলেন আব্দুর রহমান আল-হাবীব আল-ফিহরি এবং স্পেনে তাঁর পুত্র ইউসুফ আল-ফিহরি। আল-ফিহরি এ উমাইয়া উদ্বাস্তু রাজপুত্রকে সাদরে গ্রহণ করেন নি। এমনকি তিনি তাঁকে হত্যারও চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি অল্পের জন্য বেঁচে যান। এরপর তিনি সিউটায় তাঁর মাতুল বার্বার গোত্রের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আফ্রিকায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবেনা ভেবে তিনি স্পেনে গমন ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন।

স্পেনে আগমন : স্পেনে সে সময় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলছিল যা আব্দুর রহমানের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। আব্দুর রহমান বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য ক্রীতদাস বদরকে গুপ্তচর হিসেবে স্পেনে প্রেরণ করেন। বদর ফিরে এসে সেখানকার অনুকূল অবস্থা বর্ণনা করেন। অন্যদিকে স্পেনের দক্ষিণ আরবীয় বা ইয়ামেনী নেতা আবদুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহ্কে আব্দুর রহমান একটি চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠি পেয়ে তারা ইয়ামেনীদের ঐক্যবদ্ধ করে আব্দুর রহমানকে একটি নৌকা পাঠিয়ে স্পেনে আগমনের আমন্ত্রণ জানান। আব্দুর রহমান এরকম একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি ৭৫৫ সালে আল-মুনেকার বন্দরে অবতরণ করেন। সেখান থেকে এল্ভিরার মাটিতে পদার্পণ করেন। ইয়ামেনীরা তাঁর পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে। আব্দুর রহমান প্রথমে কোন প্রতিরোধ ছাড়াই দক্ষিণ দিকের শহরগুলো দখল করলেন। এরপর তিনি কর্ডোভা অভিমুখে যাত্রা করেন।

মাসারার যুদ্ধ ও স্বাধীন উমাইয়া আমীরাত প্রতিষ্ঠা : ৭৫৬ সালে কর্ডোভার মাসারা নামক স্থানে উত্তর আরবীয়দের সাথে আব্দুর রহমানের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। মাসারার যুদ্ধে আব্দুর রহমান জয়ী হন এবং কর্ডোভা দখল করেন। ফলে দামেস্কের উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের ৬ বছর পর স্পেনে উমাইয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। Syed Ameer Ali (গ্রন্থ: *A Short History of the Saracens*) বলেন,"নির্বাসিত, পলায়নপর, ভবঘুরে এবার তাঁর উচ্চাভিলাষের শিখরে পৌঁছে যান।"

এভাবে মাসারার যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমীরাত প্রতিষ্ঠা করেন।

ইউসুফ ও সুমায়েলের বিদ্রোহ দমন : মাসারার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইউসুফ টলেডোতে এবং তার সেনাপতি সুমায়েল জায়েনে পালিয়ে যান। পরে ইউসুফ জায়েনে সুমায়েলের সাথে মিলিত হয়ে বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ইউসুফ কর্ডোভা দখল করেন। কিন্তু পরে রাজকীয় বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য শক্তির মোকাবেলা করে নিজের ভবিষ্যত নিয়ে শংকিত হয়ে অব্দুর রহমানের সাথে চুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী তার দুইপুত্র আবু জায়িদ ও আবুল আসওয়াদ মুহম্মদকে আব্দুর রহমান যামিন হিসেবে রাখেন এবং ইউসুফ ও সুমায়েল নির্বিঘ্নে তাদের সম্পত্তি ভোগ-দখলে রাখেন। এর ফলে দু'বছর উভয়ের মধ্যে শান্তি বজায় থাকে। এরপর উভয়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হলে ইউসুফ পালিয়ে মেরিদায় গমন করেন এবং ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ৭৫৮ সালে লোকসার যুদ্ধে তিনি আব্দুর রহমানের বাহিনীর হাতে পরাজিত ও আহত হন এবং এর এক বছর পর টলেডোতে তার এক শত্রুর দ্বারা নিহত হন। তার পুত্র আবু জায়িদকে হত্যা করা হয়, আবুল আসওয়াদ বহুদিন কারাবাসের পর পালিয়ে রক্ষা পান। সুমায়েল কারারুদ্ধ হন এবং বিষ প্রয়োগে নিহত হন।

ইয়ামেনীদের বিদ্রোহ দমন : ক্ষমতা লাভের পর আব্দুর রহমানকে বিভিন্ন আরব গোত্রীয় কোন্দল ও ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হয়। ৭৬০ সালে আরজাক বিন নুমান গাচ্ছানি বিদ্রোহ করে সেভিল দখল করেন। রাজকীয় বাহিনী পাঠিয়ে সেভিল উদ্ধার করা হয় এবং আরজাক আত্মসমর্পণ করেন। ইয়ামেনী নেতা ও সেভিলের গভর্নর আবু সাব্বাহ আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে ৭৬৬ সালে তিনি ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। এতে অন্যান্য ইয়ামেনী নেতাগণ বিদ্রোহী হয়ে অনেক মুদারীয়কে হত্যা করে। ৭৭৪ সালে আমীর তাদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং তাদের ২০ হাজার সৈন্য নিহত হয়।

টলেডোর বিদ্রোহ দমন : ৭৬১ সালে টলেডোর প্রাক্তন শাসনকর্তা হিশাম বিন উর্‌উয়াহ্ বিদ্রোহ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকবার অভিযান প্রেরণ করা হয়। শেষ পর্যন্ত ৭৬৪ সালে তিনি আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁকে কর্ডোভায় এনে ফাঁসি দেয়া হয়।

আব্বাসীয় অভিযান প্রতিহত : আব্দুর রহমান আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের নামে খুত্‌বা পাঠ করলেও পরে তা বন্ধ করে দেন। আল-মনসুর স্পেনকে আব্বাসীয় খিলাফতের বলয়ে নিয়ে আসার জন্য কায়রোওয়ানের আব্বাসীয় গভর্নর আলা বিন মুগীসকে ৭৬৩ সালে স্পেনে পাঠান। আলা বিন মুগীস ৭০০০ বার্বার সৈন্যসহ নিহত হন। তাঁর মস্তক ছিন্ন করে আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের নিকট প্রেরণ করা হয়। খলিফা আব্দুর রহমানকে 'সাকর কুরায়িশ' বা 'কুরায়িশদের বাজপাখি' (Falcon of the Quraysh) আখ্যা দেন। দ্রুততম সময়ে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমীরাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁকে বাজপাখির সাথে তুলনা করা হয়। এছাড়া আব্দুর রহমানের বীরত্ব ও দক্ষতায় কিছুটা আতঙ্কবোধ করে আল-মনসুর বলেছিলেন,"আমাদের ও এমন এক শত্রুর মধ্যে একটি সমুদ্র (ভূমধ্যসাগর) সৃষ্টির জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ।"

বার্বার বিদ্রোহ দমন : সান্তাব্রিয়াতে বার্বাররা আবদুল্লাহ্ নামের একজন স্কুল শিক্ষকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এবং তাদের এই বিদ্রোহ প্রায় ১০ বছর স্থায়ী হয়। ৭৬৮ সালে তার বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরিত হলে তিনি জঙ্গলে আত্মগোপণ করেন এবং ৯ বছর পর অর্থাৎ ৭৭৭ সালে তিনি তার ২জন সহচরের হাতে নিহত হন।

শার্লিমেনের অভিযান প্রতিহত : আব্দুর রহমান যখন দক্ষিণে বিদ্রোহী আরব ও বার্বারদের দমনে ব্যস্ত তখন উত্তর স্পেনের কতিপয় আরব নেতা ফ্রান্সের রাজা শার্লিমেনের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে স্পেন আক্রমণে প্ররোচনা দেয়। ৭৭৭ সালে শার্লিমেন পিরেনীজ অতিক্রম করে স্পেন আক্রমণ করেন এবং উত্তর স্পেনের কয়েকটি প্রদেশের ধ্বংস সাধন করেন। ৭৭৮ সালে তিনি সারাগোসায় আব্দুর রহমানের বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ফ্রান্সে ফিরে যান।

আব্দুর রহমানের কৃতিত্ব : আব্দুর রহমান ৭৮৮ সালে ৫৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ৩২ বছর স্পেন শাসনকরে উমাইয়া আমীরাতকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর রাজ্যকে ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক প্রদেশের শাসনভার একজন গভর্নরের উপর ন্যস্ত করেন। তিনি একটি উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শক্রমে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। প্রশাসনের বিভিন্ন পদে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়ে তিনি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। মুদ্রা তৈরির জন্য তিনি কর্ডোভায় একটি টাকশাল নির্মাণ করেন। কর্ডোভার বিশ্ববিখ্যাত মসজিদটি তিনিই নির্মাণ করেন। এ মসজিদ সংলগ্ন

একটি মাদ্রাসা নির্মিত হয়, যা পরবর্তীকালে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তিনি প্রকৃতি-প্রেমিক ছিলেন এবং বাগান তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ শখ ছিল। কর্ডোভা নগরীর পশ্চিম দিকে 'মুন্যাত আল-রুসাফা' নামে একটি বাগান বাড়ি তৈরি করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ সংগ্রহ করে এখানে রোপণ করেন। এখানে পানি সরবরাহের জন্য একটি জলপ্রণালী নির্মাণ করেন। নগরের জনসাধারণও অবশ্য এই জলাধার থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারত। তিনি সুবিচারক ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। তিনি প্রায়শই প্রজাদের অভাব-অভিযোগ ও কর্মচারীদের আচরণ সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য বের হতেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিমনা, সু-সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণীজনদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি মাঝে মাঝে জ্ঞানী-গুণীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সাহিত্য সভার আয়োজন করতেন। ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া, ঈসা বিন দিনার, আবু মুসা হাওয়ারী, সাইদ বিন হাসান, ইবনে কায়েস প্রমূখ মনীষীগণ তাঁর দরবার অলংকৃত করেন।

সারসংক্ষেপঃ

খলিফা হিশামের পৌত্র আব্দুর রহমান স্পেনের ইতিহাসে প্রথম আব্দুর রহমান বা আব্দুর রহমান আদ্-দাখিল নামে পরিচিত। আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর তাঁর নাম দেন 'কুরায়েশদের বাজপাখি'। ৭৫৬ সালে তিনি স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমীরাত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং আব্বাসীয় ও ফ্রান্সের শার্লিমেনের অভিযান প্রতিহত করেন। তিনি ৩২ বছর স্পেন শাসন করে উমাইয়া আমীরাতকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রথম আব্দুর রহমানকে বলা হয়-
(ক) আদ্-দাখিল (খ) আল-আওসাত
(গ) আল-নাসির (ঘ) আল-ফিহ্‌রি

২. আব্দুর রহমান আদ্-দাখিলকে 'কুরায়িশদের বাজপাখি' উপাধি দেন কে?
(ক) খলিফা হিশাম (খ) খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান
(গ) খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহ (ঘ) খলিফা আল-মনসুর

৩. কোন্ যুদ্ধের মাধ্যমে আব্দুর রহমান স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমীরাত প্রতিষ্ঠা করেন?
(ক) ওয়াদী লাক্কোর যুদ্ধ (খ) মাসারার যুদ্ধ
(গ) টুরসের যুদ্ধ (ঘ) লোকসার যুদ্ধ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

এক বিতাড়িত রাজপুত্র অনেক ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করে একটি নতুন স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন ও শত্রুদের প্রতিহত করে এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সেই রাজ্যকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. কাকে 'কুরায়িশদের বাজপাখি' বলা হয়? ১
খ. প্রথম আব্দুর রহমান কীভাবে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমীরাত প্রতিষ্ঠা করেন? ২
গ. উদ্দীপকে আলোচিত রাজপুত্রের সাথে প্রথম আব্দুর রহমানের বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন আলোচনা করুন। ৩
ঘ. প্রথম আব্দুর রহমানে কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৯.৬ প্রথম হিশাম



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রথম হিশামের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- স্পেনে মালিকী মাযহাব প্রবর্তন বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবেন ও
- প্রথম হিশামের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

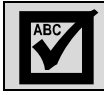	**মুখ্য শব্দ**	**হুলাল, সুলাইমান, আবদুল্লাহ্, মুসা বিন ফরতুনিও, মাতরুহ, নার্বোন, জেরোনা, ডিউক উইলিয়াম, সেপ্টিমানিয়া, মালিকী মাযহাব ও দ্বিতীয় উমর**

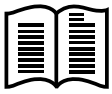

ভূমিকা

আব্দুর রহমান মৃত্যুর আগে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হিশামকে (৮৮৮-৯৬) উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। হিশাম ছিলেন হুলাল নামক একজন স্পেনীয় দাসীর গর্ভজাত সন্তান। আব্দুর রহমানের অন্য দুই পুত্র ছিলেন সুলাইমান ও আবদুল্লাহ্ যারা তাঁর সিরীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। হিশামের বুদ্ধিমত্তা ও ধার্মিকতার কারণে দাসীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে পরবর্তী আমীর হিসেবে মনোনীত করা হয়। পিতার আমলে তিনি মেরিদার গভর্নর ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ৭৮৮ সালে ৩২ বছর বয়সে হিশাম নিজেকে স্পেনের আমীর হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁর শাসনামলে নানা ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তিনি সবগুলো বিদ্রোহ সফলভাবে মোকাবিলা করেন।

ভাইদের বিদ্রোহ মোকাবিলা : সিংহাসন লাভ করেই তাকে প্রথমেই ভাইদের বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়। পিতা আব্দুর রহমানের জীবদ্দশায় হিশামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় সুলাইমান ও আবদুল্লাহ্ তাঁর মনোনয়নকে সমর্থন করলেও পিতার মৃত্যুর পর হিশাম শাসনক্ষমতা গ্রহণ করলে তাঁরা বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। ৭৮৯/৯০ সালে তাঁরা টলেডোতে মিলিত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আমীর তাঁদের সাথে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে যুদ্ধ হয় এবং সুলাইমান পরাজিত হয়ে মুর্সিয়াতে পলায়ন করেন। আবদুল্লাহ্ও সুলাইমানের পরাজয় এবং কম সৈন্যের কারণে বাধ্য হয়ে হিশামের বশ্যতা স্বীকার করেন। টলেডোর আশেপাশের জায়গা আবদুল্লাহ্কে জায়গীর দেয়া হয়। সুলায়মান মুর্সিয়াতে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। ৭৯০/৯১ সালে হিশামের পুত্র মুয়াবিয়া লোরকায় প্রচণ্ড যুদ্ধের পর চাচা সুলাইমানকে পরাজিত করেন। সুলাইমান ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাঁকে ক্ষমা করা হয় এবং স্পেন ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়।

পূর্ব স্পেনে বিদ্রোহ : হিশাম যখন ভাইদের সাথে দ্বন্দ্বে ব্যস্ত সেসময় পূর্ব স্পেনে ইয়ামেনীরা বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। ৭৮৮ সালে সাইদ বিন হুসাইন বিন ইয়াহিয়া আল-আনসারীর নেতৃত্বে ইয়ামেনীরা তরতোসাতে বিদ্রোহ শুরু করে। এর ফলে বনু কাসী গোত্রের নও-মুসলিম নেতা মুসা বিন ফরতুনিও-এর নেতৃত্বে মুদারীয়গণ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং উমাইয়া শাসনের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সাইদ পরাজিত ও নিহত হন এবং তরতোসা মুসার হস্তগত হয়। এ সময় মাতরুহ নামের একজন নেতার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা বার্সিলোনায় বিদ্রোহ করে এবং মুসার সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করে তরতোসা, সারাগোসা, বার্সিলোনা, তারাগোনা ও হুয়েস্কা দখল করে নেয়। ফলে এ সময় স্পেনে উমাইয়া অস্তিত্ব বিপন্ন হতে যাচ্ছিল। হিশাম তাদের দৃঢ় হস্তে দমনের চেষ্টা করেন। ৭৯১ সালে ভ্যালেন্সিয়ার গভর্নর আবু উসমান উবায়দুল্লাহ্ বিন উসমানকে মাতরুহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। সারাগোসা অবরুদ্ধ হয়। পরে মাতরুহ তাঁর নিজের লোকদের হাতে প্রাণ হারান। ফলে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে ও পরাজিত হয়। মুসা বিন ফরতুনিওকে সারাগোসার গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

ফ্রান্স অভিযান : অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠার পর হিশাম মুসলিমদের পূর্ব শত্রু ও বিদ্রোহে উৎসাহদানকারী উত্তরের খ্রিস্টান নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ৭৯২ সালে আবু উসমানের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী দক্ষিণ ফ্রান্সে অগ্রসর হয়। পরে এই সেনাবাহিনী দুভাগে বিভক্ত হয়ে অভিযান করে। একদলের নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল

মালিক বিন আব্দুল ওয়াহিদ এবং আর একদলের নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল করিম বিন আব্দুল ওয়াহিদ। আব্দুল মালিক বিন আব্দুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী নার্বোনে ফ্রাঙ্কদের পরাস্ত করে নার্বোন ও জেরোনা জয় করে। এ সময় ফ্রান্সের রাজা শার্লিমেন ও তাঁর পুত্র লুইস জার্মানী ও ইতালীতে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। তুলুসের ডিউক উইলিয়াম মুসলিমদের বাধা প্রদান করেন এবং পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। মুসলিমরা সেপ্টিমানিয়া অধিকার করে নেয়। অন্যদিকে আব্দুল করিম বিন আব্দুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী গ্যালেসিয়া ও আস্তুরিয়া আক্রমণ করে। আস্তুরিয়ার রাজা প্রথম বারমুডো ও দ্বিতীয় আলফান্সোর সাথে মুসলিম বাহিনীর কয়েকবার মোকাবিলা হয়। শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী তাদের পরাস্ত করে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী ফেরার পথে খ্রিস্টানরা আক্রমণ করে এবং এতে মুসলিমরা পরাজিত হয়। ফলে উত্তর স্পেনে খ্রিস্টানরা আধিপত্য ধরে রাখে এবং মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে।

মালিকী মাযহাবের প্রবর্তন : হিশাম ধর্মানুরাগী ছিলেন। তিনি ফুকাহা বা ইসলামী আইন-বেত্তাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ইমাম মালিক বিন আনাসের ভক্ত ও শিষ্য। ইমাম মালিক ৭১৫ সালে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। আব্বাসীয় আমলে শিয়া দাবীদার মুহম্মদ বিন আবদুল্লাহ্‌কে সমর্থন করার কারণে আল-মনসুর কর্তৃক তিনি নির্যাতনের শিকার হন। হিশাম তাঁকে স্পেনে আগমন ও বসতি স্থাপন করার অনুরোধ করেন। ইমাম মালিক আব্বাসীয় অত্যাচার সত্ত্বেও এই প্রস্তাবে রাযী হননি। তদুপরি হিশাম মদীনায় ইমাম মালিকের সাহচর্য এবং তাঁর থেকে জ্ঞান লাভ করার জন্য ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। তিনি এ মতবাদ স্পেনে প্রচারের জন্য প্রচেষ্টা চালান। স্পেনে ইমাম মালিকের শিষ্যদের মধ্যে ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া ও ঈসা বিন দিনার ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

হিশামের চরিত্র ও কৃতিত্ব :

প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা : ৮ বছর শাসন করার পর ৭৯৬ সালে ৪০ বছর বয়সে হিশাম প্রাণত্যাগ করেন। হিশামকে উমাইয়া আমীরাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি উমাইয়া রাজ্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর তিন পুত্র উমায়িদ আল-মালিক, মুয়াবিয়া ও হাকামের সাহায্যে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করতে সমর্থ হন।

প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহ : তিনি প্রশাসনিক ব্যক্তিদের অপ্রয়োজনে পরিবর্তন করেন নি এবং পিতার নিযুক্ত উযির ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ পদে বহাল রাখেন। তবে দুর্নীতিপরায়ণ ও অসৎ কর্মচারীদের বরখাস্ত করেন এবং তাদের কখনও পুনঃনিয়োগ দিতেন না। তিনি বেআইনী কর আদায় বন্ধ করে দেন এবং যাকাত ও সাদকাহ্ আদায়ের আদেশ দেন। তিনি সুশিক্ষিত লোকদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

জনকল্যাণমূলক কাজ : তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন এবং গোয়াদালকুইভির নদীর উপর নির্মিত সেতুর সংস্কার সাধন করেন। রাজধানীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য একটি সুন্দর ঝর্ণা নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি নতুন নতুন প্রাসাদ নির্মাণ ও পুরাতন সরকারী ভবন সংস্কার করেন। কর্ডোভার মসজিদের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন। এর ফলে এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬০০ ফুট ও প্রস্থ হয় ২৫০ ফুট। ১২০০ বছর পরও এই মসজিদটির সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয়তা বজায় রয়েছে। তিনি খাল ও পুকুর খনন করেন। তিনি দরিদ্রদের অর্থ বিতরণ করতেন।

ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা : চরিত্রের দিক দিয়ে তাঁকে উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় উমরের (উমর বিন আব্দুল আযীয) সাথে তুলনা করা হয়। কারণ তিনি দ্বিতীয় উমরের মতই ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। দ্বিতীয় উমরের মত তিনিও তাঁর গোপন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের অবস্থা দর্শন এবং প্রাদেশিক গভর্নর ও সরকারী কর্মকর্তাদের যোগ্যতা নিরূপণ ও তাদের কাজ-কর্মের খবরাখবর সংগ্রহ করতেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন অথবা তাদের চাকুরী হতে বরখাস্ত করতেন। তিনি ধর্মীয় শিক্ষাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন। আরবী শিক্ষার জন্য অনেক বিদ্যালয় নির্মাণ করেন।

কাব্যপ্রীতি : কাব্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল এবং তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন। আমর বিন আলী গাফ্‌ফার তাঁর দরবারের বিখ্যাত কবি ছিলেন।

সারসংক্ষেপঃ

প্রথম হিশাম সিংহাসন লাভ করে তাঁর দুই ভাই সুলাইমান ও আবদুল্লাহ্‌র বিদ্রোহ এবং ইয়ামেনীদের বিদ্রোহ সফলভাবে মোকাবিলা করেন। তিনি ফ্রান্সে অভিযান চালিয়ে সেপ্টিমানিয়া অধিকার করে নেন। হিশাম স্পেনে মালিকী মাযহাব প্রবর্তন করেন। তাঁকে উমাইয়া আমীরাতের 'প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা' বলা হয়। ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে তাঁকে দ্বিতীয় উমরের (উমর বিন আব্দুল আযীয) সাথেও তুলনা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. স্পেনের স্বাধীন উমাইয়া আমীরাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?
   (ক) প্রথম আব্দুর রহমান (খ) দ্বিতীয় আব্দুর রহমান
   (গ) তৃতীয় আব্দুর রহমান (ঘ) প্রথম হিশাম

২. স্পেনে মালিকী মাযহাবের প্রবর্তন করেন কে?
   (ক) প্রথম আব্দুর রহমান (খ) দ্বিতীয় আব্দুর রহমান
   (গ) তৃতীয় আব্দুর রহমান (ঘ) প্রথম হিশাম

৩. স্পেনের কোন্ শাসককে উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় উমরের সাথে তুলনা করা হয়?
   (ক) প্রথম আব্দুর রহমান-কে (খ) প্রথম হিশাম-কে
   (গ) প্রথম আল-হাকাম-কে (ঘ) তৃতীয় আব্দুর রহমান -কে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

শিক্ষক স্পেনের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, স্পেনের একজন মুসলিম শাসক মুঘল বাদশাহ হুমায়ুনের মত ভাইদের বিদ্রোহ দমন করে সিংহাসন রক্ষা করেন। শাসক হিসেবে তাঁকে দ্বিতীয় উমরের সাথে তুলনা করা হয়। তাঁকে স্পেনের স্বাধীন উমাইয়া আমীরাতের 'প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা'ও বলা হয়। তিনি পূর্ব স্পেনের বিদ্রোহ দমন, ফ্রান্সে অভিযান পরিচালনা, স্পেনে মালিকী মাযহাবের প্রবর্তন এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করেন।

ক. স্পেনের স্বাধীন উমাইয়া আমীরাতের 'প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা' কে? ১
খ. প্রথম হিশাম কর্তৃক স্পেনে মালিকী মাযহাবের প্রবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা দিন । ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন শাসককে বাদশাহ হুমায়ুনের সাথে তুলনা করা হয় এবং কেন? ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন শাসককে খলিফা দ্বিতীয় উমরের সাথে তুলনা করা হয় লিখুন? ৪

পাঠ-৯.৭ দ্বিতীয় আব্দুর রহমান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও বৈদেশিক সম্পর্কের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- খ্রিস্টান ধর্মান্ধ আন্দোলন সম্পর্কে অলোকপাত করতে পারবেন ও
- দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের উপর চার ব্যক্তির প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**আল-আওসাত, ধর্মান্ধ আন্দোলন, মোযারব, ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া, যিরীয়াব, নসর ও তারুব**

৮২২ সালে পিতা হাকামের (৭৯৬-৮২২) মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আব্দুর রহমান (৮২২-৫২) পিতৃ-সিংহাসন লাভ করেন। স্পেনের স্বাধীন উমাইয়া আমীরাতে আব্দুর রহমান নামে তিনজন বিখ্যাত শাসকের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। সেজন্য তাঁকে 'আল-আওসাত' বা মধ্যবর্তী বলা হয়।

আবদুল্লাহ্‌র বিদ্রোহ : দ্বিতীয় আব্দুর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর বয়ো:বৃদ্ধ আবদুল্লাহ্ (প্রথম হিশামের ভাই) তাঞ্জিয়ার হতে সৈন্য সংগ্রহ করে স্পেনে আগমন করেন এবং বিদ্রোহ করে পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁর পুত্রদ্বয় আসবাগ ও কাশিম বিদ্রোহী পিতাকে সাহায্য করেননি। পুত্রদ্বয়ের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা হলে তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তাঁকে মুর্‌সিয়ার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। দু'বৎসর পর সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

তুদ্‌মির ও মেরিদায় বিদ্রোহ : তাঁর সময় তুদ্‌মিরে হিমারীয় ও মুদারীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। মুদারীয়রা ছিল বেশি অশান্ত। মুদারীয় নেতা আবুল শামাখ মুহম্মদ বিন ইব্রাহিমকে রাজকীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয় এবং তুদমির-এর রাজধানী লোরকা থেকে মুর্সিয়াতে স্থানান্তর করা হয়। এতে সংঘর্ষের অবসান হয়। মেরিদায় আব্দুল জব্বার ও সুলাইমান বিন মার্তিনের নেতৃত্বে খ্রিস্টান ও ইহুদিরা বিদ্রোহ করে। আমীর তাদের বিদ্রোহ দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

টলেডোতে বিদ্রোহ : টলেডোতে হাশিম নামের এক কর্মকার নও-মুসলিমের নেতৃত্বে খ্রিস্টান, নও-মুসলিম ও ইহুদিরা বিদ্রোহ করে। ৮২৯ সালে কর্ডোভা থেকে হাশিম পরিবার টলেডোতে আগমন করে এবং লুটতরাজ, আরব-বার্বারদের গৃহ ধ্বংস, দুর্গ ধ্বংস এবং প্রহরীদের হত্যা করে। ৮৩১ সালে তাঁর বিরুদ্ধে সীমান্তের গভর্নর মুহম্মদ বিন ওয়াসিমকে পাঠিয়ে তাকে পরাজিত ও হত্যা করা হয়।

খ্রিস্টান শাসকদের সাথে সংঘাত : এ সময় লিওনের প্রধান দ্বিতীয় আলফান্সো মুসলিম সীমান্তে তৎপরতা চালায় এবং উত্তরের অন্যান্য দলপতিরা তাকে অনুসরণ করে। আমীর ৮২৫ সালে আব্দুল করিম বিন মুগিস ও উবায়দুল্লাহ্‌কে পাঠিয়ে তাদের পরাজিত করেন এবং চুক্তির মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করা হয়। এ চুক্তি দশ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে। পরবর্তীতে আস্তুরিয়া, গ্যালেসিয়া, আলভা ও ক্যাস্টিলে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং বিদ্রোহীরা পাম্পলোনা ও বার্সিলোনা দখল করে নেয়। পরে আমীর সেনাবাহিনী পাঠিয়ে পাম্পলোনা, বার্সিলোনা, গ্যালিসিয়া, মদীনাতুস সালিম পুনরুদ্ধার করেন।

নরম্যান জলদস্যুদের দমন : ৮৪৪ সালে জার্মান নরম্যানরা ৮টি জাহাজ নিয়ে লুসিতানিয়া, লিসবন ও কেডিজ লুট করে। এরপর সেভিলে আসে এবং লুণ্ঠন ও অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। কর্ডোভা থেকে প্রেরিত আমীরের নৌবহর ও সেনাদলের তাড়া খেয়ে তারা আল্‌জেসিরাস ও উপকূলীয় অঞ্চলে হানা দেয়। সর্বশেষে তাদের সেখান থেকেও পলায়ন করতে বাধ্য করা হয়। এরপর আমীর একটি শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলেন। সেভিলে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা গড়ে তোলা হয় এবং উপকূলীয় শহরগুলো সুরক্ষিত করা হয়।

ধর্মান্ধ আন্দোলন : দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের সময় স্পেনের ধর্মান্ধ খ্রিস্টান সম্প্রদায় এক উদ্ভট ও অযৌক্তিক আন্দোলনের

সূত্রপাত করে যা 'ধর্মান্ধ আন্দোলন' নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের কারণ হল:

১. ইসলামের অধিকতর গ্রহণযোগ্যতার ফলে বহু খ্রিস্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়। এতে ধর্মান্ধ খ্রিস্টানদের ঈর্ষা জন্মে।
২. আরব সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি একদল খ্রিস্টান আকৃষ্ট হয় এবং তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করেও আরবী ভাষা ব্যবহার, আরবীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এদেরকে বলা হয় 'মোযারব'। তারা আরবী ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে থাকে। এর ফলে ধর্মান্ধ খ্রিস্টানরা খ্রিস্টান ধর্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হয়ে পড়ে।
৩. ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে এসময় ইসলামের বিকাশ ঘটতে থাকে। ফলে খ্রিস্টান পাদ্রিরা নিজেদের ধর্মকে শক্তিশালী করার জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়।
৪. স্পেনের খ্রিস্টানরা বরাবরই মুসলিমদের অনুপ্রবেশকারী মনে করে এবং তারা তাদের হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার ও মুসলিমদের বিতাড়নের জন্য জঘন্য প্রচারণায় লিপ্ত হয়।

ধর্মান্ধ খ্রিস্টানরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায় এবং নবী মুহম্মদের (স.) বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে। তাদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ইউলোজিয়াস, আলভারো, ফ্লোরা, মেরী, পারফেকটাস, আইজাক, সাঞ্চো, লিওক্রাটিয়া প্রমূখ। দ্বিতীয় আব্দুর রহমান তাদেরকে আন্দোলন হতে নিভৃত করতে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের নিয়ে মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনে ধর্মান্ধদের অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধের আহ্বান জানালেও তারা তা অমান্য করে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ৮৫০ সালে আমীর তাদের মধ্যে ১১ জন ধর্মান্ধকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বহু সংখ্যককে কারারুদ্ধ করলে আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়। পরে প্রথম মুহম্মদের (৮৫২-৮৬) সময় আন্দোলন আবার চাঙ্গা হয়। ৮৫৯ সালে শীর্ষ নেতাদের ফাঁসি দেয়ার মাধ্যমে এই আন্দোলন বন্ধ হয়।

বৈদেশিক সম্পর্ক : ৮৪০ সালে বাইজানটাইন সম্রাট থিওফিলাস মূল্যবান উপহারসহ কর্ডোভায় একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। জবাবে তিনিও কনস্টানটিনোপোলে একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। এ সময় নাভারের কাউন্ট ফ্রান্সের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং একটি শক্তিশালী মিত্রের সন্ধানে কর্ডোভায় একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে বলা হয় মুসলিমরা কাউন্টকে বহিঃশক্তির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করবে এবং নাভারে এর বিনিময়ে পিরেনীজ অতিক্রম করে তাদের ফ্রান্সে আক্রমণে সাহায্য করবে।

চার ব্যক্তির প্রভাব : দ্বিতীয় আব্দুর রহমান তাঁর শাসনকালব্যাপী ৪ জন ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন ধর্মতত্ত্ববিদ ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া, সঙ্গীতজ্ঞ যিরীয়াব, খোজা নসর ও সুলতানা তারুব। ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া প্রথম হিশামের সময় ইমাম মালিক বিন আনাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে স্পেনে মালিকী মাযহাব ও কিতাবুল মুয়াত্তা গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার ঘটান। প্রথম হাকামের বিরুদ্ধে ফকীহ ও নও-মুসলিমদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেও তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের সময় তিনি অতি বৃদ্ধ হলেও আমীর তাঁকে খুব ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সমাদর করতেন এবং দরবারের শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করেন। জনগণ তাঁর মাধ্যমে ফরিয়াদ করলে আমীর তা মঞ্জুর করতেন। পারস্যের অধিবাসী যিরীয়াব প্রথমে আব্বাসীয় দরবারের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ওস্তাদ ইসহাক মওসিলির নির্দেশে বাগদাদ ত্যাগ করে আঘলাবী দরবারে যান। সেখানেও তাঁর স্থান হয়নি। অবশেষে দ্বিতীয় হাকামের আমন্ত্রণে স্পেনে আসেন। কিন্তু তিনি স্পেনে পৌঁছার পূর্বেই হাকামের মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় আব্দুর রহমান ক্ষমতালাভ করে তাঁকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর জন্য ভাল বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করেন। সঙ্গীতে বিভিন্ন সুর, ছন্দ তৈরী করেন; বীণায় ৫ম তারের সংযোজন করেন; বিভিন্ন যন্ত্র আবিস্কার করেন; এবং স্পেনে সঙ্গীত নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গীতের পাশাপাশি তিনি অঙ্গসজ্জা, রূপচর্চা, গৃহসজ্জা, ভোজন, পোশাকের ব্যবহার রীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নের ব্যাপারেও অবদান রাখেন। অর্থাৎ স্পেনে বিভিন্ন ফ্যাশন ও পারসিক রীতি প্রবর্তন হয় তাঁর মাধ্যমে। ক্রীতদাস খোজা নসর সুলতানা তারুবের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং রাজকার্যে প্রচুর দক্ষতার জন্য তিনি প্রধান সচিব পদ লাভ করেছিলেন। তাঁর উপর আমীর রাজকাজের দায়িত্ব দিয়ে সঙ্গীত আসরে বিনোদন করতেন। কিন্তু সুলতানা তারুব তাঁকে দিয়ে যুবরাজ আবদুল্লাহ্‌কে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করেন। ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে তাঁকে সেই বিষ পাণ করিয়েই হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের স্ত্রী তারুব ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। স্বর্ণালংকারের প্রতি তাঁর বিশেষ লোভ ছিল। আমীর তাঁর সব চাহিদা পূরণ করতেন। কিন্তু পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে হত্যার ষড়যন্ত্রের পর আমীর তাঁকে অন্য চোখে দেখতেন এবং তাঁর প্রভাব দিনে দিনে কমতে থাকে।

সারসংক্ষেপঃ

দ্বিতীয় আব্দুর রহমানকে বলা হয় 'আল-আওসাত'। তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, উত্তরের খ্রিস্টান দলপতি ও নরম্যান জলদস্যুদের দমন করেন। তাঁর সময় স্পেনের ধর্মান্ধ খ্রিস্টান সম্প্রদায় ধর্মান্ধ আন্দোলনের সূত্রপাত করে। বাইজানটাইন সম্রাট থিওফিলাস ও নাভারের কাউন্ট- এর সাথে তাঁর দূত বিনিময় হয়। দ্বিতীয় আব্দুর রহমান তাঁর শাসনকালব্যাপী ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া, যিরীয়াব, খোজা নসর ও সুলতানা তারুব- এই ৪ ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. 'আল-আওসাত' কার উপাধি?

(ক) প্রথম আব্দুর রহমান-এর (খ) দ্বিতীয় আব্দুর রহমান-এর

(গ) তৃতীয় আব্দুর রহমান-এর (ঘ) আব্দুর রহমান আল-গাফিকি-এর

২. যিরীয়াব ছিলেন দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের সময়ের একজন-

(ক) সঙ্গীতজ্ঞ (খ) প্রধানমন্ত্রী

(গ) ধর্মতত্ত্ববিদ (ঘ) খোজা

৩. দ্বিতীয় আব্দুর রহমান-এর স্ত্রীর নাম-

(ক) সুবাহ (খ) হুলাল

(গ) যাহ্‌রা (ঘ) তারুব

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রাতুল তার বন্ধুর কাছে শুনল যে, স্পেনের একজন মুসলিম শাসকের উপাধি 'আল-আওসাত'। ধর্মান্ধ আন্দোলন তাঁর সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুদের প্রতিহত করেন এবং বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি তাঁর শাসনকালব্যাপী ৪ ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ক. 'আল-আওসাত' কার উপাধি? ১

খ. দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও বৈদেশিক নীতির বর্ণনা দিন। ২

গ. উদ্দীপকে খ্রিস্টান ধর্মান্ধ আন্দোলন সম্পর্কে অলোকপাত করুন। ৩

গ. দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের উপর চার ব্যক্তির প্রভাব আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৯.৮ উমর বিন বিন হাফ্সুন



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উমর বিন হাফ্সুনের পরিচয় ও বোবাস্ট্র দুর্গে তাঁর আধিপত্য বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পরবেন।
- মুহম্মদ, মুন্যির, আবদুল্লাহ্ ও তৃতীয় আব্দুর রহমানের সাথে তাঁর সংঘর্ষের বিবরণ দিতে পারবেন।
- তিনি জাতীয়তাবাদী নেতা কিনা সে সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	**মুখ্য শব্দ**	**বোবাস্ট্র দুর্গ, ইজনাট, প্রথম মুহম্মদ, হাশিম, মুন্যির, আবদুল্লাহ্, পলির যুদ্ধ, স্যামুয়েল ও টোলক্স দুর্গ**

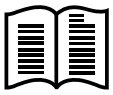

আমীর মুহম্মদের শাসনামলে (৮৫২-৮৬) স্পেনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বোবাস্ট্র পর্বতের পাদদেশে উমর বিন হাফ্সুন নামে এক বিদ্রোহী নেতার নাটকীয় উত্থান ঘটে। স্পেনের ইতিহাসে উমর বিন হাফ্সুন একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। মুসলিমদের নিকট তিনি একজন ধর্মদ্রোহী বিদ্রোহী নেতা হলেও স্বজাতির অনেকের নিকট তিনি জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে বিবেচিত। মুহম্মদ, মুন্যির, আবদুল্লাহ্ ও তৃতীয় আব্দুর রহমান- এ চারজন আমীরের বিরুদ্ধে তিনি ক্রমাগতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যান।

উমর বিন হাফ্সুনের পরিচয় ও বোবাস্ট্র দুর্গে আধিপত্য বিস্তার : উমর বিন হাফ্সুন ৮৬০ সালে রোন্দার নিকটবর্তী ইজনাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাফ্স্ বিন উমর বিন জাফর আল-ইসলামী। হাফ্সুন একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক হলেও তাঁর পুত্র উমর ছিলেন উগ্র মেজাযী এবং দস্যু প্রকৃতির। ফলে তিনি পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন এবং পর্বতের পাদদেশে গহীন অরণ্যের মধ্যে দস্যুদের সাথে মিলিত হয়ে দস্যু জীবন শুরু করেন। উমর একবার একজন স্থানীয় সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করে পিতার সাথে বোবাস্ট্র পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত সেরেনিয়া ডে রোন্দায় পলায়ন করেন। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করা হলে তিনি উত্তর আফ্রিকায় পলায়ন করেন। ৮৮০ সালে তিনি বোবাস্ট্রতে ফিরে আসেন। চাচা মুজাহিরের সহযোগিতায় ৪০ জনের একটি ডাকাত দল গঠন করে বোবাস্ট্র দুর্গে বসবাস শুরু করেন। বহু মোযারব ও নও-মুসলিম তাঁর দলে যোগদান করে এবং তিনি তাদের নিয়ে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে নগরের বিদ্রোহীরাও তার দলে যোগদান করে। তিনি বোবাস্ট্র দুর্গের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন।

প্রথম মুহম্মদের সাথে সংঘর্ষ : প্রথম মুহম্মদ (৮৫২-৮৮৬) উমরের বিরুদ্ধে দুটি অভিযান প্রেরণ করেন এবং অভিযান দুটি উমর কর্তৃক পরাজিত হয়। এরপর মুহম্মদের প্রধানমন্ত্রী হাশিম তাঁকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তবে উমরের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে হাশিম তাকে ৮৮৩ সালে রাজকীয় সেনা অফিসার হিসেবে নিয়োগ দান করেন। সেনা অফিসার হিসেবে নিয়োগের পর তিনি একাধিক যুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সৈন্যদের জন্য অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করার কারণে কর্ডোভার নগর-প্রধান মুহম্মদ বিন ওয়ালিদের সাথে তাঁর মনোমালিন্য হয় এবং প্রধানমন্ত্রী হাশিমের কাছে এ বিষয়ে তিনি অভিযোগ করেন। কিন্তু কোন প্রতিকার না পেয়ে রাগান্বিত হয়ে ৮৮৪ সালে মুহম্মদের সেনাবাহিনী ত্যাগ করেন এবং বোবাস্ট্রতে গিয়ে তাঁর দুর্গ সুরক্ষিত করে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুহম্মদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে থাকেন। নও-মুসলিমদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার দলের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং জায়েন ও আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে দস্যুবৃত্তি অব্যাহত রাখেন। আমীর তাঁর বিরুদ্ধে জায়িদ বিন কাসিমকে প্রেরণ করেন। উমর রাজকীয় বাহিনীকে মোকাবিলা না করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং করদানে স্বীকৃত হন। তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি রাতে হঠাৎ রাজকীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ করে সেনাপতি জায়িদকে হত্যা করেন। ৮৮৬ সালে যুবরাজ মুন্যির আল-হামা দুর্গে উমরের এক সহযোগী বিদ্রোহীকে পরাজিত করে তার মস্তক রাজধানীতে প্রেরণ

করেন। উমরও এ যুদ্ধে অংশ নেন এবং আহত অবস্থায় পলায়ন করেন। ঠিক এ সময়ে পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে মুন্‌যির রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

মুন্‌যিরের সাথে সংঘর্ষ : আমীর মুন্‌যির (৮৮৬-৮৮) রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে উমর নিজের অবস্থা সুরক্ষিত করতে সময় ও সুযোগ পান। তিনি সারাগোসা, হিউয়েসকা ও টলেডোতে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত করেন। মুন্‌যির প্রথমে উমরের সহযোগী আর্চিদোনা দুর্গের অধিপতি নও-মুসলিম আইসুনের বিরুদ্ধে ৮৮৮ সালে অভিযান প্রেরণ করেন। আমীর সহজেই দুর্গটি দখল করেন । আর্চিদোনা দখলের পর তিনি বোবাস্ট্র দুর্গ অবরোধ করেন। উমর উপয়ান্তর না দেখে কয়েকটি শর্তে বশ্যতা স্বীকার করেন: ১. তিনি বোবাস্ট্র ত্যাগ করে কর্ডোভাতে বসবাস করবেন, ২. রাজকীয় বাহিনীতে যোগ দেবেন, ৩. তাঁর পুত্রগণ আমীরের নিকট যামিন হিসেবে থাকবে এবং ৪. তাঁর আসবাবপত্র বহনের জন্য আমীর ১০০ খচ্চর প্রেরণ করবেন। আমীর তাঁর কথায় বিশ্বাস করে ১০০ খচ্চর বোবাস্ট্রতে প্রেরণ করেন। কিন্তু উমর রাতের অন্ধকারে আমীরের তাঁবু হতে পলায়ন করে নিজের আস্তানায় চলে আসেন এবং দলবল নিয়ে ১০০ খচ্চর হস্তগত করেন। মুন্‌যির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং বোবাস্ট্র দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু ভাই আবদুল্লাহ্‌র প্ররোচনায় চিকিৎসকের বিষপ্রয়োগে তিনি নিহত হন। ফলে উমরকে পরাস্ত করা এবারও সম্ভব হয়নি।

আবদুল্লাহ্‌র সাথে সংঘর্ষ : মুন্‌যিরের পর আবদুল্লাহ্‌র শাসনামলে (৮৮৮-৯১২) রাজ্যব্যাপী গোলযোগের সুযোগে উমর বোবাস্ট্রো দুর্গ সুরক্ষিত করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রভাব বৃদ্ধি করতে থাকেন। তিনি উমরকে পরাস্ত করতে না পেরে তাঁর সাথে একটি চুক্তি করেন। সেখানে উল্লেখ থাকে যে উমর তাঁর অধিকৃত এলাকায় আমীরের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করবেন। কিন্তু উমরের অনুচররা এই নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ শাসনে বিশ্বাসী ছিলনা। কারণ তারা লুণ্ঠনবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহন করেছিল এবং এজন্যই উমরের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল। এ সময় আমীর অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসণে বিশেষ করে আরব নেতাদের দমনে উমরের সাহায্য কামনা করেন। ফলে উমর রাজকীয় বাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজকে শক্তিশালী করা এবং রাজকীয় বাহিনীকে পঙ্গু করা। তিনি জায়েনের শাসনকর্তা ইবনে মুসতানার সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং কর্ডোভার খ্রিস্টানদের সমর্থনে গোয়াদালকুইভার নদীর দক্ষিণ দিকে প্রভাব বৃদ্ধি করেন। এমনকি তাদের সহযোগিতায় তিনি কর্ডোভাতেও প্রভাব বিস্তার শুরু করেন। আমীর তাঁর সেনাপতি আব্দুল মালিককে উমরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং ৮৯১ সালে পোলির যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেন। এরপর পোলি দখল করেন এবং বোবাস্ট্র অবরোধ করেন। কিন্তু রণক্লান্ত সৈন্যরা অধিককাল রণাঙ্গণে থাকতে সম্মত না হওয়ায় বোবাস্ট্র অধিকার সম্পন্ন না করেই রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে। এরপর উমর পোলি, এছিজা, আর্চিদোনা, এলভিরা, গ্রানাডা ও জায়েন দখল করেন। ক্রমাগত যুদ্ধ সাফল্যে উমর গর্বিত হয়ে ওঠেন এবং ৮৯৯ সালে ইসলাম-ধর্ম ত্যাগ করে স্যামুয়েল নাম নিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টান নরপতিদের সাহায্য ও সমর্থন লাভ করা। কিন্তু খ্রিস্টানগণ তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেনি। মুসলিমরাও তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে। ৯১০ সালে তিনি উত্তর আফ্রিকার ফাতিমিদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের সাথে সংঘর্ষ : উমর বিন হাফ্‌সুন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় এবং তাঁর পার্বত্য দুর্গ ধীরে ধীরে আব্দুর রহমানের হস্তগত হতে শুরু করে। ফাতিমিদের সাথে তাঁর মিত্রতা তৃতীয় আব্দুর রহমানের (৯১২-৬১) রাজ্যে হুমকির সৃষ্টি করেছিল। আমীর গোয়দালকুইভার নদীর তীরে টোলক্স দুর্গে তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন এবং ৯১৭ সালে উমর মৃত্যুবরণ করেন। উমরের পুত্রগণ বোবাস্ট্রতে আরও কিছুকাল আধিপত্য বজায় রাখলেও ৯২৮ সালে চূড়ান্তভাবে এর পতন হয়।

জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক : মুসলিমদের কাছে উমর বিন হাফ্‌সুন বিদ্রোহী হলেও খ্রিস্টানদের অনেকের কাছে তিনি জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক ছিলেন। খ্রিস্টান-ধর্ম গ্রহণ করার পর স্পেনবাসী খ্রিস্টানরা তাঁর নেতৃত্বে তাদের হারানো রাজ্য ও কর্তৃত্ব ফিরে পেতে চেয়েছিল। অনেক খ্রিস্টান জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর দলে যোগদান করে। এ দিক থেকে বিচার করে অনেকে তাঁকে স্পেনের খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক বলতে চেয়েছেন। তবে সার্বিক বিচারে তাঁকে জাতীয়তাবাদী বলা যায়না। উমর বিন হাফ্‌সুন ধর্মান্তরিত হবার কারণে তাঁর মধ্যে সঠিক কোন জাতীয়তাবোধ ছিল না। প্রথমত তিনি ছিলেন মুসলিম। তাই মুসলিম হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জাতীয়তাবাদী হবার প্রশ্ন অবান্তর। পরে তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও তা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। খ্রিস্টানরাও তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি। ফলে কোন সম্প্রদায়েরই আন্তরিক বিশ্বাস ও সমর্থন তিনি লাভ করতে পারেননি। এছাড়া তাঁর প্রভাবাধীন এলাকা

কখনই রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। তাই তিনি কারও কারও নিকট জাতীয়তাবাদী হলেও অনেকের নিকট একজন বিদ্রোহী বা দুর্বৃত্ত হিসেবে পরিচিত।

উমর বিন হাফ্সুন প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে বিদ্রোহ, লুটতরাজ, লুণ্ঠন, দুর্বৃত্তপনার মাধ্যমে বোবাস্ট্রতে রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি। আমীর তথা সেনাবাহিনীর দুর্বলতা, ভৌগোলিক প্রতিকূলতা এবং উমর বিন হাফ্সুনের ধূর্তামি তাঁর দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকার কারণ। তবে উমর বিন হাফ্সুন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলেও তাঁর বিদ্রোহ সে সময়ে মুসলিম স্পেনের সংহতি অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

সারসংক্ষেপঃ

স্পেনের ইতিহাসে উমর বিন হাফ্সুন একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তিনি দক্ষিণ স্পেনের বোবাস্ট্রতে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে মুহম্মদ, মুন্যির, আবদুল্লাহ্ ও তৃতীয় আব্দুর রহমান- এ চারজন আমীরের বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তিনি ইসলাম-ধর্ম ত্যাগ করে স্যামুয়েল নাম নিয়ে খ্রিস্টান-ধর্ম গ্রহণ করেন। তৃতীয় আব্দুর রহমান গোয়দালকুইভার নদীর তীরে টোলক্স দুর্গে তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উমর বিন হাফ্সুন কোন্ দুর্গকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন?
(ক) আর্চিদোনা দুর্গ (খ) টোলক্স দুর্গ
(গ) আল-হামা দুর্গ (ঘ) বোবাস্ট্র দুর্গ

২. উমর বিন হাফ্সুন ইসলাম-ধর্ম ত্যাগ করে কী নাম নিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন?
(ক) হাফস (খ) আইসুন
(গ) স্যামুয়েল (ঘ) আলফান্সো

৩. তৃতীয় আব্দুর রহমান কোন্ দুর্গে উমর বিন হাফ্সুনকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন?
(ক) আর্চিদোনা দুর্গে (খ) টোলক্স দুর্গে
(গ) হামা দুর্গে (ঘ) বোবাস্ট্র দুর্গে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

লিটনের বাবা একটি প্রাচীন রূপকথার গল্প বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, এক রাজবংশের শাসনকালে হাবুস নামক একজন বিতর্কিত ব্যক্তির নাটকীয় উত্থান ঘটে। তিনি ঐ রাজবংশের চারজন শাসকের বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যান। অনেকের কাছে তিনি বিদ্রোহী হিসেবে পরিচিত হলেও অনেকের নিকট আবার তিনি জাতীয়তাবাদী হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন।

ক. উমর বিন হাফ্সুন কোন্ দুর্গে আধিপত্য বিস্তার করেন? ১
খ. উমর বিন হাফ্সুনের উত্থানের বিবরণ দিন। ২
গ. উদ্দীপকে হাবুস স্পেনের যে ব্যক্তিকে নির্দেশ করে বোবাস্ট্রতে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ দিন। ৩
গ. উমর বিন হাফ্সুন কি জাতীয়তাবাদী ছিলেন? ৪

পাঠ-৯.৯ তৃতীয় আব্দুর রহমান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তৃতীয় আব্দুর রহমানের পরিচয়, তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতি ও বিদ্রোহ দমনের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- তাঁর বৈদেশিক নীতি এবং খ্রিস্টান ও ফাতিমিদের সাথে সংঘর্ষের বিবরণ দিতে পারবেন।
- জনকল্যাণে ও রাষ্ট্রের উন্নতিতে তাঁর বিভিন্ন অবদান উল্লেখ করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	**স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের ত্রাণকর্তা, বোবাস্ট্রের পতন, খলিফা ও আমীর-উল-মুমিনীন উপাধি গ্রহণ, কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যাল ও আল-যাহ্‌রা প্রাসাদ**

পিতামহ আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর আব্দুর রহমান আল-নাসির ৯১২ সালে ২২ বছর বয়সে স্পেনের সিংহাসন লাভ করেন। স্পেনের ইতিহাসে তিনি তৃতীয় আব্দুর রহমান নামে পরিচিত। তিনি যখন সিংহাসন লাভ করেন তখন স্পেনে যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলহ ও বিশৃংখলার কারণে কোন নিরাপত্তা ছিলনা। তিনি প্রায় ৪৯ বছর শাসনকালে (৯১২-৬১) স্বীয় প্রতিভাবলে সর্বপ্রকার বিশৃংখলা দূর করে স্পেনকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যান। এজন্য তাঁকে স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের ত্রাণকর্তা (Saviour of Spain) বলা হয়। Reinhert Dozy (গ্রন্থ: *The Spanish Islam*) বলেন, æOf all the Umayyad princes who reigned in Spain Abd al-Rahman III was undoubtedly the greatest."

তৃতীয় আব্দুর রহমানের নীতি : সিংহাসন লাভ করার পর তিনি কতগুলো নতুন নীতি গ্রহণ করেন। যেমন: বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, আরব আভিজাত্য খর্ব করার জন্য বিদেশীদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, বিদ্রোহী নেতা ও সর্দারদের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা এবং উত্তর ও দক্ষিণের সীমান্ত সংরক্ষণ।

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন : তিনি হাজ্জাজ বংশের মুহম্মদ ও তার ভাতিজা আহমদ বিন মাসলামাহকে পরাজিত করে সেভিল ও কারমোনায় কর্ডোভার শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গোয়াদালকুইভার নদীর তীরে টোলক্স দুর্গে বোবাস্ট্রের অধিপতি উমর বিন হাফ্‌সুনকে পরাজিত করে দুর্গটি দখল করেন। ৯১৭ সালে উমর বিন হাফ্‌সুনের মৃত্যু হয়। এরপর কিছুকাল বোবাস্ট্র তাঁর পুত্রদের অধীনে থাকলেও ৯২৮ সালে পুরোপুরিভাবে এর পতন ঘটে। তিনি তুদমির, মেরিদা, বেজা, জায়েন ও এল্‌ভিরার বিশৃংখলা দূর করে শান্তি স্থাপন করেন। টলেডোর বনু কাসী, বার্বার, নও-মুসলিম ও স্পেনীয়রা তাঁর অধীনতা অস্বীকার করলে টলেডো অবরোধ করা হয় এবং দীর্ঘদিন অবরোধের পর টলেডো তাঁর অধীনে আসে।

খ্রিস্টানদের সাথে সংঘর্ষ : ৯১৪ সালে লিওনের রাজা দ্বিতীয় ওরডোনা মেরিদা আক্রমণ করলে আব্দুর রহমান তাঁকে পরাস্ত করেন। পরাজিত হয়ে তিনি নাভারের রাজা সাঞ্চোর সাথে মিলিত হয়ে মুসলিম রাজ্যে আক্রমণ চালালে ৯২০ সালে তিনি তাঁদেরকেও পরাজিত করেন। ৯২৪ সালে সাঞ্চোর রাজধানী পাম্পলোনা তাঁর অধিকারে আসে। ৯২৫ সালে ওরডোনার মৃত্যুর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রামিরো লিওনের সিংহাসন লাভ করেন। সারাগোসার মুসলিম গভর্নরের সাথে তিনি ষড়যন্ত্র করে আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে তিনি বিদ্রোহী গভর্নরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। ৯৫০ সালে দ্বিতীয় রামিরোর পুত্র তৃতীয় ওরডোনা মুসলিমদের দ্বারা অক্রান্ত হয়ে তৃতীয় আব্দুর রহমানের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। ৯৬০ সালে সাঞ্চো খলিফার সাথে মিত্রতা স্থাপন করে লিওনের রাজা চতুর্থ ওরডোনাকে পরাস্ত করেন এবং খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে লিওন ও নাভারেতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে লিওন ও নাভারে তাঁর করদ-রাজ্যে পরিণত হয়।

ফাতিমিদের সাথে সংঘর্ষ : ফাতিমি খলিফা উবায়দুল্লাহ্‌ আল-মাহ্‌দী উমর বিন হাফ্‌সুনের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে স্পেন আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। উবায়দুল্লাহ্‌ আল-মাহ্‌দী স্পেনে ফাতিমি মতবাদ প্রচারের লক্ষ্যে একদল দক্ষ গুপ্তচর ও প্রচারক প্রেরণ করেন। তৃতীয় আব্দুর রহমান এ অবস্থা মোকাবিলায় ৯৩১ সালে সিউটা দখল করেন এবং উত্তর আফ্রিকার

নেতৃস্থানীয় বার্বার জানাতা গোত্র, শিয়া ইদ্রিসীয় এবং ইবাদিয়া খারিজি নেতাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে ফাতিমিদের প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। ৯৫২ সালে ফাতিমি খলিফা আল-মুইয স্পেনের উমাইয়া মিত্রদের উত্তর আফ্রিকা হতে বিতাড়িত করেন। ৯৫৫ সালে তৃতীয় আব্দুর রহমানের আলেকজান্দ্রিয়াগামী একটি বাণিজ্য জাহাজ আল-মুইযের মাহ্দীয়াগামী একটি সিসিলিয় জাহাজকে বিধ্বস্ত করে। আল-মুইযও সিসিলির শাসনকর্তা হাসান বিন আলীর মাধ্যমে স্পেনের উপকূল আক্রমণ করেন, আলমেরিয়া বিধ্বস্ত করেন এবং অনেক স্পেনীয় জাহাজ দখল করেন । প্রত্যুত্তরে খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানও গালিব ও আহম্মদ বিন ইয়ালার মাধ্যমে আফ্রিকার উপকূলে দুবার অভিযান চালান।

বৈদেশিক নীতি : তিনি একজন অমায়িক, ন্যায়পরায়ন, প্রজাহিতৈষী, নম্র ও উদার শাসক ছিলেন বলে তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কনস্টানটিনোপোল, জার্মান, ইতালি ও ফ্রান্সের নরপতিগণ তাঁর দরবারে দূত প্রেরণ করে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন।

সেনাবাহিনী পুনর্গঠন : তিনি বার্বার, স্লাভ, আরব ও খ্রিস্টানদের সমন্বয়ে সেনাবাহিনী গঠন করেন। সেনাবাহিনীতে প্রায় দেড় লক্ষ নিয়মিত ও অসংখ্য অনিয়মিত সৈন্য ছিল। তাঁর সেনাবাহিনী তৎকালীন জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল।

'খলিফা' উপাধি গ্রহণ : তাঁর আগে স্পেনের শাসকগণ আমীর ও সুলতান উপাধি নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু ৯২৯ সালে তিনি 'খলিফা' ও 'আমীর-উল-মুমিনীন' উপাধি গ্রহণ করেন। একদিকে বাগদাদের ক্ষয়িষ্ণু সুন্নি আব্বাসীয় খিলাফত এবং অন্যদিকে মিসরের প্রতিদ্বন্দ্বি শিয়া ফাতিমি খিলাফতের প্রাধান্য তাঁর 'খলিফা' উপাধি গ্রহণের মূল কারণ। তাছাড়া শাসক হিসেবেও তিনি সমসাময়িক মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং খলিফা হবার সব গুণাবলী তাঁর মধ্যে ছিল।

কৃষি : তাঁর সময় কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর দাম কম ছিল। সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি ছিলনা। ইবনে হাওকল বলেন যে, ফলমূল এত সস্তায় বিক্রয় হত যে মনে হত কোন মূল্যই নেই। উন্নতমানের শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষি ও উদ্যানবিদ্যায় নতুন নতুন কৌশল আনয়ন করা হয়। ফলে তাঁর সময় উন্নত চাষাবাদ ও উচ্চ ফলনমূলক বাগান গড়ে ওঠে। অনুর্বর, অসমতল ও পাহাড়ী ভূমিকে চাষের আওতায় আনা হয়। কৃষি কাজের জন্য পাথরের মধ্য দিয়ে খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। খাদ্য সামগ্রীর প্রাচুর্য ও স্বল্প মূল্যের কারণে মুসলিম স্পেনের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৩ কোটিতে যেখানে শুধু কর্ডোভার লোকসংখ্যাই ছিল ১০ লক্ষের বেশি।

শিল্প : কৃষির উন্নতির ফলে স্পেনে শিল্পেরও বিকাশ ঘটে। কারণ শিল্পের জন্য প্রয়োজন হয় কাঁচামালের যা আসে কৃষি থেকে। স্পেনের বিভিন্ন শহরে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে। কর্ডোভা, সেভিল ও অন্যান্য শহরে সিল্ক, সুতা, পশম, চামড়া ও ধাতব এর অসংখ্য শিল্প গড়ে ওঠে। একটি মাত্র প্রদেশেই ৩ হাজার গ্রাম গুটি পোকার লালন-পালনের ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। শুধু কর্ডোভাতেই ১৩ হাজার তাঁতী ছিল। তরবারী, বর্ম, প্রদীপ ও লোহার দরজা তৈরির ক্ষেত্রে স্পেনের ধাতব শিল্পীদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। ইউরোপের বাজারে কর্ডোভার চামড়াজাত পণ্যও সমান ভাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। উন্নতমানের কার্পেট ও নক্শীকরা কাপড়ের সমাদর ছিল পৃথিবীর সর্বত্র।

ব্যবসা-বাণিজ্য : স্পেনের ব্যবসা-বাণিজ্য দামেস্ক ও বাগদাদ থেকেও এক ধাপ এগিয়ে ছিল। দামেস্ক ও বাগদাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশিরভাগ উট-বাহিত ছিল। কিন্তু কর্ডোভার ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশিরভাগ পরিচালিত হত বাণিজ্যিক জাহাজের মাধ্যমে। ১ হাজারেরও বেশি বাণিজ্য জাহাজের মাধ্যমে বাণিজ্য পরিচালিত হত। বাণিজ্য পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন জায়গায় এজেন্সি গড়ে তোলা হত। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে বার্ষিক রাজস্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি : তৃতীয় আব্দুর রহমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এ সময় উন্নয়ন সাধিত হয়। তাঁর সময় দর্শনে ইবনে মাসার্‌রাহ, ইতিহাসে ইবনে আল-আহ্মার ও ইবনে আল-কুতিয়া, জোতির্বিদ্যায় আহমদ বিন নসর ও মাসলামাহ বিন আল-কাসিম, চিকিৎসাবিদ্যায় আরিব বিন সাইদ ও ইয়াহিয়া বিন ইসহাক খ্যাতি লাভ করেন। তিনি কর্ডোভা মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করেন।

স্থাপত্য শিল্প : তাঁর সময় কর্ডোভায় অসংখ্য মসজিদ, প্রাসাদ, গৃহ ও হাম্মামখানা ছিল। এ সময় বিশ্বে কর্ডোভার স্থান ছিল বাগদাদ ও কনস্টানটিনোপোলের পরই। আল-যাহ্‌রা প্রসাদ ছিল তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কর্ম। তাঁর উপপত্নী আল-যাহ্‌রার নামে এর নামকরণ করা হয়। এছাড়া তিনি কর্ডোভা মসজিদের সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বর্ধন করেন।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনকাল স্পেনের ইতিহাসে অতি গৌরবের। তাঁকে ভারতের আকবর, আরবের খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) এবং বাগদাদের খলিফা হারুন-অর-রশিদের সাথে তুলনা করা হয়। তিনি শুধু স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন না; বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যেও অন্যতম ছিলেন।

সারসংক্ষেপঃ

তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনকাল স্পেনের ইতিহাসে অতি গৌরবের। তাঁকে স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের ত্রাণকর্তা বলা হয়। তিনি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মাধ্যমে স্পেনে মুসলিম শাসন সুসংহত করেন।। তাঁর সেনাবাহিনী তৎকালীন জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তিনি 'খলিফা' ও 'আমীর-উল-মুমিনীন' উপাধি গ্রহণ করেন। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে স্পেন ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে তাঁর সময়ে। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও স্থাপত্য শিল্পে এসময় কর্ডোভার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। তিনি কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আল-যাহ্‌রা প্রাসাদ তাঁর একটি অসামান্য নির্মাণ-কর্ম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কাকে স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের ত্রাণকর্তা বলা?
   (ক) প্রথম আব্দুর রহমান-কে (খ) দ্বিতীয় আব্দুর রহমান-কে
   (গ) তৃতীয় আব্দুর রহমান-কে (ঘ) দ্বিতীয় আল-হাকাম-কে

২. কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন কে?
   (ক) প্রথম আব্দুর রহমান (খ) দ্বিতীয় আব্দুর রহমান
   (গ) তৃতীয় আব্দুর রহমান (ঘ) দ্বিতীয় আল-হাকাম

৩. আল-যাহ্‌রা প্রসাদ কে নির্মাণ করেন?
   (ক) প্রথম হিশাম (খ) দ্বিতীয় আব্দুর রহমান
   (গ) তৃতীয় আব্দুর রহমান (ঘ) দ্বিতীয় আল-হাকাম

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

সম্রাট আকবরের শাসনকাল ভারতের ইতিহাসে অতি গৌরবের। তিনি শুধু মুঘল শাসকদের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন না; বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যেও অন্যতম ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দিক দিয়ে রাষ্ট্রের বৈষয়িক উন্নতি সাধন করেন।

ক. কাকে স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের ত্রাণকর্তা বলা হয়? ১
খ. তৃতীয় আব্দুর রহমানের সাথে খ্রিস্টানদের সংঘর্ষ আলোচনা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্রাট আকবরের মত স্পেনের কোন শাসক উমাইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় স্পেনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বিবরণ দিন। ৪

পাঠ-৯.১০ দ্বিতীয় হিশাম ও হাজিব আল-মনসুর



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দ্বিতীয় হিশাম ও হাজীব আল-মনসুরের পরিচয় সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- হাজীব আল-মনসুরের প্রাথমিক জীবন ও 'হাজিব' পদ লাভ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- হাজীব আল-মনসুরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন ।

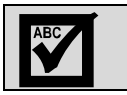	**মুখ্য শব্দ**	**সুলতানা সুবাহ্, আল-মুশাফি, আবু আমির মুহম্মদ ও মদিনাত আল-জাহিরা**



তৃতীয় আব্দুর রহমানের পর স্পেনের শাসন ক্ষমতায় বসেন খলিফা দ্বিতীয় হাকাম (৯৬১-৭৬)। দ্বিতীয় হাকামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হিশাম (৯৭৬-১০০৯) ১২ বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। রাজমাতা সুলতানা সুবাহ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী আল-মুশাফি ও রাষ্ট্রাধ্যক্ষ আবু আমির মুহম্মদের উপর। আবু আমির মুহম্মদ পরবর্তীতে হাজিব বা প্রধানমন্ত্রী হয়ে 'আল-মনসুর' উপাধি ধারণ করেন এবং স্পেনের ইতিহাসে তিনি 'হাজীব আল-মনসুর' নামেই অধিক পরিচিত। হিশাম খলিফা হলেও প্রকৃত ক্ষমতা আল-মনসুরের হাতেই চলে গিয়েছিল। তিনি রাজবংশে জন্ম গ্রহণ না করেও এবং রাজা বা শাসক না হয়েও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

আল-মনসুরের পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন : আল-মনসুর ৯৪২ সালে কর্ডোভায় অতি সাধারণ এক আরব পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে লেখাপড়া করেন। এরপর বিচারপতি মুহম্মদ আল-সলিমের অধীনে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি তাঁর সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে অতি শীঘ্রই সুলতানা সুবাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৯৬৭ সালে তিনি তাঁকে বালক খলিফা হিশামের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। এরপর তিনি তাঁর দক্ষতা ও মেধার মাধ্যমে বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেন।

'হাজিব' পদ লাভ : সে সময়ে খলিফা হিশামের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মুশাফি। কিন্তু তাঁর বদমেজাজ ও রুক্ষ আচরণের কারণে আমত্যবর্গ ক্ষুব্ধ হয়। অন্যদিকে আবু আমীর মুহম্মদ তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে জনগণের আস্থা, ভালবাসা ও খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সেনাপতি গালিবের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং রাজকীয় তত্ত্বাবধানে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এতে তাঁর প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায় এবং সুলতানা সুবাহর অনুমোদন নিয়ে আল-মুশাফিকে অপসারণ করে গালিবকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেন। ৯৮১ সালে গালিব ও আবু আমির মুহম্মদ একত্রে লিওনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে গালিব নিহত হন। এরপর আবু আমির রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে 'আল-মনসুর' (বিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করে 'হাজিব' বা প্রধানমন্ত্রী পদ লাভ করেন। হিশামের অভিভাবক হিসেবে তিনি রাষ্ট্রীয় সকল কার্য সম্পাদন করেন। খলিফার নামের সঙ্গে মুদ্রা, খুতবা ও রাজকীয় ফরমানে নিজের নাম সংযুক্ত করেন। এভাবে তিনি হাজিব হলেও স্পেনের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

আলিমদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা : সুলতানা সুবাহ্র সাথে কথিত সম্পর্ক নিয়ে তিনি সমালোচনার শিকার হন। ফকীহ্গণ তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলে আখ্যা দেয় এবং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করে। ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে গেলে ষড়যন্ত্রকারীদের ফাঁসি ও নির্বাসন দেয়া হয়। পরে তিনি বিচারক ও আলিমদের খুশী রাখার জন্য আল-হাকামের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক দর্শনের গ্রন্থসমূহ জ্বালিয়ে দেন। এছাড়া তিনি তাঁদের সমর্থন লাভের জন্য স্বহস্তে কুরআনের অনুলিপি করেন।

সেনা সংস্কার : সে সময় সেনাবাহিনীতে বহু জাতির লোকদের সংমিশ্রণ থাকায় সেনাবাহিনীতে গোত্র-কলহ দেখা দেয়। তিনি গোত্র-কলহপ্রিয় সেনাদের অপসারণ করেন। আফ্রিকান, সিউটার বার্বার, সুদানী ও উত্তর অঞ্চলের খ্রিস্টানদের

সেনাবাহিনীতে নিয়োগদানের মাধ্যমে সেনাবাহিনী পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ করেন। সেনাদের পর্যাপ্ত বেতন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন। এভাবে তিনি সেনাবাহিনীতে শৃংখলা আনয়ন করেন।

সমরাভিযান : ইবনে খালদুনের মতে, তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ৫২টি অভিযান প্রেরণ করেন এবং এর একটিতেও পরাজিত হননি। তিনি লিওনের রাজা তৃতীয় রামিরো ও নাভারের রাজা সাঞ্চোকে পরাজিত করে লিওন ও নাভারেকে করদ রাজ্যে পরিণত করেন। পরে তৃতীয় রামিরোর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বারমুডো বিদ্রোহ করলে তাঁকেও পরাজিত করা হয়। তিনি গ্যালিসিয়ানদেরকেও পরাজিত করেন। কাউন্ট বোরেলকে বিতাড়িত করে বার্সিলোনা জয় করেন। তিনি উত্তর আফ্রিকাতেও কয়েকটি স্বার্থক অভিযান চালান। এসব অভিযানের ফলে সাম্রাজ্যের সীমানা পিরেনীজের উত্তর অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

উত্তর আফ্রিকায় অভিযান : ৯৮৫ সালে আল-মনসুরের সেনাপতি ইদ্রিসিয় শাসক হাসান ইবনে গান্নুনের রাজ্য অবরোধ করেন এবং তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। তিনি কর্ডেভায় প্রেরিত হন এবং সেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়। ৯৯৭ সালে জিরি বিন আতিয়া আল-মাগরিবি কর্ডোভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাঁকে হত্যা করা হয় এবং এর মধ্য দিয়ে সমগ্র মরক্কো ও পশ্চিম আফ্রিকায় আল-মনসুরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জিরি বিন আতিয়ার উত্তরাধিকারী আল-মুইযও কর্ডোভার কঠোর নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। আল-মনসুর খ্রিস্টান স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জানাতা ও সিন্হাজাহ গোত্রের নেতাদের স্পেনে নিয়ে আসেন। এছাড়া তাদের মধ্য থেকে অসংখ্য সৈন্য তাঁর বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। এক সময়কার ফাতিমীয় অনুগত সেনাবাহিনী উমাইয়া সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার কারণে তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তারা আল-মনসুরের পরবর্তী সময়ে স্পেনের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকে।

কৃতিত্ব : তৃতীয় আব্দুর রহমানের পর তিনিই ছিলেন দশম শতাব্দীর ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক ও রাজনীতিবিদ। সে সময় উত্তর অঞ্চলের খ্রিস্টানগণ তাঁকে ছাড়া অন্য কোন নরপতিকে এত বেশি ভয় করত না। তিনি কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতের উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি বংশগত আভিজাত্য ও কৌলিন্য প্রথা রহিত করেন। সামন্ত প্রথা ও জায়গীর প্রথা মূলোৎপাটন করেন। রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ ও সংস্কার সাধন করেন। বহু হাসপাতাল, সেনানিবাস, অট্টালিকা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। কর্ডোভা মসজিদের পুন:সংস্কার সাধন করেন। তিনি 'মদিনাত আল-যাহিরা' নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করেন। ডোজি বলেন যে, আল-মনসুর মুসলিম স্পেনে যে শক্তি ও সমৃদ্ধি আনেন মহামতি তৃতীয় আব্দুর রহমানের পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি। তাঁকে বলা হয় দশম শতাব্দীর বিসমার্ক। বিসমার্ক (১৮৭০-৯০) যেভাবে যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে জার্মানীকে একত্রিত করেন (১৮৭১) হাজিব আল-মনসুরও তেমনি যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে মুসলিম স্পেনের সংহতি বজায় রাখেন। ১০০২ সালে তাঁর মৃত্যু হয় এবং মদিনা-তুস-সলিমে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য শাসক বা প্রশাসকের অভাবে উমাইয়াদের পতন রোধ করা যায়নি।

সারসংক্ষেপ:

খলিফা দ্বিতীয় হিশাম (৯৭৬-১০০৯) ১২ বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। তার শাসনকালে প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় আল-মনসুরের হাতে। আল-মনসুর ৯৪২ সালে কর্ডোভায় অতি সাধারণ এক আরব পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তিনি কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে লেখাপড়া করেন। আল-মনসুর তাঁর দক্ষতা ও মেধার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজকীয় পদ অলংকৃত করার পর সবশেষে হাজিব পদে আসীন হন। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ৫২টি অভিযান প্রেরণ করে প্রত্যেকটিতেই তিনি বিজয়ী হন। তিনি মদিনাত আল-যাহিরা নির্মাণ করেন। তাঁকে বলা হয় দশম শতাব্দীর বিসমার্ক। ১০০২ সালে তাঁর মৃত্যু হয় এবং মদিনা-তুস-সলিমে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১০

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. 'হাজিব' শব্দের মানে কী?
   (ক) নগরাধ্যক্ষ (খ) প্রধানমন্ত্রী
   (গ) বিচারপতি (ঘ) গৃহাধ্যক্ষ

২. হাজিব আল-মনসুর কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ বিষয়ে লেখাপড়া করেন?
   (ক) সাহিত্য (খ) দর্শন
   (গ) ইতিহাস (ঘ) আইন

৩. হাজিব আল-মনসুর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে কতটি অভিযান পরিচালনা করেন?
   (ক) ২৫টি (খ) ৩৫টি
   (গ) ৪২টি (ঘ) ৫২টি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

শিক্ষক স্পেনের ইতিহাস আলোচনা করার সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, স্পেনের এক ব্যক্তি অতি সাধারণ অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে হাজিব পদে উন্নীত হন এবং নামে মাত্র খলিফার একজন সভাসদ হলেও প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ছিল তাঁরই হাতে। অর্থাৎ রাজবংশে জন্মগ্রহণ না করেও এবং শাসক না হয়েও ঐ ব্যক্তি শাসকের মতই শাসন করেছেন। তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণে কার্যত তিনি একজন শাসকেরই মর্যাদা লাভ করেন।

ক. কাকে 'দশম শতকের বিসমার্ক' বলা হয়? ১
খ. হাজিব আল-মনসুরের পরিচয় দিন। ২
গ. উদ্দীপকে স্পেনের যে ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তিনি কীভাবে হাজিব পদে উন্নীত হন? ৩
ঘ. সংক্ষেপে হাজিব আল-মনসুরের কৃতিত্ব আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৯.১১ স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্পেনে মুসলিম শাসন অবসানের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- স্পেনে মুসলিম শাসন অবসানের ঘটনাপ্রবাহ উল্লেখ করতে পারবেন ও
- মুসলিম শাসন অবসানের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	**মুখ্য শব্দ**	**মুলুক আত্-তাওয়াইফ, মুরাবিতুন, মুয়াহিদুন, নসর বংশ, ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলা, আল-হামারা, বোয়াবদিল, আল-জাগাল, গ্রানাডার পতন ও মরিস্কো**

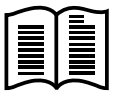

১৪৯২ সালে স্পেন হতে মুসলিম শাসনের অবসান হয়। দীর্ঘ প্রায় ৮০০ বছরের মুসলিম শাসন অনেকটা সময় ধরে সুদৃঢ় থাকলেও বিভিন্ন সময় এই অবস্থা ভেঙ্গে পড়তে দেখা যায়। অবশেষে ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলার হাতে গ্রানাডার পতনের মধ্য দিয়ে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে

স্পেনে মুসলিম শাসন অবসানের কারণ

অনৈক্য ও গোত্রীয় কোন্দল : স্পেনে মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই অনৈক্যের বীজ উপস্থিত ছিল। সেখানে আরব, সিরিয়ান, বার্বার, নও-মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদি জাতি ও ধর্মের লোকেরা বসবাস করত। আরবরা আবার হিমারীয়, মুদারীয়, কালবী, কায়েসী ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত ছিল। বার্বাররা সানহাজাহ, জানাতা ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত ছিল। এসব গোত্র ও উপ-গোত্রের মধ্যে কোন্দল স্পেনের মাটিতে সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়। গোত্রীয় কোন্দলের ফলে ১০৩১ সালে উমাইয়া শাসনের পতন ঘটে এবং এরপর স্পেন আরব, বার্বার, স্লাভ, নও-মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে ভাগ হয়ে যায় যেগুলোকে বলা হয় 'মুলুক আত্-তাওয়াইফ'। এরপর উত্তর আফ্রিকার মরক্কো হতে মুরাবিতুন (১০৯১-১১৪৬) ও মুয়াহিদুন (১১৪৬-১২৪৮) রাজবংশ স্পেন শাসন করলেও তারা সেখানে কার্যকরীভাবে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। গ্রানাডার নসর বংশ (১২৩২-১৪৯২) মুসলিম শাসনের পতনলগ্নে মুসলিম শাসন ও সভ্যতার নিস্তেজ দণ্ডটিকে ধারণ করলেও পঞ্চদশ শতকে এসে এর সর্বশেষ উজ্জ্বলতাটুকুও নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

দুর্বল সরকার : দুর্বল শাসকদের সময় স্পেনের প্রশাসন যন্ত্রের অবনতি ঘটে। সেনাবাহিনীতে বহুজাতির সংমিশ্রণের ফলে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। আত্মকেন্দ্রিক ও দেশপ্রেম বিবর্জিত অভিজাত শ্রেণী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃংখলার জন্য দায়ী। তাছাড়া শাসকদের আয়েশী জীবন-যাপন প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তোলে। সুষ্ঠু উত্তরাধিকারী নীতির অভাবে গড়ে ওঠা প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং সিংহাসনের দাবীদারদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা স্পেনীয় মুসলিম শাসনকে দুর্বল করে। এছাড়া শাসন ব্যবস্থা জনবিচ্ছিন্ন হবার কারণে সরকারের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহে জনগণ কোন প্রতিবাদ জানাত না। ফলে বিদ্রোহী ও খ্রিস্টান অনুপ্রবেশকারীরা এই সুযোগ গ্রহণ করে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা : ক্রমাগত যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিদ্রোহ দমন, রাজস্ব ঘাটতি ইত্যাদির ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং রাজকোষ প্রায় শূণ্য হয়ে যায়। সরকারী কর বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকরা তাদের কৃষিকাজ পরিত্যাগ করে অন্য জীবিকা গ্রহণ করে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ দস্যুতে পরিণত হয়। ফলে কৃষি ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থ সংকটের কারণে দুর্গ মেরামত, সেনাবাহিনীর বেতন প্রদান সম্ভব হয়না। ফলে সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সামরিক অভিযান ব্যাহত হয়। আমদানী-রফতানী শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। মুসলিম শাসনের শেষ দিকে খ্রিস্টান রাজাদের কর দিতে গিয়ে গরীব প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করতে হয়। ফলে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

ভৌগোলিক প্রতিকূলতা ও মুসলিম নীতির দুর্বলতা : স্পেনের পার্বত্য অঞ্চল ও আঁকাবাঁকা পথ সেনাবাহিনী গমনাগমণের জন্য অত্যন্ত অনুপযোগী ছিল বলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করা ছিল দুরুহ। দুর্বল শাসকদের সময় দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াতও নিরাপদ ছিলনা। ভৌগোলিক প্রতিকূলতা নিরসনে মুসলিম শাসকদের উচিৎ ছিল সেনাবাহিনীকে সাহায্যের জন্য সর্বাবস্থায় রাজধানী-নির্ভর না করে বিভিন্ন কৌশলগত অবস্থানে সেনানিবাস নির্মাণ করে প্রয়োজনীয় রসদ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা। এতে ইউরোপে আর অগ্রসর হতে না পারলেও অধিকৃত এলাকা অধিকারে রাখা যেত।

খ্রিস্টানদের শত্রুতা : মুসলিমদের অদূরদর্শী নীতির ফলে খ্রিস্টানরা শহরের কেন্দ্রস্থলে বসবাসের সুযোগ লাভ করে। ফলে তারা মুসলিম সাম্রাজ্য ধ্বংসের লক্ষ্যে সুবিধাজনক সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানসহ উত্তরাঞ্চলের স্বজাতীয়দের সাথে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। খ্রিস্টানরা শুরু থেকেই মুসলিম শাসনকে সুনযরে দেখেনি। তারা মুসলিমদেরকে বিজাতীয় এবং অনুপ্রবেশকারী মনে করত। খ্রিস্টান ধর্মান্ধ আন্দোলন, খ্রিস্টান সমর্থনে উমর বিন হাফ্সুনের বিদ্রোহ, ১০৮৫ সালে খ্রিস্টানদের টলেডো পুনর্দখল ইত্যাদি ঘটনা থেকেও মুসলিমরা শিক্ষা নেয়নি।

মুসলিম শাসন অবসানের ঘটনাপ্রবাহ :

ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলার উত্থান : গ্রানাডার শাসক আবুল হাসান আলীর সময় (১৪৬৫-৮২) খ্রিস্টান জগতে নতুন শক্তিজোটের উত্থান ঘটে। আরাগনের ফার্ডিন্যান্ড ও ক্যাস্টিলের ইসাবেলা ১৪৬৯ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যুগপৎভাবে গ্রানাডার মুসলিম আধিপত্য নির্মূলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে। এটা ছিল মুসলিম শাসন অবসানের ঘন্টাধ্বনি। ১৪৮২ সালে তারা **আল-হামারা দুর্গ** দখল করে। আল-হামারার পতন গ্রানাডার পতনের পূর্ব সংকেত ছিল। কিন্তু এই সংকটকালেও রাজ পরিবারের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্বে এতটুকু ভাটা পড়েনি। উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে বোয়াবদিল (মুহম্মদ আবু আবদুল্লাহ্ বা একাদশ মুহম্মদ: ১৪৮২-৮৩/১৪৮৭-৯২) পিতা আবুল হাসানকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি আল-হামারা উদ্ধার করেন। কিন্তু লুছেনা আক্রমণ করতে গিয়ে খ্রিস্টানদের কাছে পরাজিত ও বন্দী হন। আবুল হাসান সিংহাসন উদ্ধার করেন এবং পরে ভাই আল-জাগালের (আবু আবদুল্লাহ্ মুহম্মদ বা দ্বাদশ মুহম্মদ: ১৪৮৩-৮৭) পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন।

গ্রানাডা দখল : খ্রিস্টানরা বন্দী বোয়াবদিলকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং চাচা আল-জাগালের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে খ্রিস্টানদের সহায়তায় গ্রানাডা দখল করেন। ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলা এরপর বোয়াবদিলকে গ্রানাডা হস্তান্তরের দাবী জানালে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। ফলে ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ১৪৯২ সালের ২ জানুয়ারী কতিপয় শর্তসাপেক্ষে গ্রানাডা খ্রিস্টানদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এতে মুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ভাষা ও পোশাক বহাল রাখার অধিকারসহ নানা বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। বোয়াবদিল ফেজে নির্বাসিত হন এবং সেখানে অতি দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করে ১৫৩৮ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অন্যদিকে বোয়াবদিলের প্রধান সেনাপতি মুসাও যুদ্ধে মারা যান। গ্রানাডার পতনের ফলে স্পেনে ৭৮০ বৎসরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

মুসলিম শাসন অবসানের ফলাফল : ১৪৯২ সালে গ্রানাডার পতনের ফলে মুসলিমদের ভাগ্যে নেমে আসে করুণ ও মর্মস্পর্শী বিপর্যয়। গ্রানাডার পতনের পর মুসলিমদের প্রথম 'মরিস্কো' বলে সম্বোধন করা হয়। এর আগে তাদের বলা হত 'মুর'। বিশেষ করে ইসলাম থেকে খ্রিস্টান-ধর্মে ধর্মান্তরিতদের 'মরিস্কো' নামে ডাকা হত। আর যেসব মুসলিম তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বজায় রেখে খ্রিস্টান-শাসিত অঞ্চলে বসবাস করত তাদের বলা হত 'মুদেজারেস'। গ্রানাডা দখলের পর ফার্ডিন্যান্ড চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে মুসলিম প্রজাদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান-ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে শুরু করে এবং ধর্মান্তরিত না হলে মৃত্যুদণ্ড, বহিস্কার, কারাদণ্ড ,সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি আরোপ করা হয়। তাদের মসজিদবদ্ধ করে পুড়িয়ে মারা হয়; তাদের ভাষা, পোশাক, রীতিনীতি নিষিদ্ধ হয়; গোসল নিষিদ্ধ করা হয়; শুক্রবার জুমুআর দিন তাদের গৃহসমূহ খুলে রাখতে বাধ্য করা হয়। কিছু অঞ্চলে বিশেষ করে ভ্যালেন্সিয়া ও আরাগন অঞ্চলে মুসলিম নিধন ও উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। এর কারণ কিছু সংখ্যক জমিদার ও শিল্পপতি তাদের স্বার্থে মুসলিমদের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছিলেন। কারণ মুসলিমরা একচেটিয়া তাদের জমি চাষ করত এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর হিসেবে কাজ করত। তাই তারা স্পেনের অর্থনীতি, শিল্প কারখানা ও কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষার জন্য কিছুকালব্যাপী রাজাদের ঘুষ প্রদান করে বা

অন্যভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে নানা আইন পাশ করে তাদেরকে চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদ করা হয়। ফলে মুসলিমরা আফ্রিকার উপ-কূলে বা আরও দূরবর্তী মুসলিম দেশগুলোতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। গ্রানাডার পতনের পর সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলিমকে নির্বাসিত বা হত্যা করা হয়। **১৬১৩** সালের মধ্যে এই চূড়ান্ত বহিষ্কার সম্পন্ন হয়েছিল এবং এর পর সেখানে প্রকাশ্যে কোন মুসলিমের অস্তিত্ব ছিলনা।

বস্তুত **১৪৯২** সালে মুসলিম শাসনের অবসান মুসলিমদের স্পেন হতে চূড়ান্তভাবে বিতাড়নের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল। শুধু স্পেনেই আরব সভ্যতা গড়ে উঠে টিকে থাকতে পারেনি। তবে এতদ্বসত্ত্বেও তাদের শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইউরোপ গ্রহণ করেছিল এবং এর যথার্থ প্রতিফলন ঘটে ইউরোপীয় রেনেঁসায় । P. K. Hitti (গ্রন্থ: *History of the Arabs*) বলেন,"মূরেরা নির্বাসিত হল; কিছু সময়ের জন্য ধার করা আলোর বাহার নিয়ে স্পেনের বুকে খ্রিস্টধর্মের চাঁদের উদয় হল; তারপর শুরু হল চন্দ্রগ্রহণ এবং তখন থেকেই স্পেন সেই অন্ধকারের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল।"

সারসংক্ষেপ:

১৪৯২ সালে স্পেন হতে মুসলিম শাসনের অবসান হয়। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মধ্যে অনৈক্য, গোত্রীয় কোন্দল, অর্থনৈতিক সংকট, ভৌগোলিক প্রতিকূলতা, খ্রিস্টানদের শত্রুতা ইত্যাদি নানা কারণে স্পেনে মুসলিম শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলার হাতে গ্রানাডার পতনের মধ্য দিয়ে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. 'মুলুক আত্-তাওয়াইফ' মানে কী?
   (ক) বৃহৎ রাজ্য (খ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য
   (গ) বার্বার রাজ্য (ঘ) আরব রাজ্য

২. গ্রানাডার পতন হয় কত সালে?
   (ক) **১০৩১** সালে (খ) **১২৩২** সালে
   (গ) **১৪৯২** সালে (ঘ) **১৬১৩** সালে

৩. কোন দম্পতির হাতে গ্রানাডার পতন হয়?
   (ক) ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলা (খ) ইউলোজিয়াস ও ফ্লোরা
   (গ) পারফেকটাস ও মেরি (ঘ) আলভেরো ও লিওক্রিটিয়া

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

মিলা তার বোনের নিকট জানত পারে যে, ভিজিগথদের শাসন অবসানের পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। **৭১১** সালে তারিক বিন যিয়াদের হাতে টলেডোর পতন ছিল স্পেনে ভিজিগথদের শাসন অবসানের উপলক্ষ মাত্র। এর প্রেক্ষাপট আগেই তৈরী হয়েছিল। এই পতনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

ক. গ্রানাডার পতন হয় কত সালে? ১
খ. স্পেনে মুসলিম শাসন অবসানের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করুন। ২
গ. উদ্দীপকে ভিজিগথদের শাসন অবসান সদৃশ স্পেনে মুসলিম শাসন অবসানের বিবরণ দিন। ৩
গ. স্পেনে মুসলিম শাসন অবসানের ফলাফল আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-৯.১২ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে স্পেনের মুসলিমদের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় স্পেনের মুসলিমদের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।
- সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র কর্ডোভা নগরীর গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন।
- ইউরোপের উপর মুসলিম স্পেনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব উল্লেখ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ইবনে হাজম, কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় হাকামের লাইব্রেরি, ইবনে খালদুন, আল-ইদ্রিসি, ইবনে রুশদ, কর্ডোভা মসজিদ, আল-হামারা ও কর্ডোভা**

বলা হয়ে থাকে যে, আরবরাই জ্ঞানের বর্তিকা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে বহন করে নিয়ে এসেছে। যখন সমগ্র ইউরোপ অন্ধকারাচ্ছন্ন তখন স্পেনীয় আরবরা বৌদ্ধিক জগতে ব্যাপক ও নজিরবিহীন অগ্রগতি সাধন করেছিল।

ভাষা ও সাহিত্য : ভাষার দিক দিয়ে আল-কালী ও আল-জুবায়দী, সাহিত্যে ইবনে আবদ-রাব্বিহ, আলী ইবনে হাজম, ইবনে খাতিব, ইবনে জায়দুন এবং মহিলা কবি উয়াল্লাদাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তাঁদের রচনাগুলো এখনও উন্নতমানের বলে গণ্য করা হয়। আলী ইবনে হাজমকে বলা হয় মুসলিম স্পেনের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মৌলিক চিন্তাবিদ। P. K. Hitti (গ্রন্থ: *History of the Arabs*) তাঁকে ইসলামের দু-তিনজন চিন্তাশীল মনিষী ও সুপ্রসিদ্ধ লেখকদের মধ্যে একজন বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে জায়দুনকে কেউ কেউ আন্দালুসের শ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য করে থাকেন।

শিক্ষা ও শিক্ষার উপকরণ : স্পেনীয় মুসলিমদের একটা বড় অংশ লিখতে ও পড়তে পারত। প্রধান প্রধান শহরগুলোর অনেকগুলোতেই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। সেগুলির মধ্যে কর্ডোভা, সেভিল, মালাগা ও গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বিদেশী ছাত্ররাও পড়াশুনা করত। স্পেনে অনেক গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল এবং সেগুলোতে বইয়ের ব্যাপক সংগ্রহ ছিল। দ্বিতীয় হাকামের লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ লক্ষ। স্পেনে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ও বিশাল বইয়ের সংগ্রহ গড়ে তোলা সম্ভব হয় স্থানীয়ভাবে কাগজ উৎপাদনের জন্য। কাগজ শিল্পের সাথে সম্পর্কিত 'ream' শব্দটি মূল আরবী শব্দ 'rizmah' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যা স্পেনীয় 'resma' ও ফরাসি 'rayme' হতে বিবর্তিত হয়ে ইংরেজিতে 'ream' হিসেবে স্থান পেয়েছে। এটা কাগজ শিল্পে মুসলিমদের মৌলিক অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পরে স্পেন থেকে কাগজ উৎপাদন কৌশল গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

ইতিহাসতত্ত্ব : মুসলিম স্পেনে অসংখ্য ঐতিহাসিক ইতিহাস-শাস্ত্রে অবদান রাখেন। স্পেনের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইবনে আল-কুতিয়া, ইবনে হাইয়ান, ইবনে আল-আব্বার, অবুল কাসিম সাইদ ইবনে আহম্মদ আল আন্দালুসী, ইবনে আল-খতিব, ইবনে খালদুন অন্যতম। ইবনে খালদুন ছিলেন পৃথিবীর সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-দার্শনিক।

ভূগোল : স্পেনের ভূগোলবিদ, ভূগোল গ্রন্থকার ও মানচিত্রবিদদের মধ্যে অধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন আল-বাক্‌রি ও আল-ইদ্রিসি। পর্যটকদের মধ্যে ইবনে যুবাইর, ইবনে আহম্মদ, আবু হামিদ ও মুহম্মদ আল-মাজিনি উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষবিদ্যা ও গণিত : স্পেনের জ্যোতির্বিদদের মধ্যে আল-মাজরিতি, আল-জারকালি, আল-বিতরুজি এবং ইবনে আফলাহ উল্লেখযোগ্য। আন্দালুসিয়ার বেশিরভাগ জ্যোতির্বিদ বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীতে মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ের প্রধান ঘটনার পেছনে নক্ষত্রের প্রভাব আছে। আল-মাজরিতিকে আল-হাসিব বা অংকশাস্ত্রবিদ খেতাব দেয়া হয়েছিল। পরিমিতিসহ অংকশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁকে একজন পথ-প্রদর্শক বলে গণ্য করা হত। অংকশাস্ত্রে বিভিন্ন আরবী শব্দের ব্যবহার তাদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উদ্ভিদ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান : মুসলিম দুনিয়ার সবচেয়ে খ্যাতনামা উদ্ভিদবিদ ও ওষুধবিদ্যা বিশারদ ছিলেন ইবনে আল-বায়তার। স্পেনের শ্রেষ্ঠ শল্যবিদ বা সার্জন ছিলেন দ্বিতীয় আল-হাকামের রাজদরবারের চিকিৎসক আল-যাহরাবী। তিনি ক্ষতস্থান পোড়ানো, মূত্রাশয়ের পাথর নষ্ট করা ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন ধারণা দিয়েছেন। স্পেনের মুয়াহিদ শাসক আব্দুল মুমিনের উযির ও রাজ চিকিৎসক আল-যুহর হাড়ের অনুভূতি ও খোস পাঁচড়ার বর্ণনা করেছেন। তাঁকে আল-রাযীর পরে ইসলামী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে আখ্যা দেয়া যায়।

দর্শন : স্পেনের আরব বুদ্ধিজিবীদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে। দার্শনিকদের মধ্যে বেন গ্যাবিরোল, ইবনে বাজ্জাহ, ইবনে রুশদ, ইবনে মায়মুন, ইবনে আরাবী, ইবনে তোফায়েল প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা গ্রিক দর্শনকে ধারণ ও লালন করে ইউরোপের কাছে পৌঁছে দেন।

শিল্পকলা ও স্থাপত্য : ক্ষুদ্র শিল্প, মৃৎ শিল্প, বস্ত্র শিল্প এবং স্থাপত্য শিল্পে স্পেনীয় আরবদের বিশেষ অবদান ছিল। বিশেষ করে স্থাপত্য শিল্পে স্পেনীয় মুসলিমদের অবদান ছিল অসামান্য। স্পেনীয় মুসলিমদের স্থাপত্যিক অবদানের মধ্যে কর্ডোভার মসজিদ, আল-যাহ্‌রা প্রাসাদ, সেভিলের আল-কাজার ও গ্রানাডার আল-হামারা স্মৃতিসৌধ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রকার বক্র খিলান নির্মাণে তাদের মৌলিক অবদান রয়েছে।

সংগীত : যিরীয়াবের মাধ্যমে স্পেনে মুসলিম সঙ্গীতকলার প্রচার শুরু হয়। এছাড়া ইবনে ফিরনাস, আল-মুতামিদ, ইবনে বাজ্জাহ, ইবনে সাবিন ও আল-মনসুর সঙ্গীতে অবদান রাখেন।

ধর্মতত্ত্ব : স্পেনীয় আরবরা কুরআন ও হাদীস পঠন, ব্যাখ্যা, অনুশীলন ও গবেষণায় শ্রম ও সময় নিয়োজিত করেছে। ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইবনে হাযম, ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া ও ঈসা বিন দিনার ।

অনুবাদ কেন্দ্র হিসেবে টলেডো : স্পেনের মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ইউরোপে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে টলোডো মূল ভুমিকা পালন করেছিল। ১০৮৫ সালে খ্রিস্টানরা টলেডো পুনর্দখল করলেও এখানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা হতে থাকে। টলেডোর আর্চ-বিশপ রেমন্ড (১১২৬-৫১) এখানে একটি অনুবাদ বিভাগ চালু করেছিলেন। পরে একদল অনুবাদক মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ অনুবাদ করে ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

কর্ডোভা নগরী : স্পেনে মুর সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল কর্ডোভা। এই নগরীকে তৎকালীন বিশ্বের জগৎমণি (Jewel of the world), ইউরোপের বাতিঘর (Light House of Europe), ইউরোপের গৌরব (Glory of Europe) ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। প্রায় ১০ লক্ষ লোক এখানে বসবাস করত। Drapper (গ্রন্থ: *History of the Intellectual Development in Europe*) বলেছেন যে, কর্ডোভায় মাইলের পর মাইল বাঁধানো রাস্তা ও রাস্তার ধারে আলোর ব্যবস্থা ছিল, যেখানে আধুনিক ইউরোপের সবচেয়ে সভ্য নগরী লন্ডনে এর সাতশত বৎসর পরেও কোন সরকারী বাতি ছিলনা এবং কয়েকশ বছর পরেও প্যারিসের রাস্তা বৃষ্টির দিনে কাদায় ডুবে যেত। অসংখ্য মসজিদ, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পুষ্পোদ্যান, স্নানাগার, বিপণি, দুর্গ, প্রাসাদসহ লক্ষাধিক অট্টালিকা কর্ডোভা নগরীকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেছিল।


কর্ডোভা মসজিদ

ইউরোপের উপর প্রভাব : Lane Poole (গ্রন্থ: *The Moors in Spain*) এর মতে, মুরদের শাসনামলে স্পেনে শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল ইউরোপের কোথাও তা পরিলক্ষিত হয়নি। ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশ হতে শিক্ষার্থী ও পাদ্রীগণ স্পেন ও সিসিলিতে আসত জ্ঞান আহরণের জন্যে। তারা আরবি ভাষার গ্রন্থসমূহ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে পাশ্চাত্যের কাছে পৌঁছে দেয়। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিনির্মাণে স্পেনীয় মুসলিমদের অবদান অনস্বীকার্য। ইউরোপীয় রেনেঁসা এমনকি বর্তমান বিশ্বসভ্যতা স্পেনীয় মুসলিমদের কাছে নানাভাবে ঋণী।

সারসংক্ষেপঃ

স্পেনীয় মুসলিমরা বৌদ্ধিক জগতে ব্যাপক ও নযিরবিহীন অগ্রগতি সাধন করেছিল। জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ওষুধবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, সঙ্গীতকলা ও ধর্মতত্ত্বে স্পেনের মুসলিমরা ব্যাপক অবদান রাখে। ইউরোপের বাতিঘর কর্ডোভা ছিল মুর সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। বর্তমান বিশ্বসভ্যতা স্পেনীয় মুসলিমদের কাছে নানাভাবে ঋণী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. দ্বিতীয় হাকামের লাইব্রেরীতে কতগুলো পাণ্ডুলিপি ছিল?
(ক) ১ লক্ষ (খ) ২ লক্ষ (গ) ৫ লক্ষ (ঘ) ৬ লক্ষ

২. 'ream' শব্দটি কোন মূল ভাষা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে?
(ক) ইংরেজি (খ) আরবী (গ) ফারসি (ঘ) ল্যাটিন

৩. 'ইউরোপের বাতিঘর' বলা হয় কোন্ নগরীকে?
(ক) লন্ডন (খ) গ্রানাডা (গ) প্যারিস (ঘ) কর্ডোভা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় রোমানদের ব্যাপক অবদান রয়েছে। প্রাচীন রোম নগরী ছিল এই সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। পরে রোমীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিক সভ্যতা রোমানদের কাছে নানাভাবে ঋণী।

ক. স্পেনের মুসলিম সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র কোন্ নগরী? ১
খ. কর্ডোভাকে 'ইউরোপের বাতিঘর' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে রোমানদের মত কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্পেনীয় মুসলিমদের অবদান বেশি বলে আপনি মনে করেন? ৩
ঘ. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে স্পেনের মুসলিমদের অবদান আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ : ১. গ ২. ক ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ : ১. ঘ ২. ঘ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ : ১. ক ২. গ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ : ১. ঘ ২. গ ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ : ১. ক ২. ঘ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬ : ১. ঘ ২. ঘ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭ : ১. খ ২. ক ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৮ : ১. ঘ ২. গ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৯ : ১. গ ২. গ ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১০: ১. খ ২. ঘ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১১: ১. খ ২. গ ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১২: ১. ঘ ২. খ ৩. ঘ

ফাতিমি খিলাফত ও আইয়্যুবী বংশ (৯০৯-১২৫০ খ্রি.)

ইউনিট ১০

ভূমিকা

শিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা ঈসমাইলীয়রা হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমার (রা.) বংশধর দাবী করে ৯০৯ সালে উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে। ঈসমাইলীয়রা ছিল সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী বা সাবিয়া (The Seveners)। তারা প্রথম সাত জন ইমামকে তাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে স্বীকার করে। উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী ফাতিমি বংশ প্রতিষ্ঠার পর পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দী ধরে গৌরবের সাথে এর যাত্রা অব্যাহত থাকে। শেষ দিকের খলিফাগণ বিশেষ করে আল-হাকিমের পরবর্তী খলিফাগণ ছিলেন অযোগ্য, অদক্ষ, অকর্মণ্য এবং তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নাবালক। ফলে আল-হাকিমের মৃত্যুর পর প্রকৃত ক্ষমতা উযিরদের হাতে চলে যায় এবং নাবালক উত্তরাধিকারীগণ তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। ১১৭১ সালে সর্বশেষ খলিফা আল-আদিদের মৃত্যু হলে সালাহ্উদ্দিন আব্বাসীয়দের অনুকূলে আইয়্যুবী বংশ প্রতিষ্ঠার করেন এবং এর মধ্য দিয়ে ২৬২ বছরের ফাতিমি শাসনের অবসান হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১ : ফাতিমিদের পরিচয় ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা
পাঠ-১০.২ : উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী, আল-কায়িম ও আল-মনসুর
পাঠ-১০.৩ : আল-মুইয
পাঠ-১০.৪ : আল- আযিয
পাঠ-১০.৫ : আল-হাকিম
পাঠ-১০.৬ : ফাতিমিদের পতন
পাঠ-১০.৭ : জ্ঞান-বিজ্ঞানে ফাতিমিদের আবদান
পাঠ-১০.৮ : ক্রুসেড
পাঠ-১০.৯ : আইয়্যুবী বংশ

পাঠ-১০.১ ফাতিমিদের পরিচয় ও মিসরে খিলাফত প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফাতিমিদের পরিচয় সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ফাতিমি মতবাদ প্রচার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ও
- আঘলাবীদের পরাজয় ও ফাতিমি বংশ প্রতিষ্ঠার বিবরণ দিতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ঈসমাইলীয় সম্প্রদায়, সাবিয়া, জাফর আস-সাদিক, মুহম্মদ আল-হাবীব, সালামিয়া, আবদুল্লাহ্ বিন মায়মুন, আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ী ও কাতামা**

ফাতিমিদের পরিচয়

উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী উত্তর আফ্রিকায় যে বংশটি প্রতিষ্ঠা করেন তাই ফাতিমি বংশ নামে পরিচিত। এই বংশের লোকেরা নিজেদেরকে হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমার (রা.) বংশধর দাবী করে বলে তাদেরকে ফাতিমি বলা হয়। তারা ছিল সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী বা সাবিয়া (The Seveners)। তারা ঈসমাইলীয় সম্প্রদায় নামেও পরিচিত। উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী ছিলেন ইমাম ইসমাইলের অধ:স্তন। তারা প্রথম সাত জন ইমামকে তাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে স্বীকার করে। এই সাতজন ইমাম হলেন যথাক্রমে হযরত আলী (রা.), হযরত হাসান (রা.), হযরত হোসাইন (রা.), যয়নুল আবিদীন (তাঁকে দ্বিতীয় আলীও বলা হয়ে থাকে), মুহম্মদ আল-বাকির, জাফর আস-সাদিক এবং ঈসমাইল। ঈসমাইলীয় সম্প্রদায় শিয়া উপ-দলের একটি অন্যতম শাখা।

৭৬৫ সালে ইমাম জাফর আস-সাদিক তাঁর উত্তরাধিকারী ও সপ্তম ইমাম হিসেবে বড় পুত্র ঈসমাইলকে মনোনীত করেন। ঈসমাইল মদ্যপায়ী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্বেই ঈসমাইল ইন্তেকাল করলে ইমাম জাফর আস-সাদিক তদস্থলে তাঁর পরবর্তী পুত্র মুসা আল-কাযিমকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী বা সপ্তম ইমাম হিসেবে মনোনীত করেন। শিয়াদের অনেকে এটা মেনে নেয়, আবার অনেকে মেনে নেয় নি। যারা মুসা আল-কাযিমের মনোনয়ন মেনে নেয়নি এবং কেবল ঈসমাইলকেই সপ্তম ইমাম হিসেবে স্বীকার করে তারাই ঈসমাইলীয় সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ফলে তারা শিয়াদের সাধারণ ধারা হতে বিভাজন হয়ে যায়। তারা মনে করে ইমামত স্রষ্টা কর্তৃক নির্দেশিত। যিনি একবার ইমাম হিসেবে মনোনীত হন তাঁকে আর বাদ দেয়া যায়না। তারা মনে করে ইমামত শুধু ঈসমাইল ও তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করবে। তারা ঈসমাইলের পুত্র মুহম্মদ আল-মাকতুমকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে। এরপর মুহম্মদ আল-মাকতুমের পুত্র জাফর আল-মুসাফাক, জাফর আল-মুসাফাকের পুত্র মুহম্মদ আল-হাবীব এবং মুহম্মদ আল-হাবীবের পুত্র উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী পর্যায়ক্রমে ঈসমাইলীয় ইমাম মনোনীত হন।

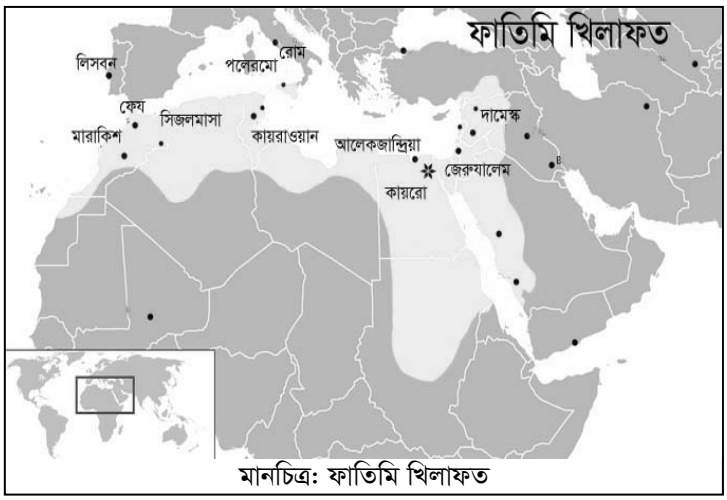

মানচিত্র: ফাতিমি খিলাফত

সালামিয়া হতে ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচার : মুহম্মদ আল-হাবীব সিরিয়ার সালামিয়া নামক স্থানে ঈসমাইলীয় মতবাদ

প্রচারের প্রধান কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এখান থেকে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচারের জন্য প্রচারক প্রেরণ করেন এবং এই মতবাদের সমর্থকদের নাম তালিকাভুক্ত করেন। ঈসমাইলীয়রা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে গোপন আস্তানা গড়ে তুলে ইমামের পক্ষে প্রচারণা চালায়। প্রচারকরা পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এর ফলে ইয়েমেন, বাহরাইন, ভারত (সিন্ধু), মিসর এবং উত্তর আফ্রিকার অনেক মানুষ এ মতবাদে দীক্ষিত হয়।

আবদুল্লাহ্ বিন মায়মুন ও আবু আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইনের প্রচারণা : আবদুল্লাহ্ বিন মায়মুন ছিলেন পারস্যের (বর্তমান ইরান) অধিবাসী ও ঈসমাইলীয় মতবাদের প্রধান প্রচারক বা দাঈ। তিনি বিভিন্ন এলাকায় তাঁর সহকারী দাঈদের নিযুক্ত করেন। আবদুল্লাহ্ বিন মায়মুনের শিষ্য এবং দাঈ আবু আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইনকে ইয়ামেনের প্রচারক হিসেবে পাঠানো হয়। আবু আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইন ইয়ামেনে ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে যথেষ্ঠ প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেন। আবদুল্লাহ্ বিন মায়মুনের মৃত্যুর পর নবম শতকের শেষ দিকে আবু আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইন ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আবু আবদুল্লাহ্র উত্তর আফ্রিকায় আগমন ও ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচার : আবু আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইন ছিলেন ইয়েমেনের সানার অধিবাসী। তিনি এক সময় আব্বাসীয়দের অধীনে বসরার মুহ্তাসিব ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আশ্-শিয়ী নামে পরিচিত হন। তিনি ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচারের জন্য সুদূর উত্তর আফ্রিকাকে উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি কয়েকটি কারণে উত্তর আফ্রিকাকে বেছে নেন: ক. আব্বাসীয়দের রাজধানী বাগদাদ হতে এর দূরত্ব, খ. সেখানে মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, গ. বার্বারদের সাম্প্রদায়িক ও আরব-বিদ্বেষী মনোবৃত্তি, ঘ. সেখানে আঘলাবী শাসনে সেনাবাহিনীতে বিশৃংখলা, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদি। আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ী উত্তর আফ্রিকার এ বাস্তব অবস্থার সদ্ব্যবহার করেন। ৯০১ সালে উত্তর আফ্রিকা হতে আগত হজ্জযাত্রীদের সাথে উত্তর আফ্রিকায় গমন করেন এবং সেখানে ব্যাপক সংখ্যক বার্বার জনসাধারণকে ফাতিমি মতবাদে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন। বিশেষ করে কাতামা (কিতামা/কুতামা) নামক একটি বার্বার গোত্রের মধ্যে ঈসমাইলীয় মতবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আঘলাবীদের পরাজয় ও ফাতিমি বংশ প্রতিষ্ঠা : উত্তর আফ্রিকার আঘলাবীরা ছিল সুন্নি মতাবলম্বী। আঘলাবী শাসক ঈসমাইলীয়দের আন্দোলন প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আবু আবদুল্লাহ্ দুই লক্ষ বার্বার সৈন্য প্রস্তুত করলেন। তিনি আঘলাবীদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য শীঘ্রই একজন মাহ্দী বা উদ্ধারকারীর আবির্ভাবের কথা তাদের বোঝালেন এবং ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। এ সময় আঘলাবী শাসক ইব্রাহিম বিন মুহম্মদের মৃত্যুর পর তৃতীয় যিয়াদাতুল্লাহ্ ক্ষমতায় আসেন। তিনি ঈসমাইলীয়দের বিরুদ্ধে দুটি সেনাদল প্রেরণ করেন। আবু আবদুল্লাহ্ তাদের পরাজিত করেন। এরপর আবু আবদুল্লাহ্ তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে আঘলাবী রাজধানী রাক্কাদায় গমন করেন এবং আঘলাবীদের পরাজিত করে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করেন। ৯০৯ সালে আবু আবদুল্লাহ্ উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীর পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীর আগমন ও খলিফা উপাধি গ্রহণ : মুহম্মদ আল-হাবীব তাঁর পুত্র উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীকে ইমামতের উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যান এবং সালামিয়ায় মৃত্যুবরণ করার পর উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন। মৃত্যুর সময় পুত্র উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, "তুমিই মাহ্দী। আমার মৃত্যুর পর তোমাকে দূরদেশে যাত্রা করতে হবে। তুমি অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমিই জয়ী হবে।" মুহম্মদ আল-হাবিবের মৃত্যুর পর আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ী উবায়দুল্লাহ্কে উত্তর আফ্রিকায় আসার জন্য চিঠি লেখেন। তিনি তাঁকে জানান যে তিনি সেখানে তাঁর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। বেশিরভাগ বার্বার ইতোমধ্যেই ঈসমাইলীয় মতবাদে দীক্ষিত হয়েছে। তাই তিনি এখানে এসে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য তাঁকে আহবান জানান। আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ীর পত্র পেয়ে তিনি পুত্র কাসিম, আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ীর ভাই আবুল আব্বাস এবং কয়েকজন অনুসারীসহ বণিকবেশে উত্তর আফ্রিকায় যাত্রা করেন। আব্বাসীয় খলিফা মুক্তাফী (৯০২-৭) এই সংবাদ পেয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন। তারা বিনা বাধায় ত্রিপলী পর্যন্ত পৌঁছেন। এরপর আবুল আব্বাস দল থেকে আলাদা হয়ে কায়রোওয়ানের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে আঘলাবী কর্তৃপক্ষ তাঁর পরিচয় পেয়ে কারারুদ্ধ করে। অন্যদিকে উবায়দুল্লাহ্ ও তাঁর দল পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন। সিজিলমাসাহ (মরক্কোর অদূরে) নামক স্থানে উবায়দুল্লাহ্ ও তাঁর পুত্র ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির শাসক ছিলেন এলিসা বিন মিদরার। আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ী এই সংবাদ শুনে প্রথমে কায়রোওয়ানের দিকে যাত্রা করেন এবং ভাই আবুল অব্বাসকে মুক্ত করেন। এরপর সিজিলমাসাহর শাসক এলিসা

বিন মিদরারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করেন। এরপর ওবায়দুল্লাহকে কারামুক্ত করেন। আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ী ওবায়দুল্লাহকে সঙ্গে করে রাক্কাদায় গমন করেন এবং জনসমক্ষে তাঁকে 'মাহ্দী' উপাধি দিয়ে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। জনগণও তাঁকে শাসক ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে স্বীকার করে এবং তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। এভাবে ৯০৯ সালে উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বংশের মোট ১৪ জন খলিফা শাসন করেন।

সারসংক্ষেপঃ

ফাতিমিরা হল হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমার (রা.) বংশধর এবং সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী। তারা ঈসমাইলীয় সম্প্রদায় নামেও পরিচিত। এই মতবাদের প্রধান প্রচারক বা দাঈ আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ী ৯০১ সালে উত্তর আফ্রিকায় আগমন করে ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচার করেন। বার্বার সৈন্যদের সহায়তায় তিনি আঘলাবীদের পরাজিত করে উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীর পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এরপর উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী রাক্কাদায় আগমন করেন এবং 'খলিফা' উপাধি গ্রহণ করেন। এভাবে ৯০৯ সালে উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ফাতিমিরা শিয়াদের কোন্ শাখার?
   (ক) ঈসমাইলীয় (খ) ইসনে আশারিয়
   (গ) যায়িদিয়া (ঘ) কারামতিয়

২. উত্তর আফ্রিকার কোন্ গোত্রের মধ্যে ঈসমাইলীয় মতবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে?
   (ক) কাতামা (খ) জানাতা
   (গ) সিনহাজাহ (ঘ) জিরি

৩. উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীকে কোথায় কারারুদ্ধ করা হয়?
   (ক) ফেজে (খ) রাক্কাদায়
   (গ) কায়রোওয়ানে (ঘ) সিজিলমাসায়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-ঃ

৭৫০ সালে আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ্ আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ বংশ প্রতিষ্ঠা করলেও এর নামকরণ করেন তাঁর পূর্ব পুরুষ হযরত আব্বাসের নামানুসারে। এই বংশের লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের মতবাদ প্রচার করতে থাকে। অবশেষে তারা একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে।

ক. ফাতিমি বংশের নামকরণ হয় কার নামানুসারে? ১
খ. ঈসমাইলীয়দের পরিচয় ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে আব্বাসীয় মতবাদ সদৃশ পাঠ্যপুস্তকে আলোচিত মতবাদ প্রচারের বর্ণনা দিন। ৩
ঘ. উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীর উত্তর আফ্রিকায় আগমন ও ফাতিমি বংশ প্রতিষ্ঠার বিবরণ দিন। ৪

পাঠ-১০.২ উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী, আল-কায়িম ও আল-মনসুর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী কর্তৃক ফাতিমি বংশ সুদৃঢ়করণের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তারের বিবরণ দিতে পারবেন।
- আল-কায়িম ও আল-মনসুর সম্পর্কে বলতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**আল-মাহ্দীয়া, রুস্তামী, অরুবা বিন ইউসুফ, তাহরাত, ওরান, ইদ্রিসীয় রাজ্য, কাদু, আবু ইয়াজিদ ও আল-মানসুরিয়া**

উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী (৯০৯-৯৩৪):

উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী ৯০৯ সালে উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নিজেকে একজন যোগ্য শাসক হিসেবে প্রমাণ করেন এবং সমগ্র ইফ্রিকিয়ার উপর ফাতিমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ীকে হত্যা : সিংহাসন লাভ করার দুই বছর পর তিনি আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ীকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হত্যা করেন। উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীকে কারামুক্ত করার পর আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ী ভেবেছিলেন যে উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী শুধু একজন আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড তাঁর উপর ছেড়ে দেবেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী একইসাথে ধর্মীয় নেতা ও শাসক হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেন। এতে আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ী ও তার ভাই আবুল আব্বাস ক্ষুব্ধ হন। ফলে তারা উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কিছু সংখ্যক বার্বার নেতার সাথে ষড়যন্ত্র করেন। উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ী ও তাঁর ভাই আবুল আব্বাসকে হত্যা করেন।

আল-মাহ্দীয়া নগরী স্থাপন : উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী তাঁর বংশের নিরাপত্তা ও একটি সুশৃংখল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি সুরক্ষিত নতুন রাজধানী স্থাপন করেন এবং এর নাম দেন 'মাহ্দীয়া'। এটি কায়রোওয়ান নগরী থেকে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তিউনিসের উপকূলে অবস্থিত। এই শহর নির্মাণ করতে মোট সময় লেগেছিল ৫ বছর। ৯১৬ সালে এই শহরের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ৯২০ সালের দিকে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। শহরটি ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। এর চারদিক শক্ত দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং এই দেয়ালে ছিল লোহার দরজা। শহরের অভ্যন্তরে মার্বেল পাথরে নির্মিত প্রাসাদ, পানি সরবরাহের জন্য বিরাট ট্যাংক এবং মাটির নীচে শস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়। এ ধরনের একটি পরিকল্পিত রাজধানী ফাতিমিদের ভবিষ্যত স্থায়িত্বের জন্য সহায়ক হয়।

বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তার : খলিফা উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী ক্ষমতা গ্রহণ করার পরপরই তাঁর রাজ্যের সীমা বৃদ্ধিতে তৎপর ছিলেন। ৯০৯ সালে তিনি কাতামা নেতা অরুবা বিন ইউসুফকে পাঠিয়ে রুস্তামীদের রাজধানী তাহরাত এবং ওরান জয় করে নেন। ৯২২ সালে অরুবা মরক্কোর ইদ্রিসীয়দের রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তাদের পরাস্ত করে মরক্কোর একটি বড় অংশ ফাতিমি রাজ্যভুক্ত করেন। এর ফলে আল-মাহ্দীর রাজ্যসীমা মিসর থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি একটি নৌ-বাহিনী গঠন করেন এবং ইতালীর উপকূলে অভিযান চালান। এছাড়া সার্দিনিয়া, বেলারিক দ্বীপপুঞ্জ, মালটা ও করসিকাতেও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কায়রোওয়ানে কাতামারা বিদ্রোহী হলে আল-মাহ্দী পুত্র আবুল কাসিমকে পাঠিয়ে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন। ত্রিপলিতে আরব এবং বার্বারদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। জল ও স্থল পথে যৌথ আক্রমণের পর ত্রিপোলির বিদ্রোহীরা বশ্যতা স্বীকার করে।

সিসিলির কর্তৃত্ব হাতছাড়া : উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী সিসিলি দ্বীপকে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি কাতামা গোত্র হতে একজনকে নতুন গভর্নর হিসেবে সিসিলিতে পাঠান। কিন্তু পরে সেখানেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেখানে যিয়াদাতুল্লাহ্র পুত্র আহম্মদকে সিসিলিবাসী ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। প্রথমে তিনি এই আহবান প্রত্যাখান করেন। কিন্তু পুনরায় আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি সিসিলির আমীর হতে রাযী হন। এখানকার আমীর নিযুক্ত হয়ে তিনি এক চিঠি মারফত আব্বাসীয় খলিফার আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাঁকে সিসিলির আমীর হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। ফলে সিসিলিতে ফাতিমিদের আধিপত্য হাতছাড়া হয়ে যায় এবং তা পুনরায় আব্বাসীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মিসর অভিযান : উত্তর অফ্রিরায় বার্বারদের ক্রমাগত বিদ্রোহ এবং সেখানে উমাইয়াদের তৎপরতার কারণে উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী পূর্বদিকে রাজ্য সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি দুবার মিসর অভিযান চালান। সেনাপতি আবুল কাসিম স্থল পথে মিসরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। আর একজন সেনাপতি খুবাসা নৌপথে বার্কা জয় করে আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। পরে বাগদাদ থেকে প্রেরিত বাহিনী ও মিসরীয় বাহিনীর মোকাবিলায় উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীর বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। প্রথম অভিযান সফল না হওয়ায় তিনি আবার মিসরে অভিযান প্রেরণ করেন। ৮৫টি যুদ্ধ জাহাজসহ তাঁর সেনা ও নৌ-বাহিনী মাহ্দীয়া থেকে মিসর যাত্রা করে। তাঁর বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছলে বাগদাদের খলিফা মাত্র ২৫টি জাহাজ ও কিছু সংখ্যক সৈন্য পাঠিয়ে এই বাহিনীর মোকাবিলা করেন। এই যুদ্ধজাহাজগুলো গ্রিক নৌ-সেনা দ্বারা সুসজ্জিত ছিল যারা নৌ-যুদ্ধে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিল। ফলে দ্বিতীয় অভিযানেও উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীর পরাজয় ঘটে।

স্পেনের উমাইয়াদের সাথে সম্পর্ক : উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী স্পেনে ফাতিমি মতবাদ প্রচারের লক্ষ্যে একদল দক্ষ গুপ্তচর ও প্রচারক প্রেরণ করেন। তারা অতি গোপনে ফাতিমি মতবাদ প্রচার করতে থাকে। এছাড়া তিনি স্পেনে তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উমাইয়াদের অভ্যন্তরীণ শত্রু উমর বিন হাফ্সুনের সাথেও মিত্রতা স্থাপন করেন। এ অবস্থা অবগত হয়ে স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান উত্তর আফ্রিকার নেতৃস্থানীয় বার্বার জানাতা গোত্র, শিয়া ইদ্রিসীয় এবং ইবাদিয়া খারিজি নেতাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে ফাতিমিদের প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। প্রত্যুত্তরে উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীও স্পেন অভিযানের একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বেই ৯৩৪ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

খলিফা উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী ২৬ বছর শাসন করেন। অনেক বাধা মোকাবিলা করে তিনি ইসলামী বিশ্বে প্রথম ঈসমাইলীয় বা ফাতিমি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিল ইসলামী বিশ্বের একমাত্র শিয়া খিলাফত। তিনি মরক্কো হতে মিসর পর্যন্ত যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে তা আরও পূর্বদিকে সম্প্রসারিত হয় এবং ১১৭১ সাল পর্যন্ত টিকে থাকতে সক্ষম হয়।

আল-কায়িম (৯৩৪-৪৬)

উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীর মৃত্যুর পর তাঁর মনোনয়নক্রমে বড় পুত্র আবুল কাসিম 'আল-কায়িম' উপাধি নিয়ে ৯৩৪ সালে শাসনভার লাভ করেন। তিনি তাঁর পিতার শাসনামলে সমরবিদ হিসেবে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। পিতার শাসনামলে তাঁর সেনাপতিত্বে মিসরে দুবার অভিযান প্রেরিত হয়। এছাড়া উত্তর আফ্রিকার অসংখ্য বিদ্রোহ দমন করে তিনি সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। খলিফা হিসেবে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার পর ৯৩৪ সালে ফ্রান্স ও ইতালীর দক্ষিণ উপকূলে একটি নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এ অভিযানে জেনোয়া এবং লোম্বার্ডির অংশবিশেষ ফাতিমিদের অধিকারে আসে। ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনি তৃতীয়বারের মত মিসর অভিযান চালান। এবারও এই অভিযান ব্যর্থ হয় এবং ফাতিমি অভিযানকারীরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিসহ মিসর হতে প্রত্যাবর্তন করে। তাঁর সময় জানাতা গোত্রের ইবাদিয়া খারিজি নেতা আবু ইয়াজিদ দক্ষিণ তিউনিসিয়ায় বিদ্রোহ করে। তিনি আবু হিমার (গাধার বাপ/ The man with an ass) নামে পরিচিত ছিলেন। কায়রোওয়ানের সুন্নী নেতারা এবং স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান তাঁকে সমর্থন করেন। আল-কায়িম তাঁকে দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু পুরোপুরি সফল হবার পূর্বেই ৯৪৬ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আল-মনসুর (৯৪৬-৫৩)

আল-কায়িমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবু তাহির ঈসমাইল 'আল-মনসুর' উপাধি ধারণ করে তৃতীয় ফাতিমি খলিফা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকালের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় আবু ইয়াজিদের বিদ্রোহ ও অন্যান্য বিদ্রোহ দমন করে রাজ্য সুদৃঢ়করণে। ৯৪৭ সালে খারিজি নেতা আবু ইয়াজিদ তাঁর কাছে পরাজিত হন এবং তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। এর ফলে ইফ্রিকিয়ায় ফাতিমি আধিপত্য পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯৪৮ সালে কায়রোওয়ানের নিকটবর্তী স্থানে তিনি একটি শহর নির্মাণ করেন যা প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত ছিল। নিজের নাম অনুসারে এর নাম দেওয়া হয় 'আল-মানসুরিয়া'।

সারসংক্ষেপঃ

৯০৯ সালে উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আবু আবদুল্লাহ্ আশ্-শিয়ী ও তাঁর ভাই আবুল আব্বাসকে হত্যা করেন। তিনি 'আল-মাহ্দীয়া' নামে কায়রোওয়ানের নিকট একটি সুরক্ষিত নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি তাহরাত, ওরান ও মরক্কোর একটি বড় অংশ জয় করেন। আল-মাহ্দী কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করেন এবং স্পেনে উমাইয়াদের শত্রু উমর বিন হাফ্সুনের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। ৯৩৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর আল-কায়িম ও আল-মনসুর পর্যায়ক্রমে খলিফা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীর প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজধানীর নাম-
   (ক) হাশিমিয়া (খ) মাহ্দীয়া
   (গ) মানসুরিয়া (ঘ) কাহিরা

২. 'আবু হিমার' কে?
   (ক) আবু ইয়াজিদ (খ) আল-কাইম
   (গ) আল-মনসুর (ঘ) উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী

৩. কায়রোওয়ানের নিকট ফাতিমি খলিফা আল-মনসুর প্রতিষ্ঠিত নতুন শহরের নাম-
   (ক) হাশিমিয়া (খ) মাহ্দীয়া
   (গ) মানসুরিয়া (ঘ) কাহিরা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মীর আলী উত্তরপুরে মীর বংশ প্রতিষ্ঠা করার পর এই বংশের শত্রুদের দমন করেন এবং সেখানে এই বংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কণকপুরে একটি সুরক্ষিত নতুন রাজধানী স্থাপন করেন এবং সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন। নিজ বংশের শাসনধারা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি এই বংশ প্রতিষ্ঠার প্রধান নায়ক বিজু-কে হত্যা করেন। মীর আলীর মৃত্যুর পরও এ বংশের বিরুদ্ধে অনেক বিদ্রোহ দেখা দেয়।

ক. ফাতিমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. আল-মাহদিয়া নগরীর বর্ণনা দিন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিজু পাঠ্যপুস্তকে কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাঁকে কেন হত্যা করা হয়? ৩
ঘ. উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমি কর্তৃত্ব সুদৃঢ়করণে উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দী কৃতিত্ব আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-১০.৩ আল-মুইয



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আল-মুইযের বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন, রাজ্য বিস্তার ও বহি:শক্তির সাথে সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন;
- আল-মুইযের মিসর বিজয়ের বিবরণ দিতে পারবেন ও
- কায়রো নগরী প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দিতে পারবেন।

	**মুখ্য শব্দ**	**জওহর আল-সিকিল্লি, সিসিলি, ক্রীট, পালেরমো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো নগরী, রাজা জর্জ, কারামাতিয় ও হাফ্তাকিন**

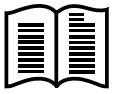

৯৫৩ সালে আল-মনসুরের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবু তামিম মা'আদ 'আল-মুইয লি-দীনিল্লাহ্' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে ফাতিমিরা এক নব যুগে পদার্পণ করে।

জওহর আল-সিকিল্লির ভূমিকা : আল-মুইযের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার পেছনে সেনাপতি জওহরের ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পূর্ণনাম জওহর আল-সিকিল্লি বা জওহর আল-রুমী বা আবু হাসান জওহার বিন আবদুল্লাহ্। তাঁর জন্ম বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সিসিলিতে। তিনি একজন গ্রিক লিপিকার ছিলেন। সিসিলি থেকে তাঁকে ক্রীতদাস হিসেবে আল-মনসুরের সময় কায়রোওয়ানে নিয়ে আসা হয়। পরে নিজ যোগ্যতাবলে সচিব ও সেনাপতির পদে সমাসীন হন।

আল-মাগ্রিবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা : শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর তিনি প্রথমে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা বা আল-মাগ্রিবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দেন। এ লক্ষ্যে তিনি সেনা ও নৌ-বাহিনীর পুনর্গঠন সম্পন্ন করেন। সেনাপতি জওহর সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৫৮ সালে ফাতিমি সেনাবাহিনী পশ্চিমে আটলান্টিক পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সেখান থেকে জওহর উপহার হিসেবে আল-মুইযকে পাত্রের মধ্যে জীবন্ত মাছ পাঠান।

স্পেনের সাথে সংঘাত : আল-মুইয স্পেনের উমাইয়া মিত্রদের উত্তর আফ্রিকা হতে বিতাড়িত করেন। জওহর উমাইয়াদের নিকট থেকে মৌরিতানিয়া পুনরুদ্ধার করেন। ৯৫৫ সালে আল-মুইযের একটি বাণিজ্য জাহাজ উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের (৯১২-৬১) একটি বাণিজ্য জাহাজ দ্বারা আক্রান্ত হয়। জবাবে আল-মুইয সিসিলির শাসনকর্তা হাসান বিন আলীর মাধ্যমে স্পেনের উপকূল আক্রমণ করে অনেক স্পেনীয় জাহাজ দখল করেন। প্রত্যুত্তরে খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানও যথাক্রমে গালিব ও আহম্মদ বিন ইয়ালার নেতৃত্বে আফ্রিকার উপকূলে দুবার অভিযান চালান। উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় আল-হাকামের সময় (৯৬১-৭৬) উমাইয়া ও ফাতিমিদের মধ্যে উত্তর আফ্রিকার আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষ হয়। ৯৭৩ সালে ফাতিমি রাজধানী কায়রোতে স্থানান্তরিত হলে এ এলাকায় তাদের আধিপত্য হ্রাস পেতে থাকে।

ক্রীটে বিপর্যয় : তাঁর সময়ের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হল ক্রীট হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। আব্বাসীয় ও ফাতিমিদের অধীনে ক্রীট সভ্যতা, শিল্প ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হয়। ৯৬১-৬২ সালে বাইজানটাইনগণ এটা পুনরাধিকার করে মুসলিমদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালায়। পুরুষদের শরীরে আলকাতরা মেখে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। মহিলা ও শিশুদের উপরেও ভীষণ অত্যাচার করা হয়।

সিসিলি বিজয় : ক্রীট হাতছাড়া হয়ে গেলেও সিসিলি বিজয়ের মধ্য দিয়ে এর আংশিক ক্ষতিপূরণ হয় । সিসিলির কয়েকটি সুরক্ষিত দুর্গ দিয়ে বাইজানটাইনরা আরবদের হয়রানী করত। রাজপ্রতিনিধি আহম্মদ বিন হাসান বাইজানটাইন নিয়ন্ত্রিত শহরগুলো দখল করেন। ৯৬৬ সালে সিসিলি পুরোপুরিভাবে ফাতিমি শাসনাধীনে আসে। মুসলিম শাসনামলে সিসিলি খুবই উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। সিসিলির পালেরমো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বাগদাদ ও কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমকক্ষ ছিল।

মিসর বিজয় : ফাতিমি বংশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে মিসর বিজয়ের লালিত স্বপ্ন আল-মুইয বাস্তবে পরিণত করেন। এর আগে উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহ্দীর সময় দুবার ও আল-কায়িমের সময় একবার মিসরে অভিযান প্রেরণ করা হলেও নানা কারণে তা ব্যর্থ হয়। আল-মুইযের সময় মিসরের পারিপার্শ্বিক আনুকূল্য তাঁর মিসর বিজয়ে সহায়ক হয়েছিল। এ সময় মিসরে আব্বাসীয় অনুগত ইখ্শিদীয়দের শাসন চলছিল। তাদের অধীনে এ সময়ে মিসরে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ রোগের মহামারী, ব্যাপক মানুষের মৃত্যু, জনসংখ্যা ঘাটতি, কৃষি ও কর ব্যবস্থার অধঃপতন ইত্যাদি নানা কারণে এক চরম বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় যার কারণে আল-মুইযের মিসর বিজয় সহজতর হয়। আল-মুইয মিসর অভিযানের দায়িত্ব দেন সেনাপতি জওহরের উপর। জওহর আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে ফুস্তাতের দিকে অগ্রসর হন এবং নদী পার হয়ে ফুস্তাত দখল করেন। ফুস্তাত দখল করার পর জওহর নাগরিক, কর্মকর্তা ও সভাসদদের অভিবাদন গ্রহণপূর্বক বিজয়ীবেশে শহরে প্রবেশ করেন। ৯৬৯ সালে মিসর ফাতিমিদের অধীনে আসে।

কায়রো নগরী প্রতিষ্ঠা : আল-মুইযই হলেন আধুনিক কায়রো নগরীর নির্মাতা। মিসর বিজয়ের পর জওহর ফুস্তাতের নিকটে কায়রো নগরীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। আল-মুইয পূর্ব থেকেই এই নতুন শহরের নক্শা ঠিক করে দেন। ১২০০ গজের একটি বর্গক্ষেত্র চিহ্নিত করে চারদিকে খুঁটির সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঘন্টা ঝুঁলিয়ে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল শুভ সময়ের জন্য অপেক্ষা করা এবং ঘন্টা বাজিয়ে একসাথে কাজ শুরু করা। মজুররা কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকে সংকেত প্রাপ্তির জন্য। জ্যোতিষিরা শুভলক্ষণের সংকেত প্রাপ্তির পূর্বেই একটি কাক রশিতে বসলে সকল ঘন্টা একসাথে বেজে ওঠে ও শ্রমিকরা কোদাল দিয়ে কাজ শুরু করে দেয়। এ সময়টি ছিল অত্যন্ত অশুভ। কারণ এ সময় মঙ্গল গ্রহ উদিত হচ্ছিল। মঙ্গল গ্রহকে আরবীতে বলা হয় 'আল-কাহির'। এ কারণে এ নগরীর নামকরণ করা হয় 'আল-কাহিরা আল-মাহ্রুসা' (মঙ্গলের প্রহরাধীন নগরী) যার পরিবর্তিত নাম কায়রো। ৯৭২ সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এটি বর্তমানে আফ্রিকার সবচেয়ে বৃহৎ ও জনবহুল নগরী। এটাকে বাজারের শহরও বলা হয়।

দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা : মিসর বিজয়ের পূর্ব থেকেই সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জওহর এ অবস্থা আল-মুইযকে জানালে তিনি কতগুলো জাহাজ ভর্তি করে সেখানে শস্য পাঠান এবং সেগুলো ত্রাণ হিসেবে জনগণের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়। এছাড়া পণ্য গুদামজাত ও চড়ামূল্যে বিক্রি যাতে না হয় সেজন্য মুহ্তাসিবের মাধ্যমে বাযার ব্যবস্থা তদারক করা হয়। তার এসব উদ্যোগের ফলে দুর্ভিক্ষ দূর হয়।

নুবিয়ার রাজার সাথে মিত্রতা : জওহর ৯৭২ সালে নুবিয়ার রাজা জর্জ-এর নিকট ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ ও কর প্রদানের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান। এই প্রতিনিধি দল সাদরে গৃহীত হয় এবং রাজা কর দিতে স্বীকৃত হন। তবে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। এই মিত্রতার ফলে নুবিয়াসহ লোহিত সাগরে ফাতিমি বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে।

কারামাতিয়দের দমন : জওহর জাফর বিন ফিল্লাহ্র মাধ্যমে দামেস্ক জয় করলে কারামাতিয়দের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে। কারামাতিয় নেতা হাসান বিন আহম্মদ হামানিয়দের সাহায্যে দামেস্ক উদ্ধার করেন এবং পরে মিসর আক্রমণ করেন। জওহর আইনুস্ শামস্ (হেলিওপোলিস) নামক স্থানে তাদের পরাজিত করেন।

কায়রোতে রাজধানী স্থাপন : কারামাতিয়দের পুনরায় মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি ও জওহরের আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে আল-মুইয ৯৭৩ সালে মিসরে আগমন করেন। এরপর তিনি কায়রো নগরীকে ফাতিমিদের নতুন রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলেন।

হাফ্তাকিনের সাথে সংঘর্ষ : হাফ্তাকিন নামক একজন পলাতক বুয়াইয়া সেনাপতি দামেস্ক দখল করে কারামতিয়দের সাহায্যে সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি দখল করতে থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই আল-মুইযের মৃত্যু হয়।

আল-মুইযের অর্থনৈতিক সংস্কার : আল-মুইয মিসরে একটি শক্তিশালী ফাতিমি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ইয়াকুব বিন কিল্লিসের পরামর্শে তিনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করেন। তাঁর পরামর্শে নতুন কর ব্যবস্থা চালু হয়। নতুন নতুন পণ্য করের আওতাধীনে আনা হয়। এর ফলে মিসরের রাজস্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় যা পরবর্তীতে মিসরের ফাতিমি সাম্রাজ্য সুরক্ষা ও সম্প্রসারণে সহায়ক হয়েছিল।

আল-মুইয নিজেকে সাহসী, যোগ্য ও দক্ষ শাসক হিসেবে প্রমাণ করেন। তবে পূর্বসূরীরা তাঁর মত মার্জিত, রুচিসম্পন্ন ও উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি আরবি, বার্বার, সুদানী, গ্রিক ও স্লাভ ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর শাসনকাল ফাতিমি ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে ফাতিমিদের শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত হন। তিনি এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন।

সারসংক্ষেপঃ

আল-মুইযের ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে ফাতিমিরা এক নব যুগে পদার্পণ করে। তিনি আল-মাগ্‌রিবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সিসিলি ও মিসর বিজয় করেন। মিসর বিজয়ের পর কায়রো নগরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৯৭৩ সালে তিনি কায়রোতে ফাতিমিদের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর শাসনকাল ফাতিমি ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। তিনি ছিলেন ফাতিমিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ফাতিমিদের মধ্যে কে মিসর বিজয় করেন?
   (ক) আল-মাহ্‌দী (খ) আল-কাইম
   (গ) আল-মুইয (ঘ) আল-আযিয

২. কার দ্বারা আল-মুইয মিসর বিজয় করেন?
   (ক) অরুবা (খ) আবুল কাসিম
   (গ) জওহর (ঘ) ইয়াকুব

৩. কায়রো নগরী প্রতিষ্ঠা করেন কোন্ খলিফা?
   (ক) আল-মাহ্‌দী (খ) আল-কাইম
   (গ) আল-মুইয (ঘ) আল-আযিয

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

হারুন-অর-রশীদ ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে আব্বাসীয়রা এক নব যুগে পদার্পণ করে। তিনি বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন, রাজ্য বিস্তার ও বহি:শক্তির মোকাবিলা করেন। তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের সমৃদ্ধি আনয়ন করেন। তাঁর শাসনকাল আব্বাসীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে আব্বাসীয়দের শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত হন।

ক. কোন্ ফাতিমি খলিফা মিসর বিজয় করেন? ১
খ. কায়রো নগরী প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দিন। ২
গ. উদ্দীপকে হারুন-অর-রশীদের মত আপনি কাকে ফাতিমি খলিফাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং কেন? ৩
ঘ. আল-মুইযের মিসর বিজয়ের বিবরণ দিন। ৪

পাঠ-১০.৪ আল-আযিয

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আল-আযিযের সিরিয়া বিজয় ও তুর্কী দেহরক্ষী বাহিনী গঠন সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন;
- খ্রিস্টান, ইহুদি ও অন্যান্যদের সাথে উদার ব্যবহারের বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্থাপত্য শিল্পে অবদান আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**হাসান বিন আহম্মদ, তুর্কী দেহরক্ষী বাহিনী, ইয়াকুব বিন কিল্লিস, ইসা বিন নেসতুরিয়াস, মুহম্মদ বিন নুমান, আল-আযহার, সোনালী প্রাসাদ ও মুক্তাভবন**

৯৭৫ সালে আল-মুইযের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল-ইমাম নিজার আবু মনসুর 'আল-আযিয বিল্লাহ' (৯৭৫-৯৬) নাম নিয়ে ২০ বছর বয়সে ক্ষমতাসীন হন। সাধারণভাবে তিনি 'আল-আযিয' নামেই পরিচিত।

সিরিয়া বিজয় : আল-মুইয সিরিয়া বিজয় কাজটি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। আল-আযিয ক্ষমতা গ্রহণ করে সিরিয়া বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। হাফ্তাকিন ও তাঁর তুর্কী বাহিনী ইতোমধ্যে দামেস্ক থেকে ফাতিমি শাসককে উৎখাত করে এবং কারামাতিয়রা তার সাথে যোগ দেয়। রামলা, দামেস্ক ও আসকালানে হাফ্তাকিন ও কারামাতিয় নেতা হাসান বিন আহমদের সাথে ফাতিমি সেনাপতি জওহরের মোকাবিলা হয়। রামলায় যুদ্ধে হাসান বিন আহমদের মৃত্যু হয়। অনেক সংঘর্ষের পর হাফ্তাকিনও পরাজিত ও ধৃত হন এবং আল-আযিযের নিকট তাঁকে হাযির করা হয়। এর ফলে সিরিয়া ফাতিমি শাসনাধীনে আসে।

তুর্কী দেহরক্ষী বাহিনী গঠন : জওহর সিরিয়া বিজয় করে হাফ্তাকিনকে মিসরে খলিফার সামনে উপস্থিত করলে খলিফা তাঁর সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করেন। তাঁকে মূল্যবান পোশাক, উপহার ও সুন্দর বাসভবন প্রদান করা হয়। তাঁর সাথে আনীত বন্দী তুর্কিদের নিয়ে একটি তুর্কি দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনীর নেতৃত্ব হাফ্তাকিনের উপর ন্যস্ত করা হয়। বার্বার বাহিনীর সাথে ভারসাম্য রক্ষার জন্য সময় ও সুযোগ মত খলিফা এই বাহিনী ব্যবহার করতেন।

ইয়াকুব বিন কিল্লিসকে কারারুদ্ধ ও সম্মান প্রদর্শন : ইয়াকুব বিন কিল্লিস ছিলেন খলিফা আল-আযিযের উযির। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রশাসন চালালেও হাফ্তাকিনকে বিষপ্রয়োগে হত্যায় জড়িত থাকায় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় । অবশ্য ৪০ দিন পর তাঁকে মুক্তি দিয়ে উযির পদে পুনর্বহাল করা হয়। কারণ খলিফা তাঁর দীর্ঘদিনের সেবার কথা ভুলতে পারেননি। ইবনে কিল্লিসের মৃত্যুর পর তাঁর শবযাত্রায় খলিফা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মৃতদেহ একটি সুরম্য সমাধি ভবনে রাখা হয়। তিন দিন পর্যন্ত তিনি দর্শনার্থী বা আপ্যায়ন টেবিলে কাউকে সাক্ষাৎ দেননি। ১৮ দিন সরকারি কাজ বন্ধ ছিল। এক মাসব্যাপি রাজকীয় খরচে দিনরাত তাঁর সমাধিতে প্রশংসাগাঁথা আবৃত্তি ও কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। যিয়ারতকারীদের জন্য ক্রীতদাসীরা রুপার পেয়ালা ও চামচ নিয়ে তৈরী থাকত মদ ও মিষ্টান্ন নিয়ে। মৃত উযিরের সকল ক্রীতদাসকে মুক্তি দেয়া হয়। খলিফা তাঁর সকল দেনা পরিশোধ করে দেন।

খ্রিস্টান ও ইহুদিদের প্রতি উদারতা : তাঁর একজন স্ত্রী ছিলেন খ্রিস্টান এবং তার স্ত্রীর দুই ভাই দরবারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। সে কারণে মিসরের কিব্তি খ্রিস্টানদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি খ্রিস্টানদের জরাজীর্ণ গির্জাগুলির সংস্কার করেন। প্রশাসনের উচ্চপদে সর্বদা ইহুদি-খ্রিস্টানরাই বহাল ছিল। খ্রিস্টান ঈসা বিন নেসতুরিয়াস দরবারের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং ইবনে কিল্লিসের মৃত্যর পর পরবর্তী দুবছর তিনি আল-আযিযের উযির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ইহুদি ঈসা বিন মানিসমাও ছিলেন প্রবল ক্ষমতার অধিকারী।

ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচার : তাঁর কাজী মুহম্মদ বিন নুমানকে ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচারের জন্য বিভিন্ন যায়গায় দাঈ বা প্রচারকদের প্রেরণ করেন। ইয়ামেনে আবদুল্লাহ্ বিন বিশরকে এবং ভারতের মুলতানে জালাম বিন শাইবানকে ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচারের জন্য পাঠানো হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতা : P. K. Hitti (গ্রন্থ: *History of the Arabs*) বলেন, "সকল ফাতিমি খলিফার মধ্যে আল-আযিয সম্ভবত সবচেয়ে বিজ্ঞ ও এবং উদার ছিলেন।" ফাতিমিদের মধ্যে জ্ঞানের প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আল-আযিযের উযির ইয়াকুব বিন কিল্লিস। তিনি একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে প্রতি মাসে ১ হাজার দিনার খরচ করা হত। খলিফা আল-আযিয নিজে একজন কবি এবং বিদ্যেৎসাহী ছিলেন। তিনি আল-আযহার মসজিদকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজপ্রাসাদে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়। যাতে ২ লক্ষ গ্রন্থ ছিল। সেখানে ছিল ব্যাখ্যাসহ কুরআনের বিভিন্ন গ্রন্থ। ইবনে মুকলা এবং অন্যান্য বিখ্যাত লিপিকাররা পাণ্ডুলিপি লিখতেন। আল-আযিয এই লাইব্রেরির জন্য তাবারীর স্বাক্ষরিত তাঁর ইতিহাস বইয়ের একটি কপি সংগ্রহ করেন।

স্থাপত্য শিল্প : ৯৯০ সালে আল-আযিয একটি মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন এবং ১০১২ সালে আল-হাকিম এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন যা 'আল-হাকিম মসজিদ' নামে পরিচিত। আল-হাকীমের এ মসজিদটি ধ্বংস হয়ে গেছে। সোনালী প্রাসাদ, মুক্তাভবন, কারাফা সমাধিক্ষেত্রে মায়ের নামে মসজিদ তাঁর উল্লেখযোগ্য নির্মাণ।

আল-আযিযের চরিত্র-কৃতিত্ব : Lane-Poole (*History of Egypt in the Middle Ages*) গ্রন্থে তাঁর চরিত্রের কতগুলো দিক উল্লেখ করেছেন: দীর্ঘকায়, লাল চুল, নীল চোখ, সাহসী, দক্ষ শিকারী, নির্ভীক সেনাপতি, উদার, সমঝোতার মানসিকতাকামী ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শান্তিকামী। তিনি সোনার তৈরি পাগড়ি, স্বর্ণখচিত তলোয়ার, মূল্যবান চমৎকার পরিচ্ছদে অলংকৃত হতেন। তাঁর উমারারও শান-শওকতপূর্ণ বেশভূষা ছিল। মূল্যবান একখানা পারস্যের রেশমী পর্দার জন্য খরচ করা হত ১২ হাজার পাউন্ড সমমানের স্বর্ণমুদ্রা। তাঁর দরবারে চাকরানি ব্যতীত ৮০০ মহিলা ছিল। তিনি জুমুআর দিনে রাষ্ট্রীয় শোভাযাত্রার প্রচলন করেন। তিনি জনগণের মাঝে সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে জামাআত পরিচালনা করতেন।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন : আল-আযিয ২১ বছর শাসন করে ৪১ বছর বয়সে অর্থাৎ ৯৯৬ সালে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্র আল-হাকিমকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কোষাধ্যক্ষ বারজোয়ানকে তিনি তাঁর ১১ বছর বয়সী পুত্র আল-হাকিমের অভিভাবক এবং কাজী মুহম্মদ নুমান ও সেনাপতি হাসান বিন আম্মারকে উপদেষ্টা মনোনীত করে যান।

সারসংক্ষেপ

৯৭৫ সালে আল-মুইযের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল-আযিয ২০ বছর বয়সে ক্ষমতাসীন হন। তিনি হাফ্তাকিন ও কারামতিয় নেতা হাসান বিন আহমেদকে পরাজিত করে সিরিয়া জয় করেন। পরে হাফ্তাকিনের সাথে আনীত বন্দী তুর্কিদের নিয়ে একটি তুর্কি দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়। তিনি খ্রিস্টান-ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ উদারতা প্রদর্শন করেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচার করেন। আল-আযিয একজন বিজ্ঞ শাসক ছিলেন। তিনি আল-আযহার মসজিদকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রাজপ্রাসাদে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয় যেখানে ২ লক্ষ গ্রন্থ ছিল। সোনালী প্রাসাদ ও মুক্তাভবন তার উল্লেখযোগ্য নির্মাণ-কর্ম। তাঁর উযির ইয়াকুব বিন কিল্লিসও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ফাতিমি খলিফাদের মধ্যে কে প্রথম সিরিয়া বিজয় করেন?
   (ক) আল-মাহ্দী (খ) আল-আযিয
   (গ) আল-মুইয (ঘ) আল-হাকিম

২. কার মাধ্যমে খলিফা আল-আযিয তুর্কি দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন?
   (ক) হাফ্তাকিন (খ) বারজোয়ান
   (গ) ইয়াকুব বিন কিল্লিস (ঘ) হাসান বিন আহমদ

৩. খলিফা আল-আযিযের উযিরের নাম-
   (ক) হাফ্তাকিন (খ) বারজোয়ান
   (গ) ইয়াকুব বিন কিল্লিস (ঘ) হুসাইন ইবনে জওহার

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

শিক্ষক একজন ফাতিমি খলিফা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বললেন যে, ফাতেমিদের মধ্যে একজন বিজ্ঞ ও উদার শাসক ছিলেন। তিনিই সিরিয়া বিজয় করেন। হাফ্তাকিন, ইয়াকুব বিন কিল্লিস, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি তিনি উদারতা প্রকাশ করেন। তিনি ঈসমাইলীয় মতবাদ প্রচারে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্থাপত্যে অবদান রাখেন।

ক. ফাতেমিদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ শাসক কে? ১
খ. আল-আযিযের সিরিয়া বিজয়ের বিবরণ দিন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কোন শাসককে উদার শাসক ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং কেন? ৩
ঘ. আপনি কি খলিফা আল-আযিযকে বিজ্ঞ শাসক মনে করেন? বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-১০.৫ আল-হাকিম



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বারজোয়ার ও ইবনে আম্মারের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্ধ ও আল-হাকীমের ক্ষমতা হস্তগতকরণের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- আল-হাকিমের বিভিন্ন নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জনকল্যাণে তাঁর অবদান আলোচনা করতে পারবেন।

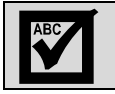	**মুখ্য শব্দ**	**বারজোয়ান, ইবনে আম্মার, মনজুতাকিম, হুসাইন ইবনে জাওহার, আবু রাকওয়া, আরসেনিয়াস, কিব্‌তি, দারাজী, দারুল্ হিক্‌মাহ্ ও আল-মুকাত্তাম**

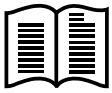

৯৯৬ সালে আল-আযিযের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল-মনসুর আবু আলী 'আল-হাকিম বি আম্‌রিল্লাহ্' উপাধি নিয়ে সিংহাসন লাভ করেন। ফাতিমি ইতিহাসে তিনি একজন বিতর্কিত শাসক ছিলেন। তাঁর নীতিসমূহের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা তাঁকে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিতে পরিণত করেছে।

বারজোয়ান ও ইবনে আম্মারের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব : ক্ষমতা গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। অপ্রাপ্ত বয়সের কারণে গৃহশিক্ষক বারজোয়ানকে তাঁর তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়। কাজী মুহম্মদ নুমান ও সেনাপতি হাসান বিন আম্মারকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। কিন্তু পরে তাঁর অভিভাকত্ব নিয়ে বারজোয়ান ও ইবনে আম্মারের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ক্ষমতালোভী ইবনে আম্মার প্রথমে ঈসা বিন নেসতুরিয়াসকে অপসারণ করে উযির পদটি দখল করে নেন। বারজোয়ান সিরিয়ার গভর্নর মনজুতাকিম ও তুর্কী সেনাদের সাহায্যে ইবনে আম্মার ও তার সমর্থক বার্বারদের দমনের চেষ্টা করেন। বার্বার ও তুর্কীদের মধ্যে সংঘর্ষে ইবনে আম্মার শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। পরে তাঁকে গৃহবন্দী করা হয়। এরপর তাঁকে মুক্ত করে দেয়া হয়। পরে তাঁকে বিচারের জন্য আদালতে হাযির করা হলে তুর্কীরা তাঁকে আক্রমণ করে হত্যা করে। ফলে ইবনে আম্মারের ১১ মাসের প্রবল উচ্চাভিলাষী ক্ষমতা নিঃশেষ হয় এবং বারজোয়ান খলিফার প্রকৃত অভিভাবক, প্রধান উযির ও সচিব পদে ফিরে এসে ফাতিমি শক্তি পুন:প্রতিষ্ঠিত করেন।

বারজোয়ানকে হত্যা ও হুসাইন ইবনে জাওহারকে উযির নিয়োগ : বারজোয়ান ইবনে আম্মারের হত্যার পর খলিফার অভিভাকত্বের অযুহাতে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। বারজোয়ানের অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে অত্যন্ত গোপনে খলিফা তাঁকে হত্যা করেন। এরপর হুসাইন ইবনে জাওহারকে উযির হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

আবু রাকওয়াকে পরাজিত ও হত্যা : স্পেনের একজন উমাইয়া রাজপুত্র আবু রাকওয়া উত্তর আফ্রিকায় পালিয়ে আসেন এবং সেখানকার আরব ও বার্বারদের সাহায্যে বার্কা দখল করে কায়রোর দিকে অগ্রসর হন। গিজার যুদ্ধে তাকে পরাজিত ও হত্যা করা হয়। তার ৩০ হাজার অনুসারীকে বন্দী হিসেবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। উযির হুসাইন ও কাজী আব্দুল আযিয বিন মুহম্মদ বিন নুমানকে আবু রাকওয়ার সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে হত্যা করা হয়।

আল-হাকিমের নীতিসমূহ : খলিফা আল-হাকিম কতগুলো নতুন নিয়ম চালু করেন। যেমন, খলিফাকে 'আমাদের মালিক' বা 'আমাদের প্রভূ' বলে সম্বোধন নিষিদ্ধ হয় এবং এর পরিবর্তে শুধু আমীরুল মুমেনিন সম্বোধন করার আদেশ জারী করা হয়। এ আদেশ লঙ্ঘনকারীদের মৃত্যদণ্ডে দণ্ডিত করার আদেশ জারী করা হয়। দিনের পরিবর্তে রাতের গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মন্ত্রী বা উপদেষ্টা পরিষদের সভা রাতে আহবান করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য রাতে পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হয়। সরকারী অফিসসমূহ রাতে খোলা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। সমগ্র রাতব্যাপী দোকান খোলা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। মহিলাদের ঘরের বাইরে গমন নিষিদ্ধ হয়। মুচিদের মহিলাদের বাইরে গমনের জুতা তৈরী না করতে আদেশ দেয়া হয়। মদ নিষিদ্ধ হয়, মদের পাত্রগুলো ভেঙ্গে দেয়া হয়। দাবা, জুয়া নিষিদ্ধ করা হয়। শুকর, কুকুর হত্যা করা হয় এবং গবাদি পশু

জবাই নিষিদ্ধ করা হয়। খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কালো পোশাক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়। খ্রিস্টানদের ক্রুশ ও ইহুদিদের কাঠের বাছুরের প্রতিকৃতি অথবা ঘন্টা পরা বাধ্যতামূলক করা হয়। আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ্' রহিত করা হয়। লুপিন, ওয়াটার ক্রেস, মুলুখিয়া ও অন্যান্য আগাছা জাতীয় গাছ উৎপাদন নিষিদ্ধ হয়। আইশ ছাড়া মাছ শিকার ও আহার নিষিদ্ধ করা হয়। তবে সম-সাময়িক আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কিছু নীতির যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

খ্রিস্টানদের প্রতি নীতি : রাজত্বের প্রথম দিকে খ্রিস্টানদের প্রতি নীতির ক্ষেত্রেই তিনি পিতার নীতি অনুসরণ করেন। ১০০০ সালে মামা আরসেনিয়াসকে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রধান বিশপের পদে অধিষ্টিত করেন। অন্য একজন খ্রিস্টান মামা ওরেসটিসকে জেরুজালেমের বিশপ নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে খ্রিস্টানদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। ১০০৯ সালে তিনি জেরুজালেমের প্রধান গির্জা ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। এটা পরে ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১০১০ সালে আরসেনিয়াসকে হত্যা করা হয়। মালেকী খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার করা হয় এবং তাদের গির্জার দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক কিব্তি (Coptic) খ্রিস্টানদের খুশি করা ও তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করা। তাদের উপর থেকে কর প্রত্যাহার করা হয়। এতে কিব্তিরা সন্তুষ্ট হয়েছিল। তবে মালেকী খ্রিস্টানদের প্রতি তাঁর এই বৈরী আচরণের কারণে বাইজানটাইনদের সাথে ফাতিমিদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

দারাজী মতবাদ : তাঁর সময়ে পারস্য থেকে দারাজীরা মিসরে এসে আল-হাকীমকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত বলে প্রচার করতে থাকে। তাদের নেতা হামযা বিন আলীর প্রভাবে খলিফা নিজেকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন ভাবতে থাকেন। তিনি সালাত, সাওম ও হজ্জ পালন নিষেধ করেন। ১০১৭ সালে তারা খলিফাকে 'আল্লাহর অবতার' বলে ঘোষণা করলে তিনি তাতে সম্মতি দেন। রাস্তায় বের হলে দারাজীরা তাঁকে সেজদা করে। ১০২১ সালে দারাজীদের প্রচার কেন্দ্র মুকাত্তাম পর্বতে আল-হাকিম রাতের বেলায় গমন করলে সেখানেই তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু হয়। দারাজীরা বিশ্বাস করে যে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন এবং আবার ফিরে আসবেন।

আল-হাকিমের নীতির পরিবর্তন : ১০১১ সালের পর মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি-সকল শ্রেণীর প্রতি জারীকৃত অনেক কড়াকড়ি আদেশ শিথিল করা হয়। তাঁর সময় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিয়াগণ কায়রোতে এসে বসবাস করতে শুরু করে। ১০১১ সালে তিনি কায়রোর সুন্নী মুসলিমদেরকে খুশী করার জন্য হযরত আবু বকর ও উমরের (রা.) লাশদ্বয় মদীনা থেকে এনে কায়রোতে সমাধিস্থ করার এক জঘন্য পরিকল্পনা করেন। এজন্য একজন গুপ্তচর ও খলিফাদ্বয়ের কবরের কাছে বসবাসকারী এক শিয়াকে দায়িত্ব দেয়া হয়। সেই বাড়ি হতে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে লাশ অপহরণের চেষ্টা চালানো হয়। খননকার্য চলা অবস্থায় হঠাৎ এক ভয়ংকর ঝড় শুরু হলে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মদিনার গভর্নরের কাছে কৃতকর্মের কথা স্বীকার করে। গভর্নর তাদের শাস্তি প্রদান করেন। আল-হাকিম আবার আদেশ জারি করেন যে আযানে 'আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম'-বলা যাবেনা; সালাতুজ্-যোহা ও রমযানে তারাবীর সালাত আদায় করা যাবেনা। ফুস্তাত জামে মসজিদের ইমাম এই আদেশ না মানলে তাঁকে হত্যা করা হয়।

দারুল্ হিক্মাহ্ প্রতিষ্ঠা : ১০০৫ সালে আল-হাকিম 'দারুল্ হিক্মাহ্' বা 'দারুল্ ইলম্' (Hall of Wisdom/Hall of Knowledge) প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত শিয়া মতবাদ প্রচার ও শিক্ষার জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞানের প্রসারে বিশেষ অবদান রাখে। এই প্রতিষ্ঠানটি রাজপ্রাসাদের সাথে যুক্ত ছিল। এখানে একটি বিশাল পাঠাগার ছিল জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাকরণ, আইন, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে এখানে চর্চা করা হত। পণ্ডিত ও গবেষকদের সমাবেশ ঘটে এখানে। প্রখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইবনে হায়সামকে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। ১১১৯ সালে প্রচলিত ধর্মবিরোধিতার অভিযোগে উযির মালিক আল-আফজাল এটিকে বন্ধ করে দেন। পরে আবার চালু হয় এবং আইয়্যুবীদের উত্থান পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব ছিল।

মানমন্দির নির্মাণ : আল-হাকিম জোতিষশাস্ত্রে আগ্রহী ছিলেন। তিনি জোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য আল-মুকাত্তাম নামক পর্বতে একটি মানমন্দির স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সময়ে আলী বিন ইউসুফ মিসরের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ছিলেন।

জনহিতকর কার্যাবলি : তিনি রাজপথ সংস্কার করেন। রাস্তার পাশে কুপ খনন ও ঝর্ণার ব্যবস্থা করেন। একদিনের যাত্রাপথের দূরত্বে পথিকদের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করেন। গরীব ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস, রুগ্নদের জন্য হাসপাতাল,

যুবকদের জন্য বিদ্যালয় নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর পিতার আমলে শুরু হওয়া আযিযিয়া মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন এবং নাম দেন আল-হাকিম মসজিদ। এছাড়া রাশিদিয়া মসজিদ নির্মিত হয়। মাক্স-এ তিনি আর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রাদেশিক শহরগুলোতে হাম্মামখানা, ঝর্ণা, বাজার, কুপ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। তিনি প্রকৃতি-প্রেমী ছিলেন। জনসাধারণকে তাদের গৃহাঙ্গণে ও গৃহের আশেপাশে বাগান তৈরিতে অনুরোধ করেন। তাঁকেও প্রায়ই রাজকীয় বাগানের পরিচর্যা করতে দেখা গেছে।

সারসংক্ষেপঃ

খলিফা আল-হাকিম ফাতিমি ইতিহাসে একজন বিতর্কিত শাসক ছিলেন। তাঁর নীতিসমূহের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা তাঁকে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। তিনি কতগুলো নতুন ও উদ্ভট নিয়ম চালু করেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিও তিনি ভারসাম্যহীন নীতি আরোপ করেন। তিনি দারাজী মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি শিয়া মতবাদ প্রচার ও শিক্ষার জন্য দারুল্ হিক্মাহ্ এবং জোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য মানমন্দির স্থাপন করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আল-হাকিম মিসরের কোন্ খ্রিস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন?
   (ক) মালিকি (খ) ক্যাথলিক
   (গ) কিব্তি (ঘ) প্রোটেসট্যান্ট

২. আল-হাকিম কোন্ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন ভাবতে থাকেন?
   (ক) সুন্নি (খ) কারাআতিয়
   (গ) মালিকি (ঘ) দারাজী

৩. দারুল্ হিকমাহ প্রতিষ্ঠা করেন কোন্ খলিফা?
   (ক) আল-মাহ্দী (খ) আল-আযিয
   (গ) আল-মুইয (ঘ) আল-হাকিম

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জামিল একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর নীতিসমূহের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার কারণে তিনি একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। এসব নীতির মাধ্যমে তাঁর মানসিক ভারসাম্যহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্বসত্ত্বেও তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্থাপত্যে অবদান রাখেন।

ক. ফতিমিদের মধ্যে বিতর্কিত খলিফা কে? ১
খ. দারুল্ হিক্মাহ্-এর পরিচয় দিন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জামিল সদৃশ পাঠ্যপুস্তকে আলোচিত ফাতিমি খলিফার বিভিন্ন ধর্মীয় নীতি উল্লেখ করুন। ৩
ঘ. আল-হাকিমের প্রশাসনিক নীতিসমূহের বর্ণনা লিখুন। ৪

পাঠ-১০.৬ ফাতিমিদের পতন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফাতিমি খিলাফতের পতনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ও
- সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর মিসরে আগমন ও ফাতিমিদের পতন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**বদর আল-জামালী, হজ্রে আস্ওয়াদ্ লুণ্ঠন, নিজারীয়, তাইয়েবীয়, ক্রুসেড, সাওয়ার, শির্কুহ, জঙ্গি ও সালাহউদ্দিন আইয়্যুবী**

৯০৯ সালে ফাতিমি বংশ প্রতিষ্ঠার পর পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দী ধরে গৌরবের সাথে এর যাত্রা অব্যাহত থাকে। কিন্তু যে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও উদ্দেশ্য নিয়ে ফাতিমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকেনি। একটি শিয়া মতাবলম্বী খিলাফত হিসেবে প্রতিনিয়ত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে টিকে থাকার জন্য যে শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন ছিল তা শেষ দিকের শাসকদের, বিশেষ করে আল-হাকিমের পরবর্তী দুর্বল খলিফাদের ছিলনা। ফলে ফাতিমি খিলাফতের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

ফাতিমি খিলাফতের পতনের কারণ

১১৭১ সালে সর্বশেষ খলিফা আল-আদিদের মৃত্যুর পর সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে ফাতিমি বংশের পতন হয়। কিন্তু তাদের পতনের প্রেক্ষাপট আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। ফাতিমিদের পতনের কারণগুলো নিম্নরূপ:

খলিফাদের দুর্বলতা : ফাতিমিদের শেষদিকের খলিফাগণ বিশেষ করে আল-হাকিমের পরবর্তী খলিফাগণ ছিলেন অযোগ্য, অদক্ষ, অকর্মণ্য এবং তাঁদের অধিকাংশই ছিল নাবালক। আল-হাকিমের মৃত্যুর পর প্রকৃত ক্ষমতা উযিরদের হাতে চলে যায় এবং নাবালক উত্তরাধিকারীগণ তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। এসব উযিরদের মধ্যে বদর আল-জামালী (১০৭৩-৯৪) , আল-আফজাল (১০৯৪-১১২১), আবু আলী আহমদ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তাঁরা খলিফাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নেন।

সুন্নীদের বিরোধিতা

ফাতিমি খিলাফতের চারদিকে সুন্নী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে সুন্নী আব্বাসীয়দের শাসন চলে। ইউরোপের স্পেনে সুন্নী উমাইয়ারা স্বাধীনভাবে শাসন করছিল। ফলে গোটা মুসলিম জাহানে সুন্নীদের প্রবল বিরোধিতার মোকাবিলা করেই শিয়া ফাতিমিদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়। এ সময় শিয়া মতবাদপুষ্ট উগ্রপন্থী কারামাতিয় সম্প্রদায় কাবা আক্রমণ করে হজ্রে আস্ওয়াদ্ লুণ্ঠন করায় সুন্নী ও মধ্যপন্থী শিয়ারা তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। এই ঘটনা বিশেষ করে সুন্নীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং শিয়াদের প্রতি প্রতিশোধের বাসনা বংশ পরম্পরায় চলে আসতে থাকে।

শিয়া মতবাদ প্রচার বিঘ্নিত

ফাতিমিদের প্রথমদিকের খলিফাগণ রাজ্য শাসনের সাথে সাথে শিয়া মতবাদ প্রচারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই প্রচারে ভাটা পড়ে। ফলে জনগণের মন-মানসিকতা শিয়ামত থেকে অন্যদিকে ধাবিত হয় এবং এর বহুধা বিভক্তি ঘটে। ফাতিমি রাজ্যে ঈসমাইলীয়, নিজারীয়, তাইয়েবীয়, দারাজী, কারামাতিয় প্রভৃতি দল-উপদলগুলি মিসর, সিরিয়া, ইয়ামেন, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে স্বতন্ত্র পরিচয়-পতাকা নিয়ে প্রচার-কার্যের ফলে শিয়া মতবাদের খুবই ক্ষতি হয়।

খাদ্যাভাবের প্রভাব : বারংবার দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব ও রাজস্ব ঘাটতি মিসরকে দারূণভাবে দুর্বল করে দেয়। এছাড়া রাজকোষ অর্থশূণ্য হয়ে যাবার কারণে সময় সময় বাইরের শত্রু শক্তির কাছে নিতান্ত হীন স্বার্থে সাহায্য চাইতে হত। এর

প্রভাবে অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট হত। রাজস্বের ঘাটতি মোকাবিলা করতে গিয়ে রাজদরবারের সঞ্চিত সম্পদ, রত্ন ও অলংকারেও টান পড়ে।

সামরিক ক্ষমতা হ্রাস : মধ্যযুগে যে সময় শক্তির উৎস হিসেবে সামরিক বাহিনীর রণকুশলতা, দক্ষতা ও সাহসিকতা অপরিহার্য সে সময় অর্থাৎ ফাতিমি শাসনের শেষ দিকে সামরিক বাহিনী আত্মঘাতী গোষ্ঠীকলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। জনগণের নিরাপত্তার রক্ষাকর্তা হিসেবে সেনাবাহিনীর প্রতি জনগণের যখন শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকার কথা, তখন তারা জনগণের জানমাল ও ইজ্জতের হরণকারীরূপেই পরিচিত হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনীর প্রতি অবহেলা এবং খলিফাদের পক্ষে বিশাল সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের অক্ষমতা তাদের সামরিক শক্তিকে হ্রাস করে যা তাদের পতন ত্বরান্বিত করে।

ক্রুসেডের প্রভাব : ১০৯৭ সালে ক্রুসেডার বা খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধারা জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য এশিয়াতে উপস্থিত হলে ফাতিমিরা তুর্কী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য ধর্মযোদ্ধাদের স্বাগত জানায়। ফল ক্রুসেডারদের পক্ষে প্রাচ্যে অনুপ্রবেশ আরও সহজতর হয়। তারা জেরুজালেম, এডেসা, এন্টিওক ও সিরিয়ার বেশ কিছু অংশ দখল করে নিজেদের শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এমনকি যখন সেলজুক তুর্কীরা মিসরের উপকণ্ঠে তখনও তারা তাদের প্রতিহত করার জন্য বিরাট অংকের ধনরত্ন ক্রুসেডারদের প্রদানে সম্মত হয়। তাদের এই অদূরদর্শী ও আত্মবিনাশী ভাবনা তাদের পতনের কারণ হয়েছিল।

সুন্নী নিপীড়ন : ফাতিমি খলিফাগণ বিশেষ করে খলিফা আল-হাকিম ছিলেন সুন্নী-বিদ্বেষী। আল-হাকিম সুন্নী সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাতে থাকেন। এছাড়া তিনি মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনদের উপহার প্রদান বন্ধ করে দেন। মালিকী মাদ্রাসাও বন্ধ করে দেন। ফলে সুন্নীগণ ফাতিমি খিলাফতের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

অমুসলিম নির্যাতন : অমুসলিমদের উপর নির্যাতন ফাতিমি বংশের পতনের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। ফাতিমি খলিফা আল-হাকিম সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি অমুসলিমদের প্রতি নির্যাতনমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অমুসলিমদেরকে তাঁর তৈরিকৃত বিভিন্ন আইন মেনে চলতে বাধ্য করেন। তাঁর রাজত্বে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান এবং গলায় ক্রুশ ও ঘন্টা পরতে হত। ফলে ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ ফাতিমি খিলাফতের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক অবক্ষয় : ফাতিমি খিলাফতের শেষ দিকে অযোগ্য খলিফারা উযিরদের হাতে রাজ্যের সকল ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে হারেমে বিলাসী জীবন-যাপন করে প্রচুর অর্থ অপচয় করতেন। অন্যদিকে উযিররাও শাসনকার্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে বিপুল অর্থের অপচয় করত। এছাড়া ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর হাতছাড়া হয়ে যাওয়া এবং জেরুজালেমে ক্রুসেডারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বহি:বাণিজ্যে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে রাজকোষ শূণ্য হয়ে পড়ে এবং অর্থের অভাবে ফাতিমি অবকাঠামোগুলো ভেঙ্গে পড়ে। অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ফলে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর আগমন ও ফাতিমিদের পতন : ফাতিমি উযির সাওয়ার তুর্কীদের সাহায্যে উযির পদ লাভ করলেও পরবর্তীতে ফ্রাঙ্কদের সাহায্যে তুর্কিদের সিরিয়ায় তাড়িয়ে দেন। তুর্কীরা যখন মিসরের উপকণ্ঠে তখন তাদের প্রতিহত করার জন্য বিরাট অংকের অর্থের বিনিময়ে তিনি ফ্রাঙ্কদের মিসরে আহ্বান জানান। কিন্তু শেষ রক্ষা হলনা। স্বয়ং খলিফা ও নগরের অভিজাত রমণীদের আমন্ত্রণে সিরিয়ার নুরুদ্দীন জঙ্গি তাঁর সেনাপতি শিরকুহ এবং সালাহউদ্দিনকে ফ্রাঙ্কদের বিতাড়নের জন্য প্রেরণ করেন। মিসরে তুর্কী সেনারা বিজয়ীবেশে প্রবেশ করল। সালাহ্উদ্দীন এবং শির্কুহের গতি রোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শিরকুহ্কে উযিরের পদে নিয়োগ করা হয়। ২ মাস পরে শির্কুহ মৃত্যুমূখে পতিত হলে সালাহ্উদ্দিন উযির পদ গ্রহণ করেন। ১১৭১ সালে সর্বশেষ খলিফা আল-আদিদের মৃত্যু হলে সালাহ্উদ্দিন আব্বাসীয়দের অনুকূলে আইয়্যুবী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। খুত্বায় আব্বাসীয় খলিফার নাম পাঠ করা হয়। আর এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে ২৬২ বছরের ফাতিমি শাসনের।

উপর্যুক্ত নানা কারণে ফাতিমিদের অধঃপতনের ধারা সূচিত হয় এবং এই বংশের শক্তি এতটাই কমে যায় যে তাদের কখনও সেলজুক তুর্কীদের, কখনও ফ্রাঙ্ক ক্রুসেডারদের আবার কখনওবা সিরিয়ার জঙ্গি তুর্কিদের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এমনকি সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর আইয়্যুবী বংশ প্রতিষ্ঠার পর ফাতিমি বংশের পক্ষে কেউ কোন দাবী উপস্থাপন করেনি বা করার সাহস দেখায়নি। ফলে ফাতিমিদের ধ্বংসস্তুপের উপর আইয়্যুবী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামী বিশ্বের একমাত্র শিয়া তথা ফাতিমি খিলাফতের চির অবসান ঘটে।

সারসংক্ষেপঃ

৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ফাতিমি বংশের **১১৭১** সালে পতন ঘটে। ফাতিমিদের শেষ দিকের খলিফাগণ বিশেষ করে আল-হাকিমের পরবর্তী খলিফাগণ ছিলেন অযোগ্য, অদক্ষ, অকর্মণ্য এবং তাদের অধিকাংশই ছিলেন নাবালক। এ সময় প্রকৃত ক্ষমতা উযিরদের হাতে চলে যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, রাজস্ব ঘাটতি অর্থনৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি নানা কারণে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। **১১৭১** সালে সর্বশেষ খলিফা আল-আদিদের মৃত্যু হলে সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী আব্বাসীয়দের অনুকূলে আইয়্যুবী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। আর এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে ২৬২ বছরের ফাতিমি শাসনের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ফাতিমি বংশের পতন ঘটে কত সালে?
   (ক) **১১৭১** সালে (খ) **১২৫০** সালে
   (গ) **১২৫৮** সালে (ঘ) **১৫১৭** সালে

২. সর্বশেষ ফাতিমি উযির-
   (ক) বদর আল-জামালি (খ) ইয়াকুব বিন কিল্লিস
   (গ) ইসা বিন নেসতুরিয়াস (ঘ) সাওয়ার

৩. সর্বশেষ ফাতিমি খলিফা কে?
   (ক) আল-মাহ্দী (খ) আল-আযিয
   (গ) আল-মুইয (ঘ) আল-আদিদ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

সৈয়দ বংশের পতন সম্পর্কে আলোচনা করার সময় ওবায়েদ সাহেব তাঁর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, নানা কারণে এ বংশের পতন ঘটে। এ বংশের সর্বশেষ শাসকের মৃত্যু হলে একজন বীর যোদ্ধার হাতে এ বংশের শাসন অবসান হয়।

ক. কত সালে ফাতিমি বংশের পতন হয়? **১**
খ. ফাতিমিদের পতনের দুটি সাধারণ কারণ ব্যাখ্যা করুন। **২**
গ.উদ্দীপকে সৈয়দ বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত বংশের পতনের প্রধান কারণগুলো পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা করুন। **৩**
ঘ. ফাতিমিদের পতনের ঘটনার বিবরণ দিন। **৪**

পাঠ-১০.৭ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ফাতিমিদের অবদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফাতিমিদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতা ও জ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- জোতির্বিজ্ঞান, চক্ষু ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁদের অবদান আলোচনা করতে পারবেন ও
- তাঁদের শিল্পকলা, স্থাপত্য, নক্শা ও খোদাই শিল্প সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**দারুল্ হিক্মাহ্, আল-আযিযের লাইব্রেরি, আলী বিন ইউসুফ, ইবনে হায়সাম, আল- বাব আল-জাওয়িলা, বাব আল-নাসর ও বাব আল-ফুতুহ্**

৯০৯ সালে উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথমত তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে। পরবর্তীতে তাদের অস্তিত্বের জন্য অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনাও তাদের নিকট মুখ্য হয়ে ওঠে। পাশাপাশি প্রথম দিকের খলিফারা তাদের সাংস্কৃতিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ৯৬৯ সালে মিসর জয় এবং ৯৭৩ সালে কায়রোতে রাজধানী স্থাপনের ফলে একই সময় বাগদাদ, কর্ডোভা ও কায়রো-এই ত্রিমাত্রিক ইসলামী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কায়রো অন্যান্য দিক থেকে বাগদাদ এবং কর্ডোভার সমকক্ষ কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকলেও সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাগদাদ এবং কর্ডোভা থেকে পিছিয়ে ছিল। এর প্রধান কারণ হল ফাতিমিরা তাদের রাজদরবারে জ্ঞানী-গুণীদের আকর্ষিত করতে পারেনি। কারণ ফাতিমি রাজদরবারে তাদের জীবনের নিরাপত্তা কম ছিল। বিশেষ করে ফাতিমিদের শেষ যুগে এই ব্যাপারটি আরও বেশি প্রযোজ্য ছিল। ফাতিমি শাসনামলে পারসিক সংস্কৃতির প্রভাবই ছিল বেশি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতা : ফাতিমিদের মধ্যে যিনি জ্ঞানের প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁর নাম ইবনে কিল্লিস। তিনি একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে প্রতি মাসে ১ হাজার দিনার খরচ করা হত। প্রথম দিকের ফাতিমি খলিফারা সংস্কৃতি-মনস্ক ছিলেন। খলিফা আল-আযিয নিজে একজন কবি এবং বিদ্যুৎসাহী ছিলেন। তিনি আল-আযহার মসজিদকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দারুল্ হিক্মাহ্ : খলিফা আল-হাকিম ১০০৫ সালে শিয়া মতবাদ প্রচার ও শিক্ষার জন্য দারুল্ হিক্মাহ্ বা দারুল্ ইলম্ (Hall of Wisdom/Hall of Science) প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের জন্য তিনি একটি তহবিল তৈরি করেন। এই তহবিল থেকে কিছু অর্থ পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি তৈরি, সংস্করণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হত। এই প্রতিষ্ঠানটি রাজপ্রাসাদের সাথে যুক্ত ছিল। এখানে পাঠাগার ছিল এবং সভার জন্য কক্ষ বরাদ্ধ ছিল। ইসলামী বিষয়সহ জোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদি চর্চা করা হত এখানে। ১১১৯ সালে প্রচলিত ধর্ম বিরোধিতার অভিযোগে উযির মালিক আল-আফজাল এটিকে বন্ধ করে দেন। পরে আবার চালু হয় এবং আইয়্যুবীদের উত্থান পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব ছিল।

রাজকীয় লাইব্রেরি : খলিফা আল-আযিযের সময় রাজপ্রাসাদে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়। সে সময় এই গ্রন্থাগারে ২ লক্ষ গ্রন্থ ছিল। সেখানে ছিল ব্যাখ্যাসহ কুরআনের বিভিন্ন গ্রন্থ। ইবনে মুকলা এবং অন্যান্য বিখ্যাত লিপিকাররা পাণ্ডুলিপি লিখতেন। আল-আযিয তাঁর এই গ্রন্থাগারের জন্য তাবারীর স্বাক্ষরিত তাঁর ইতিহাস বইয়ের একটি কপি সংগ্রহ করেন। ১০৬৮ সালে আল-মুস্তান্সিরের সময় তুর্কীরা কায়রোতে লুটতরাজ চালায় এবং তারা এই লাইব্রেরি থেকে মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ২৫ টি উটের পীঠে চাপিয়ে নিয়ে যায়। এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলো তুর্কী অফিসাররা তাদের বাড়িতে আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করেছিল। এসব বইয়ের মলাট তুর্কী অফিসাররা তাদের ক্রীতদাসদের জুতা মেরামতের কাজে ব্যবহার করত। আল-মুস্তানসিরের বংশধররা এই লাইব্রেরির জন্য নতুন বই সংগ্রহ করেছিল। সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী যখন মিসরে আইয়্যুবী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন তখনও সেখানে লক্ষাধিক বই ছিল। সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী অন্যান্য সম্পদের

মত এই পাঠাগারের কিছু বই তাঁর লোকদের মধ্যে বিতরণ করেন।

জোতির্বিজ্ঞান : আল-হাকিম জ্যোতিষশাস্ত্রে আগ্রহী ছিলেন। তিনি জোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য আল-মুকাত্তাম নামক পর্বতে একটি মানমন্দির স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সময়ে আলী বিন ইউসুফ মিসরের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জোতির্বিদ ছিলেন।

চক্ষু ও চিকিৎসা বিজ্ঞান: ফাতিমিদের একজন বিখ্যাত চক্ষু বিজ্ঞানী ছিলেন ইবনে আল-হায়সাম। চক্ষু বিজ্ঞান ছাড়াও তিনি গণিত, জোতির্বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর চক্ষু চিকিৎসা সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল মানাযির'। মধ্যযুগের চিকিৎসা সংক্রান্ত অধিকাংশ রচনাই ইবনে আল-হায়সামের *Optica Thesaurus*-কে ভিত্তি করে রচিত হয়। রজার বেকন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ও কেপলারের উপর ইবনে আল-হায়সামের প্রভাব সুস্পষ্ট। আল-হাকীমের আমলে আম্মার ইবনে আলী আল-মাওসিল নামক চক্ষুবিদ *'আল-মুন্তাখাব ফি ইয়াজ আল-আইন'* (*Select Materials on the Treatment of Eye/চক্ষু চিকিৎসার উপর নির্বাচিত সামগ্রী*) নামক একখানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নলের সাহায্যে চোখের ছানির অস্ত্রোপচারের বর্ণনা দিয়েছেন এবং এই নল তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। মুহম্মদ আল-তামিমি চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জেরুজালেমে জন্মগ্রহন করেন এবং ৯৭০ সাল নাগাদ মিসরে আগমন করেন।

শিল্পকলা ও স্থাপত্য : ফাতিমিরা শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ অবদান রেখেছিল। ফাতিমি যুগের স্থাপত্যের যেসব নিদর্শন আজও রয়েছে এর মধ্যে প্রাচীনতম হল আল-আযহার মসজিদ। ৯৭২ সালে জওহর এই মসজিদ নির্মাণ করেন। ৯৯০ সালে আল-আযিয আর একটি মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন এবং ১০১২ সালে আল-হাকিম এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। আল-হাকিমের এ মসজিদটি ধ্বংস হয়ে গেছে। ১১২৫ সালে একজন আর্মেনীয় খ্রিস্টান স্থপতি কর্তৃক আল-আকমার মসজিদ নির্মিত হয়। ১১৬০ সালে নির্মিত আল-সালিহ ইবনে রুজ্জিক মসজিদ গাত্রের শিল্প ও লিপিকলা ফাতিমিদের শিল্পকলার খ্যাতি বৃদ্ধি করেছিল। ১০৮৫ সালে মসজিদের সাথে মসজিদ-প্রতিষ্ঠাতার কবর তৈরির প্রথা চালু হয়। আল-মুকাত্তাম পর্বতে বদর আল-জামালী প্রতিষ্ঠিত সমাধি-মসজিদটি এ ধারার প্রথম মসজিদ। এ যুগের শিল্পশোভার স্বাক্ষর বহনকারী তিনটি তোরণ আজও বর্তমান। এগুলো হল বাব আল-জাওয়িলা, বাব আল-নাসর ও বাব আল-ফুতুহ। এডেসার স্থপতিরা এগুলো নির্মাণ করেছিলেন। কায়রোর এই তোরণগুলোর ধ্বংসবশেষ ফাতিমি মিসরের গৌরবের উল্লেখযোগ্য সাক্ষী।

নকশা ও খোদাই শিল্প : ফাতিমি যুগের কাঠের উপর খোদাইয়ের নানাবিধ কাজ রয়েছে। এতে নানা ধরনের পশুপাখির নমুনা খোদাই করা হয়। ব্রোঞ্জের তৈরি আয়না ও হাতলওয়ালা জগের উপরও এ ধরনের কাজ দেখা যায়। বস্ত্র শিল্পে ইরানের প্রভাব ছিল। এ যুগে মিসরের বস্ত্রে জন্তুদের নক্শা করা থাকত। সিরামিকের ক্ষেত্রেও মিসরীয় শিল্পিরা ইরানী শিল্পশৈলীকে অনুসরণ করে। ঐতিহাসিক মাক্রিযি ফাতিমিদের শিল্প-সম্পদের তালিকায় মৃৎ শিল্প ও ধাতব সামগ্রীর কথা উল্লেখ করেছেন। মিসরের তৈরী মাটির জিনিস এতই সুক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ ছিল যে এর ভিতর দিয়ে হাত দেখা যেত।

এছাড়া ফাতিমি যুগের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন ইবনে সালমা আল-কুদাই, যিনি ১০৬২ সালে ফুস্তাতে মারা যান। ফাতিমিগণ একদিকে কর্ডোভার উমাইয়া এবং অন্যদিকে বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের মধ্যস্থিত হওয়ায় ক্রমাগত আক্রান্ত হবার ভীতি জ্ঞান-সাধকদের কায়রোমূখী হওয়া থেকে অনেকটা বিরত রেখেছিল। তদুপরি জোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ:

ফাতিমিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রথম দিকের খলিফাগণ তাদের সাংস্কৃতিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। জ্ঞান চর্চার জন্য একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। খলিফা আল-আযিয আল-আযহার মসজিদকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খলিফা আল-হাকিম প্রতিষ্ঠিত দারুল্ হিক্মাহ্ ছিল জ্ঞান চর্চার একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। খলিফা আল-আযিযের সময় রাজপ্রাসাদে একটি পাঠাগার জোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য একটি মানমন্দির স্থাপন করা হয়। তার আমলে চিকিৎসা বিদ্যা, স্থাপত্য শিল্প ও সাহিত্যে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ফাতিমিদের রাজধানী-
   (ক) বাগদাদ (খ) কায়রো
   (গ) কর্ডোভা (ঘ) দামেস্ক

২. আল-মুকাত্তাম পর্বতে একটি মানমন্দির স্থাপন করেন কে?
   (ক) আল-মাহ্দী (খ) আল-আযিয
   (গ) আল-মুইয (ঘ) আল-হাকিম

৩. আল-আযহার মসজিদকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন কোন্ খলিফা?
   (ক) আল-মাহ্দী (খ) আল-আযিয
   (গ) আল-মুইয (ঘ) আল-হাকিম

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

বেলাল ও হেলাল পরস্পর যদু বংশের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান সম্পর্কে আলোচনা করার সময় উল্লেখ করে যে, এ বংশের প্রথম দিকের শাসকরা সাংস্কৃতিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় তাঁদের প্রতিভা বিকশিত হয়।

ক. ফাতিমি জ্ঞান-বিজ্ঞানে কোন্ কোন্ খলিফার অবদান বেশি? ১
খ. আল-আযিযের রাজকীয় লাইব্রেরির পরিচয় দিন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যদু বংশ সদৃশ ফাতিমি বংশের চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদান আলোচনা করুন। ৩
ঘ. শিল্পকলা, স্থাপত্য ও কারুকার্য শিল্পে ফাতিমিদের অবদান উল্লেখ করুন। ৪

পাঠ-১০.৮ ক্রুসেড

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্রুসেডের বিভিন্ন কারণ আলোচনা করতে পারবেন;
- ক্রুসেডের পর্বসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন ও
- ক্রুসেডের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**জেরুজালেম, সামন্ততন্ত্র, সেলজুক, সম্রাট আলেকসিয়াস কমনেনাস, পোপ আরবান, ক্লেরমোন্ট, ক্যাথলিক ধর্ম, রেনেঁসা ও আধুনিক ইউরোপ**

'ক্রুসেড' শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ। অর্থাৎ খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধকে 'ক্রুসেড' বলা হয়। একাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছরব্যাপী (১০৯৬-১২৯১) ইউরোপের খ্রিস্টানরা যিশুখ্রিস্টের জন্মভূমি জেরুজালেম উদ্ধারের নামে প্রাচ্যের মুসলিমদের সাথে যে ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল ইতিহাসে তা ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন ধারণ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল।

ক্রুসেডের কারণ :

ক্রুসেডের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সংক্ষেপে কারণগুলো নিম্নরূপ:

ধর্মীয় কারণ : যিশুখ্রিস্ট বা হযরত ইসার (আ.) জন্মস্থান, মহানবী হযরত মুহম্মদের (সা.) মিরাজ গমণের স্থান এবং হযরত মুসা, দাউদ ও সুলাইমানের (আ.) স্মৃতি বিজড়িত স্থান হিসেবে জেরুজালেম খ্রিস্টান, মুসলিম ও ইহুদিদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র স্থান। সপ্তম শতক থেকে এটি মুসলিমদের অধীনে থাকে। একাদশ শতকের শেষ দিকে ধর্মোন্মত্ত খ্রিস্টানরা নানা অযুহাতে মুসলিমদের নিকট থেকে জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য ধর্মযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

খলিফা আল-হাকিম ও সেলজুকদের নীতি : ১০০৯ সালে ফাতিমি খলিফা আল-হাকিম তাঁর রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক কিব্‌তি (Coptic) খ্রিস্টানদের খুশি করা ও তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করার জন্য বাইজানটাইনদের সমর্থনপুষ্ট মালেকী খ্রিস্টানদের নিয়ন্ত্রিত জেরুজালেমের প্রধান গির্জা ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। এছাড়া সেলজুক তুর্কীদের অধীনে থাকাকালে খ্রিস্টানদের জেরুজালেমে গমনে বাধা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। আক্রান্ত খ্রিস্টানরা দেশে ফিরে তাদের প্রতি অত্যাচারের কথা স্ব-জাতির কাছে প্রচার করে। এসব কারণে খ্রিস্টানরা জেরুজালেমকে মুক্ত করতে উদ্যত হয়।

ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের প্রভাব : ইউরোপে এ সময় সামন্ততন্ত্র বা ভূমি-কেন্দ্রিক এক ধরনের ব্যবস্থাপনা বা এক কথায় জমিদারতন্ত্র প্রচলিত ছিল যেখানে সামন্তরাজাদের পুত্রগণ আধিপত্য নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করত। খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ তাদের সামরিক দক্ষতা ও শক্তিকে নিজেদের মধ্যে অপব্যয় না করে কৌশলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য ধর্মযুদ্ধের আহ্বান করেন।

বাণিজ্যিক কারণ : মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগরসহ গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বাণিজ্যিক পথগুলো মুসলিমদের দখলে ছিল। এতে খ্রিস্টান ইউরোপ বাণিজ্য সুবিধা হতে বঞ্চিত হয় এবং অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হয়। খ্রিস্টানরা এসব বাণিজ্যিক পথ ও এলাকা দখল করে ব্যবসা-বাণিজ্যে আধিপত্য পুন:প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।

রাজনৈতিক কারণ : ইসলামের আবির্ভাবের পর এর রাজনৈতিক শক্তি পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা, স্পেন ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে যেখানে এক সময় খ্রিস্টানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলিম সাম্রাজ্যের ক্রমাগত সম্প্রসারণে খ্রিস্টানগণ তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বিজীত অঞ্চল পুনরুদ্ধার ও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ধর্মযুদ্ধে যোগদানের পরিকল্পনা করে।

ক্রুসেড আহ্বান : ১০৯৪ সালে সেলজুকগণ অভিযান চালিয়ে বাইজানটাইন রাজধানী কনস্টানটিনোপোলের নিকটবর্তী হলে সম্রাট আলেকসিয়াস কমনেনাস আতঙ্কিত হয়ে পোপের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। পোপ দ্বিতীয় আরবান জেরুজালেমসহ এশিয়া মাইনর পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ১০৯৫ সালে ফ্রান্সের ক্লেরমোন্ট শহরে আহূত এক সম্মেলনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান করেন। ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের পাপমোচন ও স্বর্গ লাভের আশ্বাস দেয়া হয়।

ক্রুসেডের পর্বসমূহ

১০৯৬ সালে সালে প্রথম ক্রুসেড শুরু হয় এবং সর্বমোট ৮টি পর্বে ক্রুসেড সম্পন্ন হবার পর ১২৯১ সালে পরিসমাপ্তি ঘটে। ধর্মযুদ্ধে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ডের ধর্মযোদ্ধাগণ অংশগ্রহণ করে। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জঙ্গী বংশের ইমামুদ্দিন জঙ্গী ও নুরুদ্দীন জঙ্গী; আইয়্যুবী বংশের গাজী সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী, আল-আদিল, আল-কামিল ও মালিক আস-সালিহ; মামলুক বংশের বাইবার্স, কালাউন ও আশরাফ প্রমূখ শাসকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ক্রুসেডের সময় এশিয়া মাইনর, এডেসা, এন্টিয়ক, জাফফা, আক্কা, সিডন, বৈরুত, ত্রিপলি, জেরুজালেম, আলেপ্পো, মসুল, হাররান, হিট্টিন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। ক্রুসেডের একটি পর্বে খ্রিস্টান শিশুদেরকেও নিয়ে আসা হয় যারা পরে ইতালির অসাধু খ্রিস্টান বণিকদের মাধ্যমে দাসে পরিণত হয়। প্রায় দুশ বছর ব্যাপী ধর্মযুদ্ধ জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত জেরুজালেমে মুসলিমরা আধিপত্য বহাল রাখতে সক্ষম হয়।

ক্রুসেডের ফলাফল

ক্রুসেডের ফল সুদূর প্রসারী। ক্রুসেডের মাধ্যমে খ্রিস্টানরা জেরুজালেম উদ্ধার করতে না পারলেও ইউরোপের জন্য ক্রুসেড ব্যাপক ইতিবাচক ফলাফল বয়ে নিয়ে এসেছিল।

প্রাচ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ : ক্রুসেডের ফলে খ্রিস্টান ইউরোপ প্রাচ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। প্রাচ্যে ব্যবহৃত অনেক দ্রব্য নিজেদের দেশে নিয়ে যাবার সুযোগ পায় যে সম্পর্কে ইতোপূর্বে তাদের কোন ধারণাই ছিলনা। মেরিনার্স কম্পাস, সুগন্ধি দ্রব্য, উন্নত কার্পেট, উন্নতমানের কৃষি পদ্ধতি, শিল্পজাত দ্রব্যাদি, লাইটিং, মসলা ইত্যাদি দ্রব্যাদি নিজেদের দেশে নিয়ে যাবার কারণে ইউরোপে এর ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়।

মসলা বাণিজ্য ও ভৌগোলিক আবিস্কার : প্রাচ্যের মসলার ইউরোপে এত চাহিদা ছিল যে ইউরোপীয় বণিকরা প্রাচ্যের সাথে মসলা বাণিজ্য শুরু করে। প্রাচ্যের মসলা বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তারা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে বিকল্প জলপথের আবিস্কার করে। বলা যায় ভৌগোলিক আবিস্কার ক্রুসেডের পরোক্ষ ফল।

ক্যাথলিক ধর্ম প্রচার : ক্রুসেডের ফলে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে রেশারেশির কারণে খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। খ্রিস্টান ক্যাথলিক ধর্মের অনুসারীরা প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মিশনারী স্থাপনের মাধ্যমে তাদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ লাভ করে।

রেনেঁসা ও আধুনিক ইউরোপের সৃষ্টি : ইউরোপের রেনেঁসা বা নবজাগরণ সৃষ্টিতে আরব তথা ইসলামী সংস্কৃতির বিরাট প্রভাব রয়েছে যা ক্রুসেডের মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশ করে। ক্রুসেডের ফলে আধুনিক ইউরোপের জন্ম হয়। কারণ এর ফলে প্রাচ্যের তথা ইসলামী সভ্যতার অনেক উপাদান ইউরোপীয়রা গ্রহণ করার সুযোগ পায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক আরবী পাণ্ডুলিপি প্রাচ্য হতে সংগ্রহ করে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

সারসংক্ষেপঃ

খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধকে ক্রুসেড বলা হয়। ইউরোপের খ্রিস্টানরা মুসলিমদের নিকট থেকে যিশুখ্রিস্টের জন্মভূমি জেরুজালেম উদ্ধারের নামে প্রাচ্যের মুসলিমদের সাথে কথিত ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়। বাইজানটাইন সম্রাট আলেকসিয়াস কমনেনাসের আবেদনের প্রেক্ষিতে পোপ দ্বিতীয় আরবান ধর্মযুদ্ধের আহ্বান করেন। ১০৯৬ সালে সালে প্রথম ক্রুসেড শুরু হয় এবং সর্বমোট ৮টি পর্বে ক্রুসেড সম্পন্ন হবার পর ১২৯১ সালে পরিসমাপ্তি ঘটে। ক্রুসেডের ফলাফল সুদূর প্রসারী। ইউরোপে রেনেঁসা ও আধুনিক ইউরোপ সৃষ্টিতে ক্রুসেড ভূমিকা রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. 'ক্রুসেড' শব্দের অর্থ-
   (ক) অন্যায় যুদ্ধ (খ) পবিত্র যুদ্ধ
   (গ) ন্যায় যুদ্ধ (ঘ) ধর্মযুদ্ধ

২. কোন্ পবিত্র স্থানের আধিপত্য নিয়ে ক্রুসেড শুরু হয়?
   (ক) মক্কা (খ) মদিনা
   (গ) জেরুজালেম (ঘ) ভ্যাটিক্যান

৩. কোন্ পোপ ক্রুসেড আহ্বান করেন?
   (ক) দ্বিতীয় আরবান (খ) জন পল
   (গ) বেনিডিক্ট (ঘ) ফ্রান্সিস

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মারিয়া তার পিতার নিকট জানতে পারল যে, ইউরোপের খ্রিস্টানরা মুসলিমদের নিকট থেকে যিশুখ্রিস্টের জন্মভূমি জেরুজালেম উদ্ধারের নামে প্রাচ্যের মুসলিমদের সাথে এক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবে এই যুদ্ধের পেছনে তাদের অন্য স্বার্থও জড়িত ছিল। প্রায় দুশ বছর ধরে যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ মুসলিম প্রাচ্যের জন্য ক্ষতিকারক হলেও ইউরোপের জন্য অনেক ইতিবাচক ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে।

ক. 'ক্রুসেড' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ক্রুসেডের প্রধান দুটি কারণ ব্যাখ্যা করুন। ২
খ. উদ্দীপকে যুদ্ধ পাঠ্যপুস্তকের যে যুদ্ধকে ইঙ্গিত করে -এর পর্বসমূহ আলোচনা করুন। ৩
ঘ. ক্রুসেডের ফলাফল আলোচনা করুন। ৪

পাঠ-১০.৯ আইয়্যুবী বংশ



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর পরিচয় দিতে পারবেন;
- আইয়্যুবী বংশের উত্থানের বিবরণ দিতে পারবেন ও
- সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও ক্রুসেডারদের সাথে সংঘর্ষের বর্ণনা দিতে পারবেন।

	**মুখ্য শব্দ**	**নজমুদ্দিন আইয়্যুব, কুরুন হামার যুদ্ধ, হিত্তিনের যুদ্ধ, আস্-সালিহ, তুরান শাহ ও শাজারুদ্বার**

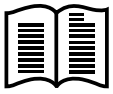

দ্বাদশ শতকে ইউরোপের ক্রুসেডারদের উপর্যপুরি আঘাতে পশ্চিম এশিয়া হতে ইসলাম যখন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিশ্চিহ্ন হবার পথে তখন সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী ইসলামের গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর উত্থানের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ফাতিমিদের পতন ঘটে, অন্যদিকে তেমনি আইয়্যুবী বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এ বংশের মোট ৮ জন শাসক শাসন করলেও সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীই ছিলেন এ বংশের শ্রেষ্ঠ ও সফল শাসক।

সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর পরিচয় : গাজী সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী ১১৩৮ সালে তাইগ্রীস নদীর তীরে তিকরিত নামক স্থানে এক কুর্দি পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পূর্ণ নাম সালাহ্উদ্দিন ইউসুফ বিন আইয়্যুব। 'সালাহ্উদ্দিন' শব্দের অর্থ 'সততার প্রতি বিশ্বস্ত'। পিতা-মাতা ছিলেন কুর্দি। পিতা নজমুদ্দিন আইয়্যুব ইমামুদ্দিন জঙ্গী কর্তৃক বালাবাক্ক-এর সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন। সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর বাল্য, কৈশর ও প্রাথমিক দিনগুলি কেটেছে সিরিয়ায়। ১১৬৪ সাল পর্যন্ত জনসমক্ষে তিনি পরিচিতি পাননি। ১১৬৪ সালে চাচা শিরকুহের সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিসরে যেতে বাধ্য হন। এটাই তাঁর প্রথম অভিযান, আর এর মাধ্যমেই তাঁর সৌভাগ্যের সূচনা হয়। এখানে এসে তিনি দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন: ১. শিয়া সম্প্রদায়ের পরিবর্তে সুন্নী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং ২. ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে ফ্রাঙ্কদের প্রতিহত করা। বিশেষ করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করে তিনি গাযী উপাধি লাভ করেন এবং পরবর্তী ইতিহাসে তিনি একজন যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

আইয়্যুবীয় বংশের উত্থান : ফাতিমি খলিফা আল-আদিদের (১১৬০-৭১) উযির সাওয়ার তুর্কীদের সাহায্যে উযির পদ লাভ করলেও পরবর্তীতে ফ্রাঙ্কদের সাহায্যে তুর্কিদের সিরিয়ায় তাড়িয়ে দেন। তাদের প্রতিহত করার জন্য বিরাট অংকের অর্থের বিনিময়ে তিনি ফ্রাঙ্কদের মিসরে আহ্বান জানান। কিন্তু শেষ রক্ষা হলনা। স্বয়ং খলিফা ও নগরের অভিজাত রমণীদের আমন্ত্রণে সিরিয়ার নুরুদ্দীন জঙ্গি তাঁর সেনাপতি শির্কুহ এবং সালাহ্উদ্দিনকে ফ্রাংকদের বিতাড়নের জন্য প্রেরণ করেন। ১১৬৯ সালে মিসরে তুর্কী সেনারা বিজয়ীবেশে প্রবেশ করে। সালাহ্উদ্দিন এবং শির্কুহের গতি রোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শির্কুহ্কে উযিরের পদে নিয়োগ করা হয়। ২ মাস পরে শির্কুহ্ মৃত্যুমূখে পতিত হলে শির্কুহ্-এর ভাইপো সালাহ্উদ্দিন উযির পদ গ্রহণ করেন। খুতবায় আব্বাসীয় খলিফার নাম পাঠ করা হয়। ১১৭১ সালে সর্বশেষ খলিফা আল-আদিদের মৃত্যু হলে সালাহ্উদ্দিন আব্বাসীয়দের অনুকূলে আইয়্যুবী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ফাতিমি খলিফার নাম বাদ দিয়ে খুতবায় আব্বাসীয় খলিফার নাম পাঠ করা হয়। এই পরিবর্তন ঘটেছিল বিনা প্রতিবাদেই এবং এর ফলে আলোড়ন বা হৈ-চৈ এত কম হয়েছিল যে P. K. Hitti (গ্রন্থ: *History of the Arabs*) বলেন,"এ নিয়ে দুটো ছাগলেও গুঁতোগুতি হয়নি।" ১১৭৪ সালে নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যু হলে তিনি সমগ্র মিসর, নুবিয়ার কিয়দংশ, হিজায ও ইয়ামেনে স্বাধীনভাবে স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন এবং কায়রোতে রাজধানী স্থাপন করেন। আর এভাবেই আইয়্যুবী বংশের উত্থান হয়। পিতা নজমুদ্দিন আইয়্যুবীর নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ আইয়্যুবী বংশ নামে পরিচিত।

মিসরীয় যুগ (১১৬৯-৭৪) : সালাহ্উদ্দিন আইয়্যূবীর শাসনকালকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়: ১. মিসরীয় যুগ (১১৬৯-৭৪), ২. সিরীয় যুগ (১১৭৪-৮৬) এবং ৩. ক্রুসেডারদের সাথে সংঘর্ষ (১১৮৬-৯৩)। মিসরীয় যুগে তিনি ফাতিমি, ক্রুসেডার, নুরুদ্দীন জঙ্গী ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন। এসময় তিনি ক্রুসেডারদের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং ১১৭৪ সালে সিসিলি হতে তাদের বিতাড়ন করেন। আফ্রিকার কাফ্রী সৈন্যদের বিদ্রোহ দমন ও নির্বাসন করা হয়। মিসরীয় ও সুদানী কর্মচারীদের বিদ্রোহ দমনে তাদের নেতাদের হত্যা ও ষড়যন্ত্রকারীদের দক্ষিণ মিসরে নির্বাসিত করা হয়। এ পর্বে তিনি কারাকুশ, বার্কা, ত্রিপলী এবং বড় ভাই তুরান শাহের মাধ্যমে ইয়েমেন জয় করেন।

সিরীয় যুগ (১১৭৪-৮৬) : এ সময় তিনি আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। ১১৭৪ সালে নুরুদ্দীন জঙ্গী মারা গেলে তিনি মিসরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এ স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মূলত আইয়্যূবী বংশের উত্থান হয়। নুরুদ্দীন জঙ্গীর পুত্র ঈসমাইলের সাথে তাঁর কুরুন হামার যুদ্ধ হয় এবং পরে সন্ধির মাধ্যমে এবং ঈসমাইলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কারণে দামেস্ক ব্যতীত অন্যসব অধিকৃত অঞ্চল তাঁকে ফিরিয়ে দেন। ১১৭৫ সালে তিনি আব্বাসীয় খলিফা কর্তৃক এতদ্বাঞ্চলের বৈধ সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এ সময় তিনি ফ্রাঙ্ক রাজা বল্ডউইনের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করে সিরিয়া, মসুল ও আলেপ্পো উদ্ধার করেন।

ক্রুসেডারদের সাথে সংঘর্ষ (১১৮৬-৯৩) : ১১৮৭ সালের ৪ জুলাই ফ্রাংকদের সাথে তাঁর হিত্তিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এতে জয়লাভ করে জেরুজালেম দখল করে নেন। এর ফলে জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস ও ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড তাঁর বিরুদ্ধে ৩য় ক্রুসেড আহ্বান করেন। সম্মিলিত বাহিনী জেরুজালেম উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে ১১৯২ সালে তাঁর সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১১৯৩ সালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

সালাহ্উদ্দিন আইয়্যূবীর উত্তরাধিকারীগণ : সালাহ্উদ্দিন আইয়্যূবীর মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য পুত্র ও ভাইদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। পুত্র আল-আযিয (১১৯৩-৯৮) কায়রো, মালিক আল-আফজাল দামেস্ক, আল-জাহির আলেপ্পো এবং ভাই আল-আদিল কারাক ও শাবাকের শাসনভার লাভ করেন। তবে মিসরের আইয়্যূবীরাই ছিল এই বংশের প্রধান। সালাহ্উদ্দিন আইয়্যূবীর পুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সুযোগে ১১৯৯ সালের মধ্যে আল-আদিল মিসর ও সিরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেন। ফলে আল-আযিযের পর তাঁর পুত্র আল-মনসুর মুহাম্মদের (১১৯৮-৯৯) শাসনের এক বছরের মাথায় আল-আদিল কায়রো-কেন্দ্রিক তাঁর শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'সাফাদিন' বা সাইফ-আল-দীন (ধর্মের তলোয়ার)। ৪র্থ ক্রুসেডে তিনি ক্রুসেডারদের সিরিয়ায় গতিরোধ করেন এবং তাদেরকে শান্তি চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করেন (১১৯৮)। ১২১৮ সালে আল-আদিলের মৃত্যুর পর তাঁর বংশোদ্ভুত আইয়্যূবীরা মিসর, দামেস্ক ও ইরাক শাসন করে। আইয়্যূবী পরিবারের অন্যান্য শাখার শাসকরা হিমস, হামাহ ও ইয়ামেন শাসন করে। আল-আদিলের পুত্র আল-কামিল (১২১৮-৩৮) ক্রুসেডারদের সথে যুদ্ধে আংশিক সাফল্য লাভ করলেও ১২৩৮ সালে জার্মান সম্রাটের নিকট জেরুজালেম হস্তান্তর করেন। আল-কামিলের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আল-আদিল (১২৩৮-৪০) ২ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এরপর আস্-সালিহ (১২৪০-৪৯) ক্ষমতা লাভ করেন। ১২৪৪ সালে খাওয়ারিজমের তুর্কীদের সহায়তায় তিনি জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন। ১২৫০ সালে এ বংশের শেষ শাসক তুরান শাহকে হত্যা করে তাঁর সৎ মা ও আস্-সালিহের ক্রীতদাসী স্ত্রী সাজারুদ্দার মামলুক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আইয়্যূবী শাসনের অবসান হয়।



সারসংক্ষেপঃ

গাযী সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী ১১৩৮ সালে তাইগ্রীস নদীর তীরে তিকরিত নামক স্থানে এক কুর্দি পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। ১১৭১ সালে সর্বশেষ ফাতিমি খলিফা আল-আদিদের মৃত্যু হলে তিনি আব্বাসীয়দের অনুকূলে আইয়্যুবী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৭৫ সালে তিনি আব্বাসীয় খলিফা কর্তৃক বৈধ সুলতান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করে তিনি গাযী উপাধি লাভ করেন। ১২৫০ সালে আইয়্যুবী শাসনের অবসান হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী জাতিতে-
   (ক) পারসিক (খ) তুর্কি
   (গ) কুর্দি (ঘ) বার্বার

২. কোন্ যুদ্ধের মাধ্যমে সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী ক্রুসেডারদের থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করেন?
   (ক) কুরুন হামার যুদ্ধ (খ) হিত্তিনের যুদ্ধ
   (গ) কায়রোর যুদ্ধ (ঘ) এডেসার যুদ্ধ

৩. আইয়্যুবী শাসনের অবসান ঘটিয়ে মামলুক বংশ প্রতিষ্ঠা করেন কে?
   (ক) তুরান শাহ (খ) আস-সালিহ
   (গ) বাইবার্স (ঘ) শাজারুদ্বার

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

আ: করিম একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি 'ক'-বংশের ধ্বংসস্তুপের উপর 'খ'-বংশের অনুকূলে 'গ'-বংশের শাসন প্রাতষ্ঠা করেন। পরে তিনি তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃতির মাধ্যমে স্বাধীন শাসকে পরিণত হন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করে তিনি গাযী উপাধি অর্জন করেন। 'গ'-বংশের অন্যান্য শাসকরা ১২৫০ সাল পর্যন্ত শাসন করেন।

ক. সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর জন্মস্থান কোথায়? ১
খ. সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী কীভাবে ক্ষমতা লাভ করেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত করিম পাঠ্যপুস্তকে যে যোদ্ধাকে নির্দেশ করে তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা দিন। ৩
ঘ. সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর পরবর্তী আইয়্যুবী শাসকদের সম্পর্কে আলোকপাত করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ : ১. ক ২. ক ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ : ১. খ ২. ক ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ : ১. গ ২. গ ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ : ১. খ ২. ক ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫ : ১. গ ২. ঘ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৬ : ১. ক ২. ঘ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৭ : ১. খ ২. ঘ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৮ : ১. ঘ ২. গ ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৯ : ১. গ ২. খ ৩. ঘ

মানবন্টন

এইচএসসি প্রোগ্রাম

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (প্রথম পত্র)

নম্বর বন্টন	**সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের সাধারণ কাঠামো**

পূর্ণমান-১০০

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন- ৬০ নম্বর **৬×১০ = ৬০**

সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৬০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর।
প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১।

এতে প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (Stem) থাকবে যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, সমীকরণ, চিত্র, ম্যাপ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের এ ৪টি অংশে মোট ১০ নম্বর (১+২+৩+৪=১০) থাকবে । প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের ধরন হবে নিম্নরূপ:

প্রশ্নের ধরণ	**নম্বর**
ক. জ্ঞান স্তর-	১
খ. অনুধাবন স্তর-	২
গ. প্রয়োগ দক্ষতা স্তর	৩
ঘ. উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর	৪
	মোট=১০

(খ) বহুনির্বাচনী প্রশ্ন- ৪০ নম্বর

মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্ন ১ নম্বর। ৪০×১ = ৪০

সর্বমোট = ১০০

নমুনা প্রশ্ন

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র (তত্ত্বীয়)

সৃজনশীল অভীক্ষা পূর্ণমান : ৬০ সময় : ২ ঘন্টা ১০ মিনিট

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। (যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিন)]

১। রহীম একটি অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের নিয়ে আলোচনা করছিল। সে বলল, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত। তাদের রাজ্য শাসনব্যবস্থায় পুরোহিততান্ত্রিক প্রভাব ছিল। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই এবং তাদের সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরেই ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হতো। তাদের সামাজিক জীবনে শ্রেণিভেদ বিদ্যমান ছিল। তবে দক্ষতা, কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা একজন ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বদলে দিত। বিষয়টি রহীমের কাছে বেশ ভালো লাগল।

ক. মিসরীয়রা কয়টি ব্যঞ্জনবর্ণের আবিষ্কার করে? ১

খ. মিসরে পিরামিড কী হিসেবে ব্যবহৃত হতো? ২

গ. 'উদ্দীপকের জাতীয় সমাজব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনে ধর্ম আবশ্যক।'-প্রমাণ করুন। ৩

ঘ. রহীমের বর্ণনাকৃত জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কোন্ চিন্তা-চেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে? ব্যাখ্যা দিন। ৪

২। সাংবাদিক আলমগীর ইরাক যুদ্ধের ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করতে বাগদাদে গিয়েছিলেন। সেখানে থাকাকালীন সময়ে সে জনৈক ইরাকির কাছে একটি সভ্যতার গল্প শুনেছিলেন। ঐ সভ্যতার মানুষ কাদামাটির নরম স্লেটে নল খাগড়ার কলম দিয়ে অক্ষরভিত্তিক বর্ণলিপি কিউনিফর্ম উদ্ভাবন করেন। এ থেকে অন্যান্য সভ্যতাও বিভিন্ন শিক্ষা নিয়েছিল। এছাড়া তারা প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার ভিত্তি গড়ে গিয়েছিল।

ক. পেপিরাস কী? ১

খ. মেসোপটেমীয় সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সভ্যতা থেকে অন্যান্য সভ্যতা কী শিক্ষা পেয়েছিল? বাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উক্ত সভ্যতার মানুষেরা প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল-উদ্দীপকে এ উক্তির যথার্থতা ব্যাখ্যা দিন। ৪

৩। 'নারীর ক্ষমতায়ন' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব কবীর তাঁর বর্তমান অবস্থানের পিছনে স্ত্রীর সহযোগিতার কথা অকপটে প্রকাশ করলেন। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনলেন এবং নারীর তৎপরতায় পরিবারের ছোট-বড় সবাই কীভাবে পূর্ণতা পায়, তা অনুধাবন করলেন।

ক. মদিনা সনদের কতটি ধারা ছিল? ১

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে আল কুরআনে 'ফাতহুম মুবিন' বলা হয়েছে- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বিবি খাদিজা (রা.)-এর অবদান মূল্যায়ন করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ন্যায় তৎকালীন নারীর সামাজিক মর্যাদা বিশ্লেষণ করুন। ৪

৪। দৈনিক নয়া বাংলা আয়োজিত '*পাকিস্তান সংবিধান প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*' শীর্ষক সেমিনারে ড. মালিক বলেন, বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার নয় বছর পর সংবিধান লেখা হলেও এদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর কারণ হলো, সব শ্রেণির মতামত এতে প্রতিফলিত হয়নি। অথচ মহানবি (সা.) মদিনায় হিজরতের পর সেখানে অবস্থানরত সব ধর্ম ও গোত্রের মধ্যে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা এড়াতে জনগণকে নিয়ে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করেন। এর মাধ্যমে সেখানে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ক. বদরের যুদ্ধ কত রমযান সংঘটিত হয়? ১

খ. ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদকে-ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদের শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৩

ঘ. সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর ভূমিকা ছিল কালজয়ী- মতামত দিন। ৪

৫। মাওলানা হোসেন এক ধর্মসভায় বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তিনি স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকারের কথা বলেন। তিনি বলেন, সুদ খাওয়া হারাম ও আমানত সংরক্ষণ আবশ্যকীয়। তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের দাস-দাসিদের প্রতি সদয় হতে বলেন। তিনি শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই।

ক. কত সালে মক্কা বিজয় হয়? ১
খ. হুদায়বিয়ার সন্ধির কতগুলো শর্ত উল্লেখ করুন। ২
গ. মাওলানা হোসেন কোন আদর্শ মহাপুরুষের বাণী দ্বারা উদ্দীপকে বর্ণিত বক্তব্য দিয়েছেন? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর বাণী কী ভূমিকা রাখতে পারে? মতামত দিন। ৪

৬। একজন মহাপুরুষের পরলোকগমনের পর তাঁর একজন সহচরকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। কিন্তু এ সময় অনেক গোত্রের দলনেতাগণ তাদের মতাদর্শ ত্যাগ করে পূর্বের ধর্মে ফিরে যান। ফলে নবনির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এসময়ে কঠোরতা ছাড়া প্রাথমিক ইসলামের অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব ছিল না।

ক. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম খলিফা কে ছিলেন? ১
খ. খলিফা আবু বকর (রা)-এর উদ্বোধনি ভাষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. ইসলামের ইতিহাসের কোন ঘটনার উদ্দীপকের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইসলামের ইতিহাসে যে যুদ্ধের নির্দেশ করে সেই যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণ করুন। ৪

৭। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের এক সংকটময় মুহূর্তে আবু বকর (রা) খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি তার যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্র ও ইসলামকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করে গেছেন। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান, ভণ্ডনবী ও স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন দমন করে তিনি শিশু রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি খলিফা হওয়ার পূর্বে ও পরে ইসলামের খিদমতের জন্য যা করে গেছেন, তা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ক. স্বধর্মত্যাগীদের সাথে খলিফা আবু বকর (রা.) এর সংগঠিত যুদ্ধের নাম কি? ১
খ. হযরত উসমান (রা.)-কে যিননুরাইন বলা হয়- ব্যাখ্যা করুন? ২
গ. উদ্দীপকে আপনার পঠিত খলিফার অভ্যন্তরীণ শান্তি, ভণ্ডনবী ও স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলনে ভূমিকা কীরূপ। ৩
ঘ. উক্ত খলিফাকে কেন ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান। ৪

৮। মুর সম্প্রদায়ের দলনেতা আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি। দলনেতা নির্বাচন নিয়ে গোত্রের লোকদের মধ্যে সংঘাত দেখা দিল। দলের বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানী মানুষ হিসেবে সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন আলী সাহেব। মৃত দলনেতার তিনি বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন। আকিব বললেন, আমাদের নেতা হবেন আলী সাহেব। সকলে তাঁর কথা মেনে নিল। আসন্ন সংঘাত থেকে মুর সম্প্রদায় রক্ষা পেল।

ক. হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপাধি কী ছিল। ১
খ. হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরিচয় দিন। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে মিল রয়েছে এমন পঠিত কোন একটি ঘটনার ব্যাখ্যা দিন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যেভাবে নেতা নির্বাচিত হলেন সেভাবে কোন খলিফা নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন? ৪

৯. ভাটি অঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত রসুলপুর গ্রামে ধর্মীয় নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছে। এ পদের প্রার্থী সকলেই গ্রামের বিজ্ঞ মুসলিম। সব প্রার্থীই যোগ্য হবার কারণে ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার বিবেচনায় কে নির্বাচিত হবেন তা নিয়ে সারা গ্রাম মুখরিত।

ক. ইসলামের ত্রাণকর্তা কাকে বলা হয়? ১
খ. খিলাফত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়া মুসলিম খলিফা নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখা করুন। ৩
ঘ. মুসলিম সমাজে উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়ার "বিকল্প নেই"- বিশ্লেষণ করুন। ৪

১০. গণতন্ত্রের মূলকথা হলো সকলের পরামর্শ নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা। রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর সিদ্ধান্ত কারো ওপর চাপিয়ে দিবেন না। এজন্য রাষ্ট্রপ্রধান পরামর্শ গ্রহণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্রাত্যহিক ও নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন করবেন। ব্যক্তির ভুলের কারণে রাষ্ট্রের প্রভুত ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

ক. মহিলা ভণ্ডনবীর নাম কী ছিল? ১
খ. স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. খুলাফায়ে রাশিদীনের কোন খলিফার রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত শাসন পরিচালনার সামঞ্জস্য আছে ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রাষ্ট্র পরিচালনায় পরামর্শ কীভাবে রাষ্ট্রপ্রধানকে সহায়তা করতে পারে পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা বিশ্লেষণ করুন। ৪

নমুনা প্রশ্ন

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র (বহু নির্বাচনি প্রশ্ন)

সৃজনশীল অভীক্ষা পূর্ণমান :৪০ সময় : ৪০ মিনিট

১. কোন নদীর তীরে মিসরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে?
ক. সিন্ধু খ. টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস
গ. নীল ঘ. দজলা

২. মিসরকে বলা হয়-
i. সভ্যতার অগ্রদূত ii. নীলদের দান
iii. ইতিহাসের নীল কন্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. আরবে জনবসতি গড়ে ওঠার পেছনে প্রাথমিক সুবিধা কোনটি?
ক. মরুদ্যান খ. মরুভূমি
গ. তেল সম্পদ ঘ. খালি ভূমি

৪. মহানবী (সা.) কত সালে নবুয়ত লাভ করেন?
ক. ৪৮০ খ. ৬১০
গ. ৬২০ ঘ. ৬২২

৫. মিরাজ বলতে কী বোঝায়?
ক. পথযাত্রা খ. ঊর্ধ্বগমন
গ. সমুদ্র ভ্রমণ ঘ. কাফেলায় ভ্রমণ

\# নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
হযরতের অনুপম চরিত্র এবং সত্যনিষ্ঠার কথা আরবের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় জনৈক মহিলা মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর ব্যবসার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন।

৬. জনৈক মহিলার নাম কী?
ক. হযরত আয়েশা (রা.) খ. হযরত সালমা (রা.)
গ. হযরত খাদিজা (রা.) ঘ. হযরত জয়নব (রা)

৭. উক্ত মহিলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ব্যবসার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন-
i. সত্যবাদী চরিত্রের জন্য ii. সততার জন্য
iii. বিশ্বস্ততার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮. হস্তির বছর বলা হয় কত খ্রিস্টাব্দকে?
ক. ৫৭০ খ. ৫৭১
গ. ৫৯৫ ঘ. ৫৯৬

৯. আলেকজান্দ্রিয়া কোথায় অবস্থিত?
ক. মিসর খ. ইরান
গ. ইরাকে ঘ. আরব দেশে

১০.হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপাধি ছিল-
i. সিদ্দিক ii. আতিক
iii. আব্দুল্লাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১১.হযরত উসমান (রা.) অংশগ্রহণ করেননি-
i. বদরের যুদ্ধে ii. উহুদের যুদ্ধে
iii. খন্দকের যুদ্ধে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

১২.'সাইফুল্লাহ' কার উপাধি ছিল?
ক. আমর ইবনু আস খ. খালিদ বিন ওয়ালিদ
গ. সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ঘ. মুসান্না

১৩.আরবের বাণিজ্য করের নাম কী?
ক. যাকাত খ. জিযিয়া
গ. উশর ঘ. আল-ফাই

১৪.রোমান সাম্রাজ্য জয়ের ফলে-
i. মুসলমানগণ নৌশক্তির অধিকারী হন
ii. মুসলিম জাতি সচ্ছলতা লাভ করে
iii.মুসলমানগণ সভ্যতার সংস্পর্শে আসেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

১৫. খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনকাল কোনটি?
ক. ৬৩০-৬০০ খ্রি. খ. ৬৩২-৬৬১ খ্রি.
গ. ৬৩২-৬৬০ খ্রি. ঘ. ৬৩২-৬৬২ খ্রি.

১৬.'আরব সিজার' কার উপাধি ছিল?
ক. মুয়াবিয়া খ. আব্দুল মালিক
গ. ইয়াজিদ ঘ. হিশাম

১৭.কুব্বাতুস সাখ্‌রা কী ধরনের ইমারত?
ক. গোলকৃতি খ. চতুস্কোণাকার
গ. অষ্টকোণাকার ঘ. আয়তাকার

১৮.দিওয়ান আল খারাজ বলতে কী বোঝ?
ক. বিচার বিভাগ খ. রাজস্ব বিভাগ
খ. শাসন বিভাগ গ. ডাক বিভাগ
ঘ. সামরিক বিভাগ

১৯.খিলাফত প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হচ্ছে–
ক. একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা খ. স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা
গ. জনগণের স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
ঘ. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

২০.যুদ্ধরত অবস্থায় ইমাম হুসাইন ফোরাত নদীর দিকে অগ্রসর হলেন কেন?
ক. শিশু পুত্র আসগরকে পানি পান করাতে
খ. নিজে পানি পান করতে
গ. যুদ্ধের জন্য নদী পার হতে
ঘ. স্ত্রী-কন্যার জন্য পানি আনতে

২১.সেতুর যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে হয়?
ক. ৬৩৫ খ. ৬৩৫ গ. ৬৩০ ঘ. ৬৩৮

২২.আন্দালুসিয়া বলতে কোন দেশ বোঝায়?
ক. উত্তর আফ্রিকা খ. স্পেন
গ. ফ্রান্স ঘ. মিসর

২৩.আব্দুর রহমানদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে স্পেনে আগমন করেন-
i. মুদারীয় ii. হিমারীয় iii. সামানীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৪.কোন যুদ্ধে শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের পতন ঘটে?
ক. সিফ্ফিন খ. উষ্ট্র গ. জাবের ঘ. সেতুর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
প্রেসিডেন্ট X এর আমলে তাঁর স্ত্রী জান্নাতি একটি পয়ঃপ্রণালি খনন করেন এবং এর নাম রাখেন নাহরে জান্নাতি।

২৫.উদ্দীপকের জান্নাতির কাজ কোন সম্রাজ্ঞীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক. হেলেন খ. জুবাইদা
গ. মমতাজ ঘ. জাহানারা

২৬.উক্ত সম্রাজ্ঞী ছিলেন-
i. হারুন অর রশিদের স্ত্রী
ii. আব্বাসীয় খিলাফতের সাম্রাজ্ঞী
iii. হারুন অর রশিদের প্রেমিকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৭.ক্রুসেড বলতে কী বোঝায়?
ক. গৃহযুদ্ধ খ. সাধারণ সামরিক অভিযান
গ. গোত্রীয় কলহ ঘ. ধর্মযুদ্ধ

২৮.আল মাহ্দী কার উপাধি ছিল?
ক. আল হাদীর খ. আল মামুনের
ঘ. ঈশার ঘ. মুহাম্মাদের

২৯.আল-মুইয অধিকার করেন-
i. সিসিলি দ্বীপ ii. মিসর iii. মরক্কো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০.মিরাজ-কে সভাপতি পদে মেনে না নিলে গ্রামে কী হতে পারে?
ক. দলাদলি বৃদ্ধি খ. একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
গ. উন্নয়ন স্থবির হয়ে যেতে পারে।

৩১.খারিজিদের উৎপত্তি হয়-
ক. মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর
খ. দুমাতুল জন্দলের মীমাংসার পর
গ. আলী (রা.)-এর মৃত্যুর পর
ঘ. উষ্ট্রের যুদ্ধের পর

৩২.মুসলিম শাসিত অঞ্চলের অমুসলিম অধিবাসীদের কী বলা হতো?
ক. মাওয়ালী খ. মুহাজির
গ. জিম্মি ঘ. পৌত্তলিক

৩৩.কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার ফলে-
i. শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি
ii. গৃহযুদ্ধের অবসান হয়
iii. খারিজিদের উৎপত্তি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৪.মুয়াবিয়াকে শ্রেষ্ঠ আরব রাজা বলা হয়-
i. বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য
ii. শাসনব্যবস্থা যুগোপযোগী করার জন্য
iii. কূটনৈতিক ব্যবস্থার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৫.দিরহাম বলতে কী বোঝ?
ক. স্বর্ণমুদ্রা খ. রৌপ্যমুদ্রা
গ. দিনার ঘ. তাম্রমুদ্রা

৩৬.আবদুল মালিকের কুব্বাতুস সাখ্রা নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল-
i. যুবায়িরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়া
ii. হজযাত্রীদের মক্কা হতে জেরুজালেমের দিকে আকৃষ্ট করা
iii. হজযাত্রীদের মক্কা হতে সিরিয়ার দিকে আকৃষ্ট করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৭.উমাইয়া বংশের সর্বশেষ কর্মদক্ষ খলিফা কে?
ক. আব্দুল মালিক খ. দ্বিতীয় ইয়াজিদ
গ. উমর বিন আব্দুল আযিয
ঘ. হিশাম

৩৮. কত সালে 'উমাইয়া আমিরাত' প্রতিষ্ঠিত হয়-
ক. ৭৫০ খ. ৭৫৫ গ. ৭৫৬ ঘ. ৭৮০

৩৯.আরবগণ ভারতীয় উপমহাদেশ আক্রমণ করেন-
i. ভারতে অফুরন্ত ধন-সম্পদের জন্য
ii. ভারতীয় জলদস্যু কর্তৃক আরবীয় জাহাজ লুণ্ঠনের প্রতিশোধ গ্রহণ
iii. আরবীয় বিদ্রোহীদের ভারতে আশ্রয় দান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪০.'সাহিবুল খারাজ' কী?
ক. রাজকর্মচারী খ. কূটনৈতিক
গ. রাজস্ব কর্মকর্তা ঘ. তহসিলদার